বাংলা উপন্যাসের কালান্তর

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

নতুন সাহিত্য ভবন
কলিকাতা-২০

প্রকাশক
সুশীলকুমার সিংহ
নতুন সাহিত্য ভবন
৩ শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রীট
কলিকাতা-২০
মুদ্রক
দ্বিজেন্দ্রলাল বিশ্বাস
ইণ্ডিয়ান ফোটো এনগ্রেভিং কোং (প্রাইভেট) লিঃ
২৮ বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা-৯
অঙ্গসজ্জা
পূর্ণেন্দুশেখর পত্রী

প্রথম সংস্করণ : শ্রাবণ ১৩৬৮
দাম নয় টাকা

বন্ধুবর অনিলকুমার সিংহের ঐকান্তিক উৎসাহে অবশেষে 'বাংলা উপন্যাসের কালান্তর' প্রকাশিত হল। স্বদেশ এবং জীবন সম্বন্ধে আগ্রহ উপন্যাস-পাঠকের রসপিপাসার বিশিষ্ট ধর্ম। সেই আগ্রহ নিয়ে একজন পাঠক যদি বাংলা উপন্যাসের শক্তি ও দৌর্বল্য, সৌন্দর্য এবং অসঙ্গতি অনুধাবন করতে চান তা হলে এই গ্রন্থ তাঁর কিছুটা সহায়তা করুক—বর্তমান গ্রন্থকারের উচ্চাভিলাষ এর বেশি কিছু নয়।

বন্ধুবর অজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত নানাভাবে এই গ্রন্থ রচনায় আমাকে সাহায্য করেছেন। তাঁদের গ্রন্থ-ভাণ্ডার যথেচ্ছ ব্যবহার করেছি, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঐকমত্যে পৌছতে না পেরে তাঁদের বিরক্ত করেছি, বই যথা সময়ে ফেরত দিইনি। কিন্তু তাঁরা সমস্তই হাসি মুখে সহ্য করেছেন। আমার সান্ত্বনা শুধু এই যে এগুলি আমাকে ভালবাসার প্রমাণ নয়, আদর্শবান সাহিত্য-প্রেমেরই নিদর্শন। যে-কোনো ব্যক্তির বেলাতেই তাঁরা এরকম করতেন। সুতরাং কৃতজ্ঞতার প্রশ্ন এখানে বোধ হয় অনাবশ্যক।

বন্ধুবর অনন্ত চক্রবর্তী ও সুবীর রায়চৌধুরী নানা মূল্যবান আলাপনে আমাকে চিন্তায় সহায়তা করেছেন। সুবীরবাবুর বহু হুঁশিয়ারী যথাসময়ে নানা দিক বাঁচিয়েছে। গ্রন্থের নামকরণের জন্যও আমি তাঁর কাছে ঋণী।

আমার স্নেহভাজন ছাত্রী শ্রীমতী ইরা রায় বিশেষ যত্নের সঙ্গে গ্রন্থটির নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করে দিয়েছেন। তাঁকে আমার আশীর্বাদ জানালাম।

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

বন্ধুবরেষু—

উপন্যাসের শিল্পরূপের বৈশিষ্ট্য ৯ ॥ উপন্যাসে বিষয়বস্তুর তাৎপর্য ৩১ ॥ উপন্যাসের ভাষারীতি ৫৭ ॥ বাংলা উপন্যাসের জন্মলগ্ন—আলালের ঘরের দুলাল ৭৪ ॥ বঙ্কিমচন্দ্র ও বাংলা উপন্যাসের প্রতিষ্ঠা ১০২ ॥ রবীন্দ্রনাথ ও বাংলা উপন্যাসের নবনিরীক্ষা ১৫৮ ॥ শরৎচন্দ্র ও ঔপন্যাসিকের দ্বিধা ২২৮ ॥ জগদীশ গুপ্ত ও শরৎচন্দ্রের প্রতিক্রিয়া ২৬৬ ॥ তিরিশের যুগ: বাংলা উপন্যাসের দ্বিধামুক্তি ২৮০ ॥ উদ্‌ভ্রান্ত বর্তমান এবং বাংলা উপন্যাস ৩৪১

উপন্যাসের শিল্পরূপের বৈশিষ্ট্য

•• এক ••

ইতিহাস বিচারে যাকে আধুনিক কাল বলা হয় সে-কালের সাহিত্যকর্মের প্রধান এবং শক্তিশালী শাখা হল উপন্যাস—একথা সমালোচকদের দৌলতে আমাদের জ্ঞাত। সে কারণেই উপন্যাসের বিচারকার্যের প্রারম্ভে এবং সমগ্রভাবে উপন্যাস সংক্রান্ত কোনো আলোচনার উপক্রমণিকায় আধুনিক কাল-লক্ষণ ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে। বাংলা উপন্যাস সংক্রান্ত বর্তমান গ্রন্থেও সে আলোচনা যথোপযুক্ত সময়ে হবে। আপাতত আমাদের আলোচনা এ প্রবন্ধের শিরোনামাকে লঙ্ঘন করবে না। উপন্যাসের শিল্পরূপের বৈশিষ্ট্য নির্ধারিত হবার পর বাংলা উপন্যাস আলোচনাকালে কাল-লক্ষণ বিচার প্রাসঙ্গিক হবে।

এ আলোচনায় প্রথমেই একটি অপরিহার্য প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। উপন্যাস সত্যই একটা নির্দিষ্ট শিল্পরূপ বা art-form কিনা? একথা আমরা জানি যে উপন্যাস ছোট গল্প নয়, কবিতা নয়, নাটক নয়। কিন্তু এ তো মাত্র নেতিবাচক পরিচিতি। যে দৃঢ়তার সঙ্গে আমরা একটা সনেটকে বলি সনেট, ছোট গল্পকে বলি ছোট গল্প বা নাটককে বলি নাটক, উপন্যাসের বেলায় সে ধরনের কোনো সুনির্দিষ্ট এবং অব্যর্থ সংজ্ঞা বেঁধে দেওয়া যায় কি না এ বিষয়ে সংশয়ের কিছু অবকাশ আছে। Tristram Shandy, Moby Dick এবং Sign of Four, আবার এদিকে Magic Mountain এবং Ulysses—এর সবগুলিই উপন্যাস বলে অভিহিত। অথচ আমরা জানি যে মবি ডিক-কে সার্থক উপন্যাস আখ্যা দিলে আর ইউলিসিস-কে সে আখ্যাদানের যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে না। আবার সাইন অব ফোর-কে উপন্যাস আখ্যা দিলে ম্যাজিক মাউণ্টেন-এর

জন্য কোন্ সংজ্ঞার সন্ধান করব তা স্থির করা দুরূহ হয়ে পড়ে। এক সময় মোপাসাঁর কোনো উপন্যাসকে কোনো সমালোচক রচনা হিসেবে রসোত্তীর্ণ বলেও উপন্যাস হিসেবে সার্থক বলতে স্বীকৃত হননি। মোপাসাঁ তাঁর একটি বিখ্যাত প্রবন্ধে প্রায় কুড়িখানি উপন্যাসের একটি তালিকা উপস্থিত করেন। উক্ত তালিকাভুক্ত উপন্যাসগুলির একটির সঙ্গে আর একটির এতই পার্থক্য যে একটিকে উপন্যাস বললে আরগুলিকে উপন্যাস বলা যায় না। মোপাসাঁরও প্রশ্ন ছিল এই যে, সার্থক উপন্যাস তাহলে কাকে বলব?

পাঠকের দিক থেকে বিবেচনা করলে এর একটা প্রাথমিক উত্তর মেলে। আমরা যে-বাসনা নিয়ে নাটক দেখতে যাই, অথবা যে-আবেগ নিয়ে একটি কবিতা পড়ি সেই বাসনা এবং আবেগকে আমরা যেমন চিনি এবং জানি উপন্যাসের কাছে আমাদের প্রত্যাশাকে তেমন করে আমরা জানি চিনি কিনা এর ওপরেই সার্থক উপন্যাস বলতে সঠিকভাবে আমরা কী বুঝি তার উত্তর নির্ভর করবে। নাটকে জীবনের ব্যাখ্যাকে আমরা হৃদয়স্থ করি দৃশ্যের মাধ্যমে। নাটক দৃশ্য-মাধ্যমী জীবন-ব্যাখ্যা। যেহেতু নাটকের প্রাথমিক আবেদন প্রত্যক্ষভাবে আমাদের শ্রুতির কাছে এবং দৃষ্টির কাছে তাই সংক্ষিপ্তি নাটকের মূল লক্ষ্যের অন্যতম। এই সংক্ষিপ্তিকে শিল্পোজ্জ্বল করতে গিয়ে নাট্যকার জীবন থেকে ঘটনা এবং চরিত্রকে নাটকের মতো করে, নাট্যকারের মনোভাব নিয়ে নির্বাচন করেন। ঘটনার এবং চরিত্রের স্ব-স্ব অথবা পরস্পর দ্বন্দ্ব নাটকের অনিবার্য বিষয়। নাট্যকারের এই বিষয়-বৈশিষ্ট্যের কাঠিন্য নাট্যসূত্রের একটি প্রধান নির্দেশের ভিত্তি-নির্ভর। সেটা হল সময়ের অতিপাত। সময়ের অতিপাত বা passage of time নাটকের প্রধান কথা। এই সময়ের অতিপাতকে নাটকে পূর্ণমাত্রায় ব্যবহার না করলে অতি বিশিষ্ট চরিত্র-কল্পনাও হানিগ্রস্ত হয়। সময়ের অতিপাতের বাস্তব-নিষ্ঠ প্রতিফলনের জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত objective co-relative-এর। এলিয়ট সাহেব তাঁর বিখ্যাত হ্যামলেট-বিষয়ক প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে উপযুক্ত objective co-relative-এর অভাবে হ্যামলেট চরিত্র স্থিতিধর্মী হয়ে পড়েছে। পটোত্তলনের পর যে বিন্দু থেকে ঘটনার যাত্রা যবনিকাপাতের সময় সেই বিন্দু থেকে ঘটনাকে অনেকখানি এগিয়ে আসতে হবে। না হলে নাটকের প্রথম ও প্রধান শর্তই লঙ্ঘিত হয়।

অথচ আমরা জানি যে উপন্যাসে এ রকম কোনো কঠিন নিয়ম নেই। Passage of time বা সময়ের অতিপাত উপন্যাসের পক্ষে একটা প্রধান কথা হতেও

পারে, আবার নাও পারে। ওঅর অ্যাণ্ড পীস-এ অবশ্যই সময়ের অতিপাতের ব্যবহার ঘটেছে। কিন্তু ইউলিসিস্-এর উপন্যাস-মহিমা নিশ্চয় সময়ের অতিপাতের ওপর নির্ভরশীল নয়। সময়ের পরম্পরাও এ উপন্যাসে রক্ষিত হওয়া আবশ্যক নয়।

সে কারণেই মনে হয় যে নাটকের জন্য যে ধরনের নাটকীয় অনুভূতি প্রয়োজন, কবিতার জন্য যে-রকম কাব্যিক অনুভূতির দরকার উপন্যাসের জন্য সে-ধরনের কোনো স্বতন্ত্র অনুভূতির আবশ্যক নেই। স্রষ্টা এবং ভোক্তা উভয়েই এখানে কাব্য এবং নাটকের চেয়ে বৃহত্তর প্রান্তরে উপস্থিত। এবং এটাই উপন্যাসের শিল্পরূপকে উপলব্ধি করার গোড়ার কথা। এখানে একটা পুরনো কথা আমাদের স্মরণে আসতে পারে যে, উপন্যাসকার কবি এবং নাট্যকার অপেক্ষা স্বাধীন। কথাটির মধ্যে যেন একটি প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত আছে যে, কাব্যে এবং নাটকে যে সাংগঠনিক কাঠিন্য বিদ্যমান, যে আঙ্গিকগত অনুশাসন উপস্থিত, ঔপন্যাসিক তা থেকে মুক্ত বলে তিনি অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক অবস্থানের অধিকারী। অথচ এ অনুমান একেবারেই মিথ্যা। বরঞ্চ পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে এই 'স্বাধীনতাই' উপন্যাসকারের দুরূহ সমস্যার স্থল।

নাট্যকারকে শুধু নাটক জানলেই চলে, কবিকে শুধু কবিতা। কিন্তু উপন্যাসকার জানেন যে জীবন শুধু নাটক নয়, শুধু কবিতাও নয়। তিনি জানেন যে জীবন নাটক, কাব্য, কাহিনী এবং হয়তো আরো অনেক কিছু। তাই উপন্যাস সর্বগ্রাসী। শ্রেষ্ঠ উপন্যাসকার সর্বত্রচারী। সাহিত্য-শিল্পের যতগুলি শাখা সবগুলিরই, অর্থাৎ কবিত্ব, নাট্যরস এবং কাহিনীরস সকল কিছুরই উত্তরাধিকারকে বহন করছে উপন্যাস। তাই সাহিত্য-শিল্পের আর কোনো শাখাই উপন্যাসের মতো সর্বার্থসাধক নয়। কিন্তু তাই বলে এটা ঔপন্যাসিকের পক্ষে কোনো সহজ উত্তরাধিকার নয়। কখন নাটকীয় দৃশ্য পরিকল্পনা কার্যকরী হবে, কখন কার্যসিদ্ধি ঘটবে কবিত্বময় বর্ণনায় তা উপন্যাসের জটিল অভিজ্ঞতায় দীক্ষিত লেখকের পক্ষেই মাত্র জানা সম্ভব। তাই ঔপন্যাসিককে সর্ব-রস-সিদ্ধ হতে হয়। উপন্যাস-পাঠককেও হতে হয় সর্ব-রস-ভোক্তা। হাতে সকল শক্তির সম্বল আছে বলেই কিন্তু ঔপন্যাসিকের যথেচ্ছ ব্যবহারের অধিকার নেই। যথাসময়ে নাটক পরিহার করে অকস্মাৎ কবিত্বময় বর্ণনার আশ্রয় গ্রহণ, অথবা যেখানে শুধু একটা বিশদ বর্ণনাতেই কাজ হতে পারত সেখানে গুরুগম্ভীর নাটকীয় দৃশ্য পরিকল্পনা কেবল যে উপন্যাসের আঙ্গিকবিন্যাসেরই হানি ঘটায়

শুধু নয়, লেখকের বিষয়ভাবনাও যে কতখানি ব্যক্তিত্বগ্রস্ত তারও পরিচয় দেয়। এবং এই কাব্য-রস, কাহিনী-রস, এবং নাট্য-রস সকলকেই একাধারে সমন্বিত করবার যে প্রচণ্ড শক্তি উপন্যাসের অধিগত, তার মূল রয়েছে উপন্যাসের শিল্প-মহিমার একান্ত স্বাতন্ত্র্যের মধ্যেই। উপন্যাসের সঙ্গে জীবনের সম্পর্ক সর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ। দ্বন্দ্বময় চরিত্র সৃজনে সফল হলেই ভালো নাটক সৃজিত হয়। অনুভূতিকে চিত্রকল্পময় করতে পারলেই কবিতার সাফল্য আসে। কিন্তু উপন্যাস জীবন সম্বন্ধে সামগ্রিক বোধ সঞ্চারিত করতে না পারলে সে ব্যর্থ। জীবনের গোটা রূপই উপন্যাসকারের ধ্যেয়। জীবনের সঙ্গে এই নিবিড় সম্পর্কের কথা স্মরণ রেখেই উপন্যাসের শিল্পবৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে হেনরি জেম্‌স্ তাঁর সুবিখ্যাত Art of Fiction প্রবন্ধে বলেছেন :

As people feel life, so they will feel the art that is most closely related to it. This closeness of relation is what we should never forget in talking of the effort of the novel.

এই closeness of relation বা জীবনের সঙ্গে সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতার বিচার উপন্যাসের শিল্প-বিচারের প্রধান কথা। এবং জীবনের ঘনিষ্ঠতাব বিষয়টি স্পষ্ট উপলব্ধির জন্যই উপন্যাসেব জন্মলগ্নের প্রসঙ্গ অপরিহার্য।

•• দুই ••

উপন্যাস যে the interpretation of human life by means of fictitious narrative in prose—জনশ্রুতিব দৌলতে একথা আমাদের মুখস্থ। যে কোনো শিল্পরূপেবই আঙ্গিক তাৎপর্য (significance of form) সেই শিল্পেব জীবন-ব্যাখ্যার বিশিষ্টতাব ধাবক। এখন মূল বিষয় হল এই যে উপন্যাসে জীবন এবং জীবন-ব্যাখ্যা দুইই- আমাদের কাম্য। উপন্যাসের কাছ থেকে আমরা জীবনের সার্মাগ্রক রূপের সন্ধান চাই। সমাজ এবং সমাজ বিধৃত মানুষ, প্লট এবং প্লট-নির্ভর জীবনই উপন্যাসের উপাদান। তাই শত আয়োজনেও উপন্যাস উপন্যাস নয়, যদি না তা পূর্ণাঙ্গ জীবনবোধক হয়ে ওঠে। এই কারণেই যখন আমরা বলি যে উপন্যাসের কোনো একক ফর্ম নেই, তখন উপন্যাসের এই জীবন ঘনিষ্ঠতার কথা স্মরণ বেখেই তা বলি। যেহেতু জীবনের কোনো নির্দিষ্ট ফর্ম নেই সেই হেতু জীবনের এই নিকটাত্মীয় শিল্পেরও কোনো বিশেষ ফর্ম নেই।

বস্তুত উপন্যাসের জন্মও হয়েছিল কোনো বিশেষ শিল্প-পিপাসা বা রূপ-(form) জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি সাধনের জন্য নয়। বরঞ্চ তীব্র জীবন পিপাসার তৃপ্তিসাধনের জন্যই উপন্যাসের জন্ম। এবং সমস্ত উপন্যাসকেই বুঝতে হবে এই দিক থেকে।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের সাহিত্যেতিহাসের অগস্টান পিরিয়ডে ইংলণ্ডের উপন্যাস সাহিত্যের যথার্থ উদ্বোধন হয় এক শক্তিশালী art-form বা শিল্পরূপ হিসাবে। নিজ বিশিষ্টরূপে উপন্যাস যে এ যুগেই স্বতন্ত্র হয়ে উঠবে তার উপযুক্ত ঐতিহাসিক কারণও এ যুগে উপস্থিত ছিল। ইংলণ্ডের ইতিহাসে এমন কতকগুলি সামাজিক রূপান্তর এ যুগে সংঘটিত হয়েছিল যা বিশেষ তাৎপর্য-সূচক।

ইংলণ্ডের ইতিহাসে এই যুগেই প্রথম সাধারণ মানুষের জীবনাচরণকে জীবনাদর্শ বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সাধারণ মানুষ বলতে যে সংখ্যা-তাত্ত্বিক হিসাবের গড়পড়তা মানুষের কথা ভাবা হয় এ সাধারণ মানুষ সেই বর্ণহীন জনসমষ্টি নয়। এ যুগের কর্মচঞ্চল জীবন্ত ব্যক্তির কথাই এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। ভোট যুদ্ধে ব্যস্ত রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ে উদ্যোগী বণিক শ্রেণী, শুভ নীতিবোধে আস্থাবান ধর্মপ্রচারক, দুঃসাহসী ভ্রমণকারী, জমিদারী নিয়ে ব্যস্ত গ্রামীণ ভদ্রলোক, সেতু-পথ-খাল নির্মাণে অগ্রণী কারুবিদ, সামাজিক স্বভাবসম্পন্না মহিলা, চিকিৎসক, আইনজীবী, নাবিক, দোকানদার, সৈনিক সব মিলিয়ে গঠিত হয়েছিল এই পাবলিক। অবশ্যই এই সাধারণ মানুষ এবং তার কার্যকলাপের কোনো পর্যায়ই নতুন কথা নয়। কিন্তু এই বিচিত্র-কর্মা সাধারণ মানুষ নিজের নিজের জীবন সম্বন্ধে এ যুগে হয়ে উঠেছিল অসীম আগ্রহী। এ যুগের লেখকেরও কাজ ছিল তাই কর্মিষ্ঠ বহুমুখী আশাশীল এই সাধারণ মানুষের জীবনকে রূপায়িত করা।

এ যুগের এই পাবলিকই ছিল লেখকের বিস্তৃত পাঠকমণ্ডলী। তৎকালীন প্রধান শিল্পচেষ্টা প্রবন্ধ, উপন্যাস এবং সামাজিক কবিতা। এই বিশিষ্ট ত্রিধারার দিকে লক্ষ্য রাখলেও বোঝা যায় কতখানি পাবলিক-সচেতন ছিলেন তখনকার লেখক। নতুন উদ্যোগী শ্রেণীর উদয়ে পুরাতন পৃষ্ঠপোষকদের দরবারী শৃঙ্খল ছিঁড়ে তৎকালীন লেখকদের দল এই ব্যাপক পাঠকমণ্ডলীকেই আশ্রয় করেছিলেন। এবং সে-যুগের সাধারণ মানুষও সাহিত্যে নিজেকেই প্রতিবিম্বিত দেখতে চাইত। তীব্র জীবনাগ্রহে এ যুগের মানুষের ব্যক্তিস্বরূপ ঘরে বাইরের

জীবন সম্বন্ধে, বিশ্ব প্রকৃতি সম্বন্ধে হয়ে উঠেছিল গভীর কৌতূহলী। জীবনের ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল ব্যাপারেই মানুষ আবিষ্কারের আনন্দ খুঁজে পেত। এই অসীম আগ্রহী মানুষ সাহিত্যেও পেতে চাইত নিজেকেই। এ যুগের সাহিত্যাগ্রহ প্রকৃতপক্ষে জীবনাগ্রহেরই এক বিশেষ অচ্ছেদ্য অংশ ছিল। ব্যক্তির জাগরণের আলোকে এ জীবনাগ্রহের অনন্য মূল্য। এর কারণ এই, ঘরে বাইরে ইংলণ্ডের বাণিজ্যের তখন বিস্তৃতি ঘটছে। বণিক এবং সওদাগরদের কণ্ঠে তখন সমাজের দেওয়া বরমাল্য। উপন্যাসের চরিত্রে নাটকের চরিত্রে তখন এঁদেরই ঘন ঘন আবির্ভাব ঘটছে। বসওয়েলের একটি উক্তি সমকালীন ইংলণ্ডীয় মধ্যবিত্তের প্রাণের কথা বলে বিবেচিত হয়ে থাকে :

"In this great commercial country, it is natural that a situation which produces much wealth should be considered as very respectable."

জাতীয় জীবনে এই respectability-র সাধক যাঁরা তাঁরাই ইংলণ্ডের সেই বিখ্যাত gentleman বা ভদ্রলোক শ্রেণী। সর্বতোমুখী কর্মচঞ্চলতায় জীবনাগ্রহী এই ভদ্রলোক শ্রেণী তখন গড়ে তুলেছিলেন এক বাস্তব-উপযোগী মানবতাবাদ বা practical humanism। জাতীয় জীবনের সকল দিকেই—সাহিত্যে রাজনীতিতে দর্শনে বুদ্ধি যুক্তি (লক্ এবং হিউমের প্রভাব) এবং এই বাস্তব উপযোগী মানবতাবাদের প্রাধান্য বিস্তারের ব্যাপার এ সময়ে লক্ষ্য করা যায়। যে ভদ্রলোক শ্রেণী এই প্রাধান্যবিস্তারের শক্তিশালী মেরুদণ্ড তাদের ইতিবাচক স্বরূপটিও প্রণিধানযোগ্য। শোভন আচরণ-বিধি এবং সৌজন্যের ধারণাই ভদ্রলোক শ্রেণীর একমাত্র পরিচয়চিহ্ন ছিল না। নীতিবাদী ধর্মীয় বিশ্বাস, নৈতিক এবং দৈহিক সাহস, মানসিক এবং শারীরিক উদ্দীপনা এবং সংস্কৃতিমনস্কতা--এক কথায় যা কিছু সমাজ প্রগতির সহায়ক সমস্তই ছিল নবধা কুল লক্ষণের মতো ভদ্রলোকের পরিচয়চিহ্ন। "A man completely qualified as well for the service and good, as for the ornament and delight, of society." এই ধরনের মানুষের উদ্দেশ্যেই অগস্টান যুগের দার্শনিক, সাহিত্যিক এবং রাজনীতিবিদ তাদের কর্মধারাকে প্রবাহিত করে তুলেছিলেন।

ইংলণ্ডের উপন্যাস সাহিত্যের বনিয়াদ দৃঢ় হয়ে ওঠে এই ভদ্রলোক শ্রেণীর ঘরে বাইরে আত্মবিস্তৃতির যুগে। আগেই বলা হয়েছে শিল্পাগ্রহ অপেক্ষা

জীবনাগ্রহই এর মূলে অপেক্ষাকৃত অধিক মাত্রায় সক্রিয় ছিল। ব্যক্তির নিজ কীর্তি সম্বন্ধে নব মূল্যবোধের উৎসে ছিল নবীন জিজ্ঞাসা।

•• তিন ••

এই জীবনাগ্রহেব জন্যই এ যুগের প্রধান ঔপন্যাসিকবৃন্দ যথা ডিফো, ফিল্ডিং, রিচার্ডসন এবং স্মলেট সকলেই তাঁদের উপন্যাসের জীবন জীবনেরই মতো প্রতীয়মান করানোর জন্য বেশি তৎপর ছিলেন। এঁরা কেউ ছিলেন ছাপাখানার মালিক, কেউ ছিলেন বা সাংবাদিক, কেউ বা অনুরূপ কিছু। সমকালেব জীবনের ঘূর্ণবাত্যাব কেন্দ্রে ছিলেন এঁরা অধিষ্ঠিত। স্বভাবতই স্বকালীন মর্মবাণীতে এঁরাও বিশ্বাসী ছিলেন দৃঢভাবে। সে মর্মবাণী হল: Follow nature অথবা Portray the world as you see it—যে বিশ্বসংসার দর্শন করেছ তাকেই রূপায়িত করো। একে অনুসরণ করেই Restoration Comedy জীবনের প্রতি বিশ্বস্ত ছিল। এ যুগের উপন্যাসে Restoration Comedy-র প্রভাব প্রকৃতপক্ষে জীবনকে যা দেখেছ 'সে ভাবেই চিত্রিত করো' এই বাণীরই অনুসবণ মাত্র।

শ্রীমতী ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্‌ ডিফোর উপন্যাসকে truth-teller জাতীয় উপন্যাস বলেছেন (তাঁর Phases of Fiction প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। এ-কথা বলার পিছনে যে-যুক্তি তিনি প্রয়োগ কবেছেন তা হল এই: এ জাতীয় উপন্যাসেব প্রধান গুণ এবা আমাদের বিশ্বাসবৃত্তিকে পরিতোষণ করে। ঘটনার যে বিবরণ এ জাতীয় উপন্যাস থেকে পাওযা যায় সে সম্বন্ধে আমাদের তিল মাত্র সন্দেহ থাকে না। বর্ণিত ঘটনা যেন চোখের সামনেই ঘটছে এমন মনে হয়। "Belief is completely gratified by Defoe. Here the reader can rest himself and enter into possession of a large part of his domain. He tests it, he tries it, he feels nothing give under him or fade before him." যে কারণের জন্য শ্রীমতী উল্‌ফ্‌ ডিফোর উপন্যাসের স্থান truth-teller শ্রেণীর মধ্যে নির্দেশ করেছেন অবশ্যই সেই কারণের জন্যই অপর একজন সমালোচক ডিফোর উপন্যাস-ধর্মকে narrative realism বলে আখ্যাত কবেছেন। আমরা যদি ডিফো সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করতাম তা হলে একা ডিফোর প্রসঙ্গই বিশেষভাবে আলোচিত হত। কিন্তু আমরা দেখাতে চাইছি এ যুগের বাস্তব জীবনাগ্রহ। এ যুগের শিল্পাগ্রহ যে

বাস্তব জীবনাগ্রহেরই আত্মীয় এ কথাটাই উপন্যাস প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখা দরকার। স্যামুয়েল রিচার্ডসন এ যুগের আর একজন প্রধান ঔপন্যাসিক। "A faithful and chaste copy of real life and manners." ছিল রিচার্ডসনের লক্ষ্য। এ যুগের গদ্যরীতির যে-ধর্ম—খুঁটিনাটি বাস্তব ব্যাপারের তন্নিষ্ঠ বর্ণনা প্রদান—তাকে রিচার্ডসনও যেন ডিফোর শিল্পের মতোই অনুসরণ করেছেন।

আবার স্মলেট এবং ফিল্ডিংও এই লক্ষ্যেরই ভিন্নপন্থার পথিক। লেস্‌লি স্টিফেন ফিল্ডিং-এর আলোচনাকালে ফিল্ডিং-এর প্রধান গুণের কথা বলতে গিয়ে তাঁর সবিশেষ বাস্তবানুগ চিত্রাঙ্কন ক্ষমতার বিষয়ে বলেছেন। এ যুগের চিত্রশিল্পী হগার্থের মতো তিনিও তাঁর দৃষ্টিসীমার ভিতরে যা কিছু আসতো তাকেই বিশ্বস্ততার সঙ্গে তুলে ধরতেন। ("We have the conviction that the man has given an absolutely faithful portrait of all that came within the sphere of vision.")

আমাদের আলোচ্য যুগে—যে যুগে উপন্যাসের প্রাধান্য বিস্তারের সূচনা হয়েছিল —যে যুগে সাধারণ মানুষের কর্মধারা তথাকথিত বৃহৎ মানুষের কীর্তি অপেক্ষা সাধারণ মানুষের মনে অনেক বেশি কৌতূহলের সঞ্চার করেছিল—এই বহুমুখী বিচিত্রপন্থী মানুষের জীবনই উপন্যাসের বিষয়। উপন্যাসের কাছে জীবনের থেকে বড়ো আর কিছু নেই। উপন্যাসের শিল্পরূপের যে নমনীয়তা সেটা এসেছে এই বিশুদ্ধ জীবনকে সামগ্রিকভাবে অঙ্গীভূত করার প্রয়াস থেকে। যে যুগে জীবনকে নতুনভাবে দেখা হয়, বোঝা হয় সে-যুগেই জীবনের ইতিবাচকতার পাদপীঠে উপন্যাসের নব নব ভাব, নব নব রূপায়ণ লক্ষ্য করা যায়। এই উপলব্ধি ও দর্শনের তারতম্যের ওপর কিংবা প্রকারভেদের ওপর নানা যুগের উপন্যাসের প্রভেদও নির্ভর করে।

যেমন ধরা যাক অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর উপন্যাসের তুলনামূলক পার্থক্যের কথা। অষ্টাদশ শতাব্দীর স্বাস্থ্যবান সর্বদর্শী বাস্তবতা এবং উনিশের শতকের ভাববাদী চরিত্রায়ন ও কাব্যিক অনুভূতি শুধু অগস্টান যুগের সুস্থ জীবনাগ্রহ এবং ভিক্টোরীয় ভাববাদ বলে ব্যাখ্যা করা যায় না। আসলে অষ্টাদশ শতক ছিল ইংলণ্ডের ইতিহাসে নতুন শ্রেণীর আত্মবিকাশের কাল। এ সম্বন্ধে আর্নল্ড কেট্‌ল্ তাঁর An Introduction to the English Novel নামক অপরিহার্য পাঠ্য পুস্তকে বলেছেন যে এ-যুগে যে নতুন বাণিজ্যিক শ্রেণীর উদ্ভব হল ঈশ্বর

নির্ধারিত ধর্ম, গির্জা এবং রাষ্ট্রবোধের কারাগারে স্বভাবতই তাঁরা আর বন্দী থাকতে চাইলেন না। স্বাধীনতাই ছিল তাঁদের মূল মন্ত্র। সেই নতুন সমাজের মানুষের পক্ষে তখন প্রয়োজন ছিল সেই কর্মচঞ্চল সমাজের উপযোগী একটা নব্যদর্শন সৃষ্টি করা। তা তাঁরা করেছিলেন। সে-যুগের উক্ত নতুন মানুষের দল পূর্বতন শতাব্দীর সামন্তযুগীয় কাঠামোকে ভেঙে ফেলতে চাইছিলেন নিজ অস্তিত্বরক্ষার তাগিদেই। কেননা স্বাধীনতা ছাড়া এই নতুন শ্রেণীর পক্ষে জীবনধারণ ও নানা মুখে সম্প্রসারণ ছিল অসম্ভব। স্বাধীনতা ছাড়া ব্যবসা-বাণিজ্য, অনুসন্ধান-আবিষ্কার কিছুই কল্পনা করা যেত না। অষ্টাদশ শতাব্দীর নবোদিত বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বাধীনতা স্পৃহারই অপর নাম জীবনাগ্রহ।

কোনো প্রকার সমাজতাত্ত্বিক হবার ভান না করেই এই সহজ শিক্ষালব্ধ সত্য কথাটার আবৃত্তি করা চলে যে, উনবিংশ শতাব্দী জীবনবোধের ঐ দুঃসাহসিক আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছিল। জীবনেব সঙ্গে উপন্যাসের শিল্পরূপের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ বলে জীবনের স্রোত শুকিয়ে যাবার মুখোমুখি হলেই, অথবা জীবনের ভারসাম্যে কথঞ্চিৎ ব্যত্যয় ঘটলেই জীবন-স্পর্শ-প্রবণ উপন্যাস-শিল্পে তার প্রভাব অনুভূত হবে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকেই ইংলণ্ডের উপন্যাস-সাহিত্য সে-জাতীয় প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হল। বাণিজ্যপন্থী ভদ্রলোক এবং আত্মসচেতন ভূস্বামী অভিজাতের সুবর্ণ দিবস ততক্ষণে গত হয়েছে। শিল্পবিপ্লবের প্রচণ্ড তাড়নায় এক অতিশক্তিধর শিল্পপ্রভুশ্রেণীর আবির্ভাব ঘটল।

এর অবশ্যম্ভাবী ফল হল—যে-সামাজিক এবং জাতীয়, অখণ্ড ভবিষ্যৎ দৃষ্টি অষ্টাদশ শতকের প্রথমপাদে (সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে) রাজত্ব করছিল তা ভেঙে গেল। শোষিত ধ্বংসমুখী গ্রামীণ কৃষিজীবন, নবোদ্ভূত নগর, নগর-জীবনের ধনীদরিদ্রের বিপুল অসাম্য, ভারতবর্ষের অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে লুণ্ঠন এবং অন্যদিকে আমেরিকার প্রথম গণতন্ত্রী সরকাররূপে আত্মপ্রকাশ—উনবিংশ শতকের প্রধান ইতিহাস সূত্র। চার্টিস্টদের অগ্নিগর্ভ বিক্ষোভের কথা স্মরণ রাখলে হ্যামণ্ড দম্পতির মতো গত শতাব্দীর প্রথম পঞ্চাশ বছরকে আখ্যা দিতে হয় Bleak age বা Age of discontent.

এই অসন্তোষের যুগে এটা স্বাভাবিক যে উপন্যাস চিন্তারও মৌল পরিবর্তন দেখা যাবে। অষ্টাদশ শতাব্দীর গদ্যগত বাস্তবতার চেয়েও এ যুগের ঔপন্যাসিকদের কাছে কবিসুলভ আদর্শীকরণের ব্যাপারটা অধিকতর প্রয়োজনীয় বলে মনে হয়েছিল। তাই স্কট্ থেকে ডিকেন্স পর্যন্ত প্রায় সকল ঔপন্যাসিকেরই poetic

idealization-এর ঝোঁক স্পষ্ট। এটাকে ইংলণ্ডের রোমাণ্টিক যুগের কাব্য-প্রসাদের সঙ্গে ভিক্টোরীয় যুগের বিস্তৃত মধ্যবিত্ত পাঠকসমাজের সখ্য স্থাপনের চেষ্টা বললে ভুল হবে। সামাজিক খণ্ডীভবনের সম্মুখে মীমাংসায় অক্ষম শিল্পীর আদর্শীভবনের কাব্যাশ্রয় গ্রহণই এর মূল কথা। স্বভাবতই আগের শতাব্দীতে বস্‌ওয়েল যে respectability সাধনার কথা বলেছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর স্থূল বস্তুতন্ত্রী প্রলুব্ধতার যুগে সেটা হয়ে উঠেছিল একান্তই surface respectability।

সুতরাং অষ্টাদশ শতাব্দীর গদ্য-কাহিনীর মুখ্য লক্ষ্য যেখানে ছিল পাঠক জনসাধারণের বিশ্বাসবৃত্তিকে তোষণ করা, উনবিংশ শতকের গদ্য-কাহিনীর মূল লক্ষ্য সেখানে দাঁড়াল পাঠকের কল্পনাকে আকৃষ্ট করা। বস্তুত বাস্তব জীবনের যে অসম্পূর্ণতার যন্ত্রণা থেকে রোমাণ্টিকতার জন্ম, উপন্যাসের দীর্ঘ বিস্তৃত পটে কবিত্ব অঙ্গীভূত হয়েছে সে অসম্পূর্ণতার যন্ত্রণা থেকেই। ভিক্টোরীয় যুগের আপাত-উজ্জ্বল বর্ণাবরণের অন্তরালে ছিল এই অসম্পূর্ণতাব বোধ। অবশ্যই ডিকেন্স ভিক্টোরীয় যুগের রোমাণ্টিকতা-বিরোধী প্রতিক্রিযার অন্যতম প্রতিনিধিস্থানীয় লেখক। ওয়ার্ডসওযার্থের মতো শান্ত কিংবা শেলীব মতো ঝঞ্ঝাঘন প্রকৃতি কখনও ডিকেন্সের মূল বিষয় ছিল না। জনাকীর্ণ লণ্ডন শহবেব বিভিন্ন পরিবেশ, লণ্ডন শহরের অলিগলি, তাব নিম্ন-মধ্যবিত্ত জীবনের নানান চিত্র ও এই রকম নানা ধবনের অসংখ্য খুঁটিনাটি ডিকেন্সকে আকৃষ্ট করেছে বেশি। লণ্ডন শহরের এই নতুন চেহারাকে সমগ্রভাবে ধরার চেষ্টাই ডিকেন্সের চেষ্টা। উপন্যাসের অনাসক্ত হাস্যরস-দৃষ্টি ডিকেন্সের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এবও মূলে সক্রিয হয়ে রয়েছে তাঁর সর্বগামী অনুভূতির সর্বৈব বিকাশ। সাধারণ ছোট মানুষের জীবনের নাটক এবং প্রাণশক্তিকে আবিষ্কার করা, আত্মসন্ধিৎসু ঐহিকতাবাদকে আঘাত হানা ডিকেন্সের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই দিক দিয়ে ডিকেন্স প্রকৃতপক্ষে এ-যুগের আত্মাকে অনুসন্ধান করেছিলেন। ডিকেন্সের কথা কিন্তু কখনই সমাপ্ত হবে না যতক্ষণ না আমরা ডিকেন্সের শিল্প প্রচেষ্টার প্রতিটি অংশের প্রাণ-স্পন্দনশীল কবিত্বের আভাটুকুর কথা বলছি। স্বভাবতই এ কবিত্ব রোমাণ্টিক যুগের প্রসাদসম্পন্ন নয় বরঞ্চ ঐ কবিত্বকে আত্মীয়তার দিক থেকে এলিজাবেথানদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এ-কথা বলা যায়। Poetic fantasy-র ব্যবহারে স্বচ্ছ হাস্যরসের প্রয়োগে ডিকেন্সের কবি প্রতিভা তাঁর উপন্যাসকে অনন্য মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে। এ প্রসঙ্গে সমালোচকেরা Bleak House

উপন্যাসের কুয়াশা বর্ণনার কথা উল্লেখ করে থাকেন। আসলে ডিকেন্সের কবিত্ব উপন্যাস-অতিরিক্ত কোনো ব্যাপার নয় বরঞ্চ বলা যেতে পারে সমগ্র উপন্যাসের আত্মাতেই এই কাব্যশ্রীর অধিষ্ঠান।

শুধু ডিকেন্স নন ভিক্টোরীয় যুগের আর একজন প্রধান শিল্পী জর্জ ইলিয়টের ক্ষেত্রেও এই কবি কল্পনার প্রশ্ন ওঠে। জর্জ ইলিয়টকেই বলা যেতে পারে যে আপাদমস্তক ভিক্টোরীয় যুক্তিবাদের দ্বারা দীপ্ত হয়ে তিনি তাঁর সমগ্র উপন্যাসের পবিমণ্ডলে একটি মননশীল দৃষ্টিভঙ্গিকে বাবহার করেছেন। জর্জ ইলিয়টের চরিত্রগুলি আমাদের বিশ্বাস উৎপাদন কবাব জন্য কেবল বহিরঙ্গ বিবরণের যথার্থতাকে বহন করাব কাজেই ব্যবহৃত হয় না। "Her portraits are all primarily portraits of the innerman"—এই innerman-কে অনুসন্ধান করার জন্যই জর্জ ইলিয়ট পূর্ববর্তী শতাব্দীর তুলনায়, এবং তাঁর ভিক্টোরীয় পূর্বসূবীদের অপেক্ষা জটিলতর চরিত্রকে অঙ্কন করার ব্যাপারে অধিক পারদর্শিতার এবং প্রবণতার পবিচয় দিয়েছেন। ডিকেন্সের ন্যায় অথবা অনুরূপ আর কারো মতো বাইবেব মানুষটাকে নিয়ে জর্জ ইলিয়টের কারবার ছিল না।

জেন অস্টেন, ডিকেন্স এবং জর্জ ইলিয়টের প্রয়াসের কথা স্মরণে রেখেও এ-কথা বলা চলে যে অষ্টাদশ শতকের উপন্যাসেব গৌরবমহিমা চ্যানেলের অপর পারেই বরঞ্চ অধিষ্ঠিত ছিল। ইংলণ্ডকে অপেক্ষা করতে হয়েছে হেনরি জেম্‌স্ কন্‌রাডের লেখনী ধারণ পযন্ত, তবে সে আবার হতে পেরেছে উপন্যাসের ক্ষেত্রে স্বর্ণপ্রসূ। উনবিংশ শতকের উপন্যাসের আদর্শ পুরুষ বালজাক, স্তঁাদাল এবং নিঃসন্দেহে অনেকখানিই টলস্টয়। হয়তো এ প্রসঙ্গে ইংলণ্ডের সাম্রাজ্যমহিমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ভিক্টোবীয় আপাতসন্তুষ্টি এবং surface respectability-র কথা উত্থাপিত হতে পারে, এবং চ্যানেলের ওপারে কিংবা কন্টিনেন্টের শেষপ্রান্তে জীবনের এবং সমাজের সর্বস্তরে ইতিহাসের যে নির্মম টানাপোড়েন চলছিল তার কথাও স্তঁাদাল এবং টলস্টয় প্রসঙ্গে আলোচিত হতে পারে—বলা যেতে পারে যে সমাজ এবং সভ্যতার ময়ালমন্থর জরদ্গব মূর্তি স্বভাবতই উপন্যাস শিল্পীকে অলস করে তোলে, স্বভাবতই সে অবস্থায় পাঠকের কল্পনাবৃত্তিকে তোষণ করার জন্য উপন্যাসের স্বাভাবিক বিকাশ অপেক্ষা ঔপন্যাসিককে কবিত্বাভিমুখী হতে হয়। এবং এ কবিত্ব লালন করার জন্যই অনেক সময় উপন্যাসের চরিত্রকে উপন্যাসের পূর্বনির্দিষ্ট প্লটের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হয়। হার্ডি সম্বন্ধে ফর্স্‌টার সাহেবের অভিযোগ-বাণীটিও এ প্রসঙ্গেই স্মরণ করা

চলতে পারে।

কিন্তু আমরা জানি যে এ ধরনের সমাজতাত্ত্বিক টীকাভাষ্য প্রণয়নে কদাচই শিল্পের গূঢ় রহস্য ব্যাখ্যাত হতে পারে না। দান্তের কালে তাঁর সমকালীন স্বাদেশিক সভ্যতা ও সমাজের সঙ্গে শেক্‌সপীয়রের স্বদেশের ও সমাজের সমসাময়িক রূপের প্রতিতুলনার মধ্যে উভয় মনীষার তারতম্যের কোনো সূত্র সুপ্ত হয়ে নেই সে কথা এলিয়ট সাহেবের দান্তে-বিষয়ক প্রবন্ধের মারফতে আমরা জানি। মুকুন্দরাম এবং শেক্‌সপীয়র উভয়ে সমপ্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন এবং কেবল একজনের সমাজ আর একজনের থেকে হীনতর ছিল বলে প্রতিভার ফলেরও তরতম হয়েছে একথা কিছুকাল পূর্বে হয়তো মানাত কিন্তু এখন আমরা জানি এ হাস্যকর উক্তি অর্থহীন। কাজেই স্তাঁদাল এবং টলস্টয় উভয়ে স্বদেশীয় এবং স্বকালীন সমাজ সভ্যতাব নানা টানাপোড়েনের আনুকূল্য পেয়েছিলেন বলেই মহৎ উপন্যাসের জনক হতে পেরেছিলেন এ-কথা সত্য নয়।

সমাজ এবং সভ্যতার অন্তরের অসঙ্গতি মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের কাছে যত স্পষ্ট হয়েছে, যত তার খণ্ডীভবনকে তাঁরা অনুভব করেছেন ততই ঔপন্যাসিকেরা চরিত্রাঙ্কনে অন্তর্মুখিনতার আশ্রয়ী হয়েছেন। এই অন্তর্মুখিনতা বা inwardness-এর সাহায্যে ফ্লবেয়াব ও দস্তয়েভস্কি যেমন উপন্যাসের ক্ষেত্রে আঙ্গিকরীতির বিশিষ্টতা সৃজন করেছেন—ইংরাজি সাহিত্যে তেমনি হেনরি জেম্‌স্‌ উপন্যাসে আধুনিকতার জনক হয়ে রইলেন—তাঁর প্রখর আঙ্গিক সচেতনতার জন্য এবং বক্তব্যগত বিশিষ্টতার জন্য। আঙ্গিক সচেতনতার জন্য জেম্‌স্‌কে ফ্লবেয়ারের সঙ্গে তুলনা করা হয়ে থাকে। প্রকরণের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিশীলতা শুধুমাত্র শেষ ভিক্টোরীয় সৌখিন রুচিবিলাস হিসাবে জেমসের কাছে প্রতীয়মান হয়নি। উচ্চ কোটির মানুষের আপাতশান্ত এবং বিশ্রব্ধ জীবনের অন্তর্লগ্ন ক্ষয়িষ্ণুতা চিত্রণের বেলায় তিনি বালজাকেরই স্মৃতিবহ। তাঁর প্রথম প্রধান উপন্যাস 'দি পোর্ট্রেট অব এ লেডি' প্রসঙ্গে তাঁর রচনাকালীন মন্তব্য স্মরণীয়। তিনি বলেছেন যে উপন্যাসটির প্রধান বিষয় বা বক্তব্য হল কেমন করে মুক্তি এবং সম্ভ্রমের প্রয়াসী একটি তরুণী প্রথানুগত্যের যাঁতায় নিষ্পেষিত হল। ন্যূনাধিক পরিমাণে জেম্‌স্‌ জীবনকে এই রূপকেই ভেবেছেন এবং রূপায়িত করেছেন। স্বভাবতই এই জাতীয় চরিত্র-চিত্রণের জন্য বৃহৎ ঘটনামুখাপেক্ষী হওয়া অপেক্ষা চরিত্রের অন্তর্মুখিনতাকে রূপান্বিত করে তোলা অধিক তাৎপর্যবাচক। কেননা ভালো বা মন্দ, ন্যায় বা অন্যায়ের সংঘাতমূলক কাহিনীতে ঘটনার ডাক পড়ে অবশ্যম্ভাবী হিসাবে। জেম্‌স্‌-এর

নায়ক-নায়িকাদের নৈতিকতাই তাদের কর্তব্য নির্ধারণের জনক। ইসাবেলের শেষ প্রত্যাখ্যানের মধ্যে যে গভীর আত্মমর্যাদার বোধ বিদ্যমান তার মধ্যে ঔচিত্য অনৌচিত্যের প্রশ্ন অপেক্ষা ইসাবেলের জীবনের প্যাটার্নটাই বেশি সক্রিয়। যে মর্যাদা, যে শুচিতা মানুষের পরমার্থ এবং জীবনার্থ উভয় ক্ষেত্রেই হয়ে পড়েছিল বন্ধ্যা, জেম্‌স্‌ মননশীলতায় এবং কবিকল্প বাগ্‌বিন্যাসে সেই মর্যাদার ট্র্যাজেডিকেই এ ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ করেছেন। জেন অস্টেন এবং জর্জ ইলিয়টে পাত্রপাত্রীর আন্তর সত্তার স্বরূপ বিচারের যে প্রাধান্য জেম্‌স্‌-এর সাহিত্যকর্মে বক্তব্য-সূত্রে তা অধিকতর অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কে যুক্ত।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে, বহুধাখণ্ডিত জীবন-ব্যাখ্যার সূত্রে অন্তর্মুখিনতাই উপন্যাসের প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়াল, ফ্রয়েড এবং ইয়ুং-এর প্রভাব অবশ্যই এখানে সক্রিয় ছিল। কিন্তু বোধকরি সমাজের ও সভ্যতার মর্মশায়ী গভীর অসুস্থতার চেতনা মানুষের মনোময় সত্তার সন্ধানী হয়ে উঠেছিল স্বাভাবিক নিয়মে। এমন কি, বর্ণাঢ্যতা, বীর্যবত্তা, চূড়ান্ত পরিস্থিতি প্রবণতা কন্‌রাডের আপাত-লক্ষণ হলেও উপন্যাসের গঠনসৌষ্ঠবের আশ্চর্য মহিমায় চরিত্রের অন্তর্গামী স্বরূপকে ফুটিয়ে তোলার জন্যই তিনি ব্যস্ত ছিলেন অধিক। বিংশ শতাব্দীর প্রথমপাদের ঔপন্যাসিকেরা—অন্তত যাঁরা পরিচর্যাশীলতায় বৃহৎ পাঠক সমাজ অভিমুখী নন—ফ্লবেয়ারের শিল্পপ্রাণতার অভিনিবেশী শিষ্য ছিলেন এই কারণে যে অব্যর্থ রূপক, অব্যর্থ প্রতীক প্রয়োগে তাঁরাও ফ্লবেয়ারের মতোই স্থির লক্ষ্য খুঁজছিলেন। ফ্লবেয়ার যে একদিকে ইওরোপের সর্বাপেক্ষা প্রভাবশীল ঔপন্যাসিক সেটা এই শিল্পপ্রাণতার দিক থেকে অনুধাবনযোগ্য। জয়েস এবং লরেন্স উভয়ের বিপুল বৈপরীত্য সত্ত্বেও, সদৃশ-লক্ষণ বোধ হয় এইখানে যে উভয়েই প্রতীকে এবং কাব্যের অনুশাসনে উপন্যাসের শিল্পকর্মকে সমৃদ্ধ করতে চেয়েছেন। পৃথকভাবে দুজনেই কাব্য চর্চা করেছেন। এবং দুজনেই উপন্যাসে দৃশ্যের অতীতকে ধরতে চেয়েছেন। লরেন্সের প্রতীক সে ক্ষেত্রে লরেন্সের সহায়ক, জয়েসের গদ্যের কাব্য-কল্প অবিচলতা তাঁর বিষয়ের বাহন।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে যত দিন যেতে লাগল ততই formal realism-এর শক্তিমান গদ্য-মাধ্যম বিষয়গত বাস্তবতার দায় পরিহার করে, বিষয়ের অতীতে বা স্বরূপে পৌছনোর জন্য কাব্যের দ্বারে প্রার্থী হতে লাগল। উনিশের শতকের শেষবর্তী দিকে যখন থেকে social disintegration ধীরে ধীরে অনুভূত হয়েছে, তখন থেকেই উপন্যাসের ফর্মে গদ্যের বস্তু-লক্ষ্য, ঋজু অনুশাসন

অপেক্ষা কাব্যের আবহাওয়া ধীরে ধীরে স্পষ্ট হতে লাগল। উপন্যাস সাহিত্য জীবনের নিকটতম শিল্পকলা বলে উপন্যাসের প্রসঙ্গে একটা ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়। জাতির জীবনের চিত্রকলা, কাব্যধারা, অর্থাৎ জীবন-বিষয়ক সমকালীন সমস্ত কিছু থেকেই উপন্যাস নিজের প্রাণ-বায়ুর কিছু-না-কিছু অংশ সংগ্রহ করে থাকে। হার্ডির উপন্যাসে চিত্রকল্প, রূপকের প্রয়োগ, কাব্যময় ভাষা ওয়েসেক্সের আঞ্চলিক জীবনধারার সঙ্গে যেমন অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কিত—সেখানকার লোকজীবনের অনিবার্য অভিব্যক্তি তেমনি আবার হার্ডির পরাভবাত্মক বিষয়বস্তুর প্রসঙ্গে, এই সব কাব্যময়তা অপরিহার্য। লরেন্স এবং জয়েসও মানুষের আত্মা এবং সমগ্র মনোলোকের বিন্যাস আয়ত্ত করতে গিয়ে কাব্যের এবং গদ্যের অন্তর্বর্তী ব্যবধানকে কমিয়ে এনেছেন।

লরেন্স এবং জয়েস যখন ইংলণ্ডের উপন্যাস-গগনের প্রধান জ্যোতিষ্ক তখন ইংলণ্ডের মধ্যবিত্ত শ্রেণী আপন বন্ধ্যাত্বে দার্শনিক-শূন্যতায় ক্লান্ত। ইংলণ্ড যে টমাস মানের মতো ম্যাজিক মাউন্টেন সৃষ্টি করল না, এবং আলেক্সি টলস্টয়ের অগ্নিপরীক্ষার মতো উপন্যাস সৃজন করেনি এর কারণ ইংলণ্ডের মধ্যবিত্তশ্রেণীর অভিজ্ঞতার বিশিষ্টতার মধ্যেই অনুসন্ধেয়। জাতীয় অভিজ্ঞতার ব্যক্তি-রূপকের আধার উপন্যাসের রসোত্তীর্ণতার যোগ্যতর ধারক। মান-এর ব্যক্তিমানস ইওরোপীয় সংস্কৃতির সংকটের ব্যাকুল চেহারাকে যতটা উপলব্ধি করেছিল তার মধ্যে আবহমানকালের সংস্কৃতির ঐশ্বর্যের চেতনা প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে। অগ্নিপরীক্ষায় একটা জাতির অগ্নিপরীক্ষার পর্বের যন্ত্রণা রূপান্বিত। লরেন্স এবং জয়েসের সংকট চেতনায় এই-জাতীয় ব্যাপকতার সর্বতোমুখী যন্ত্রণা জ্বলন্ত ছিল না। ইংলণ্ডের মধ্যবিত্ত শ্রেণী বিংশের প্রথম পাদে মাত্র নিজশ্রেণীর সংকটকে অস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করেছে। ইংলণ্ডের সংকটকে নয়, ইওরোপের সংকটকেও নয়। সেই শ্রেণী আপন বন্ধ্যা পর্যায়ে শুধুমাত্র মূল্যের ভাঙনগুলিকে প্রত্যক্ষ করেছে। জয়েস এবং লরেন্স দু-দিক থেকে এই ভাঙনের ছায়াবহ। বহু ভগ্নাংশে পরিকীর্ণ অস্তিত্বের খণ্ডীভবনের প্রবল প্রতিক্রিয়ায় পৃথকভাবে লরেন্স এবং জয়েস নিজ নিজ শিল্প মাধ্যমের সন্ধানী হয়েছেন। এই সন্ধানের পশ্চাতে যে পরিমাণে শিল্পীর সততা সে পরিমাণে শিল্পের সমস্যাও বিদ্যমান এবং সে সমস্যার উৎস নিঃসন্দেহেই জীবন।

বর্তমান পরিচ্ছেদে ইংরাজি উপন্যাস সাহিত্যের যৎসামান্য সীমারেখাগত পরিচয় বাংলা উপন্যাস সাহিত্য সংক্রান্ত আলোচনা-গ্রন্থে নানা কারণে প্রাসঙ্গিক।

জীবনের জন্য নিবিড় আগ্রহে অনন্য এই শিল্প মাধ্যমে সমাজ এবং সভ্যতার নানা-কালের টানাপোড়েন, দ্বন্দ্ব, নানা গভীর প্রশ্ন সদাই প্রত্যক্ষ ছায়াপাত করে। জীবন প্রত্যক্ষ সৃষ্টিবাচকতায় পূর্ণ হলে উপন্যাসেও আসে মানুষের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ও প্রত্যক্ষ সংকটের ছায়া এবং তদুপযুক্ত মাধ্যম বা আঙ্গিকরীতি—জীবন অবক্ষয়ে ক্লান্ত, কর্মসার্থকতাহীন পরোক্ষ এবং নেতির সম্মুখীন হলে তার প্রসঙ্গ প্রকরণও বিভিন্ন। ডিফো-ফিল্ডিং থেকে লরেন্স-জয়েস সেই ইতিহাস। বাংলা উপন্যাস আলোচনাকালে এই সূত্র আমাদের সহায় হবে।

•• চার ••

আসল কথা ঔপন্যাসিকের পক্ষে সর্বাপেক্ষা বড়ো বিষয় হল জীবনের সমগ্রতার সন্ধান। সে সন্ধানের প্রেরণা সর্বত্রই উপস্থিত। বলা বাহুল্য আমরা আগেই বলেছি যে উপন্যাস জীবনের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। জীবনের এই আত্মীয়তাকে স্বীকার করে নিয়ে উপন্যাসকার জীবনের সামগ্রিক রূপের সন্ধান করেন। এই সামগ্রিকতা ব্যতিরেকে কখনই সার্থক উপন্যাস সৃজিত হতে পারে না। ইউলিসিস পযন্ত যতগুলি সার্থক উপন্যাসের কথা আমরা স্মরণে আনতে পারি, সকল ধরনের এবং সকল বিষয়ের উপন্যাসেরই প্রধান কথা হল এই সমগ্রতা। আমরা ইংলণ্ডের যে-যুগের উপন্যাস সাহিত্যের কথা বললাম সে-যুগে নিশ্চয়ই ডিকেন্স, জেন অস্টেন প্রমুখের রচনায় এই সমগ্রতার সন্ধান উপস্থিত ছিল। কিন্তু এই সন্ধানের সার্থকতর রূপ তখনই সৃজন করা যায় যখন উপন্যাসকারের নির্ভীক নিরাসক্তি জীবন সন্ধানে লেখককে সম্পূর্ণ সংস্কারমুক্ত করে তোলে (স্তাঁদাল এবং বালজাক এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়)। ভিক্টোরীয় ইংলণ্ডের surface respectability-র যুগে এই নির্ভীক নিরাসক্তি ছিল ব্যাহত। যখন আমরা হার্ডির চরিত্রকে প্লটের কাছে কবিত্বময় আত্মসমর্পণ করতে দেখি, কিংবা দেখি ডেভিড কপারফিল্ডের আশ্চর্য বাস্তবতাবোধের অবান্তর স্নিগ্ধ পরিসমাপ্তি এবং এরই পাশাপাশি যখন আমরা দস্তয়েভস্কির (যাঁর ওপর ডিকেন্সের প্রভাব নাকি বিদ্যমান) ক্রাইম অ্যাণ্ড পানিশমেণ্টের নায়কের যন্ত্রণার কথা ভাবি, কিংবা রেজারেকসনের নেখল্যুডফ চরিত্র প্রসঙ্গ চিন্তা করি একমাত্র তখনই এই নির্ভীক নিরাসক্তির ব্যাপারটা আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়। উপন্যাসে আসক্তি মানেই আংশিকতা।

এ নির্ভীক নিরাসক্তির ফল কিছুতেই বাস্তবের স্থূল অতিবর্ণনা নয়। তা যদি

হত তাহলে নিশ্চয়ই আমরা ভিক্টোরীয় শুচিবায়ুতার পটভূমিকায় জোলা-র প্রসঙ্গ উত্থাপন করতাম। কিন্তু আমরা জানি যে এ প্রসঙ্গে জোলা-র গুরুদেব ফ্লবেয়ার-এর কথা যদিবা উত্থাপিত করা চলে জোলা নৈব নৈব চ। সামগ্রিকতা মানে totality of objects এবং totality of objects মানে cataloguing of details নয়; নয় শুধুমাত্র পরিধিগত পৃথুলতা। আসলে এটা লেখকের অভিজ্ঞতার প্রদর্শনী নয়। লেখকের জীবনবোধ পূর্ণবৃত্ত হয়ে উঠতে পেরেছে কিনা এইটাই প্রধান কথা। উপন্যাসকার যে জীবন আমাদের সামনে হাজির করেন সে জীবন সামগ্রিক এই কারণে যে সে জীবন সৎ নয়, অসৎ নয়, শুদ্ধ নয়, অশুদ্ধ নয়, নীতিতুষ্ট নয়, নীতিগ্রস্ত নয়; সেই জীবন মানসোৎসুক হংস যে সব সময় উত্তীর্ণ হতে চাইছে; সে জীবন সেই সীতা যে বারংবার অগ্নি পরীক্ষার ভিতর দিয়ে নিজের শুদ্ধ স্বরূপের পরিচয় দেবে কিন্তু পরীক্ষার কখনও অন্ত হবে না। এই সমগ্র জীবনকেই অডিসি, ইলিয়াড, রামায়ণ, মহাভারতের মহাকবিরা একদিন ধরবার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁদের আশ্চর্য বোধের সামনে আমাদের যে এখনও স্তম্ভিত হয়ে যেতে হয় তার কারণ এই সর্বতোমুখী সমগ্রতা। যিনি পিতৃসত্য পালনের জন্য বনে যান তিনি পত্নী পুনরুদ্ধারের জন্য বালীবধ করেন। মানুষের এই পরীক্ষাই প্রকৃতপক্ষে জীবনের সামগ্রিকতার পরীক্ষা। যিনি এতে উত্তীর্ণ হন তিনি মহাকবি—একালে মহৎ ঔপন্যাসিক।
সেই জন্যই বলা হচ্ছে যে শুধুমাত্র অভিজ্ঞতা বা প্রত্যক্ষ দর্শনের সাহায্যেই এই সামগ্রিক বোধের জন্মদান সম্ভবপর নয়। সামগ্রিক বোধ তখনই সৃজিত হতে পারে যখন ঔপন্যাসিকের জীবন অভিজ্ঞতা একটা নৈতিক সচেতনতায় শেষ পর্যন্ত মণ্ডিত হয়ে ওঠে। আর্নল্ড্ কেট্‌ল্ তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থে উপন্যাসের প্রধান উপাদান কী এ-কথা নির্দেশ করতে গিয়ে বলেছেন যে উপন্যাসে থাকা চাই জীবন এবং জীবনের বিন্যাসগত শিল্পরূপ দুইই। এই life and pattern-এর যুগল দাবিতে গড়ে ওঠে সার্থক উপন্যাস। ফর্স্টার সাহেব তাঁর সুবিখ্যাত Aspects of Novel গ্রন্থে pattern প্রসঙ্গ আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন "The pattern appeals to our aesthetic sense." সুতরাং উপন্যাস শুধু জীবনের যথাদৃষ্ট রূপ নয়—উপন্যাসকে জীবনের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বলে স্বীকার করেও সে-কথা আমাদের মনে রাখতে হবে। Pattern causes us to see the book as a whole—এবং এই সময়েই উপন্যাসটির প্রকৃত পরীক্ষা। উপন্যাসের জীবনবোধে ফাঁকি থাকলে অথবা

জীবনের পরিচয় অসম্পূর্ণ হলে যত তথ্য সঞ্চয়ন হোক না কেন এই pattern-এর বোধ পাঠক মনে সঞ্চারিত হবে না। এবং এই pattern-এর বোধ সঞ্চারিত না হলে যে নৈতিক সচেতনতা এবং জীবনের অমেয় সম্ভাবনামূলক বিশ্বাস উপন্যাসের অন্বিষ্ট তা আয়ত্ত হওয়াও সম্ভব নয়। বিভিন্ন উপন্যাসের অভিজ্ঞতায় বলা যায় যে pattern হচ্ছে সেই বস্তু যা ঔপন্যাসিকের রচনাকে অখণ্ড রসমূর্তি দান করে।

জীবনের সামগ্রিকবোধ এবং pattern-এর ব্যাপারটি পরস্পর ঘনসন্নিবদ্ধ। একটি উপন্যাস থেকে আমরা শেষ পর্যন্ত শুধু জীবন খুঁজি না, জীবন সম্বন্ধে ঔপন্যাসিকের কী বক্তব্য সেইটারই সন্ধান করি। উপন্যাসের pattern, তার মানে অভিজ্ঞতার সাহায্যে সেই অখণ্ড রসমূর্তি-রচনা যা পাঠকের রস পিপাসার সর্বতোভাবে নিবৃত্তিসাধক—সেই pattern লেখকের এই জীবন সম্বন্ধে নিজস্ব ধ্যান ধারণার ওপরেই স্থাপিত। এই ধ্যান ধারণাই হল লেখকের জীবনদর্শন। টলস্টয় বা স্তাঁদালের শিল্পে এই জীবন এবং জীবনদর্শন দুইই সমমাত্রায় বিদ্যমান ছিল।

জীবন সম্বন্ধে এই সামগ্রিক বোধ শুধুমাত্র আমাদের বিশ্বাসবোধকে তোষণ করা নয়, বা শুধুমাত্র আমাদের বাস্তবজ্ঞানের সম্প্রসারণ অথবা আমাদের কল্পনাবৃত্তির পরিচর্যাও এর লক্ষ্য নয়। জীবনের কাব্য এবং নাটক, কাহিনী এবং আলেখ্য সকল কিছুকেই কুক্ষিগত করে এই সামগ্রিকবোধ গড়ে ওঠে। সেই সমগ্রতাবোধের একমাত্র লক্ষ্য জীবনের অফুরন্ত সম্ভাবনাকে উপন্যাসে রূপদান। এ কারণেই উপন্যাস কখনই realism naturalism ইত্যাদির পুঁথি নির্দিষ্ট ছককে অনুসরণ করে চলে না। যেহেতু জীবনের কোনো ছক নেই সেই হেতু উপন্যাসকেও তার এই সামগ্রিকতার জন্যই, কোনো ছকে ফেলা চলে না। টলস্টয় দস্তয়েভ্স্কি, টমাস মান প্রমুখ মহৎ শিল্পীদের রচনায় আমরা যে সামগ্রিকতার সাক্ষাৎ পাই তা এই কারণেই কোনো প্রকার ছক, পূর্বচিন্তা, পূর্বপোষিত মতাদর্শ বা dogma নিরপেক্ষ ভাবেই গড়ে উঠেছে। জগৎ জীবন সম্বন্ধে অভিনিবিষ্ট আগ্রহ কোনো সূত্র-নির্ভর হতে পারে না।

•• পাঁচ ••

এখন প্রশ্ন হবে একজন ঔপন্যাসিকের সৃজিত জীবন সম্বন্ধে এই সামগ্রিকতাবোধ ব্যাপারটি বস্তুত কী? কী ভাবে আমরা এর বিচার করব এবং কী ভাবেই বা

আমরা এর ব্যাখ্যা করব ?

প্রত্যেক উপন্যাসই প্রকৃতপক্ষে জগৎ এবং জীবন সম্বন্ধে লেখকের ধ্যান ধারণার রূপক। এবং এই সুবিস্তৃত রূপকে লেখক ঘটনা, আখ্যান, চরিত্র, কথোপকথন, সমাজ-প্রতিবেশ এবং রচনাশৈলী—এই প্রতি বিষয়েরই ব্যবহারে তাঁর উদ্দিষ্ট রূপকার্থেরই প্রতিফলন ঘটে। রূপকের লেখকের মতো সচেতন ভাবে তিনি এটা করেন কিনা এবং করলে তা শিল্পকর্ম হয় কিনা এ প্রশ্ন অবশ্যই উত্থাপন যোগ্য কিন্তু আপাতত আমরা এই প্রশ্নকে পাশ কাটিয়ে এই কথাটুকু বলতেই পারি যে উপন্যাসের সমগ্র জীবন যখনই একটি pattern পরিগ্রহ করে তখনই রসিক পাঠকের কাছে উপন্যাসে বিস্তৃত জীবন এক বিস্তৃত রূপকের আকারে প্রতিভাত হয়। উপন্যাসে উপরোক্ত সমস্ত উপাদানই তখন অংশত এবং সমগ্রভাবে সেই রূপকেরই তাৎপর্য বহন করে। উপন্যাস সমগ্রভাবে সেই রূপক নির্মাণ করে বলে উপন্যাসের প্রতি অংশের সঙ্গে এই রূপকের সম্পর্ক নিবিড়। এরকম একটা ধারণা থাকা স্বাভাবিক যে উপন্যাসের সৃষ্ট চরিত্রই বুঝি সেই সমগ্রতার ধারক এবং বাহক। চরিত্র যদিও সমগ্রতা নির্মাণে অনেকখানি ভূমিকা পালন করে তথাপি উপন্যাসেব সমগ্রতা চরিত্র ছাড়াও আবও নানা কিছুর ওপর নির্ভরশীল। চবিত্র তার মধ্যে একটা অংশ বিশেষ। চরিত্রের মাধ্যমে ঔপন্যাসিক জীবন সম্বন্ধে তার ধ্যান ধারণাব কথা ব্যক্ত করেন এটা ঠিকই, কিন্তু এই ধ্যান ধারণা যেহেতু উপন্যাসের সমগ্রতার ভিত্তির ওপর স্থাপিত সেইহেতু আরও নানা কিছু এ প্রসঙ্গে উপন্যাসকারের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সেগুলি হল ব্যক্তি, সমাজ এবং সভ্যতা ও ইতিহাস সম্বন্ধে প্রগাঢ় সচেতনতা। উপন্যাসকার তাঁর সমস্ত প্রচেষ্টার সাহায্যে অবশ্যই প্রাথমিক ভাবে পাঠকের জীবন সম্বন্ধে কৌতূহলের নিবৃত্তি সাধন করবার জন্য প্রয়াসী হন। কিন্তু বহুরূপী বলেই জীবন সম্বন্ধে কৌতূহলও অন্তহীন। এই কারণে একই বিষয় নিযে দুই লেখকের রচনা দুই ভিন্ন কৌতূহলের পরিতৃপ্তি সাধন করে। অন্তহীন এই জীবনের বহু বিচিত্র রূপই বারে বারে ঔপন্যাসিককে ডাক দেয় জীবনের গূঢ় রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য। ঔপন্যাসিকের মন সেই বহিরঙ্গ বিচিত্রতার ব্যবহারে জীবনের একটা সমগ্র অর্থ সৃজন করে, যা শেষ অবধি উপন্যাসকে একটা জীবন-দর্শনে পৌঁছিয়ে দেয়। এই জীবনদর্শন ঔপন্যাসিক সৃজন করেন জীবনের আকাঁড়া তথ্যগুলি থেকে। সুতরাং লেখকের মন এবং সেই মনের উৎকর্ষ এবং সমৃদ্ধি একটা সার্থক উপন্যাসের নেপথ্যে সক্রিয় থাকে। হেনরী জেম্স্

এ প্রসঙ্গে বলেছেন যে উৎকৃষ্ট মনই উৎকৃষ্ট শিল্পকর্মে রূপায়িত হতে পারে। "The deepest quality of a work of art will always be the quality of the mind of the producer." এখন শিল্পী মানসের সেই গভীর মনীষার পরিচয় আমরা উপন্যাসের ভিতরে কেমন করে সন্ধান করি উপন্যাসের সমগ্রতা এবং তার pattern-এর বিচার প্রসঙ্গে সে-কথা আলোচিত হওয়া প্রয়োজন। প্রত্যেকটি উপন্যাসই শিল্পীর অন্তরাত্মারই প্রতিফলন। সুতরাং উপন্যাসের শিল্প বিচারের সময় আমাদের দেখতে হয় পাঁচটি বিষয়। এক, কোন্ পদ্ধতিতে শিল্পী জগৎ এবং জীবনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন ; দুই, তিনি কী গভীরভাবে অনুধাবন করেছেন , তিন, কী তিনি পরিহার করেছেন ; চার, কোন্ ধরনের সমস্যা তিনি উপন্যাসে উপস্থাপিত করেছেন , পাঁচ, এই সমস্ত অভিজ্ঞতা থেকে তিনি কোন্ নৈতিক মূল্য নিষ্কাশিত করেছেন—এই পঞ্চ পরিচয়ের ওপরে ঔপন্যাসিকের মানসোৎকর্ষের বিচার হবে। এবং এর ওপরে একটা উপন্যাস শিল্পকর্ম হিসাবে কতখানি উত্তীর্ণ হল তারও মীমাংসা হবে। শিল্পীর অন্তরাত্মার পরিচয় গ্রহণেব কালেই এই পদ্ধতির ভিতরে তাঁর সমাজ সভ্যতা বিষয়ক জিজ্ঞাসাও স্পষ্ট হবে। সুতরাং অভিজ্ঞতাসঞ্জাত অনুভূতিকে ঔপন্যাসিক উপন্যাসের রূপকে তুলে ধরেন একথা আমরা যে কোনো মহৎ উপন্যাস আলোচনা কালে উপলব্ধি করতে পারি। তাই যদিও পাঠকের জীবনাগ্রহের পরিতৃপ্তি সাধন করা ঔপন্যাসিকের লক্ষ্যের একটা প্রাথমিক অংশ তাহলেও শেষ পযন্ত দেখা যায় যে অভিজ্ঞতা অপেক্ষা ঔপন্যাসিকের quality of mind-টাই বড়ো কথা হয়ে দাঁড়ায়। কেননা একক অভিজ্ঞতাব কোনো অন্ত নেই। মানুষও যেমন বহুবিস্তৃত অন্তহীন বৈচিত্র্যের অধিকারী বাস্তবতাও তেমনি শতরূপিণী। কাজেই শুধু অভিজ্ঞতাকে আলাদা করে কখনই বিচার করা যায় না। এ প্রশ্নের কখনও মীমাংসা হয়নি যে অভিজ্ঞতার কোথায় আরম্ভ আর কোথায় শেষ। অভিজ্ঞতা কখনও সম্পূর্ণ হয়েছে বলে কেউ দাবি করতে পারেন না। সুতরাং শেষ পর্যন্ত অভিজ্ঞতা থেকে যে জীবন রসের নিষ্কাশন হবে স্বভাবত সেটাই প্রধান ব্যাপার হয়ে দাড়ায়। এ ব্যাপারে প্রধান কর্মকর্তা হল শিল্পীমানসের কল্পনার উৎকর্ষ। রোমান্টিক কবিদের কাছে যেমন কল্পনাই অন্তর্দৃষ্টি, কল্পনাই যেমন তাদের উপাস্য ঈশ্বর, ঔপন্যাসিকের কাছে তেমনি বুদ্ধিদীপ্ত কল্পনাই হল প্রধান কথা। এই বুদ্ধিদীপ্ত কল্পনা অথবা লেখকের ঔপন্যাসিক মনীষাকে আমরা যে-কোনো স্বাধিকারই দিতে প্রস্তুত—তা সে তাঁর বিষয়বস্তু, তাঁর মতাদর্শ যে

ব্যাপারেই হোক না কেন। আমাদের শুধু বিচার্য হল এই যে তিনি তাঁর সমস্ত উপাদানের ব্যবহার করেছেন কী ভাবে। তাঁর আহৃত সমস্ত অভিজ্ঞতা, সমস্ত তথ্য এবং উপাদান গভীর এবং গূঢ় মনের ভিতর দিয়ে সুনির্দিষ্টভাবে প্রবাহিত হয়ে শেষ পর্যন্ত একটা pattern পরিগ্রহ করেছে কিনা; শেষ পর্যন্ত সমস্ত উপন্যাসটি তাঁর সমস্ত জীবন ধারণার একটি বিস্তৃত রূপকের আকার ধারণ করেছে কিনা। সুতরাং লেখকের অভিজ্ঞতা—যেটা উপন্যাসের একটা প্রধান ব্যাপার—সেটা আদপেই সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতা নয়। ঔপন্যাসিকের অপরিহার্য প্রধান শক্তি কী এই প্রশ্ন যদি কখনও ওঠে তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের একমাত্র উত্তর হবে অভিজ্ঞতাসঞ্জাত ও মননসমৃদ্ধ কল্পনাই হল ঔপন্যাসিকের ব্রহ্মাস্ত্র। যেহেতু শিল্পমাত্রেই শেষ পর্যন্ত নিপুণ এবং অভিনিবিষ্ট নির্বাচন সেইহেতু উক্ত কল্পনা এ বিষয়ে ঔপন্যাসিককে, তাঁর অন্তর্দৃষ্টিকেই সাহায্য করে। এই কারণেই বলা হয়ে থাকে যে-মন কৃত্রিমতায় পূর্ণ, যে-মন আসক্ত, যে-মন পল্লবগ্রাহী সেই মন কখনও উৎকৃষ্ট উপন্যাসের স্রষ্টা হতে পারে না। ঔপন্যাসিকের মন কবির মতো শুধু কবিত্বেই আসক্ত নয়, নাট্যকারের মতো শুধু নাট্যরসেই তার পক্ষপাত নয়, সেই মন জীবনের সহজ স্বাস্থ্যের অধিকারী বলেই জীবনের কাব্যে কাহিনীতে নাট্যে, তুচ্ছ এবং উচ্চ, নিচ এবং মহৎ, সুন্দর এবং কদর্যের সকলেরই রূপসাধনা করতে পারে। এই বিচিত্র রূপসাধনা প্রকৃতপক্ষে ঔপন্যাসিকের নিজস্ব রসসাধনা। এ রসসাধনার লক্ষ্য জীবন স্বরূপ সন্ধান। এই জীবন স্বরূপই সামগ্রিকতা।

রসসাধনার এই দুরূহ পথে শিল্পীকে প্রতি পদেই পরীক্ষা দিতে হয় নানাভাবে। জীবন এবং বাস্তবেব মায়া সৃজনে সে পরীক্ষার প্রথম অধ্যায়, আবার সেই সৃজিত মায়া থেকে মায়াধীশ সত্যে পৌছনোর প্রয়াসে এ পরীক্ষার চূড়ান্ত রূপ। জীবন এবং বাস্তবের এই মায়া রচনার ক্ষেত্র ঔপন্যাসিকের স্বভূমি। এই ভূমিতে দাঁড়িয়ে তিনি কবি-নাট্যকারের থেকে পৃথক। বরঞ্চ এ বিষয়ে তাঁর প্রতিযোগী শিল্পী-পুরুষ হলেন চিত্রশিল্পী। চিত্রশিল্পেরও প্রধান কথা হল জগৎ ও জীবনের সাদৃশ্য বহন। ঔপন্যাসিকেরও কাজ তাই। আমরা বর্তমান আলোচনার শুরুতে এ-কথা বলেছি যে উপন্যাস পাঠকের কাছে রস পিপাসা এবং জীবন পিপাসা প্রায় একীভূত ব্যাপার। জীবন আধুনিক যুগে যত ফিউডাল কাঠামোকে ভেঙে ভেঙে নানাদিকে নিজেকে বিকশিত করতে চেয়েছে ততই সে হয়েছে বিচিত্র এবং কৌতূহলোদ্দীপক। এই জীবন সম্বন্ধে অসীম আগ্রহের জন্য এ

যুগের অন্যতম সাহিত্য-সন্তান উপন্যাসের কাছে অসীম এবং বিচিত্র জীবনের সাদৃশ্য আমরা কামনা করি। ঔপন্যাসিকের মানসোৎকর্ষ সেই বাঞ্ছিত জীবন-মায়া সৃজন করে। কেমন করে এবং কী ভাবে পরবর্তী পরিচ্ছেদে সেটাই আলোচিত হবে।

•• ছয় ••

জীবনকে জীবনেরই মতো উপন্যাসে প্রতীয়মান করানোর অনুজ্ঞা ঔপন্যাসিককে অক্ষরে অক্ষবে পালন করতে হয়। এরই অপর নাম বাস্তব এবং জীবনের মায়া (illusion) সৃজন। কেমন ভাবে এই মায়া সৃজিত হয় তা অবশ্যই জটিল সৃষ্টিক্রিযাব অঙ্গীভূত ব্যাপার। কাজেই কতকটা দুর্জ্ঞেয়ও বটে। এ সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। সেই মতারণ্যে দিশাহারা হবারই কথা। বিশেষত রিয়ালিজম, ন্যাচারালিজম প্রমুখ নানা ইজমের প্রবক্তাবা যেখানে নানা মতবাদী বক্তব্য নিয়ে সদাই প্রস্তুত। আমরা এই মতবাদেব জটিল বিতণ্ডায় না গিয়ে একেবারে ব্যাপাবটির মর্মানুধাবনেব চেষ্টা কবব। জীবনকে জীবনেব মতো প্রতীয়মান কবাতে গিয়ে ঔপন্যাসিকের কর্তব্য কী হবে এ প্রসঙ্গে জোলা-র একটি বক্তব্য এখানে উপস্থিত কবা যাক। জোলা বলছেন :

> "একজন লেখক বঙ্গমঞ্চ সম্বন্ধে একটি উপন্যাস লিখতে চান। এই অভিপ্রায় থেকে তিনি যখন কাজ শুরু করলেন তখন তাঁব প্রথম কর্তব্য হবে (চরিত্র বা বিযয কিছুই তখন তাঁব হাতে নেই) উপাদান সংগ্রহ কবা; মঞ্চ জগৎ সম্বন্ধে তিনি যা বর্ণনা করতে চান তার বিষয়গুলি খোঁজাই হবে তাঁর প্রধান কাজ। তিনি তখন হয়তো কতকগুলি অভি-নেতাব সঙ্গে আলাপ করবেন এবং কিছু অভিনয়ও দেখবেন। তারপরে তিনি তার বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলাপ করবেন, তাদের মতামত সংগ্রহ করবেন, গল্প এবং চিত্রাদি যোগাড করবেন। কিন্তু তা-ই সব নয়। প্রাপ্তব্য সমস্ত প্রাসঙ্গিক পুঁথিপত্র তাঁকে পডতে হবে। পরিশেষে তিনি তার যথানির্দিষ্ট স্থানটি পরিদর্শন করবেন এবং একটি থিয়েটারে সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয় সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হবাব জন্য কয়েকদিন অতিবাহিত করবেন, অভিনেত্রীদের সাজঘরে একটি সন্ধ্যা কাটাবেন এবং যতটা সম্ভব সেই পরিবেশকে আত্মসাৎ করার চেষ্টা করবেন। যখন এই সমস্ত উপাদান এইভাবে সংগৃহীত হবে তখনই উপন্যাস নিজ নিয়মে তার আকার ধারণ করবে।"

পরিবেশকে আত্মসাৎ করবার এই যে ব্যাপার এই ব্যাপারটি সম্বন্ধে সমালোচক-দের কঠিন মতামত প্রযুক্ত হতে দেখা গেছে। এই ধরনের লেখকেরা এই প্রকার অনুজ্ঞা অনুসরণ করে যে উপন্যাস রচনা করেন তাতেও অ্যাভারেজ সাধারণ চরিত্রই মুখ্যত ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কিন্তু এই আটপৌরে অ্যাভারেজ চরিত্র এবং ডিফো-ফিল্ডিং-এর আমলের অ্যাভারেজ মানুষ এক বিষয় নয়। এ হল এক ধরনের যান্ত্রিক গড়পড়তার সাধারণ মানুষ। ডিফো-ফিল্ডিং-এর অ্যাভারেজ মানুষ সমাজের পটে আবির্ভূত সে-শতাব্দীর নতুন মানুষ। তারা ছিল এক নবোদ্ভূত শ্রেণীর প্রতিনিধি। কাজেই টাইপ এবং ব্যক্তির দ্বন্দ্বমূলক ঐক্য সেখানে উপস্থিত ছিল। জোলা-র বাস্তব-মায়ায় এই গডপড়তা মানুষের দল কোনোপ্রকার pattern বা রসতান্ত্রিক পদ্ধতি ব্যতিরেকে উপন্যাসে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু আমাদের আপত্তি শুধু এইখানেই নয়। To absorb the atmosphere বা পরিবেশকে আত্মসাৎ করা বলতে জোলা কী বুঝেছেন। এ যদি হয় শুধুমাত্র আহৃত উপাদানের বর্ণহীন আটপৌরে প্রদর্শনী, অথবা সংগৃহীত অভিজ্ঞতার যদৃচ্ছ প্রকাশের একটি যান্ত্রিক ব্যবস্থালিপি মাত্র তাহলে অবশ্যই এ থেকে কোনো বৃহত্তর সার্থকতার সাক্ষাৎ মিলবে না। এই প্রসঙ্গে হেনরী জেম্স্ যে কথা বলেছেন সে কথা সবিশেষ অনুধাবনযোগ্য। তিনি বলেছেন লেখকের অভিজ্ঞতার শক্তি কখনই উপন্যাসকে জীবনের হুবহু অনুকৃতি করে তোলার সাধনা নয়। নিখুঁত সাদৃশ্য উপন্যাসের একটা গুণ হতেও পারে, নাও পারে। কেননা ডন কুইক্সোট কিংবা মিঃ মিকোবরের বাস্তবতা স্রষ্টার রঙে এত অনুরঞ্জিত যে এদের যত বাস্তবের নিখুঁত অনুসরণ বলা চলুক না কেন এরা কিছুতেই সাধারণভাবে সংসারে দেখতে পাওয়া চরিত্র নয়। অভিজ্ঞতার শক্তি আসলে একটা প্রচণ্ড অনুভবের শক্তি এবং এই অনুভবক্রিয়া সৃজনী-চেতনার প্রকোষ্ঠে যে কোনো তাৎপর্যপূর্ণ জাগতিক ঘটনার এমন আশ্চর্য প্রতিধ্বনি তুলতে পারে, এবং সেখানে এত সূক্ষ্ম ব্যাপারেরও এত সুস্পষ্ট সাড়া জাগে যে এই ব্যাপারটাকে একটা অপরূপ মানস পরিবেশ উদ্ভুত ব্যাপার ছাড়া আর কিছু বলা চলে না। লেখকের এই মানস পরিবেশই আমাদের পুর্বে কথিত জীবন ও জগতের মায়াসৃজনের মূলে।

পরিবেশকে আত্মসাৎ করা অবশ্য প্রয়োজন। তার মূল্যকে অস্বীকার করা হচ্ছে না। এবং একথা যথার্থই যে পরিবেশকে আত্মসাৎ করার সঙ্গে মানস-পরিবেশ সৃজনের কোনো মৌল বিরোধ নেই। বরঞ্চ শিল্পীমানস পরিবেশকে

আত্মসাৎ করলে পরেই মনের নির্বাচনী ক্ষমতা অবচেতন স্তরে সক্রিয় হয়ে উঠতে পারে এবং তখনই সৃজিত হতে পারে সেই অবস্থা যার ফলে উপন্যাসে স্পষ্ট হয়ে উঠবে লেখকেরই মানস-মণ্ডল। তাই বলা হয় যে উপন্যাসে জীবনকে জীবনের মতো প্রতীয়মান করাতে গিয়ে ঔপন্যাসিক কখনই হুবহু অনুলিপির আশ্রয়ী হন না। হলেও, তিনি জানেন যে এর ওপরে বাস্তবের অধ্যাস রচনার সার্থকতা নির্ভর করে না। পরিবেশকে লেখকের গোটা জীবন-বিষয়ক বক্তব্যের সঙ্গে সম্বন্ধবদ্ধ করে তোলাতেই এর সার্থকতা। ডিফো-র রবিন্‌সন ক্রুশো থেকে এর একটা উদাহরণ দেওয়া যাচ্ছে।

এ-কথা সুপরিজ্ঞাত যে ডিফো-র Formal Realism-এর প্রধান ভিত্তি ছিল পাঠকের বিশ্বাস উৎপাদন করায়। যে বিষয় তিনি বর্ণনা করতে মনস্থ করেন যে সম্বন্ধে খুঁটিনাটি বিষয়ের তুচ্ছাতিতুচ্ছ অংশও তিনি এমন বিশ্বাস্যভাবে বর্ণনা করেন যার ফলে পাঠকের চিত্তে শুধু যে অবিশ্বাসের ইচ্ছাকৃত নির্বাসন ঘটে তাই নয়, পাঠক একেবারে স্পষ্টত বিশ্বাসের দিকেই ঝুঁকে পড়েন। রবিন্‌সন ক্রুশোয় জাহাজডুবির পর ক্রুশো যখন ক্রুশোর মৃত বন্ধুদের সম্বন্ধে তাঁর স্মৃতি লিপিবদ্ধ করছেন তখন তিনি বলছেন : I never saw them afterwards, or any sign of them, except three of their hats, one cap, and two shoes that were not fellows. বর্ণনার এই অংশটুকু অনুধাবন করলে দেখা যাবে যে শেষ বাক্যাংশটুকুই হচ্ছে সেই অব্যর্থ অংশ যার ওপরে ভর করে পাঠকের বিশ্বাস্যতা নিমেষে গড়ে উঠতে পারে। দুটো জুতো ভেসে এসেছে এবং এ দুটো জুতো একই জোড়ার দুটো জুতো নয় এই ব্যঞ্জনাটুকু সমুদ্রের বিশালতা এবং উদাসীনতা এই উভয়কে আশ্চর্যভাবে নিমেষে রূপায়িত করে তুলতে সক্ষম হয়েছে। এই অতি তুচ্ছ বর্ণনাংশের মাহাত্ম্য এইখানে যে এ পাঠকের চিত্তে নানাভাবে ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে। এবং এর ফলে লেখকের আশ্চর্য তন্ময় দৃষ্টি সম্বন্ধে আমরা এক প্রকার বিস্ময়ের আনন্দ লাভ করি। কিন্তু ব্যাপারটি যদি শুধু এখানেই সীমাবদ্ধ থাকে তাহলে এটা হয় একটা দ্বিতীয় শ্রেণীর কৌশল যা গড়পড়তা লেখকের সম্বল। এ শক্তিটি তখনই লেখকের প্রবল মানসিক শক্তির পরিচায়ক যখন এই ধরনের তুচ্ছ বর্ণনাংশ আপন তাৎপর্যের গুণে পাঠকের চিত্তকে অকস্মাৎ অতিমাত্রায় গ্রহণশীল করে তোলে। অর্থাৎ কল্পনার দিক থেকে পাঠকের মনকে সক্রিয় করে তোলে। Three hats, one cap and two shoes কেবলমাত্র আক্ষিক যাথার্থ্যের পরিচায়ক।

That were not fellows এই বাক্যটুকুতে লুকিয়ে রয়েছে সমুদ্র-ব্যঞ্জনা। পাঠকের মনে এর ফলে জেগে ওঠে এক ভাবঘন অবস্থা। এরপর থেকে সে আর ঔপন্যাসিকের সৃজিত জীবনের প্রতিবিম্বকে এক মুহূর্তের জন্য অবিশ্বাস করে না। ক্রুশো, বিরাট সমুদ্র, বিজন দ্বীপ, এক কথায় ঔপন্যাসিকের সমগ্র বিষয়কে এ বর্ণনা স্পষ্ট করেছে বলেই এ সার্থক শিল্প।

এই প্রসঙ্গে টলস্টয়ের 'ওঅর অ্যাণ্ড পীস' থেকে একটা যুদ্ধ বর্ণনার অংশও অনুধাবনযোগ্য। Before Tilsit অধ্যায়ের ৩৭শ পরিচ্ছেদে যুযুধান রুশ ও ফরাসী সৈন্যদের যুদ্ধোত্থত মুহূর্তের বর্ণনা দিচ্ছেন লেখক :

It was now past noon, and the weather had cleared ; a brilliant sun was moving westward over the Danube and the surrounding hills ; the air was windless, rent now and then by bugle call and the shouts of the enemy. There was nothing now between the squadron and the enemy but some patrols. An empty space of some three hundred fathoms divided them from each other. The enemy had ceased firing, and all the more one felt that ominous, insurmountable and indefinite barrier that lies between two hostile armies. One step beyond the boundary on either side lies something that suggests that other boundary which divides the dead from the living. What is it ? Is it the dread Unknown of suffering and death ? What is it ? just beyond that field, on the other side of that tree, of that roof on which the sun is shining ! Who can tell, and who does not wish to know ? The soldier fears and yet longs to cross the line, for he feels that, sooner or later, he must, and that then he will know what lies beyond as surely as he will know what lies beyond this life. He is full of exuberant vigour, of health, spirits, and courage, and those around him are just as eager, just as brave as himself......... ...."

এখানেও উল্লেখযোগ্য যে যুদ্ধক্ষেত্রের ঝড়ের আগের স্তব্ধতা বর্ণনার সাফল্য

দুই যুযুধান বাহিনীর মধ্যবর্তী empty space-এর বর্ণনার ওপব নির্ভর-শীল। এই empty space বা শূন্য এলাকাব বর্ণনাকে এক লহমায় টলস্টয় জীবন-মৃত্যুব সীমাবেখাব রূপকে উন্নীত কবেছেন। এব ফলে ঔপন্যাসিকের কবিত্বই যে শুধু প্রকাশিত হয়েছে তাই নয়, যুদ্ধক্ষেত্রের যুদ্ধারম্ভের ভয়াবহ মুহূর্তের সংশয় উত্তেজনা আশঙ্কা এই রূপকের সাহায্যে সত্য বলে প্রতিভাত হয়ে উঠতে পেবেছে। যুদ্ধেব গম্ভীব বিস্তৃত বর্ণনাব জন্য পাঠকেব মন প্রস্তুত হয়ে উঠতে পেরেছে। এবপব সে যুদ্ধকে দার্শনিকের নিবাসক্তিতে গ্রহণ কববে।

আবার একটি ছোট বর্ণনাব আঁচড়ে বোবোদিনেব যুদ্ধেব সুবিশাল অস্ত্র-সঘন পবিবেশ এবং অমীমাংসিত যুদ্ধফল-কে জীবন্ত কবে তুলেছেন টলস্টয়। পিটাব এবং এক ফবাসী সৈনিক যেখানে কণ্ঠ আঁকড়ি ধবিলা পাকড়ি দুইজনা দুইজনে যেখানে লেখক বর্ণনা কবছেন :

It was French officer , but he dropped his sword, and took Peter by the collar. They stood for a few seconds face to face, each looking more astonished than the other at what he had just done.

"Am I his prisoner or is he mine ?" was the question in both their minds The Frenchman was inclined to accept the first alternative, for Peter's powerful hand was tightening its clutch on his throat.

'কে কাব বন্দী'—উভয়েব এই যুগপৎ চিন্তাব ব্যাপারটি বুঝিয়ে দিচ্ছে যুদ্ধ কতখানি ঘোরালো হয়েছিল। যুদ্ধেব সুবিশাল প্যানোবামা যে কাজ পাতার পব পাতা ধবে কবেছে, কামান শ্রেণীব পবিসংখ্যান, বিভিন্ন সেনাবাহিনীর সংস্থান তথ্য যে কাজে নিযুক্ত কবা হয়েছে, এই একটি অতি ক্ষুদ্র দৃশ্যাংশ সে কাজেব সাফল্যে সকলকে ছাড়িয়ে গেছে।

যে কোনো শিল্প-সফল উপন্যাসে বাস্তব জগতে জীবনেব অধ্যাস বচনাব এই শক্তি সদাই বসিক পাঠককে মুগ্ধ করে। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে বস্তুতন্ত্রী লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়েব বচনা থেকে প্রয়োজনীয় উদ্ধৃতি নিয়ে দেখা যায় যে ঔপন্যাসিকেব এই গূঢ় শক্তিতে ইনি কতখানি শক্তিমান। মানিক বন্দ্যো-পাধ্যায়েব সুবিখ্যাত উপন্যাস পদ্মানদীব মাঝিতে কুবেবেব গৃহ বর্ণনা কবছেন

লেখক। এই বর্ণনায় দেখা যায় যে বিষয় এবং বিষয়ীর এমন এক সুযোগ্য সাযুজ্য ঘটেছে যার ফলে বর্ণনা পাঠকের কাছে জীবনকল্পরূপ ধারণ করেছে। বর্ণনাটি এই :

> কোনার দিকে রক্ষিত জিনিসগুলি চিনিতে হইলে ঠাহর করিয়া দেখিতে হয়। ঘরের একদিকে মাটিতে পোঁতা মোটা বাঁশের পায়ায় চৌকি-সমান উঁচু বাঁশের বাতা বিছানো মাচা। মাচার অর্ধেকটা জুড়িয়া ছেঁড়া কাঁথার বিছানা। তৈল চিক্কন কালো বালিশটি মাথায় দিয়া কুবেরের পিসী এই বিছানায় শয়ন করে। মাচার বাকি অংশটা হাঁড়ি কলসিতে পরিপূর্ণ। নানা আকারের এতগুলি হাঁড়ি কলসি কুবেবের জীবনে সঞ্চিত হয় নাই, তিন পুরুষ ধরিয়া জমিয়াছে। মাচার নিচেটা পুরাতন জীর্ণ তক্তায় বোঝাই। কুবেরের বাপের আমলের একটা নৌকা বাব বার সারাই করিয়া এবং চালানোর সময় ক্রমাগত জল-সেঁচিয়া বছর চারেক আগে পর্যন্ত ব্যবহার করা গিযাছিল, তাবপর একেবারে মেরামত ও ব্যবহাবের অনুপযুক্ত হইযা পডায় ভাঙিয়া ফেলিয়া তক্তাগুলি জমাইয়া রাখা হইযাছে। ঘবের অন্যদিকে ছোট একটা ঢেঁকি। ঢেঁকিটা কুবেরের বাবা হাবাধন নিজে তৈয়ারি করিয়াছিল। কাঠ সে পাইয়াছিল পদ্মায। নদীর জলে ভাসিযা আসা কাঠ সহজে কেহ ঘরে তোলে না, কার চিতা রচনার প্রযোজনে ও কাঠ নদীতে আনা হইয়াছিল কে বলিতে পারে? শবেব মতো চিতার আগুনেব জডতম সমিধটিরও মানুষেব ঘরে স্থান নাই। কিন্তু এই ঢেঁকির কাঠটির ইতিহাস স্বতন্ত্র।

এই গৃহ বর্ণনায প্রথমেই যেটা নজবে পডে সেটা হল, লেখক ধীবর জীবনের অভিজ্ঞতাকে পরিভাযা-কণ্টকিত করে প্রকাশ করাব জন্য ব্যস্ত হযে ওঠেননি। সমগ্র বর্ণনাটিকে জীবন্ত করে তোলা হযেছে ঢেঁকির কাঠের প্রসঙ্গে। পদ্মার জলে ভেসে আসা কাঠেব প্রসঙ্গ কুবেবেব ঘরের দরিদ্র মাঝির বর্ণহীন গৃহ-স্থালির বর্ণনায় বৈচিত্র্য সঞ্চার কবেছে। এই ঢেঁকির কাঠের সাহায্যে ঘরখানি পাঠকের কাছে হয়ে উঠেছে পদ্মানদীর মাঝির ঘর। ঢেঁকির কাঠের মতো তুচ্ছ বিযয় পদ্মার অনন্ত জীবন-মরণ রহস্যকে, এক কথায় উপন্যাসে পদ্মা যে নিয়তির প্রতীক তাকে বিশ্বাস্য করে তুলেছে। এই বর্ণনার সমালোচনা হিসাবে এইটুকু বলা যায় যে লেখক কুবেবের বাপের আমলের নৌকার প্রসঙ্গ যদি পরিহার করতে পাবতেন তাহলে এ বর্ণনা প্রথমশ্রেণীর বর্ণনায় পরিণত

হতে পারত। কুবেরের বাপের আমলের নৌকার প্রসঙ্গ বাস্তবতার আতি-শয্যের দিকে ঈষৎ ঝুঁকে পড়েছে। শ্রেষ্ঠ শিল্প সৃষ্টিতে এই ঝোঁক অবশ্য বর্জনীয়।

বলা প্রয়োজন যে ঔপন্যাসিকের এই শিল্প-কৌশলের মূলে রয়েছে ঔপন্যাসিকের নির্বাচনী ক্ষমতা। উপন্যাসের চরিত্র, মিলিউ, প্লট এবং ঘটনাংশ সমস্ত কিছুতেই লেখকের নির্বাচনী ক্ষমতারই প্রকাশ ঘটে। যেহেতু আধুনিক সমাজ এবং সভ্যতার সমস্ত কিছুই পরস্পর ঘনসন্নিবদ্ধ এবং সংযুক্ত সেই হেতু লেখকের নির্বাচনী ক্ষমতার ভিতরেই সেই শক্তি রয়েছে যা ঘটনা, চরিত্র এবং খুঁটিনাটি বিষয় ও বিষয়াংশের নির্বাচনে জীবনের গোটা রূপকে আভাসিত করে তোলে। উল্লিখিত উদাহরণগুলি পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে বর্ণনাংশের যেসব ছোট ছোট কাজের ওপর জীবনের মায়া-সৃজন নির্ভর করে রয়েছে, সেগুলি লেখকের নির্বাচনী ক্ষমতার ফল। এই নির্বাচনী ক্ষমতা একদিকে লেখকের কাছে ঋণী এবং আর একদিকে তা উপন্যাস-ধৃত সমগ্রতাব সঙ্গে অন্বিত। যে বিশিষ্ট জীবনবোধ লেখকের সৃষ্টিগর্ভ মানসিক অবস্থা গড়ে তুলেছে এই নির্বাচনী ক্ষমতা আসলে তারই সন্তান। পবিবেশ এবং পরিবেশ-ধৃত মানুষকে উপলব্ধির ব্যাপারে লেখকেব মনীষা কতখানি সাহায্য করেছে এই নির্বাচনী ক্ষমতা তারও প্রমাণ বটে। এই নির্বাচনী ক্ষমতা শিল্প এবং জীবন এই দুই কূলে সমদৃষ্টি রাখতে পারলে কখনও যাত্রাভ্রষ্ট হয না।। জীবনের মায়া-সৃজনেব রহস্য মোটামুটি এই। একটি অভিজ্ঞতা-সমৃদ্ধ সৃষ্টিগর্ভ মানসিক অবস্থা-সম্পন্ন শিল্পী যখন জীবনকে তাঁর শিল্পের রূপকে ধরতে চান তখন এই নির্বাচনী ক্ষমতাতেই তাঁর প্রথম পরিচয় মেলে। তাঁর প্রধান পরিচয় অবশ্যই অন্যত্র। সে-কথা স্থানান্তরে আলোচিত হবে।

মহাকাব্যের মতো সার্থক মহৎ উপন্যাসও শান্তরস পরিণামী। উপন্যাসের ফলশ্রুতিতে পাঠক চিত্তে জীবন সম্বন্ধে আগ্রহেব গভীরতা বাড়ে, ব্যক্তি জীবনের বাসনা কামনাকে সুবৃহৎ পটে স্থাপিত দেখে তাদের সম্বন্ধে উচ্ছ্বাসেব আতিশয্যের হ্রাস হয়। আমরা তখন সহিষ্ণু উদার চিত্তে জীবনের অগাধ অসীমতা সম্বন্ধে সচেতন হই। চিত্তে শমভাবের সঞ্চার সার্থক উপন্যাসের শিল্পকর্মের লক্ষ্য। একজন সার্থক ঔপন্যাসিকের বিষয়বস্তু এবং তার ব্যবহারে সেই কারণেই আবিষ্টতা পরিহার্য। যে বিষয়, যে ভাষা, যে রচনারীতি

বা ঘটনা-সংস্থান লেখক নির্বাচিত করেন সেই সমস্ত কিছুই আসলে এক স্থানে এক আধারে এসে সংহত হয় লেখকের জীবন-বিষয়ক বক্তব্যের টানে। এই বক্তব্যই ঔপন্যাসিকের জীবনার্থ, যাকে তিনি আহরণ করেছেন তাঁর অভিজ্ঞতায়, সঞ্চয় করে রেখেছেন তাঁর স্মৃতিতে, গড়ে তুলেছেন তাঁর কল্পনায় তাঁর মননে। ব্যক্তিস্বরূপের এই নিয়ত আবিষ্কারের অনলস প্রয়াসে নৈর্ব্যক্তিকতাই তাঁর সাধন পীঠ। তাঁর জীবনার্থও জীবন-নির্ভর।

উপন্যাসে বিষয়বস্তুর তাৎপর্য

•• এক ••

উপন্যাসের গল্পাংশ বা আখ্যানভাগকেই উপন্যাসের বিষয় বলে না। ফর্স্টার সায়েব যে story বা plot-এর কথা বলেছেন উপন্যাসের বিষয়বস্তু বলতে শুধু তাদেরও বোঝায় না। তেমনি আবার কেবলমাত্র সৃজিত চরিত্রাবলীর ঘোরাফেরা, তাদের গতি-পরিণতিও উপন্যাসের বিষয় নয়। আনা কারেনিনা এবং মাদাম: বোভারির গল্পাংশে ক্ষীণ সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও (বিবাহিত নারীর প্রেম) এই দুই উপন্যাসের বিষয়বস্তু পৃথক। বিষবৃক্ষ এবং কৃষ্ণকান্তের উইল দুটো উপন্যাসই পুরুষের দ্বিচারিতার বিষয় নিয়ে লিখিত হলেও এই দুই উপন্যাসের লক্ষ্য এক নয়—কাজেই এরা শেষ পর্যন্ত হয়ে দাঁড়ায় ভিন্ন বিষয়ের উপন্যাস। সে কারণে শুধু শৈশবকল্পনার চিত্রণে সমৃদ্ধ হয়েছে বলে জাঁ ক্রিস্তফের প্রথম খণ্ডের সঙ্গে পথের পাঁচালির সাদৃশ্যসন্ধান নিরর্থক, যেমন নিরর্থক শুধু যুদ্ধের উত্থান-পতন ব্যবহৃত হয়েছে বলে রাজসিংহের সঙ্গে ওঅর অ্যাণ্ড পীসের তুলনা সন্ধান। কেননা, বিষয়-বিধৃত বক্তব্যে এক একটি উপন্যাস এক এক রকমের।

Subject-matter বা বিষয়বস্তুর বা উপন্যাসের বিষয় বিষয়াশ্রয়ী বক্তব্যের রূপক। ঔপন্যাসিকের জীবনদর্শন বিষয়াতিগ নয়। সকল শিল্পের ক্ষেত্রেই যেমন একথা সত্য যে শিল্পের বক্তব্য শিল্পনিহিত ব্যাপার, শিল্পাতিগ কিছু নয়—উপন্যাসের ক্ষেত্রেও সে কথা সমান প্রযোজ্য। শিল্পের বক্তব্য শিল্পনিহিত। 'ওড টু নাইটিঙ্গেল' কবিতার যা বক্তব্য তা কবিতাটির সরল গদ্যীকরণের মধ্যে অপ্রাপ্য—সে বক্তব্য শুধু ঐ কবিতাটির শিল্পসারের মধ্যে সন্ধেয়। তেমনি একটি উপন্যাসের যা বক্তব্য বা জীবন-ব্যাখ্যা তা উপন্যাসের সমগ্র প্যাটার্নের মধ্যে

নিহিত থাকে। উপন্যাসকার যখন তাঁর গল্প নির্বাচন করেন, চরিত্র ধ্যান করেন, চরিত্র-পরিবেশ এবং ঘটনার পরস্পর সম্পর্কের কথা চিন্তা করেন তখনই জীবন সম্বন্ধে তিনি কী বলতে চান তাও ভাবা হয়ে যায়। ঔপন্যাসিকের সৃষ্টিপর্যায়ের এই স্তর শিল্পীর পক্ষে পরীক্ষা-নিরীক্ষার যন্ত্রণাময় স্তর। লেখক স্বভাবতই সচেতনভাবে জীবন সম্বন্ধে বক্তব্য স্থিরীকরণের পর উপন্যাস রচনায় নিযুক্ত হন না। তাঁর গল্পের এবং চরিত্রের পরিভাষায়, তাদের মাধ্যমে তিনি জীবন সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্যকে রূপময় করে তোলেন। এই রূপান্বিত বক্তব্যই উপন্যাসের বিষয়বস্তু। একজন ঔপন্যাসিকের বিষয়বস্তু কী সে-কথার উত্তরে আমরা এই রূপান্বিত বক্তব্যের কথাই বলে থাকি। এ শুধু আখ্যানভাগের সারাংশ লিখন নয়।

•• দুই ••

এ শুধু আখ্যানভাগ নয় বলে, এর সঙ্গে ঔপন্যাসিকের জীবনদর্শনের প্রশ্নও জড়িত থাকবে বলে, উপন্যাসের প্রসঙ্গে পট এবং পটবিধৃত মানুষের সম্পর্কের ব্যাপারটা প্রধান। উপন্যাসের অব্যবহিত পূর্বপুরুষ পিকারেস্ক-জাতীয় উপন্যাস থেকেই প্রকৃতপক্ষে এই পরিবেশ এবং পটের প্রসঙ্গ প্রভাবী হয়ে উঠেছে। Outcast বা সমাজচ্যুত মানুষ, যে সমাজকে উপেক্ষা করে, এবং যাকে সমাজ উপেক্ষা করে, তার প্রতিক্রিয়া সমাজেব নির্দিষ্ট ছকে কোন্ আলোড়ন সৃষ্টি করে পিকারেস্ক উপন্যাসের রস পরিণামে সেটাই লক্ষ্য। ব্যক্তি বা Individual-এর যে প্রশ্ন পরবর্তী উপন্যাসসমূহে প্রধান হয়ে উঠল পিকারেস্ক উপন্যাসে তারই প্রথম সূত্র। ব্যক্তির প্রশ্ন উপন্যাসের প্রধান প্রশ্ন। কিন্তু এই প্রশ্নের রূপ দ্বিবিধ। ব্যক্তিবৃন্দের পরস্পর সম্পর্কে এর এক রূপ; সমাজ বা সভ্যতার সঙ্গে এদের সম্পর্ক নিরূপণে এর দ্বিতীয় রূপ। গোরা উপন্যাসের গোরা-চরিত্র এর আশ্চর্য নিদর্শন। গোরা-সুচরিতা-আনন্দময়ীর সম্পর্ক অথবা গোরা-বিনয়ের সম্পর্ক-সূত্র বা পরেশবাবু-ললিতার সম্পর্ক এই উপন্যাসের ব্যক্তিসম্পর্কের দিক। আবার গোরার যন্ত্রণায় পরেশবাবুর শান্ত দৃঢ়তায় বিনয়-ললিতার বিবাহে এই উপন্যাসের সমাজ-ব্যক্তির সম্পর্কের দিক। আমরা যেভাবে পৃথক করে এখানে বিষয়টির বর্ণনা দিলাম সেভাবে উপন্যাসে ব্যক্তি-সমাজ সম্পর্কের পৃথক রূপায়ণ ঘটে না। ব্যক্তির মৌল প্রশ্নের সঙ্গে পরিবার এবং সমাজের বিস্তৃত পটভূমি জড়িয়ে যায়। যখন এইভাবে পটবিধৃত ব্যক্তির যন্ত্রণাময় কর্মশীল বা অনুভূতিময় সংবেদনশীল সত্তাকে ঔপন্যাসিক

রূপময় করে তুলতে পারেন তখনই সার্থক উপন্যাসের জন্ম। যেমন ম্যাজিক মাউণ্টেন এবং ক্রাইম অ্যাণ্ড পানিশমেণ্ট, যেমন রেজারেকসন এবং যোগাযোগ। এগুলি মহৎ উপন্যাস। এবং এই অনুভূতিময় সংবেদনশীলতার জন্যই জেম্‌স্ জয়েসের ইউলিসিসও মহৎ সৃষ্টি।

এই ব্যক্তি-সমাজ সম্পর্কের মূল্যবান প্রশ্নটি উপন্যাস আলোচনার ক্ষেত্রে ইতিহাস-গত কারণেই প্রাসঙ্গিক। সমাজ এবং সভ্যতা কোথাও স্থিতিশীল নয়। সুতরাং এই প্রতি মুহূর্তের পরিবর্তনশীল সমাজ ও সভ্যতার বৃহৎ দায় ব্যক্তি কেমন করে বহন করছে, আবার ব্যক্তি কীভাবে সমাজ ও সভ্যতার পরিবর্তনে ভূমিকা পালন করছে উপন্যাসের ব্যক্তি-সমাজ সম্পর্কে এই প্রশ্নটি অন্যতম প্রশ্ন। সাহিত্য জীবনেরই একটি অংশ। জীবন প্রতি মুহূর্তেই রূপান্তরমুখী। কালাশ্রিত জীবনের এই রূপান্তরমুখিতার দিকে দৃষ্টি রেখেই একথা বলা হয় যে every age is an age of transition। সুতরাং ব্যক্তি এবং সমাজের পরস্পর সম্পর্কের এই সূত্রটি গাণিতিক সূত্রের মতো লেখকের মাথায় ভর না করে থাকলেও উপন্যাসের রচয়িতার কাছে যে-কটি বিষয় আপন মননের সাহায্যে অনুধাবনীয় এই বিষয়টি তার মধ্যে প্রধান। উপন্যাসের বিষয়বস্তু বলতে আমরা ব্যক্তি এবং সভ্যতার সম্পর্কের এই বিশিষ্ট প্রশ্নটিকেই বুঝি। 'আউটসাইডার' উপন্যাসে নায়কের যন্ত্রণা বর্তমান সভ্যতার পরিপ্রেক্ষিতে প্রাসঙ্গিক। এই কারণে উপন্যাসের আলোচনায় তথা তার বিষয়বস্তুর আলোচনায় দেশকালের আলোচনা উত্থাপিত না হয়ে পারে না। যদিও শেষ পর্যন্ত শিল্পরূপ প্রধান হয়ে উঠবে এটাই স্বাভাবিক তথাপি যেহেতু শিল্পরূপ কোনো নির্বস্তুক (abstract) ব্যাপার নয় সেই হেতু আধুনিক কালের এই প্রধান শিল্পকে দেশকালের কঠিন মৃত্তিকা থেকেই জীবনরস সংগ্রহ করতে হয়। এক এক দেশের উপন্যাস সেই সেই দেশের সমাজ এবং সভ্যতার জটিল এবং বঙ্কিম গতির চিহ্নধর। সে-কারণে ঔপন্যাসিকের জীবন সম্বন্ধে বক্তব্যের (যেটা উপন্যাসের বিষয়বস্তুর অন্যতম অঙ্গ একথা আমরা পূর্বে বলেছি) তারতম্য এবং পার্থক্য এই দেশকাল-সাপেক্ষ সভ্যতার ভিন্ন ভিন্ন গতির জন্য সম্ভবপর হয়। একই ধরনের উপন্যাসে মোটামুটি গাল্পিক বিষয় এক হওয়া সত্ত্বেও বিষয়বস্তু যে শেষ পর্যন্ত পৃথক হয়ে যায় সে বিচারও এই দৃষ্টিকোণ থেকে করণীয়।

মাদাম বোভারি এবং আনা কারেনিনা উপন্যাস দুটির নাম-চরিত্রের তুলনামূলক আলোচনা এ প্রসঙ্গে উত্থাপনযোগ্য। উভয় নারী সমাজ-জীবনের প্রচলিত ছকের

বাইরে চলে গিয়েছিল। উভয় নারীর জীবনে জীবন সম্বন্ধে ক্ষুধার বিচিত্র অভিব্যক্তি আমরা অনুভব করেছি। উভয়েরই বিয়োগান্ত পরিণতিতে আমরা নিষ্ঠুর জীবনের ক্ষমাহীন অনিবার্যতা সম্বন্ধে সচেতন হই। কিন্তু এতৎ সত্ত্বেও টলস্টয় এবং ফ্লবেয়ারের Idea of writer's subject বা বিষয়-ধারণা এক নয়। ফ্লবেয়ারের ক্ষুরধার মনীষা উপন্যাসের আঙ্গিক-রীতির ইতিহাসে মাদাম বোভারির মতো চিরস্মরণীয় সৃষ্টির নিদর্শন রেখে গেলেও আনা কারেনিনার বিশাল নৈতিক তাৎপর্য মাদাম বোভারির নেই। একটা ছোট মফস্বল শহরের চিকিৎসক-বধূ, যার ভাবপ্রবণ ক্ষুধা এবং নির্বোধ পল্লবগ্রাহিতা পণ্ডিতম্মন্য স্বামীর বৈচিত্র্যহীন জীবনে নিজ-তৃপ্তি খুঁজে পায়নি—একটি সন্তান থাকা সত্ত্বেও—সেই বধূটি মাদাম বোভাবি—উপন্যাসেব নায়িকা। অবশ্যই মাদাম বোভারি উপন্যাসে শিল্পীর শিল্পবোধেব পরীক্ষা হয়েছে চূড়ান্তভাবে। ফ্লবেয়ারকে ব্রতী হতে হয়েছে শিল্পীর দ্বৈত-সাধনায়। বিষয়ীর নিরাসক্ত বাস্তব-চেতনা এবং বিষয়ের যথাযোগ্য রূপ-সাধনা—যে কোনো ঔপন্যাসিকেরই দ্বৈত-সাধনার দুই দিক। এক্ষেত্রে ফ্লবেয়ারের পরীক্ষাও ছিল এই জাতীয়। কিন্তু এ জাতীয় পরীক্ষা হলেও ফ্লবেয়ারের পরীক্ষা ছিল কঠিনতর। বাস্তব দৃষ্টি এখানে বোমাণ্টিক নারীমানসের সমগ্রতাকে রূপায়িত কবতে ব্যয়িত হয়েছে। কাজেই কল্পনাচারিতা এবং বাস্তববুদ্ধির উভচর শক্তিকে আয়ত্তাধীন করেছেন লেখক। এর যে কোনো একটির ঈষৎ আতিশয্যে যে রূপসিদ্ধির জন্য উপন্যাসটিব ক্লাসিক মর্যাদা সেই রূপেরই হানি ঘটত। এ পথ ক্ষুরস্যধারা নিশিতা দুরত্যয়া।

কিন্তু এই সমস্ত বক্তব্যকে স্বীকার করেও একটা প্রশ্ন শেষ পর্যন্ত অনাহত থাকেই। এমা বোভাবির জীবনের ঘটনা শেষ পর্যন্ত কোন্ তাৎপর্যকে বহন করছে—লেখকের বিষয়ধারণার দিক থেকে এই প্রশ্ন প্রাসঙ্গিক। এমার অভিজ্ঞতা, এমাব দুঃখবোধ, এমার সমুদয় চাওয়া এবং বিড়ম্বনার পরম মূল্য কোথায়? এ-প্রশ্নের উত্তর না দিলে শিল্প-জিজ্ঞাসা জীবন-জিজ্ঞাসার আত্মীয় হয়ে উঠতে পারে না। কেননা, সতর্ক শিল্পবোধ বিশিষ্ট জীবনবোধের প্রতিফলন। এ-কথা শিল্প-সাহিত্যের যে কোনো শাখা সম্বন্ধে প্রযোজ্য—উপন্যাস সম্বন্ধে এ কথা আরো বেশি করে সত্য। তাই ফ্লবেয়ারের অমিত কীর্তিধর প্রতিভাকে ঔপন্যাসিকের নিরাসক্তি শিক্ষার ক্ষেত্রে গুরুপ্রণাম জানিয়েও এ প্রশ্ন স্বাভাবিক যে বোভারি-দম্পতির মফস্বল-জীবনের নিস্তরঙ্গ মধ্যবিত্ত মানস একটা নির্দিষ্ট পটভূমির সঙ্গে যেন দৃঢ়বদ্ধ হতে পারেনি। নির্দিষ্ট কোনো পটভূমিগত ব্যাপ্তি ছিল না বলে

এমার চাওয়া এবং পাওয়ার বিড়ম্বনা এমাকে কেন্দ্র করেই শুধু বেঁচে রইল। ততধিক কোনো ব্যঞ্জনা সঞ্চার করতে পারল না।

অথচ এই প্রসঙ্গেই আমরা যখন আনা কারেনিনার কথা চিন্তা করি তখন আনার সমস্ত জীবন ব্যাপারকে এমন তাৎপর্যান্বিত হতে দেখি যা উপন্যাসের বিষয়কে অনন্যসাধারণ গৌরবে মণ্ডিত করেছে। আমরা আগেই বলেছি যে উপন্যাসের ব্যক্তি কদাচ একক ব্যক্তি নয়। ব্যক্তি-কাহিনীও একক কাহিনী নয়। পরস্পর সম্পর্কের টানাপোড়েনে ব্যক্তির জীবনের শুধু নয়, সমষ্টিরও মূল্য-বোধের নানা দিক এবং তাদের যথার্থতা আমাদের প্রত্যক্ষগোচর হয়। ব্যক্তি-জীবনের মুকুরে সমাজ-জীবনের মূল্যবোধের যাচাই হয়। কাজেই পটভূমির প্রসঙ্গকে পরিহার করে উপন্যাস বিচার অসম্ভব। আনাব ভিতরে এমন কোনো বিশেষ ধবনেব অসঙ্গতি নেই যার ফলে তাকে আমরা মনস্তাত্ত্বিক গবেষণার বিষয় বলে মনে করতে পারি। বস্তুত আনাব জীবনাচরণে আর পাঁচজনের ব্যতিক্রম নেই—অন্তত প্রথমে ছিল না। এমা বোভারির মতো নির্বোধ বোমাণ্টিক ক্ষুধাব সাক্ষাৎ আনা-ব ক্ষেত্রে পাই না। এই অসীম জীবনাগ্রহী সুস্থ তরুণী যখন থেকে প্রচলিত ছকের বাইরে চলে গেল তখন থেকে ভ্রনস্কির প্রসঙ্গে না বিচাব কবলে এই গোটা ব্যাপারটির মীমাংসা হওয়া সম্ভব নয়। কোনো বিখ্যাত সমালোচক বলেন যে আনা-ভ্রনস্কি এবং কাবেনিনের কাহিনীতে বুর্জোয়া দাম্পত্য জীবনের ও প্রেমেব অন্তর্নিহিত অসঙ্গতিরই রূপায়ণ ঘটেছে। একেবারে এমনভাবে সূত্রানুসাবী বিচারপদ্ধতি না অনুসরণ করেও বলা চলে সে আনার অভিজ্ঞতার ফলে প্রচলিত সমাজপটেব একটা নতুন ব্যাখ্যা পাওয়া গেছে —যে ব্যাখা আনার জীবন-নিযাসে যুক্ত বলেই শিল্পসম্মত হতে পেবেছে।

কাবেনিনকে বিবাহ আনার হৃদয়ে কোনো নতুন প্রত্যাশার জাগরণ ঘটায়নি। All happy families are alike—এই উক্তির ভিতরে টলস্টয় তাঁর বক্তব্য বলেছেন। কাবেনিন এবং আনার দাম্পত্য-জীবন সচরাচর উচ্চ মধ্যবিত্তের দাম্পত্য-জীবন। কারেনিনের যান্ত্রিক জীবনধারা এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠার ব্যাপারকে লেখক যথোপযুক্ত সুবিচারেব সঙ্গে এঁকেছেন। কারেনিনকে যে আনা আবেগেব সঙ্গে কোনোদিনই ভালবাসতে পারেনি—এর জন্যে কারেনিনের কোনো অস্বাভাবিকতাকে লেখক দায়ী করেননি। আনার ব্যাপার যে সৃষ্টি-ছাড়া কিছু ব্যাপার নয় সে সম্বন্ধেও লেখকের ইঙ্গিত পরিস্ফুট। ভ্রনস্কির মায়ের সম্বন্ধে কিছু কিছু উল্লেখই যথেষ্ট। আনা বতমান সামাজিক জীবনের সম্পাত্তিবাদী

স্বামীর পত্নী। সে আশাহত আবেগহত অনুভূতিশূন্য অ্যাভারেজ মধ্যবিত্ত ঘরনীর ক্লান্তিময় দাম্পত্য-জীবনে যে চূড়ান্ত বিস্ফোরণের সম্ভাবনা থাকে তারই প্রতীক। সেই জন্যই তার গোটা অভিজ্ঞতা এমা বোভারির মতো মাঝারি অভিজ্ঞতা নয়।

আবার যে লোকটা আনাকে প্রচলিত জীবনের ছকে অনুগত থাকতে দিল না তার সম্বন্ধেও টলস্টয়ের অভিনিবেশ লক্ষণীয়। ভ্রনস্কি-আনার প্রেম এবং আনার মৃত্যু এই উভয়ের প্রত্যক্ষ হেতু। কী করে সে আনার প্রেমকে জাগ্রত করল, আবার কী করে সে আনার মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করল দুইই অনুধাবনযোগ্য।

আশ্চর্যের বিষয় উভয় ব্যাপারই সংঘটিত হচ্ছে ভ্রনস্কির ব্যক্তিচরিত্র এবং সামাজিক চরিত্রের টানাপোড়েনে। যে ভ্রনস্কি ঘোড়দৌড়ের মাঠে বিমুক্ত প্রাণাবেগের প্রতীক, যে ভ্রনস্কি সামরিক-বিভাগ পরিহার করে নাগরিক জীবনের সন্ধানী, যে ভ্রনস্কি উদারতাবাদী রুশ যুবকদের তৎকালীন প্রতিভূ—যে ভ্রনস্কি নিজ জীবনের ধারা-ধরনের পরিবর্তন প্রয়াসী সেই ভ্রনস্কি আনার হৃদয়ে প্রেমের জাগরণ সম্ভব করে তুলেছিল। আনা কারেনিনের ঘরনী হিসাবে যে যান্ত্রিক জীবন বহন করছিল তার জন্যে তার মনে ফল্গু-বিক্ষোভ বিদ্যমান ছিল, যাকে সে নিজেও হয়তো ভালো করে চিনত না। ভ্রনস্কির প্রতি আসক্তি সেই বিক্ষোভের সুড়ঙ্গ-পথ। আবার এই একই ভ্রনস্কির ভিতরে উদারতাবাদী রুশ মধ্যবিত্ত যুবকের সর্বাঙ্গীণ অসঙ্গতিও উপস্থিত। সে নিজের জীবনের ধারা পরিবর্তনের প্রয়াসী, কিন্তু এই পরিবর্তন প্রচেষ্টা তাকে যা করে তোলে তা হল সূক্ষ্মতা-বিলাসী dilettante। এই সূক্ষ্ম রুচিবিলাসীর জীবনের মূল অসঙ্গতিই হল এখানে যে এর সামর্থ্য সীমিত। কাজে কাজেই আনার সমুদয় প্রেমের দায় সে বহন করার যোগ্য নয়। চায়ের টেবিলে আনার চা খাওয়ার ভঙ্গিকে তার মনে হয় কুৎসিত। এমনি করে আনারও ঘোড়দৌড়ের ঘটনার পরে মনে হয়েছিল যে কারেনিনের কানগুলো খুব বড়ো বড়ো। কিন্তু টলস্টয়ের বিষয়চেতনা এমনই মর্মগ্রাহী যে পাঠকের কাছে আনার মনে-হওয়াটাকে মনে হবে নির্দোষ। মনে হবে যে সেটা হল কারেনিনের নিরাবেগ অভ্যাসিকতা-মন্থর জীবনের বিরুদ্ধে নবজাগ্রত প্রতিক্রিয়ার অভিব্যক্তি। আর ভ্রনস্কির মনে-হওয়াটাকে মনে হবে কদর্য। কেননা ভ্রনস্কি প্রেমের দায়কে বহন করার ব্যক্তিত্ব হারিয়ে ফেলেছিল। ঘটনার উজ্জ্বল নায়ক অনিবার্য প্রতিমুখে স্থাপিত হয়ে স্তিমিত হয়ে গেল। দেখানো হল, আধুনিক যুগের তথা সভ্যতার বিশিষ্ট পর্যায়ে কিবা দাম্পত্য-

জীবন, কিবা প্রেম উভয়েরই সংকট ও অন্তর্জটিলতা কতখানি কঠিন, কতখানি অমোচনীয়। এই অন্তর্জটিলতা সম্বন্ধে সচেতনতায় আনা কারেনিনা উপন্যাসে নৈতিক সচেতনতা সক্রিয় হয়ে রয়েছে। এবং এই বিচারেই এমা বোভারির মাঝারি অভিজ্ঞতা অপেক্ষা আনা কারেনিনার গভীর অভিজ্ঞতা অনেক বেশি তাৎপর্যবহ। উপন্যাসের এই পট এবং পটবিধৃত ব্যক্তির সম্পর্ক প্রসঙ্গে তরুণ মোপাসাঁকে লিখিত ফ্লবেয়ারের একটি চিঠি আলোচ্য। মোপাসাঁকে ফ্লবেয়ার লিখেছিলেন যে যদি শিল্পীকে একটি বিশেষ গাছের বিষয় বর্ণনা করতে হয় তাহলে তিনি ততক্ষণ ধরে সেই গাছটিকে প্রত্যক্ষ কববেন যতক্ষণ না সেই বিশেষ গাছটিকে অন্য সকল গাছ থেকে পৃথক বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। ফ্লবেয়ারের ধারণা ছিল এই পদ্ধতিতেই নাকি সেই বিশেষ গাছটির সমস্ত স্বাতন্ত্র্য ধরা পডবে। কিন্তু আংশিকভাবে এর কার্যকারিতা মেনে নিলেও এই পদ্ধতির সীমিত দিকটিও আমাদের দৃষ্টিতে আনা উচিত। এই পদ্ধতির ফলে ঐ বিশেষ গাছটি যে প্রকৃতির বিস্তীর্ণ পটভূমিকা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং তাতেই যে পূর্ণ শিল্পবোধের ব্যত্যয় ঘটে শিল্পীর সে বিষয়ে অবহিত থাকা প্রয়োজন।

•• তিন ••

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে ঔপন্যাসিকেব বিষয়চেতনা অন্য শিল্পের মতো শুধু প্রকাশ-চেতনা বা বৃহৎ অর্থে আঙ্গিক-সচেতনতা নয়। তদতিবিক্ত কিছু। এইখানে উপন্যাসের বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে পটের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়। মিলিয়ে দেখতে চাওয়াটাই ঔপন্যাসিকেব দেখতে চাওয়া। এই ব্যক্তি আর পবিবেশকে মিলিয়ে দেখতে গিয়ে ঔপন্যাসিক দেখান কী এবং কতটুকু মিলছে এবং কী কোথায় মিলছে না। অসমন্বয়ের এই যন্ত্রণাকে ঔপন্যাসিক নানাভাবে পরীক্ষা করেন। সকল প্রেমে, সকল কর্মে মানুষ তার সৎ-স্বরূপকে খুঁজছে। ব্যক্তিমানুষের এই সন্ধানী যাত্রায় ঘন ঘন করাঘাত সমাজ-পরিবেশের বুকের ওপরেই বাজতে থাকে। তাতে যে সুর-তরঙ্গ সৃষ্টি হয় উপন্যাসেব ফলশ্রুতি নির্মাণে তার ভূমিকা অন্যতম। সে কারণে বলা যায় যে যন্ত্রণাই সমস্ত উপন্যাসেব বিষয়—সে যন্ত্রণা অস্তিত্বের যন্ত্রণা।

এ প্রসঙ্গে আমরা বর্তমানে আলোচনা করব—একদিকে রাসকল্‌নিকফ ও নেখল্যুডফের অভিজ্ঞতার কথা, আর একদিকে ভ্রমর, কুমু এবং সাহেব-বিবি-গোলামের বৌঠানের অভিজ্ঞতার মূল্য।

ক্রাইম অ্যাণ্ড পানিশমেণ্ট এবং রেজারেকশনের নায়ক রাসকল্‌নিকফ এবং নেখলুাডফ জীবনের বহুধাবিস্তৃত পটে কর্মতৎপরতায় বিশিষ্ট নায়ক। ক্রাইম অ্যাণ্ড পানিশমেণ্ট এবং রেজারেকশনের কাহিনীতে অবশ্যই পার্থক্য বিগুমান। কিন্তু এই দুই নায়কের যন্ত্রণার সাদৃশ্যটুকু লক্ষণীয়। এই সাদৃশ্য দ্বিবিধ: প্রথম, উভয় নায়কেরই এক পাপকৃতির চেতনা রয়েছে—নেখল্যুডফের মাসলোভা সংক্রান্ত স্মৃতি এবং রাসকল্‌নিকফের খুনের এবং পরস্বাপহরণের স্মৃতি। দ্বিতীয়, উভয়েই এই পাপচেতনার আগুনে পুড়ে পুড়ে নিজেদের শুদ্ধ স্বরূপের সন্ধান করেছে। এই সন্ধানের জটিল বিস্তৃত পর্যায় শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে উপন্যাস দুটি শেষ হয়েছে। দুই উপন্যাসের শেষ বাক্য হচ্ছে এক পর্যায় সমাপ্ত হল। যে নব পর্যায়ের শুরু হল তা কেমন হবে সে গল্প আর এক গল্প (ক্রাইম অ্যাণ্ড পানিশমেণ্ট), একমাত্র ভবিষ্যৎ তার বিচারক (রেজারেকশন)।

দুটি উপন্যাসে প্রেমের ব্যবহার করা হয়েছে বিশেষ তাৎপর্যের সঙ্গে। এই প্রেমের আখ্যান রাসকল্‌নিকফ এবং নেখল্যুডফের জীবনের পরিণতি রচনায় মূল্যবান ভূমিকা গ্রহণ করেছে। যে দুঃখদহনের স্বেচ্ছা-বরণে এই দুই নায়কের শুদ্ধতার জন্য সংগ্রামের পরম নিদর্শন, প্রেম তাকে উভয় ক্ষেত্রেই উজ্জ্বল করে তুলেছে। কিন্তু দুই উপন্যাসে দেখা যায় যে প্রেম-কাহিনীর ব্যবহার কোনো গতানুগতিক পদ্ধতিতে হয়নি। যন্ত্রণার পথে প্রেম এসেছে যন্ত্রণাকে বৃহত্তর তাৎপর্য দানের জন্য, যন্ত্রণাকে পরম রমণীয় করে তোলা এই দুই প্রেমকাহিনীর উদ্দেশ্য ছিল না। সে কারণে বলা চলে যে মহৎ উপন্যাসের যোগ্য আবহাওয়া রয়েছে এই প্রেমের আখ্যানভাগে। উপন্যাসের মুশ্‌কিল আসানের উদ্দেশ্যে যান্ত্রিক উপায়ক্রম হিসাবে এদেব ব্যবহার ঘটেনি। রেজারেকশনে নায়কের দীর্ঘযাত্রার শেষে দেখা গেল নায়িকা মাসলোভা নেখল্যুডফকে বিবাহ করতে অক্ষম। দানব্রতী কর্ণের কবচকুণ্ডল পরিহারের মতো নেখল্যুডফকে মাসলোভার প্রত্যাশাকেও শেষ পর্যন্ত ত্যাগ করতে হল। এবং জীবনের যে সৎ-স্বরূপকে অভিজ্ঞতার ছকে ছকে সে নানাভাবে খুঁজল তার সেই জীবন-পিপাসারও চূড়ান্ত পরীক্ষা হল এই শেষ যন্ত্রণার কষ্টিপাথরে। আবার রাসকল্‌নিকফের যন্ত্রণাকেও সহনীয় করে তোলার জন্য সোনিয়ার সঙ্গে তার প্রেমের ব্যাপারটিকে ব্যবহার করা হয়নি। সাইবেরিয়ায় মাসলোভা নেখল্যুডফকে প্রত্যাখ্যান করেছিল—ক্রাইম অ্যাণ্ড পানিশমেণ্টে সেক্ষেত্রে রাসকল্‌নিকফ সোনিয়াকে সাইবেরিয়ার উষর বন্দী জীবনের মাঝখানে স্বীকার করে নিল। অবশ্যই দুটো ব্যাপারের

নিষ্পত্তি হচ্ছে দু-রকম ভাবে। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই দুই লেখক একটা বিন্দুতে আশ্চর্যভাবে স্থির। টলস্টয় এবং দস্তয়েভস্কি কোনো শিল্পী-সুবিধাবাদকে প্রশ্রয় দেননি। নায়ককে জীবনের যন্ত্রণার মুখে স্থাপিত করে, পরে প্রেমের উপাদানের সাহায্যে সে-যন্ত্রণাকে সহনীয় করে তোলার আয়োজন করলে সেই সুবিধাবাদকেই প্রশ্রয় দেওয়া হত। 'আমি সমস্ত কিছু স্বীকার করব'—এই সিদ্ধান্তের পরমুহূর্ত থেকেই রাসকল্‌নিকফ সোনিয়ার সঙ্গে দূরত্ব রচনা করার প্রয়াসী হয়ে উঠেছে। সে সোনিয়ার কাছ থেকে যখন বিদায় গ্রহণ করেছে তখন মৌখিক বিদায় সম্ভাষণ করাও প্রয়োজন মনে করেনি। সাইবেরিয়ার কারাবাসে সোনিয়াকে দেখে প্রথম প্রথম যে ব্যবহার সে করেছিল সে-ব্যবহার ছিল রূঢ় এবং উদাসীন। সুতরাং প্রেমের আকাশে মুক্তি পাবার প্রলোভনে সে গ্লানিমোচনেব পথে পা বাড়ায়নি। নেখল্যুডফ এবং রাসকল্‌নিকফ এদের দুজনেব ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে অস্তিত্বের গভীর অন্তস্তল থেকে যন্ত্রণাব উৎসমুখ উন্মোচিত হয়েছে। এই যন্ত্রণা থেকে এরা উভয়ে পৃথিবীর পীড়িত স্বরূপকে উপলব্ধি করেছে—বুঝেছে যে পৃথিবীব গভীর, গভীরতর অসুখ এখন। এই সমস্যা গোটা ব্যক্তি-বিবেকের সমস্যা। যেহেতু গোটা ব্যক্তি-বিবেকের কথা একক অংশীভবনের ভিতর দিয়ে বলা যায় না, সেইহেতু গোটা ব্যক্তি-বিবেকের কথা বলতে গিয়ে ব্যক্তিটা যে সমাজের অংশ, সভ্যতার যে পর্যায়ের সে প্রতিনিধি তার বিচিত্র রূপও এই সব ব্যক্তি-জীবনের মুকুরে নানাভাবে ছায়াপাত করে। ঔপন্যাসিকের বিষয়-চেতনা এই সকল কিছুকেই আত্মসাৎ করে থাকে।

বাংলা সাহিত্যে এর উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হল ভ্রমর এবং কুমু। কৃষ্ণকান্তের উইল এবং যোগাযোগ অবশ্যই এক ধরনের এবং ভঙ্গির উপন্যাস নয়, কিন্তু এই উপন্যাসদ্বয়ের নায়িকাযুগলের মূলভিত্তিক সমস্যার একটা সুদূর সাদৃশ্য বিদ্যমান। সমস্যাটা এই যে, উভয়েরই স্বামী নামক আইডিয়ালের প্রতি, বা স্বামীত্বের ভাবাদর্শের প্রতি অসীম শ্রদ্ধা; কিন্তু গোবিন্দলাল বা মধুসূদন উভয়েরই ব্যক্তি-জীবনের আচরণের সঙ্গে ভ্রমর এবং কুমু সেই ভাবাদর্শের সঙ্গতি কেমন করে রক্ষা করবে? কৃষ্ণকান্তের উইলে এই সমস্যা চূড়ান্ত হল উপন্যাসের নাটকীয় ঘটনাগতির চূড়ান্ত সীমায় বা climax-এ পৌঁছে—রোহিনী-হত্যার পর। যোগাযোগে এ সমস্যা উপন্যাসের প্রারম্ভ থেকেই বিদ্যমান। উপন্যাসটি অসমাপ্ত। কাজেই এ সমস্যার শেষ পরিণতি কী তা জানা সম্ভব নয়।

তথাপি একটা কথা স্পষ্ট বোঝা যায় যে উভয় ক্ষেত্রে সমস্যার মূল সূত্র নিহিত

হয়ে রয়েছে দুই নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বোধে। ভ্রমর বলেছিল তার স্বামীকে যে, যতদিন তার স্বামী শ্রদ্ধার পাত্র ছিল ততদিন সে শ্রদ্ধা করেছে। আবার কুমুর ক্ষেত্রে সমস্যাটা এসেছিল এইভাবে যে জীবনযাত্রার এক বিপরীত বিন্যাসের বা ছকের মাঝখানে গিয়ে কেমন করে সে নিজেকে তার সঙ্গে মেলাবে। ভ্রমর তার যা কিছু ethical শিক্ষা সংগ্রহ করেছিল তার স্বামী গোবিন্দলালের কাছ থেকে। গোবিন্দলাল তাকে যা শিখিয়েছিল তা উনিশ শতকের সম্পত্তিবান যুবকের নীতিবিশ্বাস প্রণোদিত শিক্ষা। এ শিক্ষার প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ আমরা কৃষ্ণ-কান্তের উইল উপন্যাসে পাই না। কিন্তু সেই শিক্ষার প্রত্যক্ষ ফল ভ্রমরকে আমরা এই উপন্যাসে নানাভাবে দেখতে পাই। গোবিন্দলালের প্রদত্ত শিক্ষা নিশ্চয়ই ধনবান একান্নবর্তী সামন্ততান্ত্রিক পরিবারের বিরোধী কোনো শিক্ষা নয়। কাজে কাজেই বধূ হিসাবেই ভ্রমরের অস্তিত্ব। তার বাইরে ভ্রমরের কোনো অস্তিত্ব নেই। ভ্রমরের ক্ষেত্রে তার ব্যক্তিত্বের উজ্জ্বল আলোকে তখনই দীপ্তিময়ী হয়ে ওঠা সম্ভব হল যখন সে স্বামীরই প্রদত্ত বিচারবোধের মাপকাঠিতে স্বামীকে বিচার করে বসল। ভ্রমর গোবিন্দলালকে বলেছিল যে, তুমি শ্রদ্ধার উপযুক্ত নও, আর বলেছিল মৃত্যু মুহূর্তে, 'আশীর্বাদ করিও যেন জন্মান্তরে সুখী হই।' এই দুটো কথাই হিন্দু সমাজের প্রচলিত পত্নীত্বের সংজ্ঞাবিরোধী। সর্বাবস্থায় পতি হিন্দু নারীর পূজ্য এবং পতিগতপ্রাণতায় তার সুখ, ভ্রমর এই দুই ধারণারই বিরুদ্ধতা করল। এইখানেই ভ্রমর-চরিত্রের নৈতিক মূল্য। যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের আলোকে বঙ্কিম নিজে উদ্ভাসিত ছিলেন ভ্রমরের চরিত্রের ভিতর দিয়ে তারই অভিব্যক্তি ঘটেছে। ভ্রমরের চরিত্র তার নিজ ন্যায়কে অনুসরণ করতে করতেই বঙ্কিমের আন্তর সত্তার প্রতিফলন ঘটিয়েছে। এই যে reflection of writer's innerself—শ্রেষ্ঠ উপন্যাস-কীর্তির এটা একটা বড়ো নিদর্শন। ভ্রমরের ক্ষেত্রে অবশ্যই সামান্য অসঙ্গতি রয়ে গেছে। ভ্রমরের জা নেই, শাশুড়ি থেকেও নেই (সূর্যমুখীরও এই অবস্থা ছিল)। ফলে ভ্রমরের অন্তঃপুরের পারিবারিক জীবন-যাত্রার সমস্ত প্রকার সম্পর্কগুলোকে ঠিকমতো উপস্থাপিত করা হয়নি। এইভাবে উপস্থাপিত করলে ভ্রমরের যন্ত্রণা আরও বেশি real হয়ে উঠতে পারত। কারণ আমরা জানি মেয়েদের জীবন এত বেশি ছক-অনুবর্তী ও এত বেশি নানা সম্পর্কের ওপর নির্ভরশীল যে শুধু দাম্পত্য সম্পর্কের ভিতর দিয়ে একটি নারীর সর্বস্ব উপলব্ধি হয় না। রোহিনীকে যেমন আমরা রোহিনীর সমশ্রেণীর ঝি-

চাকরানী প্রমুখ পরিবেশ অন্তর্ভুক্ত অবস্থাতেই সর্বদা পাচ্ছি, ভ্রমরকে সে জায়গায় একক অন্তঃপুরচারিণী বলে মনে হয়। ভ্রমরকে যে কেবল শেষ পর্যন্ত একটা ideal-এর মূর্ত প্রতীক বলে ভ্রম হয়েছে সেটা এই কারণে। নারীর সহস্র গ্রন্থিল পারিবারিক জীবনে চাপ এবং প্রতিক্রিয়া যদি প্রতি মুহূর্তেই তার ওপর পড়ত তাহলে এই অবস্থার সৃষ্টি হত না।

কিন্তু এইভাবে সামাজিক ও পারিবারিক পটের দিক থেকে সম্পর্কগত খানিকটা ব্যত্যয় থাকলেও অন্য একদিক থেকে ভ্রমর একটি নিরুপম আদর্শের সৃষ্টি করেছে। সেটি ইতিহাসের দিক থেকে। এ-কথাটি একটু পরিষ্কার করে বলা প্রয়োজন। এক হিসাবে শিল্প-সার্থক প্রতিটি উপন্যাসই ঐতিহাসিক লক্ষণাক্রান্ত। প্রথম শ্রেণীর উপন্যাসের কুশীলবেরা এই ঐতিহাসিক লক্ষণকে বহন করে থাকে। প্রতিটি ব্যক্তির নিজস্ব চিন্তায় তার ব্যক্তি-জীবনের ন্যায়-ক্রম যতটা ক্রিয়াশীল থাকে ইতিহাসের সমকালীন টানাপোড়েনও ততটা না হোক কম-বেশি করে কিছুটা প্রভাব বিস্তার করে থাকে। এ প্রভাব কখনও প্রত্যক্ষ, কখনও পরোক্ষ। কিন্তু একটি সার্থক লক্ষ্য উপন্যাসের চরিত্রাবলী কখনই এই ইতিহাস ব্যাখ্যার সীমাকে লঙ্ঘন করে চলতে পারে না। রবিনসন ক্রুশো চরিত্রের পূর্ণাঙ্গ শিল্প-রূপের সম্যক আলোচনায় আমাদের নিশ্চয় কেবলমাত্র ডিফো-র কালের ইংলণ্ডীয় সমাজ-ইতিহাসের নজির আকর্ষণ করলেই চলবে না, তার সাহিত্য সমালোচনাই সেখানে মূল কথা। কিন্তু এ সাহিত্য সমালোচনাও আবার পূর্ণ হবে না যতক্ষণ না ডিফোর শিল্পীমানসের নিজস্ব বিচিত্র গতিকে আমরা সকল দিক দিয়ে উপলব্ধি করছি। এই উপলব্ধি আরো বহুকিছুর সঙ্গে ঐতিহাসিক পটবিচারেরও মুখাপেক্ষী। টুর্গেনিভের বিখ্যাত নায়ক বাজারভের প্রসঙ্গও এ-ক্ষেত্রে তুলনীয়। বাজারভকে রুশ মধ্যবিত্ত যুবকদের তৎকালিক চিন্তাগত পটভূমিকায় স্থাপন করা ছাড়া তার অভিজ্ঞতার পূর্ণ স্বরূপকে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। ভ্রমরের ব্যাপারেও অনুরূপ বিচার পদ্ধতি প্রয়োজন।

ভ্রমর বাংলা দেশের নারীসমাজের এক বিশিষ্ট পর্যায়ের প্রতিনিধি। কিন্তু তাই বলে ভ্রমরকে শুধু সেই আখ্যায় ভূষিত করলেই তার স্বরূপাবিষ্কার সম্ভব হবে না। এ-কথা অবশ্যই স্বীকার্য যে উনিশ শতকের নবজাগ্রত ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবোধ ভ্রমরের চিন্তায় এবং চেতনায় পরোক্ষ উদ্ভাসন সৃষ্টি করেছে। কিন্তু লেখকের অন্তরাত্মার এই বিশিষ্ট প্রতিফলন গণিতের সরল সূত্র অনুসরণ করে সম্ভব হয়নি। সৃষ্টিক্রিয়ার গূঢ় এবং জটিল পন্থার অনুসরণ এখানে লক্ষণীয়। চরিত্রের

প্যাটার্নের দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায় যে ভ্রমর সম্পূর্ণভাবে সমাজ ও পারিবারিক জীবনের প্রচলিত ছকের অঙ্গীভূত চরিত্র। সে একান্নবর্তী সামন্ত-পরিবারের বধূ। সেই বধূত্বের যে বোধ সেই বোধের নির্দেশ সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ন রেখেই তার সম্ভাবনা এবং প্রতিশ্রুতিকে ব্যবহার করেছেন লেখক। এই সূত্র থেকেই সঞ্চারিত হয়েছে ভ্রমরের অন্তর্দ্বন্দ্ব। সমষ্টিরূপ এবং ব্যক্তিরূপের মধ্যস্থিত এই দ্বন্দ্বময় রূপের শিল্পায়নই ঔপন্যাসিকের কাজ। ভ্রমর সে-হিসাবে খাঁটি ঊনবিংশ শতকের বাঙালী বধূ। যার বধূ-চেতনায় চিরকালের বাংলাদেশ ক্রিয়াশীল—যার নীতি-চেতনায় ঊনবিংশ শতকের প্রভাব। এই ঔপন্যাসিক-লক্ষণের বিদ্যমানতার জন্যই ভ্রমরের সামান্য পটভূমিকাগত সীমাবদ্ধতার ক্ষতি-পূরণ হতে পেরেছে।

কুমুর ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ঔপন্যাসিক হিসাবে ব্যাপকতর অভিনিবেশের পরিচয় দিয়েছেন। মধুসূদনের পরিবারে কুমুর অস্তিত্বকে নানা সম্পর্কের আলোকে তুলে ধরা হয়েছে। মধুসূদনের রুচি এবং কুমুর রুচির মধ্যে যে বিরোধ তা অবশ্যই জীবনের দুটো বিন্যাসের বিরোধ। দুটো ব্যক্তিত্বের বিবোধ। সম্পত্তিবান মধুসূদনের অধিকার-বোধের সঙ্গে নিজ শুদ্ধ স্বরূপের সন্ধানী এক নারী, যে পত্নীও বটে, তাদের অমীমাংসার সমস্যা যোগাযোগের সমস্যা। ভ্রমরের ক্ষেত্রে ব্যক্তিত্বের প্রশ্নের উৎস যেখানে কুমুর উৎস তদপেক্ষা আরো গভীরে। এ কারণে কৃষ্ণকান্তের উইল অপেক্ষা যোগাযোগের বিষয় অধিকতর গভীর।

ভ্রমর, কুমু এবং সাহেব-বিবি-গোলামের ছোট বৌয়ের কাহিনীর তুলনামূলক বিচারে তিনজন লেখকের বিষয়বস্তুর উৎকর্ষের তারতম্য-বিচারও সুসাধ্য। ভ্রমরের চিন্তার সংকট এসেছে একটা অতি স্থূল চরিত্রের ঘটনা থেকে। তার স্বামী চরিত্রভ্রষ্ট হয়ে গেল। ভ্রমর এবং গোবিন্দলাল উভয়ে মিলে জীবনের যে ছক গড়ে তুলেছিল বহির্নিক্ষিপ্ত একটা ঘটনার আঘাতে সেই ছকের বাইরে চলে গেল ভ্রমরের স্বামী। রোহিনীর বিষয়ে গোবিন্দলাল নিরাসক্ত থাকলে ভ্রমরের সংকট সম্ভব হত না। তারা উভয়েই সচরাচর অনুসৃত জীবনযাপন করতে পারত। পুণ্যবান মানুষও দুর্বল বলেই পাপের প্রলোভনে সাড়া দিয়ে ফেলে——শুধু এই ঘটনার আতিশয্যেই এই উপন্যাসের সমস্ত সম্ভাবনা নিহিত হয়ে অপেক্ষা করছিল। এইখানে যোগাযোগের তুলনায় বিষয়গত গভীরতার ন্যূনতা। এ ধরনের ঘটনাচক্র এবং অদৃষ্টের আকস্মিক দুর্যোগ যোগাযোগে অনুপস্থিত। মধুসূদন একদা পুণ্যবন্ত ও অধুনা পাপাসক্ত নীতিশাস্ত্র পড়া যুবক নয়। উপন্যাসের

সমস্যারম্ভ তথাকথিত নৈতিক কেন্দ্রবিন্দু থেকে নয়। কুমুর কাছে এবং মধুসূদনের কাছে জীবনের মানে পৃথক, সমস্যারম্ভ এখানে। মধুসূদন এবং কুমু পরস্পরকে পরিহার করতে চাইলে সমস্যার কোনো অস্তিত্বই সম্ভব হত না। এখানে এরা দুজনে পরস্পরকে জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে নিতে চায়। তার পথে যে বাধা দুর্লঙ্ঘ্য হয়ে রয়েছে এ উপন্যাসের বিষয়বস্তু হল সেই বাধার সঙ্গে যুদ্ধের কাহিনী। সে-বিচারে এ উপন্যাসের বিষয়বস্তুতে লেখক অপার নৈতিক সচেতনতার বা moral awareness-এর পরিচয় দিয়েছেন। সেটা হল: আমরা ভালবাসতে চাইলেই যে ভালবাসতে পারব এ কথা সম্পূর্ণ সত্য নয়। আসলে ব্যক্তিমানস একটি জটিল সৃষ্টি। সেই ব্যক্তিমানসের সারীভূত রূপ হল ব্যক্তিত্ব। আমাদের নিভৃত ভালবাসার অধ্যায় রচনার ক্ষেত্রেও সেই স্বতন্ত্র ব্যক্তিমানস তার ভূমিকা হারিয়ে ফেলে না। কুমুর অভিজ্ঞতার মূল্য এ কারণেই ভ্রমরের অভিজ্ঞতা থেকে অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ। এইসব সাহিত্যাদর্শের পাশে সাহেব বিবি গোলামের ছোট বৌঠানের অভিজ্ঞতার প্রতিতুলনা যদি করা যায় তাহলে বোঝা যায় ছোট বৌঠানের অভিজ্ঞতার মূল্য এদের তুলনায় কত স্বল্প। বিষয়বস্তু হিসাবে ছোট বৌঠানের অভিজ্ঞতা লেখকের ব্যবহারের দোষে তাৎপর্যহীন হয়েছে। এ গল্পে অবশ্যই ছোট বৌঠানের ব্যক্তিস্বরূপকে সামন্ত পরিবারের বধূত্বের ফ্রেমে ঠিক ভাবেই বসানো হয়েছে। কিন্তু ছোট বৌঠানের কারুণ্য ভ্রমরের ট্র্যাজেডির পর্যায়ে উঠতে পারল না লেখকের বিষয়বস্তুর অন্তর্নিহিত দুর্বলতায়। স্বামীর ওপর স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে যে বধূটি মদ্যপান করে ও আত্মবিসর্জন দেয় তার নিঃসহায় কারুণ্যের মূল্য কতটা? নির্যাতিত নারীত্ব বা জমিদার বাড়ির কেচ্ছা ছাড়া একে আর অন্য কোন্ তাৎপর্যে অর্থবান করে তোলা যাবে? নিজে মদ্যপানাসক্ত হয়ে স্বামীর কাছে বেশ্যাদের বিকল্প রচনা করে ট্র্যাজিক মহিমা তবেই অর্জন করা যেত যদি নীতিবোধ সম্বন্ধে বৌঠানের কোনো দৃঢ় সুস্পষ্ট চিন্তা ছিল এ সম্বন্ধে স্পষ্ট পূর্ব-প্রমাণ আমাদের হাতে থাকত। তবেই মদ্যপানের ভিতরে বৌঠানের দ্বন্দ্বময় আর্তি রূপায়িত হতে পারত। এর অবর্তমানে যা হয়েছে তা হল সত্যিই চাকরের চোখে দেখা একটি বিশেষ জমিদার বাড়ির অ্যাভারেজ কেচ্ছা কাহিনী মাত্র।

আসলে বিষয়বস্তুটা ততক্ষণ লেখকের কাছে বিষয়বস্তু হয়ে উঠছে না যতক্ষণ না লেখক নিজে একটা জীবন-বিষয়ক বক্তব্যে পৌচেছেন। অমুক বইয়ের বিষয়বস্তু এই অথবা ঐ বইটার বিষয়বস্তুটা ভালো এসব কথা এই জন্যই নিরর্থক। অতি

সাধারণ বিষয়ও বক্তব্যের টানে শিল্পময় হয়ে অসাধারণ হয়ে উঠতে পারে। অসাধারণ বিষয়ও বক্তব্য বিরহিত অবস্থায় ব্যর্থ শিল্পকর্মের নজির হিসেবে কাজে লাগতে পারে। এই ভাবেই একটি ছোট ছেলে বা মেয়ের বড়ো হওয়ার বিষয় একজনের কাছে শৈশব অতিক্রমণের গল্প, আর একজনের কাছে যৌন চেতনা উন্মেষের গল্প, তৃতীয় জনের কাছে একট জগৎ ভেঙে গুঁড়িয়ে আর একটা জগৎ গড়ে ওঠার গল্প। জেন অস্টেনের 'এমা' উপন্যাসের subject matter হল বিবাহ—সেও এই ভাবেই শিথিল উক্তি। আমাদের দেখা দরকার subject matter বা বিষয়বস্তুর সাহায্যে লেখক ব্যক্তি-সমাজ এবং সম্পর্কের চলিষ্ণু রূপকে কী অর্থে বিশিষ্ট করলেন, কীভাবে রূপময় করলেন। সে বিশিষ্টতাতেই প্রকৃতপক্ষে উপন্যাসের বিষয়।

•• চার ••

সে কারণেই বলা হয়ে থাকে যে ঔপন্যাসিকের বিষয়জ্ঞান প্রকৃতপক্ষে তার সময়জ্ঞান, সমাজজ্ঞান, ইতিহাসজ্ঞান এবং ব্যক্তিমানসের জ্ঞান এই সমস্তের সারাৎসার। সেই কারণেই বলা হয়ে থাকে যে উপন্যাসেই একমাত্র মানুষের সহস্র সম্পর্কের সূত্রগুলিকে উন্মোচিত করে দেখানো সম্ভব। এর মূলে রয়েছে পূর্ব পরিচ্ছেদে কথিত উপন্যাসের বিষয়বস্তু বা লেখকের বিষয়-চেতনা। বিষয়-বস্তু সম্বন্ধে ঔপন্যাসিকের বোধ এবং চেতনার বিস্তার এবং গভীরতা উপন্যাসের প্রতিটি অংশেই অভিব্যক্তি লাভ করে থাকে। পার্সি লাবক তাঁর সুবিখ্যাত Craft of Fiction নামক গ্রন্থে উপন্যাসের ঘটনাংশের বা বর্ণনাংশের রূপায়ণ পদ্ধতিকে নানাভাবে শ্রেণী-বিভক্ত করেছেন। চিত্রানুগ বর্ণনা বা pictorial treatment, দৃশ্যানুগ বর্ণনা বা scenic treatment, নাট্যানুগ বর্ণনা বা dramatic treatment প্রভৃতি নানা পদ্ধতির কথা উক্ত গ্রন্থে বলা হয়েছে। প্রতিটি বিষয়ের ভিন্ন উদাহরণও উপযুক্ত উপন্যাস থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে। কিন্তু এ ধরনের treatment বা বিষয় ব্যবহারও শেষ পর্যন্ত নির্ভরশীল লেখকের বিষয়বোধের বনিয়াদে। একই ধরনের ঘটনাংশ দুই ভিন্নধর্মী উপন্যাসে দুই জীবন-ব্যাখ্যার জন্মদাতা।

ওঅর অ্যাণ্ড পীস উপন্যাসে বড়োদিনের রাত্রির নারী পুরুষের যথেচ্ছ-সজ্জার কৌতুক আর ম্যাজিক মাউণ্টেন-এর Walpurgis Night-এর যক্ষ্মা-রোগীদের যথেচ্ছা-সজ্জার রঙ্গরস আপাতদৃষ্টিতে একই লক্ষণাক্রান্ত। নাটকের

রিলিফের মতো বড়োদিনের সন্ধ্যা এবং Walpurgis Night গাম্ভীর্য-ঘন, ঘটনা ছায়াচ্ছন্ন এই দুই উপন্যাসে এনে দিয়েছে অবাধ মুক্তির সানন্দ অবকাশ। নেপোলিয়নীয় যুদ্ধের পটভূমিকায় স্থাপিত ওঅর অ্যাণ্ড পীস-এর কাহিনীর ঘটনাঘন অধ্যায়ে উক্ত ছদ্মসজ্জার রজনীতে নাটাশার ওষ্ঠে গুম্ফাঙ্কন এবং তাতার সওয়ারের বেশ ধারণ, নিকোলাস, সোনিয়ার বরফ-হিম রাত্রে উদ্দামগতিতে শ্লেজগাড়ির অশ্বধাবন তৎকালীন রুশিয়ার কামান-বিঘোষিত ইতিহাসে নবীনের অনিবার্য প্রাণাবেগের প্রতীক। শেষ পর্যন্ত যে জীবন নতজানু হয় না— এই প্রগল্‌ভ উল্লাসময় ঘটনাংশ তারই প্রমাণ। যক্ষ্মা হাসপাতালের মৃত্যু ছায়াচ্ছন্ন আকাশে Walpurgis Night (ম্যাজিক মাউণ্টেনে) এক রাত্রির জন্য মৃত্যু-উপেক্ষী ব্যাধি-বিস্মৃতির বিলাসকে প্রশ্রয় দেয়। রোগীরা সেদিন কেউ বা সাজে থার্মোমিটার, কেউ বা সাজে ওষুধের রেখাঙ্কিত শিশি। এরও আপাত-তাৎপর্য ওঅর অ্যাণ্ড পীস উপন্যাসের বড়োদিনের সন্ধ্যার তাৎ-পর্যের সঙ্গে সমতুল্য। কিন্তু অবশ্য স্বীকার্য সাদৃশ্যের সীমা এই পর্যন্ত। গূঢ় ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে দুই ঘটনাংশই ভিন্ন তাৎপর্যের অধিকারী। এ তাৎপর্য উভয় উপন্যাসের বিষয়বস্তুর পরিপ্রেক্ষিতেই মাত্র উপলব্ধি করা সম্ভব। নতুবা নয়।

Walpurgis Night এবং বড়োদিনের রাত্রি—এই উভয় সদৃশ ঘটনা উক্ত উপন্যাস দুইটিতে মূল প্রেমকাহিনীর একটি বিশিষ্ট অধ্যায়। নিকোলাস এবং সোনিয়ার প্রেম এবং হান্স কার্স্টপ ও ক্লাভদিয়ার প্রেম কাহিনীর গতি এবং আবেগ সঞ্চারের কাজে উক্ত দুই রাত্রির বর্ণনা ঔপন্যাসিকের কাছে অবশ্য প্রয়োজনীয় ছিল। হান্স কার্স্টপ ও ক্লাভদিয়ার প্রণয় স্বাভাবিক এবং সাধারণ প্রণয় কাহিনীর পর্যায়ে পড়ে না। এই প্রেম কাহিনীর পটভূমিকা যক্ষ্মা হাসপাতাল। প্রেমের পাত্রপাত্রী দুজনও যক্ষ্মা রোগাক্রান্ত। স্বভাবতই হান্স কার্স্টপ-এর প্রেমে morbidity বা রুগ্নতার আশঙ্কা সদা সর্বদা উপন্যাসে ছিল। কম বেশি করে টমাস মানকে এই রুগ্নতাকে পরিহার করার সংগ্রামে সারা উপন্যাসেই নিযুক্ত থাকতে হয়েছে। মানে-র অন্তর্ভেদী জীবনদৃষ্টি জীবনের বহিরঙ্গের সমস্ত রুগ্নতা, দুর্বলতা এবং খর্বতাকে ভেদ করে জীবনের সত্যস্বরূপের শুদ্ধতার সন্ধানকে এই উপন্যাসে শিল্পের উৎস বলে মনে করেছে। হান্স কার্স্টপ-এর সর্বতোমুখী জীবন সন্ধান—তা সে Herr settembrini-এর সঙ্গে মানবতাবাদ বিষয়ে তর্কের কচকচিতেই

হোক, অথবা দুরন্ত বরফপাতের রাত্রে একক পরিভ্রমণে হোক, কিংবা জীবতত্ত্ব বা উদ্ভিদতত্ত্বের গবেষণাতেই হোক—এই উপন্যাসে নানাভাবে প্রদর্শিত হয়েছে। Walpurgis Night-এর ছদ্মাবৃত কৌতুকময়ী প্রগল্‌ভতার বর্ণনায় ক্লাভদিয়া এবং হান্স কার্স্টর্প-এর প্রেমও তাই সেই বিস্তৃত জীবনান্বেষণের একটি অধ্যায় বলে পরিগণিত হবে। ম্যাজিক মাউণ্টেন অবশ্যই টমাস মান-এর এবং এ যুগের একটি অন্যতম মহৎ সৃষ্টি। এ সম্বন্ধে অবশ্যই দ্বিমতের অবকাশ নেই। কিন্তু কখনো কখনো যেন মনে হয় যে টমাস মান ম্যাজিক মাউণ্টেন রচনাকালে তার বিষয়বস্তুর সীমা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। একটা মহৎ উপন্যাসের বিষয়বস্তু হবার পক্ষে ম্যাজিক মাউণ্টেন-এর বিষয়বস্তু যে সর্বাংশে উপযুক্ত নয় এই বোধ যেন টমাস মানকে সদাই পীড়িত করেছিল। তাই, দেখা যায় হান্স কার্স্টর্প-এর অন্বেষা, সর্বতোমুখী জীবন সন্ধানে, প্রকৃতপক্ষে বিষয়বস্তুর দুর্বলতা শেষ পর্যন্ত পরিহৃত হয়েছে। মান জানতেন যে ওঅর অ্যাণ্ড পীস-এর লেখকের মতো তাঁর হাতে কোনো ঘটনার ঘনঘটাচ্ছন্ন বিষয় নেই। সুতরাং যক্ষ্মানিবাসের মিত-পরিসরে জীবনের নানা বর্ণকে প্রতিফলিত করার দুঃসাধ্য ব্রত তাঁকে পালন করতে হবে। হান্স কার্স্টর্প-এর অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সেই জীবনের বহুধাবিস্তৃত অভিজ্ঞতার মূল্যও নিরূপিত হবে। সমগ্র উপন্যাসটি এই ছকে নির্মিত। ঔপন্যাসিকের সুশৃঙ্খল শিল্প চেতনা শেষ পর্যন্ত উপন্যাসে যে-জীবন-ব্যাখ্যার জনক এ উপন্যাসে সেই শৃঙ্খলা এবং জীবন-ব্যাখ্যা দুইয়েরই সাক্ষাৎ মেলে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এবম্বিধ বিষয় মান-এর পক্ষে অসুবিধাজনক হয়েছিল এ কথা অনস্বীকার্য। এ উপন্যাসের বিরুদ্ধে যে গুরুভার পণ্ডিতিয়ানার অভিযোগ ওঠে তার উৎস এখানেই। সুতরাং মান-কে এই অসুবিধা অতিক্রম করার জন্য উপন্যাসের পটভূমিকায় আনতে হয়েছে ইওরোপীয় মহাকাশের বিস্তৃতি। বিষয়বস্তুর যা অসুবিধা তাকে তিনি অতিক্রম করেছেন পটভূমিকাকে অগাধ-বিস্তারের তাৎপর্য-প্রদানের ভিতর দিয়ে। উপ-ন্যাসে বর্ণিত যক্ষ্মা-হাসপাতালকে সংকটাপন্ন ইওরোপীয় সংস্কৃতির রূপকে ধারণ করা হয়েছে এই উদ্দেশ্যেই। নানা দেশ থেকে আগত রোগীবৃন্দের সমাহারে বিরচিত পরিবেশে তাই বারে বারে ইওরোপের বিরাট ভাবাকাশের প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয়েছে। ম্যাজিক মাউণ্টেন-এর দূরস্থিত মানমন্দির উক্ত ভাবাকাশের গ্রহসংস্থান অবলোকনের জন্য উপযুক্ত পর্যবেক্ষণ-ভূমি। শেষ

পর্যন্ত মানুষেই মুক্তি হান্স কার্স্টর্প-এর এই সিদ্ধান্তের জন্য পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির ঘনায়মান সংকটকে যক্ষ্মা হাসপাতালের জীবন সংগ্রামের মাধ্যমে নানাভাবে ব্যবহৃত করা হয়েছে। হের সেটেমব্রিনি এবং তার বন্ধু নাপ্তা-র ভূমিকা এবং ক্লাভদিয়া আর হান্স কার্স্টর্প-এর প্রেমের আখ্যান এই সমগ্র ব্যাপারেরই এক একটা অংশ। পটভূমির পরোক্ষ বিস্তৃতিসাধন না ঘটালে ম্যাজিক মাউন্টেন-এর সমস্ত কাহিনী কেবল রোগী এবং রোগের কাহিনী বলে পরিগণিত হত।

সুতরাং বলা চলে যে ক্লাভদিয়া এবং হান্স কার্স্টর্প-এর পরস্পর সম্পর্ক প্রচলিত অর্থে নরনারীর প্রেম-সম্পর্ক মাত্র নয়। সে কারণেই কার্নিভ্যাল-রাত্রির প্রগল্‌ভতার অন্তর্নিহিত কারুণ্য হান্স কার্স্টর্প-এর জীবনদর্শনকে উপলব্ধি করার পথে বড়ো সহায়। হৃত-ভবিষ্য হান্স কার্স্টর্প যেন হৃত-ভবিষ্য মানবতারই প্রতিভু। সে যখন বলে যে ঐ রাত্রের মুখোশধারী চপলতার অন্তরালে Thou had the full sway তখন তা প্রকৃতপক্ষে আশ্রয় যাচ্ঞা। ক্লাভদিয়া-র কাছে সেই প্রবাসী আত্মার মিনতিই সে পরোক্ষে ব্যক্ত করেছিল। একদিক দিয়ে সভ্যতা মানুষকে প্রবাসীর যন্ত্রণাই দিয়েছে। কিন্তু তার অসঙ্গতি এইখানে যে সে আর সেই যন্ত্রণাকে পরিহার করার জন্যও কোনো ফলপ্রসূ প্রেরণা অনুভব করে না। যেমন হান্স কার্স্টর্পও আর সমতল ভূমিতে নেমে যেতে কোনো তীক্ষ্ণ ইচ্ছা বোধ করে না। সে ভেবেছিল ক্লাভদিয়ার প্রেমে সে খুঁজে পাবে জীবনার্থ। ক্লাভদিয়া চলে যাবার পর তার জন্য প্রতীক্ষাকেও তার তাই মনে হয়েছে। এই প্রেমকাহিনীর Carnival-অধ্যায় (Walpurgis Night) এবং পরে Peeper corn-এর অধ্যায়ে জীবনের সেই জটিলতার যন্ত্রণাই বিধৃত। কার্নিভ্যাল রাত্রি সেই মানুষ এবং মানুষের ইতিহাস সম্বন্ধে সচেতন যুবকের মনে যন্ত্রণাকে প্রেমের রূপ দিয়েছিল। হান্স কার্স্টর্প-এর যে-অভিজ্ঞতা উপন্যাসের বিষয়বস্তু, উপন্যাসের প্রেমের আখ্যানভাগও সেই বিষয়-মাহাত্ম্যেই সমৃদ্ধ এবং অনন্য।

এইভাবে ঔপন্যাসিকের বিষয়বস্তুকেন্দ্রিক জীবন-ব্যাখ্যা উপন্যাসের প্রতি অংশে প্রতিফলিত হয়ে থাকে। ক্লাভদিয়ার উপবেশন ভঙ্গি থেকে শুরু করে সব কিছুই হান্স কার্স্টর্প-এর হ্যামবুর্গীয় ভদ্রয়ানার ঐতিহ্যবিরোধী। এতৎ সত্ত্বেও যে ক্লাভদিয়ার প্রতি হান্স কার্স্টর্প আকর্ষণ অনুভব করেছে উপন্যাসের মূল প্রতিপাদ্য থেকে এই ক্ষুদ্র ব্যাপারটিও বিচ্যুত হয়। জীবন-

ব্যাখ্যাহীন বা অদার্শনিক লেখকের রচনাতেই কেবল দেখা যায় যে উপন্যাসের গোটা কাঠামোয় প্রেমের ঘটনাংশ ভারসাম্যের ব্যত্যয় ঘটায়।

অবশ্যই ওঅর অ্যাণ্ড পীস উপন্যাসে বড়োদিনের সন্ধ্যার বর্ণনায় টলস্টয়কে মানে-র মতো বিষয়বস্তুগত অসুবিধা ভোগ করতে হয়নি। পটভূমিকার পরোক্ষ বিস্তৃতি বা বিষয়বস্তুর রূপক নির্মাণের জন্য সতত জাগ্রত প্রয়াসের বোঝাও টলস্টয়ের ছিল না। এ উপন্যাসের প্রাণশক্তির মূল রহস্য স্বগত বিশ্লেষণে বা বিদগ্ধ আলাপনের উজ্জ্বল আলোকসম্পাতে নয়। ঘটনানু-ক্রমিকতায় ওঅর অ্যাণ্ড পীস-এর শিল্পরস নিহিত হয়ে রয়েছে। এবং উপন্যাসটির এই সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্য লেখকের বিষয়গত বক্তব্যেরই প্রতিফলন। যেখানে উদ্দেশ্য উদাসীন মহাকালের পদক্ষেপকে ইতিহাসের বৃহৎ ক্ষুদ্র ঘটনায় প্রতিবিম্বিত করে তারই প্রভাবকে ব্যক্তি জীবনের সুখে-দুঃখে অনুভব করানো —সেখানে এই সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্যের প্রয়োজন স্বতঃস্বীকার্য। বড়োদিনের সন্ধ্যার যথেচ্ছ-সজ্জাব বর্ণনাকেও এই নিরিখেই বিচার করতে হবে।

এই ঘটনাংশের পূর্বে এনড্রুর প্রবাস জীবনকে অবলম্বন করে নাটাশার যন্ত্রণা কোন্ তীব্রতার আবর্তে পড়েছিল সে কাহিনী কথিত হয়েছে। যে কোনো মর্মদাহী যন্ত্রণা মানুষকে পরিশুদ্ধ করে—এই টল্‌স্টয়ী বিশ্বাস এখানেও শিল্পকর্মের মূল প্রেরণা হিসাবে ক্রিয়াশীল। যন্ত্রণার পরবর্তী অধ্যায়ে নাটাশার শান্তশুদ্ধ মূর্তি বড়োদিনের রাত্রির সাধারণ মানুষের আনন্দাবেগের সহজ ধারায় স্নান করে মনের পক্ষাঘাতকে অতিক্রম করল। এই মানসিক বিহ্বলতাকে অতিক্রম না করলে নাটাশার প্রেমের সংকট (আনাতোল অধ্যায়) উপন্যাসে উপস্থাপিত হতে পারে না কিন্তু তাই বলে এটা কোনো সাধারণ উপন্যাসের যান্ত্রিক চাতুর্য নয়। জীবন রসোচ্ছল নাটাশা চরিত্রের ন্যায় অনুসারে এটা তার জীবনের স্বাভাবিক গতি বলে প্রতিভাত হয়। বড়োদিনের সন্ধ্যায় নাটাশার পুনরুজ্জীবন পরবর্তী আনাতোল অধ্যায়ের পরোক্ষ প্রস্তুতিপর্ব। এইভাবে যন্ত্রণা থেকে অধিকতর যন্ত্রণায় না উত্তীর্ণ হলে শুদ্ধ থেকে অধিকতর শুদ্ধতার পথের পথিক হওয়া যায় না। বড়োদিনের রাত্রি নাটাশার জীবনের যন্ত্রণার দুই স্তরের মধ্যবর্তী এক সহজ আনন্দের সঞ্জীবনী অধ্যায়।

সোনিয়া এবং নিকোলাসের দিক দিয়ে দেখলেও এই বড়োদিনের সন্ধ্যার তাৎপর্য তাদের প্রেমের প্রসঙ্গেই অনুধাবনীয়। বড়োদিনের সন্ধ্যায় সোনিয়া এবং নিকোলাসের প্রেমের ঘনীভূত অধ্যায়ের পরেই এই প্রণয়ীদ্বয়ের প্রেমের সংকট

বিবাহ সমস্যার রূপ ধারণ করে দেখা দেবে। সেই সংকটের প্রত্যক্ষ প্রস্তুতিপর্ব বড়োদিনের আবেগময় সন্ধ্যার পলাতক মুহূর্তে। ভবিষ্যৎ দর্শনের দর্পণে সোনিয়া কিছুই দেখেনি। যা সে দেখেছে তা শুধু শূন্যতা। কিন্তু নাটাশার ব্যাকুল আহ্বানে সে মধুর মিথ্যা ভাষণে রত হয়েছে। বলেছে—এনড্রুকে দেখেছি শায়িত কিন্তু সানন্দচিত্ত। এখানে সোনিয়ার শূন্য ভবিষ্যতের ইঙ্গিতও দেওয়া হয়েছে। ওআর অ্যাণ্ড পীস উপন্যাসে বড়োদিনের সন্ধ্যার মতো আনন্দে নিটোল সন্ধ্যা আর দ্বিতীয়টি নেই। সমগ্র উপন্যাসে জীবনের সরু মোটা দুই তার জড়িয়ে যাওয়ার বেদনা সর্বত্রই সমুপস্থিত। বড়োদিনের সন্ধ্যার এক উজ্জ্বল বর্ণ-সমারোহ সে হিসাবে সারা উপন্যাসে একক। এই সন্ধ্যাই সেই সুখের গিরিচূড়া—এবং নাটাশা ও সোনিয়ার প্রেমের সংকটের উপোদ্‌ঘাত। এর পরেই সংকটের আবর্তের দিকে অবতরণ।

•• পাঁচ ••

এ সব উদাহরণ থেকে আমরা এ সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে আত্মাহীন দেহ যদি বা সম্ভব, বক্তব্যহীন উপন্যাস কদাচ সম্ভব নয়। বক্তব্যহীন উপন্যাস উপন্যাসই নয়। উপন্যাসের বিষয়বস্তু লেখকের জীবনার্থের ধারক এবং পোষক। বিষয়বস্তুর মর্যাদা নিরূপিত হবে তা কতখানি লেখকের জীবনদর্শনের প্রতিফলন সেই মাপকাঠিতে। সে-কারণেই অশ্লীল বিষয় বলে কোনো কথা সার্থক উপন্যাসের আলোচনাকালে উত্থাপিত হতে পারে না। যে বিষয়বস্তুকে অশ্লীল বলে মনে হচ্ছে তা যদি লেখকের বিস্তৃত জীবন-সংক্রান্ত গভীর বক্তব্যের অংশীভূত হয় তবে তা কোনো মতেই অশ্লীল পদবাচ্য নয়। উপন্যাসের প্রতিটি অংশ—ঘটনা, চরিত্র, বর্ণনা—সকল কিছুই উপন্যাসের নির্দিষ্ট শিল্পকর্মের অংশ—পক্ষান্তরে গোটা শিল্পকর্মটাই এক অখণ্ড মূর্তি ধারণ করতে পারে লেখকের জীবন বিষয়ক বক্তব্যকে প্রকাশ করার তীব্র প্রেরণায়। কাজেই উপন্যাসে সেই বক্তব্যের প্রসঙ্গের বাইরের যা কিছু তাই কুশিল্প অথবা অশিল্প—তাই অপ্রকাশ্য।

•• ছয় ••

এবং এই বিচার-দৃষ্টিতেই বর্তমান শতাব্দীর মনোভূমি-প্রধান বা মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসগুলির বিষয়বস্তুর মূল্যও অনুধাবনযোগ্য। আমরা জানি যে গত

শতাব্দীর প্লট-নির্ভর বা ঘটনাশ্রয়ী উপন্যাস আর এ শতাব্দীর অনুভূতি-সঞ্চারী উপন্যাসে বিস্তর পার্থক্য বিদ্যমান। এও জানি যে গত শতকের উপন্যাসের লক্ষ্য ছিল যেখানে নায়ক-নায়িকার জীবন-বৃত্তান্তকে, তাদের অভিজ্ঞতাকে বিধৃত করা, এ শতাব্দীতে সেখানে নায়কের চেতনার স্রোতস্বিনীর নানা তরঙ্গ-শীর্ষে প্রতিফলিত চিন্তার আলোকরশ্মিকে পাঠকের সম্মুখে স্পষ্ট করাই ঔপন্যাসিকের লক্ষ্য। কাজেই বাস্তবের মায়া সৃজনের জন্য নির্বাচনশীল হওয়ার ঝোঁক এখনকার ঔপন্যাসিকের নেই। বরঞ্চ তিনি যে নির্বাচনশীল নন—এই মায়া সৃজন করতে পারলেই অনুভূতির শতমুখী সামগ্রিক চেহারা পরিস্ফুট হতে পারে।

সুতরাং নায়কের অনুভূতিই এখানে বিষয়বস্তু। স্বভাবত সে অনুভূতি নায়কের অভিজ্ঞতার নামান্তর ব্যতীত আর কিছু নয়। Every thought is a part of a personal consciousness—সুতরাং চিন্তার অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশের প্রতিফলনের ভিতর দিয়ে পুরো ব্যক্তি-চেতনার আভাস মেলে। যেহেতু ব্যক্তি-চেতনা স্বয়ম্ভু ব্যাপার নয়, সমাজ এবং সভ্যতার বিশেষ অবস্থার সঙ্গে ব্যক্তির যোগফল হল ব্যক্তিচেতনা, তাই শেষ পযন্ত একটি ব্যক্তিচেতনার মুকুরে সভ্যতার চেহারাকেই আমরা প্রত্যক্ষ করি। সভ্যতা এবং সমাজের একটি বিশেষ অবস্থা এখানে একটি পরোক্ষ পটভূমিব মতো বিরাজমান।

এই দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতে গেলে বলতে হয় যে আধুনিক উপন্যাস যদিও অতিকায় বিষয়ভারে মন্থরগতি বিপুল গ্রন্থ আর নয়, তথাপি যে বিশেষত্ব নিয়ে শিল্পরূপ হিসাবে উপন্যাসের আবির্ভাব আধুনিক মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস সে বৈশিষ্ট্যে বঞ্চিত নয়। মনের সমগ্র চেহারায় সভ্যতারই সমগ্র চেহারা সেও আঁকতে চায়।

উপন্যাসের ভাষারীতি

উপন্যাসের শিল্পরূপ সর্বার্থসাধক বলে কাহিনী, কবিত্ব, নাট্যরস এবং বর্ণনা একই উপন্যাসের পরিসরে পরস্পর-নিবদ্ধ। এ কারণে এবং উপন্যাসের অবাধগতি সর্বত্রচারিতার দিকে দৃষ্টি রেখেই বলা যেতে পারে যে সাহিত্যের সকল শাখার মধ্যে উপন্যাস সর্বাপেক্ষা গণতন্ত্রী। আপন বলিষ্ঠ প্রাণবত্তায় কাহিনী, কবিত্ব, নাট্যরস সকল কিছুকে কুক্ষিগত করে উপন্যাস নিজ স্বরূপে বিশিষ্ট। উপন্যাসের ভাষাও তাই বৈশিষ্ট্যের স্বাক্ষরে চিহ্নিত। উপন্যাসের অনুজ্ঞা বহন করে কখনো. বা কাব্যের মতো গভীরগামী, কখনো বা মন্থর এবং গম্ভীর। বলাবাহুল্য উপন্যাসে ভাষার ভূমিকা সম্বন্ধে আমাদের সমালোচনা এখনো তাদৃশ সচেতন নয়। উপন্যাসের ভাষা যে উপন্যাস-নিরপেক্ষ কোনো ব্যাপার নয়, ছাপা ও বাঁধাইয়ের মতো পৃথক উচ্চারণে উপন্যাসের ভাষার প্রতি সমালোচকের কর্তব্য শেষ হয় না—আমাদেব আলোচনায় এখনো এ কথাটা অপরিস্ফুট অথবা অর্ধ পরিস্ফুট।

কারণ, উপন্যাসের ভাষা সম্বন্ধে আমাদের ঔপন্যাসিকের ধারণাও নাতিস্বচ্ছ। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ এবং হয়তো আর মাত্র দুজন ব্যতিরেকে আমাদের সমুদয় ঔপন্যাসিককুল কখনো উপন্যাসের ভাষাকে ভেবেছেন ভারবাহী পশু—উপন্যাসের ঘটনা বহন করাই তার কাজ, কখনো ভেবেছেন একে অযথা আবেগ প্রকাশের কাব্যিক রাজপথ, কখনো ভেবেছেন বর্ণাঢ্যতায় বুঝি এর কাব্য, কখনো ভেবেছেন বর্ণান্ধতায় এর বাস্তবতা। অথচ গদ্য এ-যুগের শক্তিশালী মাধ্যম। ইংরাজি সাহিত্যের উনবিংশ শতাব্দীতে কাব্য সাহিত্যের সঙ্গে গদ্য সাহিত্যের ব্যবধান ছিল যতটা সুদূর পরবর্তী শতাব্দীতে এবং বর্তমানে গদ্য স্বীয় গতিশীল

ভূমিকার সাহায্যে কাব্যকে ততখানিই নিজ সীমার মধ্যে আকর্ষণ করে সে ব্যবধানকে করে তুলেছে ক্ষীয়মাণ। কাব্য যেদিন থেকে গদ্যকে নিজ মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করতে আরম্ভ করল গদ্যের সর্বগ্রাসী শক্তির প্রতি সেই দিনই সে জানিয়েছে প্রথম প্রণতি। এ-যুগের সমস্ত কাব্য প্রয়াসের মূলকথা গদ্যের ব্যাপক শক্তির বিস্তারকে আয়ত্ত করা, কিংবা তার সঙ্গে আপস করা।

কিন্তু উপন্যাসের বা গদ্যসাহিত্যের ভাষা সর্বগ্রাসী বলেই যথেচ্ছাচারী নয়। বরঞ্চ দেখা যায় যে কবিতারই মতো উপন্যাসের ভাষাও স্রষ্টার কল্পনার এক অলিখিত অনুশাসনের সূত্রে বাঁধা। সেখানেও ভাষা ব্যবহারের তুচ্ছাতিতুচ্ছ নিদর্শনে লেখকের ঔপন্যাসিক রস-সন্ধানের অব্যর্থ লক্ষ্যের কথাই প্রমাণিত হয়। লেখকের জীবনদৃষ্টি এবং দর্শনের সঙ্গে ভাষার ওতপ্রোত সম্বন্ধ। বাক্য যোজনায়, শব্দ-প্রয়োগে, বর্ণনায় এবং চিত্রকল্প-নির্মাণে সর্বত্রই ঔপন্যাসিকের বৃহৎ কল্পনা ক্রিয়াশীল বলেই সমালোচনায় বহুধাবিস্তৃত ব্যবহারে এরাও নবনব তাৎপর্যের দ্যোতক। এবং উপন্যাসের ভাষার এই ভূমিকা সম্বন্ধে আলোচনাকালে হার্ডির মতো বিধুর কবিপ্রাণ ঔপন্যাসিকই যে আলোচনার বিষয়ীভূত তা নয়—ডিফোর মতো গদ্যময় অথবা কন্‌রাডের মতো এপিক-লক্ষ্য ঔপন্যাসিকও এ জাতীয় আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হতে বাধ্য। আসলে উপন্যাস যদি শুধু গল্প বা কাহিনী মাত্র না হয়, বালিকা বা কিশোরীদের অবসর বিনোদের বিস্ময়বিলাস না হয়ে সে যদি সার্থক শিল্পসৃষ্টির কাছাকাছিও যাবার প্রয়াসী হয়—উৎকৃষ্ট রস-কল্পনা এবং শিল্পগত নৈতিক দীপ্তি যদি উপন্যাসের অভিপ্রায় হয়, উপন্যাসের ভাষায় সেক্ষেত্রে একটা অখণ্ড কল্পনার ছাপ পড়বেই।

ঔপন্যাসিকের কল্পনা এবং লক্ষ্যের সঙ্গে তাঁর ভাষার সম্পর্ক কী সে-কথা নানা ভাবে বিভিন্ন বিদেশী সমালোচক দেখিয়েছেন। আমাদের বর্তমান আলোচনায় সেই সমস্ত উদাহরণের কিঞ্চিৎমাত্র পরিচয় গ্রহণ করে আমাদের উপন্যাস আলোচনায় অগ্রসর হওয়া যাবে। এ পরিচয় গ্রহণের প্রয়োজন সাহিত্য বিচারে বহিরঙ্গ প্রবণতার অভিযোগের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য।

সার্থক উপন্যাসের ভাষা ঔপন্যাসিকের অখণ্ড কল্পনার কতখানি দৃঢ়বদ্ধ অনুবর্তী তা ডিফোর রবিনসন ক্রুশো উপন্যাসের আলোচনাকালে জনৈক সমালোচক দেখিয়েছেন। রবিনসন ক্রুশোর বিষয়বস্তু ডিফোর কল্পনাকে গভীরভাবে বিধৃত করে রাখতে পেরেছিল বলেই এমনটা ঘটেছে। প্রসঙ্গত ঝড় ও নৌ-বিপর্যয়ের পর ভাঙা জাহাজের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আহরণ করার জন্য ক্রুশোর দ্বিতীয়

বার যাওয়া এবং দ্বীপে পুনরায় ফিরে আসা উল্লেখযোগ্য।

I was under some apprehensions during my absence from the land, that at last my provisions might be devoured on shore, but when I came back, I found no sign of my visitor, only there sat a creature like a wild cat upon one of the chests which, when I came towards it ran away a little distance, and then stood still. She sat very composed and unconcerned, and looked full in my face, as if she had a mind to be acquainted with me. I presented my gun at her, but as she did not understand it, she was perfectly unconcerned at it, nor did she offer to stir away, upon which I tossed her a bit of biscuit ....and she went to it, smelled of it and ate it. শুধু বর্ণনার যথাযথই উদ্ধৃত অংশের একমাত্র আকর্ষণ নয়। এই বিষয়টি সত্যই কৌতূহলের উদ্রেক করে যে ভাষার এই লক্ষ্যভেদী অব্যর্থতা একটা উপন্যাসের বিরাট এবং কখনো কখনো অসংহত পরিসরে কী করে বহন করা হয়। ক্রুশোর দুশ্চিন্তা এবং উদ্বেগের জন্য devour ক্রিয়া ব্যবহার করা হয়েছে। অথচ বিড়ালের বিস্কুট ভক্ষণের জন্য eat ক্রিয়াই যথেষ্ট বিবেচিত হয়েছে। এটা কেবল বাগ্‌বিলাস নয়। যেখানে ক্রুশোর সমগ্র সত্তার প্রশ্ন জড়িত সেখানে eat অপেক্ষা শক্তিশালী devour-এর সন্ধান করা হয়েছে। আবার tossed এই ক্রিয়ার ব্যবহারটিও লক্ষ্য করার মতো। Tossing-এর পরিবর্তে throwing ব্যবহার করা চলত বটে কিন্তু toss করার মধ্যে ক্রুশোর কৌতুকপ্রীতি এবং আপাত শান্ত মনের পরিচয় রয়েছে। সামুদ্রিক বিপর্যয়ের পরই ক্রুশোর মনে দুরন্ত অ্যাডভেঞ্চারের অধ্যায় শেষ হয়েছে, উপন্যাসেও। এর পর শুরু হবে পুনর্বসতির অধ্যায়। বিড়ালের ব্যবহার তারই প্রতীক। কাজেই toss ক্রিয়া এখানে সেই তাৎপর্যেই প্রযুক্ত হয়েছে। হয়তো এতখানি পুঙ্খানুপুঙ্খতা সত্যই বহিরঙ্গ বিচার কিন্তু উপন্যাসের সমগ্র পরিকল্পনার পটভূমিকায় যখন উপন্যাসের ভাষা ব্যবহারের প্রসঙ্গ আলোচিত হয় তখন তা উপন্যাসের মৌল বক্তব্যকেই নব নব ভাবে আলোকিত করে। এদিক দিয়ে বিচার করতে গেলে উপন্যাসের ভাষা-বিন্যাস যে উপন্যাসের তারতম্যের সঙ্গেই জড়িত এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকে না। ডিফোর দীর্ঘ বাক্যাবলী,

বাক্যের বিলম্বিত লয় রবিনসন ক্রুশোর মতো truth-teller জাতীয় উপন্যাসের প্রয়োজনীয় বিশ্বাস্যতা সৃষ্টির পক্ষে উপযোগী ভাষা।

অবশ্যই ভাষা-রীতি উপন্যাসের সমগ্র রীতি বা রচনাধর্ম থেকে পৃথক কোনো ব্যাপার নয়। কিন্তু এটাও একটা প্রাথমিক সত্য কথা যে, ব্যক্তি এবং সমাজ চেতনার সমগ্র মহিমাকে লেখক তাঁর ভাষা-রীতির আধারেই ধরে রাখেন। কী করে রাখেন, গদ্য সাহিত্য কেমন করে সাহিত্যের দীর্ঘ কালগত ঐতিহ্যকে অধিকার করছে, উপন্যাসের গদ্যের ধর্ম কী এবং মহৎ ঔপন্যাসিক কী ভাবে সে ভাষাকে ব্যবহার করেন—সচেতন পাঠকের কাছে সেটা একটা বিশেষ মনোনিবেশের বিষয়। মনস্তত্ত্বমূলক অথবা রোমান্টিক অথবা রবিনসন ক্রুশোর মতো truth-teller যে জাতীয় উপন্যাসই হোক না কেন, বিভিন্ন ধরনের উপন্যাসের জন্য স্বভাবতই ভাষার বিভিন্ন বিন্যাস, বিভিন্ন ভঙ্গি অনুসরণ করা হয়ে থাকে। উচ্চধ্বনিময়, পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতাপরায়ণ বিশেষণ সমন্বিত বর্ণাঢ্য গদ্য কখনোই ডিফোর উপন্যাসের ভাষা হতে পারে না। বলা হয়ে থাকে ক্রুশো 'নতুন মানুষ' এবং অষ্টাদশ শতকীয় ব্যক্তিত্বের পূর্ণ প্রতিভূ, বলা হয়ে থাকে ক্রুশো প্রাচীন সামন্ততান্ত্রিক সামাজিক কাঠামোর বিলয় এবং নতুন উৎপাদন শক্তির উন্মেষের কালের যোগ্য প্রতিনিধি। সেই জন্যই ক্রুশোর কাহিনীর জন্য যে ভাষা ব্যবহৃত হয় তার লক্ষ্য গণতান্ত্রিকতা—ডিফোর ভাষায় যে সমালোচকেবা বলেছেন অ্যাংলো-স্যাকসন উপাদান বেশি, মনে হয় তারও মূলে এই সর্ববোধগম্যতা এবং সর্বজনবিশ্বাস্যতা উৎপাদনের প্রয়াস। ডিফোর বর্ণনা-রীতিও সেই আদর্শেই বিশিষ্ট।

কিন্তু বিভিন্ন ধরনের উপন্যাসে বিভিন্ন ধরনের ভাষাব ব্যবহার লক্ষ্য করা গেলেও মোটামুটি এক জায়গায় ঔপন্যাসিককুলকে মিলত হইতেই হয়। সেটা হল উপন্যাসে ব্যবহৃত ভাষার ভূমিকার ক্ষেত্রে। (উপন্যাসের ভাষা জীবনেব বাস্তবতা এবং জীবনের কাব্য দুইকেই ধাবণ করে।) আর যেহেতু উপন্যাস যে-কাব্যের সন্ধানী তা বাস্তবতার অতিরিক্ত কিছু নয়, লেখকের অভিজ্ঞতার নির্যাস মাত্র নয় সেহেতু বাস্তবতার স্বরূপ উদ্ঘাটনকালেই উপন্যাস-লেখক জীবনের কাব্যকে অধিগত করে থাকেন। কাব্যিক মানুষ অথবা নাটকীয় মানুষ নয়, পূর্ণ মানুষটাই ঔপন্যাসিকের লক্ষ্য। তার কর্মিষ্ঠ অস্তিত্বকে সমগ্রভাবে রূপায়িত করতে গিয়েই উপন্যাস-শিল্পের জন্ম। উপন্যাসের ভাষাকে তাই উভচর হতে হয়। গদ্যের স্থল এবং কাব্যের জল উভয়তই তাকে হতে হয অবাধগতি।)

রাম দাড়ি কামাচ্ছে, বাজার করছে, দৈনন্দিনের নানান কাজ করছে এও যেমন সত্য, রামের জীবনের আবেগময় মুহূর্তগুলিও তেমন সত্য। পূর্ণাবয়ব জীবিত-কল্প রামকে আঁকতে গেলে ঔপন্যাসিককে নিজ প্রয়োজনে এমন ভাষা গড়ে নিতে হয় যা তাঁকে উভয় ক্ষেত্রেই সাহায্য করবে।

এবং এই উভচর বৃত্তিতে ঐক্যবদ্ধ সাবলীলতায় উপন্যাসের গদ্যের লাবণ্য। খুঁটিনাটি তুচ্ছ বিষয় বলতে বলতে জীবনগত কাব্যকে আবিষ্কার করবে এই গদ্য। এই দুই পর্যায় এমনভাবে মিলেমিশে থাকে সার্থক উপন্যাসের গদ্য ভঙ্গিতে যে কখনো মাটিতে আছড়ে পড়লাম অথবা হঠাৎ বেলুনের মতো আকাশে উড়ে গেলাম এ জাতীয় বিসদৃশ অনুভূতি আমাদের পীড়িত করে না। মধ্যবিত্ত রুচিশীলা ছাত্রী-নায়িকা এবং তার প্রেমকে অবলম্বন করে রচিত বুদ্ধদেব বসুর তিথিডোর উপন্যাসের ভাষার কারুকলা নিঃসন্দেহেই কৃতিত্বপূর্ণ। শুধু ত্রুটি এইখানে যে এই ভাষার সীমাবদ্ধতায় বিজনের মতো বখাটে ছেলেকে ব্যক্ত করা যায় না। তিথিডোর উপন্যাসেও তা যায়নি। বুদ্ধদেবের উপন্যাসের ভাষা উপন্যাসের অতিরিক্ত বলেই তাঁর চরিত্রগুলি তাঁর গদ্যভঙ্গির কীর্তিসাধক হয়ে থাকতে চায়। উপন্যাসের গদ্যভঙ্গির এটা একটা ত্রুটি।

তা বলে নিশ্চয় ডিফোর গদ্যময় বর্ণনার অতি অনুসরণকেই আদর্শ বলা হচ্ছে না। প্রত্যহের কর্মময় মানুষের বর্ণনা দিতে গিয়ে তার গদ্যরূপটিকেই চিত্রিত করা উপন্যাসের কাজ নয়। এবং যদিও স্কটের ব্যর্থতা সম্বন্ধে আমরা সচেতন —হয়তো বেশি সচেতন—তথাপি স্কটের পক্ষে একটা কথা বলা হয়েছে যে তিনি Prose of life এবং Poetry of life-কে নিজ উপন্যাসে বাঁধবার চেষ্টা করেছিলেন। প্রত্যেক সার্থক ঔপন্যাসিকই নিজ নিজ পন্থায় উপন্যাসের গদ্যকে এই আদর্শে গড়ে নিতে চান। সে কারণেই উপন্যাসকার যদি তাঁর বর্ণিত বিষয়বস্তুতে গাঢ় রহস্যের উপাদান আছে এ-কথা বোঝাতে গিয়ে 'অদ্ভুত' 'বিচিত্র' 'দুর্বোধ্য' 'অস্পষ্ট' প্রমুখ বিশেষণে সে-কথা ব্যক্ত করতে চান তবে আমরা একথা ন্যায্যতই মনে করতে পারি যে ঔপন্যাসিকের কল্পনায় ত্রুটি আছে। এবং সেই ত্রুটিই উপন্যাসের বর্ণনায় ছায়াপাত করেছে। যেমন উৎকৃষ্ট কবিতায় কল্পনাকে বস্তুময় করে তোলা কবির কাজ তেমনি উপন্যাসের গদ্যকেও যথার্থ লক্ষ্যভেদী করে তোলা ঔপন্যাসিকের কাজ। নায়িকা কেবল 'হাহাকার' করলেই নায়িকার অস্তিত্বের যন্ত্রণাময় অস্থিরতা প্রকাশ পায় না। তা যদি পেত তাহলে জেবউন্নিসা চাষার মেয়ের মতো মাথা কুটিতে লাগিল—এই বর্ণনায় "চাষার মেয়ের

মতো" কথাটি কেবল উপমাবিলাস বলেই পরিগণিত হত।

(এই দৃষ্টিভঙ্গিতে যদি আমরা আমাদের উপন্যাস সাহিত্যের প্রথম দিককার নিদর্শনগুলিকে পরীক্ষা করি তাহলে কতকগুলি বিষয় লক্ষ্য না করে উপায় থাকে না। আমাদের ঔপনিবেশিক জীবনের মজ্জাগত পঙ্গুতায় ক্রুশোর মতো নায়কের পরিকল্পনা সম্ভবপর ছিল না। কাজেই truth-teller জাতীয় উপন্যাস রচনায় আমরা কখনোই অভ্যস্ত হইনি। ইংরাজি সাহিত্যে অষ্টাদশ শতাব্দীর ঘটনাগতপ্রাণ উপন্যাসের যে অভিজ্ঞতা উনবিংশ শতাব্দীর ইংরাজ ঔপন্যাসিকদের পিছনে ছিল আমাদের উপন্যাস সাহিত্যের প্রথম দিকের দিক্‌পালদের পিছনে এ জাতীয় কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না। ডিফো, ফিল্ডিং-এর মতো গদ্যময় মানুষের কথা বলবার সুযোগ আমাদের ঘটেনি। আমাদের উপন্যাস সাহিত্যের প্রথম প্রধান পুরুষ বঙ্কিমচন্দ্র। রোমান্সের এবং ভাবময় বীরোচিত পরিবেশের অঙ্গনেই তাঁর প্রথম পাঠ।)

সেই কারণেই (বঙ্কিমের গদ্য মানুষের কর্মময় দৈনিকের চিত্রাঙ্কনে পরাঙ্মুখ। সে গদ্য মানুষের আটপৌরে চেহারা আঁকতে চায় না। বস্তুত বঙ্কিমের অন্য উপন্যাসের কথা স্মরণ রেখেও বলতে হয় যে কপালকুণ্ডলার পরিবেশে এই উন্নীত গদ্য যে পরিমাণ স্বচ্ছন্দ হতে পেরেছে তেমনটি বোধ করি আর কোথাও নয়। এই রচনায় বঙ্কিমের গদ্য এবং তার কল্পনা যে সাযুজ্য লাভ করেছে বঙ্কিমের উপন্যাসের অন্যত্র তা দুর্লভ। বাস্তবিক পারিবারিক এবং সামাজিক উপন্যাস-গুলিতে বঙ্কিমের ভাষার প্রধান ত্রুটি বলে যেটা পরিগণিত হবে সেটা হল আমাদের আটপৌরে জীবনযাত্রাকে সে ভাষা চিত্রিত করতে পারেনি। উনিশ শতকের আপিস-আদালতের কথা দূরে থাক একান্নবর্তী পরিবারের বিভিন্ন সম্পর্ক, কিংবা তার ঘাত-প্রতিঘাতকে বঙ্কিমচন্দ্র বরাবরই এড়িয়ে চলতেন। মানুষের গদ্যময় রূপ, তার কর্মিষ্ঠ চেহারা বঙ্কিমের কল্পনাকে স্পর্শ করত না। আসলে ডিফো-ফিল্ডিং-এর পর্যায় বাদ দিয়ে আমরা একেবারেই রোমান্টিক পর্যায় থেকে শুরু করেছি। ফলে ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছে এই যে মানুষের হৃদয়গত ভাববৈষম্যের বর্ণনায় বঙ্কিমী কল্পনা এবং ভাষা যে পরিমাণে সার্থক, বিরলরেখ জীবনের বর্ণনায় তা সেই পরিমাণেই বিফল। বঙ্কিমের যুদ্ধ বর্ণনা যে পরিমাণে সার্থক, গৃহস্থালী বর্ণনা যে পরিমাণে ব্যর্থ। সে সময়ের অন্য ঔপন্যাসিকদের প্রশ্ন এ-প্রসঙ্গেই উঠতে পারে। সে যুগের কর্মময় মধ্যবিত্তের কথঞ্চিৎ পরিচয় আমরা রমেশ দত্তের সামাজিক উপন্যাস দুটিতে পাই। কিন্তু রমেশ দত্তের ঔপন্যাসিক

কল্পনা এবং তার গদ্য আমাদের কল্পনা এবং প্রত্যয় কিছুই উৎপাদন করে না। এমন কি রমেশ দত্তের বহুবিধ প্রগতিশীল চিন্তা সত্ত্বেও ইন্দিরাও আমাদের কাছে প্রিয়তর গ্রন্থ। কারণ রমেশ দত্তের বাচনিক প্রগতিশীলতা উপন্যাসকারের কল্পনার শুদ্ধ গভীরতা থেকে উৎসারিত হয়নি। শেষ পর্যন্ত সংসার ও সমাজ কেরিয়ারমুখী বাঙালী যুবকের কাহিনীই হয়ে দাঁড়িয়েছে। 'গ্রামে থাকিলে উন্নতির সম্ভাবনা নাই'—এ ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যও নয়, সামন্ত কাঠামোর বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াও নয়। সরল চাকুরি-প্রাণ মধ্যবিত্তের সহজ স্বীকারোক্তি। এভাবে সংসার ও সমাজ রমেশ দত্তের নৈতিক দীপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে উপন্যাসের কল্পনা ও ভাষাকে সীমিত এবং স্তিমিত করেছে। সেক্ষেত্রে বঙ্কিমই রমেশ দত্তের মতো সংসার ও সমাজ অথবা তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো স্বর্ণলতা না লিখলেও নতুন কালের চিন্তায় ধৃত মানুষের যন্ত্রণাকে ধরতে চেয়েছিলেন। সে যন্ত্রণা তাঁর কল্পনাকে স্পর্শ করেছিল বলেই তার বর্ণনায় বঙ্কিমী-গদ্য কাব্যের প্রসাদগুণে বিশিষ্ট। বিষবৃক্ষে হীরার কবলে পড়বার আগে কুন্দর বিহ্বলতার বর্ণনা লক্ষ্য করার মতো।

> অট্টালিকার বৃহৎ অন্ধকারময় কায়া, আকাশের গায়ে লাগিয়া রহিয়াছে। সেই অন্ধকার বেষ্টন করিয়া কুন্দনন্দিনী বেড়াইতে লাগিল। মানস, একবার নগেন্দ্রনাথের শয়নকক্ষের বাতায়নপথে আলো দেখিয়া যায়। একবার সেই আলো দেখিয়া চক্ষু জুড়াইয়া যাইবে।
>
> তাহার শয়নাগার চিনিত—ফিরিতে ফিরিতে তাহা দেখিতে পাইল—বাতায়ন পথে আলো দেখা যাইতেছে। কবাট খোলা—সার্সী বন্ধ—অন্ধকার মধ্যে তিনটি জানেলা জ্বলিতেছে। তাহার উপর পতঙ্গজাতি উড়িয়া উড়িয়া পড়িতেছে। আলো দেখিয়া উড়িয়া পড়িতেছে, কিন্তু রুদ্ধ পথে প্রবেশ করিতে না পারিয়া কাচে ঠেকিয়া ফিরিয়া যাইতেছে। কুন্দনন্দিনী এই ক্ষুদ্র পতঙ্গদিগের জন্য হৃদয়মধ্যে পীড়িতা হইল।

অথবা—

> রাত্রি অন্ধকার, চারিদিক অন্ধকার, গাছে গাছে খদ্যোতের চাকচিক্য সহস্রে সহস্রে ফুটিতেছে, মুদিতেছে, মুদিতেছে, ফুটিতেছে। আকাশে কালো মেঘের পশ্চাতে কালো মেঘ ছুটিতেছে—তাহার পশ্চাতে আরো কালো মেঘ ছুটিতেছে—তৎপশ্চাতে আরো কালো। আকাশে দুই একটি নক্ষত্র মাত্র, কখনো মেঘে ডুবিতেছে, কখনো ভাসিতেছে। বাড়ির চারিদিকে ঝাউ

> গাছের শ্রেণী, সেই মেঘময় আকাশে মাথা তুলিয়া নিশাচর পিশাচের মতো দাঁড়াইয়া আছে। বায়ুর স্পর্শে সেই করালবদনা নিশীথিনী-অঙ্কে থাকিয়া, তাহারা আপন আপন পৈশাচী ভাষায় কুন্দনন্দিনীর মাথার উপর কথা কহিতেছে।

অথবা—

> এখন আলোকময় গবাক্ষ যেন অন্ধকার হইল। চাহিয়া, চাহিয়া, চাহিয়া চক্ষের জল মুছিয়া, কুন্দনন্দিনী উঠিল।···· ····নিশাচর পিশাচ ঝাউ গাছেরা সর্ সর্ শব্দ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কোথা যাও?" তালগাছ তর্ তর্ শব্দ করিয়া বলিল "কোথা যাও?" পেচক গম্ভীর নাদে বলিল "কোথা যাও?" উজ্জ্বল গবাক্ষশ্রেণী বলিতে লাগিল—"যায় যাউক, আমরা আর নগেন্দ্র দেখাইব না।"

এই অংশের বর্ণনাভঙ্গির সমস্ত কিছুই লক্ষ্য কবার মতো। এর ভাষা এবং চিত্রকল্প দুই-ই তাৎপর্যপূর্ণ। ঘন ঘন দ্বিরুক্তি, কাটা কাটা বাক্যবিন্যাস, কুন্দনন্দিনীর প্রায়-অপ্রকৃতিস্থতাব পক্ষে উপযুক্ত মাধ্যম। বঙ্কিমেব গদ্যে এরূপ ক্ষেত্রে প্রায় কাব্যের স্পন্দন আসে। উদ্ধৃত অনুচ্ছেদের তৃতীয়াংশের গদ্য যেন গদ্যচ্ছন্দের নিকটবর্তী হয়েছে। প্রথমাংশের 'অন্ধকার বেষ্টন কবিয়া কুন্দনন্দিনী বেডাইতে লাগিল' কুন্দ পরিকল্পনাব মৌল ধারণাব উপযুক্ত চিত্রকল্প। পতঙ্গের ব্যঞ্জনাও যে কোনো সাধারণ পাঠকের চোখে পডবে। সর্বোপরি প্যাথেটিক ফ্যালাসিব ব্যবহাব সমগ্র বঙ্কিম রচনাবলীতেও এর চেয়ে অধিক সুপ্রযুক্ত কোথাও হয়নি। যেন একটা ঘনবদ্ধ কবিতার যথাবিহিত পরিণতিতেই এটা এসেছে।

কিন্তু এই প্যাথেটিক ফ্যালাসি, চিত্রকল্প এবং ভাষাবিন্যাস শেষ পর্যন্ত কুন্দব কাব্যিক মূর্তির অতিরিক্ত কিছু গডতে পারল না। আত্মহত্যার পূর্বমুহূর্তের আনা কারেনিনা আর উদ্ধৃত অংশের কুন্দনন্দিনীর প্রতিতুলনা করলেই এটা ধরা পড়ে। গোটা ব্যক্তিটা চিবকালই বঙ্কিমেব চোখে হারিয়ে গেছে। এবং কল্পনার উচ্চগ্রামকে স্পর্শ করে না এমন সব কিছুকে পরিহার করতে গিয়ে বঙ্কিমকে জীবনের অনেকখানি বাদ দিতে হয়েছে। বিষবৃক্ষেই জমিদার বাড়ির বর্ণনায় যে পরিমাণ যথাদৃষ্টং তথালিখিতং পদ্ধতি তিনি ব্যবহার করেছেন তাতে ঔপন্যাসিকের কল্পনা এবং জমিদার বাড়ির বাস্তবতা কোনোটাই নেই। তাই, যদিও বঙ্কিমের কল্পনা বঙ্কিমের নৈতিক চেতনায় দীপ্ত হওয়ায় তিনি তাঁর সমকালীন ঔপন্যাসিকদের স্থুল গদ্যের থেকে অনেক কার্যকরী গদ্য সৃজন

করেছিলেন—যেমন 'সংসারের' কলিকাতা বর্ণনা এবং ইন্দিরার চোখে প্রথম দেখা কলিকাতার বর্ণনার প্রতিতুলনা এ-ক্ষেত্রে স্মরণ করা যেতে পারে—তথাপি বঙ্কিমের কল্পনা এবং ভাষা জীবনের গদ্যকে প্রায়ই হারিয়ে ফেলেছে। জীবনের কাব্যও যে এর ফলে সর্বত্র রক্ষিত হয়েছে তা নয়। ভ্রমরকে বাঁচানো গেলেও রোহিনীর জীবনের বাস্তবতার ভয়ে তার জীবনের কাব্যকে সমগ্রভাবে ধরা যায়নি। ইন্দিরার স্বামী কমিসারিয়েটের জুয়াচোর হয়ে থাকলে যে ইন্দিরাকেই ব্যর্থ হতে হয় এবং এভাবে জীবনের গদ্যময় দিকটিকে যে ধরা যায় না বঙ্কিমের উচ্চকল্পনাচারী মনই তাকে সে কথা বুঝতে দেয়নি—এই উচ্চকল্পনাচারী মনকে যখনই একটু নিচু গ্রামে বাঁধতে চেষ্টা করেছেন তখনই তাঁকে কল্পনার অসঙ্গতির ফল ভোগ করতে হয়েছে। তবু যে ইন্দিরার গদ্যভঙ্গি সংসার ও সমাজের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট শিল্পকর্ম বলে গণিত হবে ইন্দিরা চরিত্রের ইতিবাচকতাই তার মূলে।)

(উপন্যাসের পক্ষে যা কিছু প্রয়োজনীয়—সর্ববিধ বিষয়, এবং সবস্তরের মানুষ, তথা এর বিস্তৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করার যোগ্য ভাষাই উপন্যাসের আদর্শ ভাষা। জীবন সম্বন্ধে লেখকের ইতিবাচক মনোভাব, জীবনের নৈতিক সম্ভাবনা সম্বন্ধে সচেতনতাই উপন্যাসে উক্ত বিষয় ও চরিত্র নিয়ন্ত্রণের দৃঢ়তা সঞ্চার করে। আবার এই দৃঢ়তাই ভাষাব ক্ষেত্রেও ঘনীভূত হয়ে উঠে উপন্যাসকে ভাবে-রূপে সার্থকতা দান করে। কিভাবে করে 'গোরা' তার একটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ। গোরা উপন্যাসেব প্রধান গুণ এর বিশাল পরিসরেব সর্বত্রব্যাপী সুসমতা। উপন্যাসের কল্পনা, ভাষা, ঘটনা-বিন্যাস এবং চরিত্র-চিত্রণ—সর্বত্র ঔপন্যাসিকের সামঞ্জস্যজ্ঞান শেষাবধি সমুপস্থিত। এই সর্বত্রব্যাপী সুসমতার মূলে গোরার মৌল পরিকল্পনাই ক্রিয়াশীল। কাব্যিক মানুষ বা নাটকীয় মানুষ নয়, দেশকালের বিচিত্র বিন্যাসে ধৃত গোটা মানুষকেই রবীন্দ্রনাথ এই উপন্যাসের পটে ধরতে চেয়েছেন। ফলে কবিত্ব এবং নাটকীয়তা ভাষাবিন্যাসে এই দুইয়ের কোনোটাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়নি। গোরার গদ্যরীতির প্রধান গুণ এই যে উপন্যাসের পরিমণ্ডলের সঙ্গে এ এমনভাবে একাত্ম হয়ে রয়েছে যে আমাদের মনোযোগের অন্যায্য অংশকে এই ভাষাবিন্যাস কখনোই দাবি করে বসে না। উপন্যাসের আদর্শ গদ্যরীতিতে এমন এক নিরাসক্ত প্রবাহ সৃষ্টি হয়েছে যে তার স্থিতিস্থাপকতা চমৎকৃত করে। চরঘোষপুরের নাপিত, হরিমোহিনী, কৈলাস, মহিম অথবা সুচরিতা কারো জন্যই পৃথক কোনো ব্যবস্থা নেই—গোরারই মতো নির্ভীক এবং সর্বত্রচারী এই

গদ্যরীতি। সেই জন্যই নাপিতের মুখেও রবীন্দ্রনাথ নিজের গদ্যের ভঙ্গি তুলে দিতে ভীত হন না। অতি বিশেষীকরণের জন্য অকারণ ব্যস্ততায় উপন্যাসের এপিক মর্যাদার লাঘব করেন না। সে দিক থেকে বাংলা উপন্যাসের গদ্যরীতির কিছুটা পরিচয় নিতে গেলে আমরা দেখব যে উপন্যাসের গদ্যের তাৎপর্য কমক্ষেত্রেই হৃদয়ঙ্গম করা হয়েছে।

বাংলা ভাষায় প্রথম উপন্যাস আলালের ঘরের দুলালের ভাষায় যে ধরনের গদ্যময় বাস্তবতা অঙ্কনের প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায় সেই গদ্যময় বাস্তবতা প্রকৃতপক্ষে বাস্তবতা নয়। মাত্র বিষয়ানুগ বর্ণনা। যে-কোনো কারণেই হোক, উনবিংশ শতাব্দীর নব্য গদ্যরীতিতে সামাজিক বাস্তবতাকে আবিষ্কার করার প্রয়াস সর্বদাই মাত্র বাস্তবের বহিরঙ্গ-বিশ্বস্ততা রক্ষার্থেই নিঃশেষিত হয়েছে। আলালের ঘরের দুলাল ও বিষবৃক্ষ থেকে দুটি নিদর্শন এ প্রসঙ্গে আলোকসম্পাত করতে সক্ষম।—

> বৈদ্যবাটির বাবুরামবাবু বাবু হইয়া বসিয়াছেন। হরে পা টিপিতেছে। এক পাশে দুই-একজন ভট্টাচার্য বসিয়া শাস্ত্রীয় তর্ক করিতেছে—আজ লাউ খেতে আছে—কাল বেগুন খেতে নাই—লবণ দিয়ে দুগ্ধ খাইলে সদ্য গোমাংস ভক্ষণ করা হয় ইত্যাদি কথা লইয়া ঢেঁকির কচকচি করিতেছেন। একপাশে কয়েকজন শতরঞ্চ খেলিতেছে। তাহার মধ্যে একজন খেলোয়াড় মাথায় হাত দিয়া ভাবিতেছে—তাহার সর্বনাশ উপস্থিত—উঠসার কিস্তিতেই মাত। একপাশে দুই-একজন গায়ক যন্ত্র মিলাইতেছে—তানপুরা মেও মেও করিয়া ডাকিতেছে। একপাশে মুহুরী বসিয়া খাতা লিখিতেছে—সম্মুখে কর্জদার প্রজা ও মহাজন সকলে দাঁড়াইয়া আছে—অনেকের দেনা পাওনা ডিক্রি ডিসমিস হইতেছে—বৈঠকখানা লোকে থই থই করিতেছে।

শুধুমাত্র বাক্‌ভঙ্গিতে কিছুটা গাম্ভীর্যের প্রশ্ন মেনে নিলে এই একই বর্ণনাত্মক রীতি, যার কাজ কেবলমাত্র অবহিত করা, অনুসৃত হয়েছে বিষবৃক্ষে জমিদার বাড়ির বর্ণনায় :

> দাসদাসী কেহ জলের ভার আনিতেছে, কেহ ঘর ধুইতেছে, কেহ চাল ধুইয়া আনিতেছে, কেহ ব্রাহ্মণদিগের সঙ্গে কলহ করিতেছে। অতিথি-শালায় কোথাও ভস্মমাখা সন্ন্যাসী ঠাকুর জটা এলাইয়া, চিত হইয়া শুইয়া আছেন। কোথাও ঊর্ধ্ববাহু এক হাত উচ্চ করিয়া, দত্তবাড়ির দাসী মহলে ঔষধ বিতরণ করিতেছেন। কোথাও শ্বেতশ্মশ্রুবিশিষ্ট গৈরিকবসনধারী

> ব্রহ্মচারী রুদ্রাক্ষমালা দোলাইয়া, নাগরী অক্ষরে হাতে লেখা ভগবদ্‌গীতা পাঠ করিতেছেন। কোথাও কোনো উদরপরায়ণ 'সাধু' ঘি ময়দার পরিমাণ লইয়া, গণ্ডগোল বাধাইতেছে। কোথাও বৈরাগীর দল শুষ্ক কণ্ঠে তুলসীর মালা আঁটিয়া, কপাল জুড়িয়া তিলক করিয়া মৃদঙ্গ বাজাইতেছে, মাথায় আর্কফলা নড়িতেছে এবং নাসিকা দোলাইয়া "কথা কইতে যে পেলেম না —দাদা বলাই সঙ্গে ছিল—কথা কইতে যে" বলিয়া কীর্তন করিতেছে।

এই অপরকে অবহিত করার প্রবণতা, মাত্র বর্ণনাত্মক রীতি, আমাদের দৃষ্টিকে শুধু বিষয়ের মধ্যেই সীমিত রাখে। বলা বাহুল্য এতে বিষয়েরই স্বরূপ উপলব্ধি ব্যাহত হয়। যে কৌশলে তন্নিষ্ঠ অভিজ্ঞতা মন্ময় রসে জারিত হয় সে কৌশল রবীন্দ্রনাথের হাতে ছাড়া বাংলা সাহিত্যে ইতোপূর্বে আর কোথাও সাবলীল হয়ে দেখা দেয়নি। একই উদ্দেশ্য-সাধক নিচের বর্ণনাটি অনুধাবনযোগ্য। এ অংশটি যোগাযোগ থেকে উদ্ধৃত।

> দীর্ঘ তাঁর গৌরবর্ণ দেহ, বাবরি-কাটা চুল, বড়ো বড়ো টানা চোখে অপ্রতিহত প্রভুত্বের দৃষ্টি। ভারি গলায় যখন হাঁক পাড়েন, অনুচর-পরিচরদের বুক থরথর করে কেঁপে ওঠে। যদিও পালোয়ান রেখে নিয়মিত কুস্তি করা তার অভ্যাস, গায়ে শক্তিও কম নয়, তবু সুকুমার শরীরে শ্রমের চিহ্ন নেই। পরনে চুনট-করা ফুরফুরে মসলিনের জামা, ফরাসডাঙা বা ঢাকাই ধুতির বহুযত্নবিন্যস্ত কোঁচা ভূলুণ্ঠিত, কর্তার আসন্ন আগমনের বাতাস ইস্তাম্বুল আতরের সুগন্ধবার্তা বহন করে। পানের সোনার বাটা হাতে খানসামা পশ্চাদবর্তী, দ্বারের কাছে সর্বদা হাজির তকমা-পরা আরদালি। সদর দরজায় বৃদ্ধ চন্দ্রভান জমাদার তামাক মাখা ও সিদ্ধি কোটার অবকাশে বেঞ্চে বসে লম্বা দাড়ি দুই ভাগ করে বার বার আঁচড়িয়ে দুই কানের উপর বাঁধে, নিম্নতন দারোয়ানরা তলোয়ার হাতে পাহারা দেয়। দেউড়ির দেওয়ালে ঝোলে নানা রকমের ঢাল, বাঁকা তলোয়ার, বহুকালের পুরানো বন্দুক, বল্লম, বর্শা।

এই বর্ণনার বৈশিষ্ট্য এইখানে যে, কেবলমাত্র বিষয় অনুগামী বিশ্বস্ততাকে বহন করাই এর কাজ নয়। সেই কারণে এখানে বর্ণিত বিষয়েরও একটা চরিত্র আছে। সে চরিত্র বর্ণনাটিকে নির্বিশেষত্ব থেকে উদ্ধার করে একটা স্বকীয়তা এনে দিয়েছে, যে স্বকীয়তা যোগাযোগ উপন্যাসের পরিমণ্ডলের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত। উপন্যাসের গদ্যরীতিতেও Style is the man-এর প্রসঙ্গ অচল নয়।

ঔপন্যাসিকের ব্যক্তিপুরুষই বাণীভঙ্গিমার জনক। স্বভাবতই সে বাণীভঙ্গিমা ঔপন্যাসিকের চিন্তা, দর্শন এবং অভিজ্ঞতার স্বকীয়তা থেকে উদ্ভূত। ওপরের বর্ণনার লক্ষ্য জমিদার-বাড়ির অতীত মহিমার স্মৃতি চিত্রণ। সেই স্মৃতিচিত্রণ সফল হয়েছে কতকগুলো আশ্চয উল্লেখে। 'ইস্তাম্বুল আতরের সুগন্ধবার্তা', 'পানের সোনার বাটা', 'বহুকালের পুরানো বন্দুক, বল্লম, বর্শা'—এই সমস্ত শুধুমাত্র যে একটি বাস্তব বর্ণনার জন্য প্রয়োজনীয় হয়েছে তা নয়। প্রকৃতপক্ষে বহু-কালের জমিদার বাড়িব সোঁদা পুরনো সৌবভকেও এরা যেন ধরে বেখেছে। এই ভাবেই বর্ণনা জীবন্ত হয়। যে ব্যক্তিপুরুষ এর চিত্রকর তিনি বিষয়টিকে বিষয়-নিষ্ঠের মতো খুঁটিযে দেখেছেন তার পরে কবির মতো অনুভব করে সেটাকে সাজিয়েছেন। এখানে রবীন্দ্রনাথের পুরনো কালের আভিজাত্যকে চেনবার পদ্ধতি, তার চবিত্রকে উপলব্ধি করার সাহস সমস্তই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পুবনো সামন্ততন্ত্রেব প্রতাপ এবং স্বেচ্ছাচারের অপব্যয়ের এবং বিলাসের সৌন্দয এবং চরিত্র দুইকেই রবীন্দ্রনাথ ধরতে পেরেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের এই সাফল্যের মূল তাব ব্যক্তি জীবনীতে খুঁজতে যাওয়া নিরর্থক। সেই কারণে বঙ্কিমচন্দ্র এবং প্যারীচাঁদ যেখানে বিত্তশালী পরিবারের বর্ণনা দিতে গিয়ে "কেহ কেহ" এবং 'কোথাও কোথাও' এই বলে বাক্যাংশ শুরু করে খুঁটিয়ে বর্ণনার দিকে অগ্রসর হযেছেন, রবীন্দ্রনাথ সেখানে দুটি একটি মোক্ষম উল্লেখে লক্ষ্যভেদ করেছেন।)

রবীন্দ্রনাথের গদ্যরীতির আলোচনা আর একটু গভীর ভাবে কবার আগে এই প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রের গদ্যরীতির কথা একটু বলে নেওয়া ভালো। (শরৎচন্দ্র এবং শরৎচন্দ্রকে অবলম্বন করে আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যের অনেকটাই বাগভঙ্গির দিক দিয়ে রবীন্দ্র প্রভাবিত। বিশেষ শরৎচন্দ্রের গদ্যরীতিতে রবীন্দ্রপ্রভাব স্পষ্টতই ক্রিয়াশীল। শরৎচন্দ্রের প্রধান ক্ষমতা, যে-কোনো ভাবেই গল্প কথনের ক্ষমতা।) এই ক্ষমতার জন্যই বিরোধী সমালোচকেরা শরৎচন্দ্রের কোনো ক্ষতি করতে পাবেননি। এই গল্প কথনের ফলশ্রুতিকে মুগ্ধতা সঞ্চারী করে তোলার দিকে শরৎচন্দ্রের আগ্রহ সদাই অক্ষুণ্ণ ছিল। তাই শরৎচন্দ্রের গদ্য কখনও বঙ্কিমের মতো সংবাদবহ নয়, রবীন্দ্রনাথের মতো উচ্চকল্পনা-সঞ্চারীও নয়। এর একমাত্র কাজ হল গল্পকে পাঠকের কাছে পরম উপভোগ্য করে তোলা। নিচের অংশটুকু লক্ষণীয় :

কত দেশ, কত প্রান্তর, কত নদ-নদী-পাহাড়-পর্বত-বন-জঙ্গল ঘাঁটিয়া

ফিরিয়াছি, কত প্রকারের মানুষই না এই দুটো চোখে পড়িয়াছে, কিন্তু এত বড়ো মহাপ্রাণ তো আর কখনও দেখিতে পাই নাই ; কিন্তু সে আর নাই। অকস্মাৎ একদিন যেন বুদবুদের মতো শূন্যে মিলাইয়া গেল। আজ মনে পড়িয়া এই দুটো শুষ্ক চোখ জলে ভাসিয়া যাইতেছে—কেবল একটা নিষ্ফল অভিমান হৃদয়ের তলদেশ আলোড়িত করিয়া উপরের দিকে ফেনাইয়া উঠিতেছে। সৃষ্টিকর্তা! এই অদ্ভুত অপার্থিব বস্তু কেনই বা সৃষ্টি করিয়া পাঠাইয়াছিলে, এবং কেনই বা তাহা এমন ব্যর্থ করিয়া প্রত্যাহার করিলে! বড়ো ব্যথায় আমার এই অসহিষ্ণু মন আজ বারংবার এই প্রশ্নই করিতেছে—ভগবান! টাকা-কড়ি ধন-দৌলত, বিদ্যা-বুদ্ধি ঢের তো তোমার অফুরন্ত ভাণ্ডার হইতে দিতেছ দেখিতেছি, কিন্তু এত বড়ো একটা মহাপ্রাণ আজ পর্যন্ত তুমিই বা কয়টা দিতে পারিলে?

এ-ভাষার শক্তি এইখানে যে এ অবাধ এবং নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহের মতো একটানা অগ্রসর হবার ক্ষমতা রাখে। কিন্তু উপন্যাসের দিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে যে এ-ভাষা ত্রুটিপূর্ণ, কেননা বিষয় সম্বন্ধে লেখকের ভাবোচ্ছ্বাসকে ব্যক্ত করাই এর কাজ। ভাবোচ্ছ্বাসে আমাদের কোনো আপত্তি নেই, আপত্তি ভাবোচ্ছ্বাস অসংহত বলে। মহা, অদ্ভুত, অপার্থিব প্রভৃতি বিশেষণের সাহায্যে যে কিছুকে রূপময় করে তোলা যায় না এ-কথা যেন শরৎচন্দ্র বিস্মৃত হয়েছিলেন। সেই কারণে 'এত বড়ো মহাপ্রাণ তো আর কখনও দেখিতে পাই নাই' এ যেন অনেকটা লেখকের প্রদত্ত ক্যারেকটার সার্টিফিকেট। সার্টিফিকেট দিয়ে চরিত্রকে জীবন্ত করা বা রূপায়িত করা যায় না। 'অদ্ভুত', 'অপার্থিব', 'রহস্যময়', 'ভীষণ' এই সমস্ত বিশেষণও কিছুকেই বিশেষিত করে তুলতে পারে না। এই ধরনের গদ্যরীতি কল্পনার অমার্জিত বিন্যাসের ফল। শরৎচন্দ্রকে যারাই অনুসরণ করেছেন, এমন কি বিমল মিত্র পর্যন্ত, তাঁদের সকলের কথাসাহিত্যের গদ্যরীতি এই পরম উপভোগ্য হবার কল্পনায় ব্রতী বলে অল্পবিস্তর এই দোষে দুষ্ট।)

(সে ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের গদ্য রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিপুরুষেরই অভিব্যক্তি। আমরা রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত উপন্যাস গোরা থেকে এইবার সামান্য আলোচনা করে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের গদ্যরীতির বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করার চেষ্টা করব।

বিশিষ্ট এবং ঐক্যসূত্রে ধৃত গদ্যরীতির জন্যই উপন্যাসের বিরাট পটভূমিকাকে রবীন্দ্রনাথ এত অনায়াসে ব্যবহার করতে পেরেছেন। এবং এই একই কারণে উপন্যাসের ঘটনা-ঘন মুহূর্তে এই গদ্য সার্থক কবিত্ব সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে।

উপন্যাসের গদ্যের নিরবচ্ছিন্ন গতিশীলতায় এই কবিত্ব কখন যে পুষ্পিত হয়ে ওঠে আবার কখন যে ঘটনাকে বহন করে চলতে শুরু করে পাঠকের কাছে তা থাকে দুর্লক্ষ্য। মেরিডিথ এবং শার্লট ব্রন্টি-র দুটি রচনা আলোচনা করতে গিয়ে শ্রীযুক্তা ভার্জিনিয়া উল্ফ্ এ-প্রসঙ্গে যা বলেছেন তা স্মরণীয়। তিনি বলেছেন যে, উপন্যাসের ছন্দোপাত ঘটিয়ে কাব্যের অকস্মাৎ-আগত purple patch লেখকের কল্পনার অসঙ্গতির কথাই ঘোষণা করে। ("The objection to the purple patch, however, is not that it is purple but that it is a patch.") উপন্যাসের অংশ-বিশেষের লিরিক্যাল গুণ যতই হৃদয়গ্রাহী হোক না কেন, কিংবা তার গদ্য যতই কাব্যগুণে অন্বিত হোক না কেন উপন্যাসের সকল দিকের বিচারে তারা কতখানি সুপ্রযুক্ত হয়েছে সেটাই দ্রষ্টব্য। গোরার মতো সার্থক সৃষ্টি তার কবিত্বকেও সর্বব্যাপী সঙ্গতির সঙ্গেই মিলিয়ে নেয়। তখন সেখানে কবিত্ব আর পৃথক সত্তা নয়।)

নতুবা যে দোষটা ঘটে সেটা শিল্পরীতির একটা সাধারণত প্রধান ত্রুটি। তা হল লেখকের ভাষাবিন্যাসে অতি যত্নশীলতার দৃষ্টিকটু বহিঃপ্রকাশ। শিল্পীর কল্পনার সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপনে এটা একটা বড়ো বাধা। এ-কালের বুদ্ধদেব বসু এবং অচিন্ত্যকুমারের উপন্যাসের ভাষা সম্বন্ধে আমাদের এ-অভিযোগের কারণ আছে। যদিও বুদ্ধদেব বসুর ব্যক্তিগত রচনার গদ্যের আমি রীতিমতো ভক্ত এবং অচিন্ত্যকুমারের ছোটগল্পের ক্ষুরধার গদ্য বহুবার আমাকে মুগ্ধ করেছে তথাপি দেখেছি উভয়েরই ভাষা উপন্যাস-নিরপেক্ষ ভাবে শানিত এবং উজ্জ্বল। লেখকের উপন্যাস সম্বন্ধে ধারণার অসঙ্গতি থেকেই এগুলো জন্মায়। আর আশ্চর্য ছোট-গল্পের গদ্যের চাল যে উপন্যাসে অচল অচিন্ত্যকুমারের শেষতম উপন্যাস পড়ে মনে হল সেটা যেন তিনি স্বীকার করেন না।

সে-ক্ষেত্রে গোরায় স্টিমারে বিনয়-ললিতার রাত্রিযাপনের অংশটুকু এবং তৎপূর্ববর্তী চরঘোষপুরের হাঙ্গামার অংশটুকু পাশাপাশি রাখলে দেখা যায় যে দুটো বিপরীত-ধর্মী ঘটনা হওয়া সত্ত্বেও একটা ঘটনা থেকে আর একটায় উত্তরণের কালে ভাষার গতিতে কোনো অসমতা আসেনি। কোনো প্রকার ঝাঁকুনি ব্যতিরেকেই আমরা নিম্নোদ্ধৃত অংশে উপনীত হই :

—শুক্তির মধ্যে মুক্তোটুকু যেমন, গ্রহতারা-মণ্ডিত নিঃশব্দ-তিমির বেষ্টিত এই আকাশমণ্ডলের মাঝখানটিতে ললিতার এই নিদ্রাটুকু, এই সুডোল সম্পূর্ণ সুন্দর বিশ্রামটুকু জগতে তেমনি একটি মাত্র ঐশ্বর্য বলিয়া আজ

> বিনয়ের কাছে প্রতিভাত হইল। 'আমি জাগিয়া আছি', 'আমি জাগিয়া আছি'—এই বাক্য বিনয়ের বিস্ফারিত বক্ষঃকুহর হইতে অভয় শঙ্খধ্বনির মতো উঠিয়া মহাকাশের অনিমেষ জাগ্রত পুরুষের নিঃশব্দ বাণীর সহিত মিলিত হইল।

শুক্তির বন্ধনে মুক্তা অথবা বক্ষঃকুহর থেকে অভয় শঙ্খধ্বনির মহাকাশ গমন এই দুই চিত্রকল্পই বিনয়ের বর্তমান মনোভাবের পরিচায়ক। ললিতা সম্পর্কে তার প্রেমানুভূতি ব্যতীত বিনয় গোরার বন্ধু এবং হৃদয়োচ্ছ্বাসের নীরব শ্রোতাই থেকে যেত এ-কথা খুবই সত্য। সুতরাং এই প্রেমানুভূতি তার নিজ ব্যক্তিত্ব উপলব্ধির সূত্র। যে প্যারাগ্রাফ থেকে উদ্ধৃত অংশটি গ্রহণ করা হয়েছে সেই সমস্ত প্যারাগ্রাফটিই বিনয়ের এই নিজেকে চেনার আবেগে স্পন্দিত। এখানে প্রবহমান জলরাশি থেকে শুরু করে সমস্ত নিসর্গ বর্ণনা, সমস্ত চিত্রকল্প বিনয়ের নবার্জিত স্বাতন্ত্র্যের দিকেই অঙ্গুলি সংকেত করেছে। (অনুপ্রাণিত শিল্পীর মতো লেখকের কল্পনা ভাষার একটা ঘনীভূত রূপ সৃষ্টি করেছে গোরায়। এই প্রসঙ্গেই উল্লেখযোগ্য গোরা উপন্যাসে ব্যবহৃত উপমারাশির কথা। ঘন ঘন সুপ্রযুক্ত উপমায় রবীন্দ্রনাথ গোরা-র উপন্যাসগত ভাবকেই শুধু সমৃদ্ধ করেননি,—এ উপন্যাসের পক্ষে প্রয়োজনীয় একপ্রকার ব্যাপকতব জীবনবোধেরও পরিচয় দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ ভাষা বিষয়ে অমিতব্যয়ী, অথবা তাঁর উপমা আতিশয্যে কখনো কখনো যুক্তির আসন পরিগ্রহ করে—রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে এ সমস্ত অভিযোগবাণী গোরা উপন্যাসের কাছ থেকে নীরবেই ফিরে যাবে।

এবং এই উপমার একটা বৈশিষ্ট্য আছে। উপন্যাসের প্রথম দিকে শতাবধি পাতায় লেখক একেবারেই প্রায় উপমা প্রয়োগ করেননি। নিরলংকৃত বাক্য-স্রোত সরাসরি উপন্যাসের উদ্দিষ্ট ঘটনাবলীর মাঝখানে গিয়ে না পৌছনো পযন্ত বাক্যের অলংকরণের দিকে মনোযোগী হয়নি। এবং এর পর যে উপমা-রাশি ব্যবহৃত হতে শুরু করেছে তা অবলীলায় গোবার প্রচণ্ডতা, ললিতার নাটকীয়তা, ষ্টিমারে রাত্রির কবিত্ব সকল কিছুকেই যথারীতি ব্যক্ত করেছে। উৎকৃষ্ট কবিতার মতোই গোরা উপন্যাসের মৌল কল্পনার সঙ্গে এই ব্যবহৃত উপমারাশির নিবিড় যোগের আর একটি নিদর্শন হল বিভিন্ন প্রসঙ্গেই মাঝে মাঝে জল বা নদী বা স্রোত সংক্রান্ত কোনো চিত্রকল্প প্রযুক্ত হয়েছে। গোরার জীবনই উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দু—রচনাকালে গোরার চরিত্র-কল্পনাই বারে বারে নদীতে তার যোগ্য উপমা খুঁজে পেয়েছে। এবং এই কারণে, শুধুমাত্র প্রেমের

উন্মেষের দৃশ্য বলে নয়—উদ্ধৃত স্টিমারের অধ্যায় উপন্যাসের মৌল আবহাওয়ায় অতখানি প্রাণসঞ্চার করতে পেরেছে।

গোরা উপন্যাসের ভাষাভঙ্গিতে আগাগোড়া যে ঐক্য বিদ্যমান সেই ঐক্য উপন্যাসের ভাষার একটা আদর্শ। চতুরঙ্গ এ প্রসঙ্গে আর একটি উদাহরণ। এখানে স্পষ্টত বলা প্রয়োজন যে চতুরঙ্গ অথবা গোরার ভাষাকে যে আদর্শ বলা হচ্ছে তার অর্থ এই নয় যে এই ভাষাই অনুকরণীয়। গোরা বা চতুরঙ্গে উপন্যাসের ভাষা নির্বাচনের পদ্ধতি অনুধাবনযোগ্য। গোটা উপন্যাসের ভাষার ভিতরে যখন সৃষ্টির অনুশাসন সক্রিয় থাকে তখনই ভাষারীতিতে আদ্যন্ত ঐক্যের বাঁধন দৃঢ় বলে মনে হয়। আপাতদৃষ্টিতে যাকে কালানৌচিত্য বলে ভুল হয় তারও ব্যাখ্যা করা যায় শিল্পীর উক্ত অনুশাসনের আলোকে। চতুরঙ্গ গোরার পরবর্তী রচনা। চতুরঙ্গে নায়ক-নায়িকার কথোপকথনে সাধু ক্রিয়াপদাত্মক ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। অথচ পূর্ববর্তী রচনা গোরায় নায়ক-নায়িকার কথোপকথনে চলিত ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হয়েছে। ব্যাপারটি নিশ্চয় খেয়ালখুশির নিদর্শন নয়। গোরার দেশকালের অতিপ্রত্যক্ষ আবহাওয়ায় এবং বিস্তৃত বহুবিধ জীবনের সমাবেশে পাত্রপাত্রীর অভিজ্ঞতা স্বভাবতই প্রত্যহের জলবাতাস থেকে প্রাণ সংগ্রহ করেছে। তাদের কথাবার্তায় লৌকিকতার ভিত্তিভূমি রক্ষা অবশ্য প্রয়োজনীয়। চতুরঙ্গের জন্য ভিন্ন ভঙ্গি প্রয়োজন হয়েছে। এখানে প্রথম থেকে উপন্যাসকে এই ভাষার উপযুক্ত উচ্চতায় উন্নীত করা হয়েছে, আমাদের বোঝানো হয়েছে যে যাদের কথা, অভিজ্ঞতা এবং যন্ত্রণার বিষয় এ উপন্যাসে বিধৃত তাদের ব্যক্তিসত্তার একক এবং নিঃসঙ্গ মহিমা প্রথম থেকেই এমনভাবে কল্পিত ও প্রতিষ্ঠিত যে এরা সাধু ভঙ্গিতে কথা না বললে মনে হত যেন এদের অনেকটা নিচেয় নামানো হয়েছে। কাব্যনাটকের চরিত্রগুলি যেমন মাত্র কবিতায় কথা বলবার জন্যই কবিতা বলে না, কাব্যভূমিতেই তাদের জন্ম, তেমনি এই উপন্যাসেরও চরিত্রগুলি কল্পনায় জন্মমুহূর্ত থেকেই সাধু ভঙ্গিতে কথা বলে। এর ফলে এদের যন্ত্রণায় একটা সুদূর নিঃসঙ্গতার সৌন্দর্য এসেছে।

উপন্যাসের ভাষাজ্ঞানের এবম্বিধ মান আধুনিক বাংলা উপন্যাসে একমাত্র মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে সহজপ্রাপ্য। মানিকবাবুর সাহিত্যকর্মের আলোচনা-কালে আমরা তার বিস্তৃত আলোচনা করব। বর্তমান বাংলা সাহিত্যের উপন্যাসের ভাষায় প্রধানত তিন ধরনের ভাষাভঙ্গির প্রভাব বিদ্যমান। এক নাটুকে রীতি, দুই সর্বদা প্রস্তুত প্রচলিত রীতি; তিন চটকদার সাবলীল

রীতি। প্রথম রীতির উদ্দেশ্য পাঠককে বিস্মিত করা ; দ্বিতীয় রীতির উদ্দেশ্য পাঠকের চিন্তাকে কোনোভাবে আঘাত না করে প্রচলিত চিন্তার ছকে তাকে বেঁধে রাখা ; তৃতীয় রীতির উদ্দেশ্য হল পাঠককে চমৎকৃত করা। ঔপন্যাসিকের ভাষার বিশিষ্টতা ঔপন্যাসিকের চিন্তার বিশিষ্টতার ধারক।)বর্তমান বাংলা উপন্যাসে যে ক-এর সঙ্গে খ এবং খ-এর সঙ্গে গ-এর ভাষার কোনো পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যায় না তার কারণ অধিকাংশের মধ্যেই চিন্তার ক্ষেত্রেও কোনো প্রভেদ নেই। আ্যাভারেজ অভিজ্ঞতার জন্যই বর্তমান বাংলা উপন্যাসের ভাষায় অ্যাভারেজ গুণের এত কদর।

একে অতিক্রম করার জন্য কেউ কেউ অকারণ আবেগমত্ততার আশ্রয়ী হন। এটা ঔপন্যাসিক ধ্যান ধারণার সম্পূর্ণ বিরোধী। জীবনের স্বরূপকে আবিষ্কার করা উপন্যাসের কাজ। ভাষা তার অন্যতম আধার। এই আধারের দৌর্বল্যে জীবনের স্বরূপকে তিনি রূপময় করতে পারবেন না।

পূর্ণ জীবনবোধে অনুপ্রাণিত ঔপন্যাসিকের ভাষায় সুদৃঢ় অনুশাসন ও উপযুক্ত গাম্ভীর্য প্রধান গুণ বলে বিবেচিত হয়। সে বিচারে উপন্যাসের উপযুক্ত বিষয়বস্তু ব্যতীত উপযুক্ত ভাষার শৈলি-নির্মাণ কদাচ সম্ভব নয়। উপন্যাসের ভাষা ঔপন্যাসিকের বিষয়জ্ঞানেরই অপর নিদর্শন।

বাংলা উপন্যাসের জন্মলগ্ন—আলালের ঘরের দুলাল

•• এক ••

ইতিহাসের যে ন্যায়সূত্রের অমোঘ নির্দেশে ইংলণ্ডে অষ্টাদশ শতাব্দীতে উপন্যাসের জোয়ার তারই কিঞ্চিৎ উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা দেশের সামাজিক বিন্যাসেও বিদ্যমান ছিল এরকম ভাবা হয়ে থাকে। বাংলা উপন্যাসের জন্মলগ্নের ইতিহাসটি আমাদের উপন্যাসের গতি-প্রকৃতি এবং শক্তি-দৌর্বল্য উপলব্ধির জন্য বিশেষভাবে অনুধাবনীয়। বর্তমান গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদে আমরা এ-কথা আলোচনা করেছি যে সমকালীন জীবন সম্বন্ধে বাস্তব আগ্রহ হল উপন্যাসের জন্মলগ্নের প্রাথমিক শর্ত। সমকাল এবং সমকালীন জীবন সম্বন্ধে আগ্রহের ভিন্ন রূপ ভারতবর্ষের ইতিহাসে অবশ্য অন্যভাবে উপস্থিত ছিল। বুদ্ধদেব বা চৈতন্য মহাপ্রভুর জীবৎকাল এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। এঁদের অধ্যাত্ম কীর্তি সমন্বিত জীবন স্বভাবতই তাঁদের সমকালের মানুষকে আকৃষ্ট করেছিল। এ দিক দিয়ে বাংলা সাহিত্যে চৈতন্যযুগ আরো বিশিষ্টতার অধিকারী। 'প্রণমহোঁ কলিযুগ সর্বযুগসার—এই উক্তিতে কল্পিত সত্যযুগের পশ্চাদ্ধাবন না করে সমসাময়িক কালকেই স্বীকার করে নিতে চেয়েছিলেন সে-যুগের বৈষ্ণব সাধকরা। গৃহধর্মীদের সঙ্গে বৈষ্ণব ধর্মান্দোলনের নেতাদের প্রচারিত ধর্মাদর্শের কোনো মৌল বিরোধ না থাকায় মোটামুটি বাংলা দেশ তখন এই সমকালানুবর্তিতাকে সহজে গ্রহণ করতে পেরেছিল।

কিন্তু এই সমকালানুগত্য, এই জীবিত মানুষ সম্বন্ধে আগ্রহ উনবিংশ শতাব্দীর (বাংলা দেশের) জীবনাগ্রহ থেকে দূরবর্তী ব্যাপার। ষোড়শ শতাব্দীতে পুরুষার্থ-চেতনায় মোক্ষ এবং ধর্ম মুখ্য ছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে ক্রমশই পুরুষার্থ-

চেতনা চতুর্বর্গফল লাভের সম্যক অর্থকে উপলব্ধি করার পথে অগ্রসর হয়েছিল। সমকালীন জীবন সম্বন্ধে বাস্তব আগ্রহ এই নতুন পুরুষার্থ চেতনার জনক। এ বাস্তব আগ্রহেব স্বরূপনির্ণয় বাংলা উপন্যাসেব জন্মকালের আলোচনায় অবশ্য প্রয়োজনীয়। উপন্যাস যেহেতু জীবনেব সমগ্র ধারণার সন্ধানী সেহেতু এ যুগেব জীবনেব সমগ্র চেহারার কিছুটা নক্শা না-সংগ্রহ কবলে এ যুগের জীবনের সমস্যাব স্থূল আঁচডগুলোব ব্যাখ্যা করা সম্ভব হবে না। ঊনবিংশ শতাব্দীর কলকাতা এবং মফস্বলেব জীবনেব বিন্যাস, সে বিন্যাসেব ওপব নানা আলোছায়ার বুনুনি সমাজতাত্ত্বিকেব কাছে অবশ্যই কৌতূহলোদ্দীপক, কিন্তু সাহিত্য জিজ্ঞাসুর কাছেও সে সময়েব তীব্র টানাপোডেন কম চিত্তাকর্ষক নয়। কেননা এই টানা-পোডেনেব অমোঘ আকর্ষণেই জন্মলাভ করেছে বাংলা উপন্যাস।

এ-কথা অবশ্য স্বীকার্য যে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পঞ্চাশ বছর ব্যয়িত হয়েছে কলকাতাই জীবনেব একটা norm বা স্থিবাদর্শ সন্ধানেব প্রয়াসে। আসলে ঊনবিংশ শতাব্দীব প্রথম পঞ্চাশ বছব জীবনেব দ্বান্দ্বিক অবয়বকে তখনকাব শিক্ষিত বাঙালীব কাছে ধীবে ধীরে স্পষ্ট কবে তুলেছিল। জীবন যে একটা অতি কঠোব দ্বন্দ্বময় ব্যাপাব এটা ঊনবিংশ শতাব্দীব পুর্বে সামাজিক ভাবে অন্তত উপলব্ধি কবা যায়নি। অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রচলিত জীবনাচরণের বিরুদ্ধে কখনো কখনো ক্ষীণভাবে হয়তো একটা অস্পষ্ট বিদ্রোহের সুব শোনা গেছে। দারু ব্রহ্ম উপাসক বামানন্দেব পাঁচালি অবশ্যই উদ্ধৃতিব যোগ্য :

> দারুব্রহ্ম সেবা কবি জেববাব হৈল।
> বৃথা কাষ্ঠ সেবি কাল কাটা নহে ভাল॥
> বস্তুহীন বিগ্রহ সেবিয়া নহে কাজ।
> নিজ কষ্টদায় আব লোকমধ্যে লাজ॥

কিন্তু এ ধবনেব একক স্ববেব কথা বাদ দিলে বলা যায় ঊনবিংশ শতাব্দীতেও আমাদেব সমস্ত জীবনবোধই দাঁডিয়েছিল এই দ্বন্দ্বকে উপলব্ধিজনিত সামাজিক অনুভূতিব ওপবে। কলকাতা এবং কলকাতাব সন্নিকটবর্তী মফস্বলকে অবলম্বন কবে তখন জীবনেব দুই ধাবা ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। একদিকে ছিল কলকাতাশ্রয়ী দেওয়ান মুৎসুদ্দি প্রভৃতি বর্ণমর্যাদাচ্যুত নব্য বড়োলোক শ্রেণী—তাব সমস্ত বাবুয়ানি-বিলাস-ব্যভিচারাদি সমেত—আব একদিকে ছিল দুর্বল এবং প্রতিপত্তিহীন প্রাচীন-পুঁথি-আশ্রয়ী সংস্কৃত বিদ্যাব্রতী সমাজ। হুতোমের বিববণে, নববাবু বিলাসে এবং বঙ্কিমের লোকবহস্যের বর্ণনায় বিদ্রূপের

আতিশয্যটুকু বাদ দিলে এই দুই ধারারই প্রতিচ্ছবির সাক্ষাৎ মেলে। যদি এই দুই ধারার মধ্যে কোনো একটিও সৃষ্টি সম্ভাবনায় একাকীই পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে পারত তাহলে অবশ্যই বাংলার উনিশের শতকের সামাজিক ইতিহাসে সরল-রেখার মসৃণ গতি আমরা পেতে পারতাম। কিন্তু ইতিহাস রচনায় মানুষের কর্তৃত্ব কদাচ ইতিহাসের নিজস্ব ন্যায়ক্রমকে ছাড়িয়ে যায় না বলেই ইতিহাসের গতিরেখা জটিল এবং বঙ্কিম। সে সময়ের নব্য বড়োলোক শ্রেণী সামাজিক মর্যাদার ক্ষেত্রে ছিলেন ততটাই পঙ্গু, সংস্কৃতজ্ঞ প্রাচীনপন্থী পৃষ্ঠপোষকহীন পণ্ডিতেরা ছিলেন যতটা নিঃসহায়। এঁদের পুরনো অবলম্বনগুলো যত ভেঙে পড়ছিল ওঁদের ব্যর্থ বাবুয়ানির মর্যাদা ভিক্ষা ততই বাইজির নাচে, দুর্গোৎসবের ক্ষেমটায় আবর্তিত হচ্ছিল নিষ্ফলভাবে।

হয়তো তদানীন্তন কলকাতার সমস্ত বহিরঙ্গটা ছিল এই অবস্থারই একটা দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপক। লটারি কমিটির প্রচেষ্টায় কলকাতা শহরের ক্রমোন্নয়নের পশ্চাতে রয়েছে পঙ্কে পল্বলে জঙ্গলে কলকাতার রূপাবর্তনের ঝোঁক। ঝিঁঝি ডাকা সুতানুটি আর জলেই নিভে-যাওয়া বেড়ালের বিয়ের জলুস সেই দ্বিমুখী জীবনেরই দুই চেহারা। 'সাহেব বিবির দিগের ইংলণ্ডীয় গীতবাদ্য' এবং 'চিৎপুরের রাস্তায় মেঘ কল্লেই কাদা হয়'—এও সেই দুই চেহারারই প্রতিফলন।

•• দুই ••

স্বভাবতই কলকাতা নগরীর তাৎপর্য এ-যুগে নানামুখী ছিল। তৎকালীন সমাজ-পটের যে দ্বন্দ্ব-দীর্ণ চেহারার কথা পূর্ব-পরিচ্ছেদে বলা হল তা একান্তরূপেই ছিল কলকাতা-কেন্দ্রিক। আবার এই দ্বন্দ্ব থেকে উত্তীর্ণ হয়ে স্থির জীবনাদর্শের সন্ধানের প্রয়াসও ছিল কলকাতাশ্রয়ী। রামমোহন অথবা বিদ্যাসাগর কেউই কলকাতাই মানুষ নন। কিন্তু উভয়েরই কর্মকেন্দ্র ছিল কলকাতা। অবশ্য হয়তো এই কারণেই এঁদের দুজনের কাছেই গোটা স্বদেশের প্রেক্ষাপট কখনো হারিয়ে যায়নি। হিন্দু কলেজীয় অত্যুচ্ছ্বাস এবং অনুস্বরবাদীদের মানসিক কার্পণ্য যে কদাচ রামমোহন-বিদ্যাসাগর-মধুসূদন এবং আংশিক ভাবে বঙ্কিমচন্দ্রকে প্রভাবিত করেনি তার কারণ এইখানে যে কলকাতার নব্য জীবনের মিতপরিসর অতি-দীপ্তিকে এঁরা কেউ স্বদেশ জীবনের বিকল্প ভাবেননি। এঁদের মানস-আকাশে স্বদেশ বিদেশের ভাববিস্তৃতি সত্ত্বেও এঁদের জীবনের মূল ছিল দেশজ মৃত্তিকায় সে কারণে এঁরা যা কিছু দেখেছেন ভেবেছেন বা দেখতে ভাবতে চেয়েছেন ত

সমস্তই দেশের মানস-আবহ ও ভাবাকাশের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে চাওয়া। এই অর্থেই এঁরা কলকাতার বাইরের হওয়া সত্ত্বেও যথার্থ নাগরিক মনের অধিকারী।

কিন্তু এই নাগরিকতার প্রসাদ সমগ্র বাংলা দেশ কখনো লাভ করেনি। কলকাতার জীবনের আকর্ষণ মধ্যবিত্ত বাঙালী অবশ্য অনুভব করেছে এমন কি তার রূপ-সৌন্দর্যকেও যে আবিষ্কার করার প্রয়াস পেয়েছে বাংলা সাহিত্যে সে নিদর্শন দুর্লভ নয়। বিহারীলালের প্রেম প্রবাহিণী থেকে পরবর্তী অংশটুকু লক্ষণীয়—

কতদিন এ নগরে নিশীথ সময়ে
যে সময়ে নিসর্গ রয়েছে স্তব্ধ হয়ে
ব্যোমময় তারা সব করে দপ দপ,
যেন মণিখচিত অসীম চন্দ্রাতপ,
কোনো দিকে কোনো রব নাহি শুনা যায়
কভু মাত্র পিয়ুকাঁহা হাঁকে পাপিয়ায়।
গ্যাসের আলোক আছে পথ আলো করে
প্রহরীর দেহ টলমল ঘুমঘোরে।
ফিরিয়াছি পথে পথে পাড়ায় পাড়ায়
যেখানে দু-চোখ গেছে গিয়েছি সেথায়।
কোথাও উঠিছে হররা উল্লাস চিৎকার,
যেন ঠিক যমালয়ে নরক গুলজার।
কোথাও উঠিছে হরিবোল হরিবোল,
ধেই ধেই নাচিতেছে বাজিতেছে খোল।
পথে পথে শুঁড়িদের দর্জা ঠেলাঠেলি,
তার উপরের ঘরে ঘৃণ্য হাসি খেলি।
আশে পাশে মাতোয়াল লোটে নর্দমায়
গায়ের বিটকেল গন্ধে আঁত উঠে যায়।
কোনো পথে বাবুজির পাইশালের দ্বারে
পড়ে আছে দু-এক অনাথ অনাহারে।

এরই সঙ্গে যদি রমেশচন্দ্র দত্তের সংসার উপন্যাসের সপ্তম পরিচ্ছেদে শরৎ ও হেমচন্দ্রের ভবিষ্যৎ চিন্তামূলক কথোপকথন মিলিয়ে পড়া যায় তাহলে সে সময়ের শিক্ষিত মধ্যবিত্তের কলকাতা-চিন্তার পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়। ঐ অংশে

শরতের বক্তব্য এই : আপনারা কলকাতায় আসুন, আপনারা কি চিরকাল গ্রামেই বাস করবেন? হেমচন্দ্রের বক্তব্যও অনুরূপ : কলকাতা অতি মহৎ স্থান। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হেমচন্দ্র কলকাতার সংকট সম্বন্ধেও সচেতনতা প্রকাশ করেছেন : সেখানে আমা অপেক্ষা সহস্রগুণে উপযুক্ত লোক কর্মের জন্য লালায়িত হচ্ছে। গ্রামে থাকিলে উন্নতি নাই—মধ্যবিত্ত মানসে তখন কলকাতা এ চিন্তার স্বাক্ষর এঁকে দিয়েছে। বিহারীলালের মতো রমেশ দত্তের নায়িকাদেরও চোখে কলকাতার নতুন রূপের ঘোর।

> বিস্মিত নয়নে সুধা ও বিন্দু লাট সাহেবের বাড়ি দেখিতে দেখিতে গড়ের মাঠে বাহির হইয়া পড়িলেন। তখন সন্ধ্যার ছায়া গাঢ় হইয়া আসিয়াছে, ইন্দ্রপুরী তুল্য চৌবঙ্গীতে দীপালোক প্রজ্জলিত হইয়াছে, এখন মর্তে যাঁহারা দেবত্ব করিতেছেন তাঁহারা বেরুশ, ফিটন বা লেণ্ডলেট করিয়া ইডেন গার্ডেনে সমাগত হইতেছেন। ঐ প্রসিদ্ধ উদ্যান হইতে অপূর্ব বাদ্যধ্বনি শ্রুত হইতেছে এবং আকাশের বিদ্যুৎ মনুষ্যের বিজ্ঞান ক্ষমতার অধীন হইয়া নরনারীর রঞ্জনার্থ আলোক বিতবণ করিতেছে। ভারতবর্ষের আধুনিক অধীশ্বরদিগের গৌরব ও ক্ষমতা, প্রভুত্ব ও বিলাস দেখিয়া তালপুকুব নিবাসিনী দবিদ্রা বিন্দু বিস্মিত হইলেন।

কিন্তু শিল্পীমানসে কলকাতা নগবীর এই যে ছায়াপাত এ সম্বন্ধে আমবা যতই উদ্ধৃতির সংখ্যা বৃদ্ধি করি না কেন এর অন্তর্নিহিত সীমাবদ্ধতা আমাদের দৃষ্টি এড়ায় না। বিহারীলালের কাব্য-ধৃত কলকাতায় যদিবা কলকাতা শহরেব অন্তবের চেহারা কিছুটা প্রতিবিম্বিত হযেছিল এ-কালের উপন্যাসে কলকাতার সর্বাঙ্গীণ রূপ আদতেই প্রস্ফুট হয়নি। রমেশ দত্তেব নায়িকার চোখে বর্ণিত কলকাতা আর স্বর্ণলতায নীলমাধবের চোখে দেখা কলকাতার বর্ণনায় কলকাতা দর্শনের প্রথম বিস্ময় উপস্থিত বটে (এমন কি ইন্দিরাতেও) কিন্তু কলকাতা বা কোনো শহর সমগ্রভাবে এ-যুগের কোনো উপন্যাসে ব্যবহৃত হয়নি। একমাত্র আলালের ঘরের দুলাল এর ব্যতিক্রম। এ বিষয়ে আলোচনা আমরা বিস্তৃত ভাবে পরে করছি।

ওপরের উদ্ধৃতি সত্ত্বেও আপাতত আমাদের যেটুকু অনুধাবনীয় তা হল এই যে কলকাতা নগরীর প্রসাদ সারা বাংলা দেশ লাভ করেনি। ইতিহাসের অনিবার্য আকর্ষণে শতাব্দীর পর শতাব্দীর প্রলেপে কলকাতা নগরীর ক্রমনির্মাণ হয়নি। একদিক দিয়ে দেখতে গেলে হুতোমের বর্ণিত হঠাৎ বাবুদের মতো সেও হঠাৎ

শহর। মহাভারতের ষোড়শ মহাজনপদের কলকাতা কেউ নয়। ইংলণ্ডের শিল্প-রূপান্তরের টানে লণ্ডন শহরের বিস্তৃতি অথবা গ্রামীণ ইংলণ্ডের নববিন্যাস, 'নতুন শহরের উদয় উদ্ভব প্রভৃতির সঙ্গে কলকাতা শহরের ইতিহাসের কোনো মিল নেই। স্বভাবতই কলোনির প্রয়োজনে নির্মিত শহরের বহিরঙ্গের জেল্লা জৌলুস বড়োজোর 'বাবুদেব মেলা'। শিল্প-রূপান্তরেব প্রবল আকর্ষণে উদ্ভূত শিল্প শহরগুলির মূলে ইংলণ্ডীয় জীবনে যে-যন্ত্রণা যে-আবেগ কলকাতা শহর সৃষ্টির মূলে তা অনুপস্থিত। কলকাতা শুধু বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো জেগে রইল। বিশাল মফস্বল বাংলায় স্বনিয়মে, নতুন সৃষ্টিব ন্যাযকে অনুসরণ করে কোনো শহর সৃজিত হল না। অথচ শূন্য মক্তব-মাদ্রাসা-টোল এবং নিঃশেষিতপ্রাণ কুটির শিল্পকে ব্যঙ্গ করে দিনে দিনে জনাকীর্ণ হতে লাগল কলকাতা। আর দিনে দিনে শূন্য-প্রায মক্তব-মাদ্রাসা-টোলেব জন্য বাংলাব বিপুলতব জনসমাজে কোনোও স্পষ্ট ক্ষোভের দেখা পাওযা গেল না। মধ্যযুগীয় গ্রামীণ সমাজ বিন্যাসের কিম্ভূত গঠনেব জন্যই গ্রামীণ উচ্চ-কোটিব মানুষ যেমন ব্যাপকভাবে অসন্তুষ্ট কুটিরশিল্পী, নিপীড়িত নীলচাষীদেব জন্য কোনো সমবেদনা অনুভব করলেন না বর্ণাশ্রমেব সেই প্রেত তাড়নাতেই তেমনি প্রাচীন শাস্ত্রাধ্যায়ী পণ্ডিত সমাজের বিপর্যয়েও কোথাও জাতীয় বিপর্যয়বোধেব বেদনা অনুভূত হল না। অথচ কলকাতার উদয়েও শুধু সুবিধাভোগেব প্রত্যাশা ছাড়া নেই কোনো প্রাণীন উল্লাস।

ইংলণ্ডেব শিল্প-বিপ্লবের সমকালীন ইতিহাস স্বতন্ত্র। সেখানে শিল্প-বিপ্লবের প্রচণ্ড তাড়নাব মূলেও যেমন জাতীয় আবেগ, ১৮৪৬ সালের শস্যে স্বাধীন বাণিজ্যের নীতির ফলে agricultural decline-এও তেমনি জাতীয় বিপর্যয়-বোধ। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে লেখা ওয়ার্ডসওয়ার্থ-এব অ্যান ইনভেন্টিভ এজ নামক কবিতায় রূপান্তরের কবি-প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য কবার মতো :

> Wherever the traveller turns his steps
> He sees the barren wilderness erased
> or dissappearing.

কিন্তু কবির মনে এতে কোনো উল্লাস নেই :

> I grieve when on the darker side
> Of this great change I look : and there behold
> Such outrage done to nature as compels
> The indignant power to justify herself.

কলকাতার আঘাতে, উদীয়মান বহু শহরের প্রতিক্রিয়ায় আমাদেরও গ্রামীণ জীবন-বিন্যাস এ-জাতীয় great change-এর সম্মুখীন হলে অনুরূপ আর্তি আমাদের মধ্যেও উচ্চারিত হত। কিন্তু কলোনির স্বীয় স্বার্থে গ্রামীণ সমাজ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ভিতর দিয়ে রইল অর্ধজীবিত হয়ে। বিকল্পে কোনো মহৎ পরিবর্তন এল না। পূর্ণ আবেগে ইংলণ্ডে ১৮৬৫ সালের অল্পপরিচিত কবি উইলিয়ম কসমো মঙ্কহাউস রেলগাড়ির প্রতীকে রূপান্তরিত ইংলণ্ডের অদম্য আত্মাকে ধরতে চেয়েছিলেন। তাঁর দি নাইট এক্সপ্রেস কবিতাটির ভাবলোকে লাসেক্ষেয়ারের দিনের আশ্চর্য ছবি :

Straight on my silent road
Flanked by no man's abode
No foe I parley with, no friend I greet ,
On like a bolt I fly
Under the starry sky,
Scorning the current of the sluggish street.

বলা বাহুল্য, ওয়ার্ডসওয়ার্থ-এর বেদনা এবং মঙ্কহাউস-এর উল্লাস, এ-দুয়ের কোনোটারই অবকাশ আমাদেব উনবিংশ শতকীয় জীবনে ছিল না। নীল বাঁদরে সোনার বাংলা করলে ছারেখার, কিংবা কলিতে পুষ্পকরথ এনেছে ইংরাজ—এর ক্ষীণ ব্যতিক্রম মাত্র। কাজেই বিহারীলালে যখন নগর-জীবনের ক্লান্তি ধ্বনিত হত তা রমেশ দত্তের নায়কদের নগর-জীবনাকাঙ্ক্ষার মতোই কৃত্রিম। আসলে কলকাতার অভ্যুদয় বৃহৎ বঙ্গ মনোভূমির তীরটুকুকে মাত্র স্পর্শ করেছিল, তীর প্রান্তকে অতিক্রম করে জাতীয় জীবনের অন্তঃপুরে সে ঢেউয়ের প্রসাদ বিশেষ কেউ বয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হননি। শনিবারে শনিবারে গৃহ প্রত্যাগত কেরানীর মতো সে হয়তো থেকে থেকে বিলিয়েছে কিছু প্রসাধন, কিছু নিরাময় —তা নইলে রয়ে গেছে যেমন দূরে তেমন দূরে।

•• তিন ••

স্বভাবতই ব্রিটিশ পুঁজির এই নিরাপদ প্রয়োগ-ক্ষেত্রে ভালো করে কিছু গড়ে উঠল না, ভালো করে কিছু ভেঙেও গেল না। সেই অষ্টাবক্র অসম্পূর্ণতার মাঝখানে বাস্তব জীবনাগ্রহও সম্যক্ এবং সম্পূর্ণ হতে পারে না। সে অসম্পূর্ণতার দায়ভাগ আমাদের উপন্যাসের জন্মলগ্ন থেকেই বহন করতে হচ্ছে। বিমূঢ় বৃহৎ বাংলাকে

বাদ দিলে উনিশের শতকের কলকাতার মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের সমস্ত প্রয়াস ছিল জীবনের norm বা স্থিরাদর্শ সন্ধানের প্রয়াস। যাকে আমরা উনিশের শতকের সংস্কারান্দোলন বলি তার মূলে অবশ্যই উক্ত স্থিরাদর্শ সন্ধানের প্রেরণা। তীব্র জীবনাগ্রহ থেকেই জীবনকে সমৃদ্ধ করার বাসনার জন্ম। সংস্কারান্দোলন, ধর্মান্দোলন অথবা নবজাগরণ সকল ইতিহাসেরই পশ্চাৎপটে এই জীবনাগ্রহ। সমাজের নতুন শ্রেণীর অবলম্বনে এ জীবনাগ্রহ বাস্তবায়িত হয়। কলকাতাকে আশ্রয় করে বাংলার মধ্যবিত্ত মানসেও এই জীবনাগ্রহ অঙ্কুরিত এবং সঞ্জীবিত হল বটে কিন্তু এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীব অসম্পূর্ণতায় এই জীবনাগ্রহেরও অসম্পূর্ণতা অনুভূত হল।

কালান্তরের প্রতিক্রিয়ায় নতুন কালকে চেনার পূর্ণ প্রয়াস সর্বত্র সফল হয়নি। কলকাতাই বড়োলোক শ্রেণীর বিলাস বিকারের প্রগল্ভ জীবনাচার আর গ্রামীণ পণ্ডিত মণ্ডলীর বিপর্যয়ের দ্বন্দ্ব অবশ্যই কলকাতার নব-জাগ্রত মধ্যবিত্ত মনের অগ্রণী অংশে অনুভূত হয়েছে। এ শতাব্দীর প্রথমার্ধেব সফল সংস্কার প্রয়াসের মূলে এই দ্বন্দ্ব থেকেই উত্তরণের অভীপ্সা সে কথা আমরা পূর্বে বলেছি। কিন্তু সে অভীপ্সাও সীমিত হতে বাধ্য হয়েছিল উপলব্ধির অসঙ্গতিতে। তাই যদিও সমাচার দর্পণের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে ইংরাজি শিক্ষার নতুন বিস্তারের কাহিনী, জনতার সামনে বালকদিগের ইংরাজি বিদ্যার পারদর্শিতা প্রদর্শনের বিবরণ, ছড়িয়ে রয়েছে পত্র-লেখকদের গল্পের আকারে লেখা পত্রে বিচিত্র যত খবরের রসালো বিষয়, রয়েছে নতুন কলকাতাব সবতোমুখী প্রচেষ্টার কথা— তবু বোঝা যায় যে এ-সমস্তই বাহ্য। একটি কি দুটি আত্মীয় সভার মতো প্রতিষ্ঠান বা ইয়ং বেঙ্গলের মতো জলন্ত উগ্রতা জাতীয় জীবনের সমগ্র প্রেক্ষাপটে কতটুকু? কতটুকু উক্ত ইংরাজি শিক্ষা বিস্তারের আয়োজন? শিষ্যবিত্তজীবীদের পাদোদক পদধূলির প্লাবনে এবং ঝড়ে প্রাচীন বিদ্যাব যখন লুপ্তি ঘটতে চলেছে সে সময় রামমোহনের একক মনীষা এবং আত্মীয় সভার গুরুতর ভূমিকার কথা অবশ্যই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। কিন্তু যে অসঙ্গতির দায়ভার আমাদের কলোনির বিপাকে সদাসততই বহন করতে হয় রামমোহনের ক্ষেত্রেও তা দুলক্ষ্য নয়। কালান্তরের অসম্পূর্ণতায় জাত আমাদের তৎকালীন জীবনের অসঙ্গতি রামমোহনের চোখে ধরা পড়েছিল :

> যে ব্যক্তি স্বয়ং এবং পিতা ও পিতামহ তিন পুরুষ ক্রমশ ম্লেচ্ছের দাসত্ব করে, সে যদি দ্বিতীয় ব্যক্তি যে নিজে ম্লেচ্ছের চাকরি করিয়াছে তাহাকে

স্বধর্মচ্যুত ও ত্যজ্য কহে, তবে তাহাকে কি কহি ? যদি এক ব্যক্তি যবনের কৃত মিসি প্রায় নিত্য দন্তে ঘর্ষণ করে ও যবনের চোঁয়ানো গোলাব ও আতর এ সকল জলীয় দ্রব্য সর্বদা আহারাদিকালে ও অন্য সময়ে শরীরে ম্রক্ষণ করে কিন্তু অন্যকে কহে যে তুমি যবন স্পর্শ করিয়া থাক অতএব তুমি স্বধর্ম-চ্যুত, ত্যজ্য হও, এরূপ বক্তাকে কি কহা যায় ? এক ব্যক্তি নিজে যবন ও ম্লেচ্ছের নিকটে যাবনিক বিদ্যার অভ্যাস করে ও মনুমহাভারতাদির বচনকে সমাচার-চন্দ্রিকা ও সমাচার-দর্পণে ছাপা করায়—যাহা সে ব্যক্তির জ্ঞাতসারে অনেক ম্লেচ্ছে লইয়া থাকে, কিন্তু অন্যকে কহে যে তুমি যবন শাস্ত্র পড়িয়াছ ও শাস্ত্রের অর্থকে ছাপা করিয়াছ , সুতরাং স্বধর্মচ্যুত, ত্যজ্য হও, তবে তাহাকে কি শব্দে কহিতে পারি ?

স্বভাবতই জীবনের জট-পাকানো সূত্রগুলির চেহারা যে রামমোহনের কাছে স্পষ্ট হয়েছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই । কিন্তু রামমোহনের উপলব্ধি—যা সে যুগের পরিপ্রেক্ষিতে নিশ্চয়ই অনন্যসাধারণ—একটা সীমায় এসে থমকে গিয়েছিল। 'শাস্ত্রের অর্থকে ছাপা করানোর' মধ্যে স্বীয়-আসনচ্যুত দেশীয় পণ্ডিতদের পৃষ্ঠ-পোষকহীন জীবনের যে অসহায়ত্ব, তার ঐতিহাসিক কারণাবলীব অনুসন্ধান রাম-মোহন করেননি। শাস্ত্রার্থকে মুদ্রা যন্ত্রের মাধ্যমে বিতরণ করার মধ্যে যে অনিবার্যতা তার মূল নির্ণয়ে বামমোহনের অক্ষমতাই প্রতিফলিত হয়েছে অন্যত্র নীলকর সাহেবদের চবিত্র নির্ণয়ের অক্ষমতায । নীলকরেরা গ্রামীণ জীবনাচবণের পরিবর্তন আনছে—রামমোহনের এই বিপাকগ্রস্ত সিদ্ধান্তে সেই চেতনার সীমারেখাই চিহ্নিত হয়ে রয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে বাংলা দেশে এই নতুন সম্পর্কের আসল চেহারাটা ১৮২৭ সালের ১৫ই ডিসেম্বরে সমাচার দর্পণ থেকে অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণভাবে বোঝা যায়। "১৭৯২ সাল ও ১৮২২ সালের বাঙ্গালার ও ইংলণ্ডের আমদানি রপ্তানি দ্রব্যের এক হিসাব পাওয়া গিয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্য কি প্রকার বৃদ্ধি পাইযাছে । এদেশ হইতে রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে নীল প্রধান রূপে গণ্য তাহা ১৭৯২ সালে ৭২৬৬ মন মাত্র এখান হইতে ইংলণ্ডে রপ্তানি হয়, এবং বর্তমান বৎসরে যে নীল রপ্তানি হইবে তাহা প্রায় এক লক্ষ মনের অধিক হইবে কিন্তু অন্যপক্ষে বস্ত্রের বিষয়ে রপ্তানির অতি স্বল্পতা হইয়াছে যেহেতুক ১৭৯২ সালে এদেশ হইতে বার লক্ষ বাইশ হাজার থান কাপড ইংলণ্ডে যায় এবং তৎপরে এই বাণিজ্য এমন পতিত হয় যে ১৮২২ সালে কেবল এক

লক্ষ থান কাপড় এদেশ হইতে রপ্তানি হয়। ইহাতে দেখা যায় যে ইহার ত্রিশ বৎসর পুর্বে যত রপ্তানি হইত তাহার বার ভাগের এক ভাগ এক্ষণে রপ্তানি হয়। পুনশ্চ যদি আমরা আমদানির দিকে দৃষ্টি করি তবে দেখিতে পাই যে বাণিজ্য বিষয়ে এমত বৃদ্ধির তুলনা নাই, যেহেতুক ১৭৯২ সালে এতদ্দেশে ১৬৫০ টাকার বিলাতী কাপড় আমদানি হয়। এবং ১৮২২ সালে এক কোটি চৌদ্দ লক্ষ টাকার কাপড এদেশে আমদানি হয়। এই উভয় একত্র করিলে দেখা যায় যে এদেশের এমত রপ্তানির ন্যূন হইয়াছে যে বার ভাগের এক ভাগ মাত্র অবশিষ্ট আছে এবং আমদানির অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই আমদানির বৃদ্ধি হওয়াতে যে তাঁতিদের ব্যবসায় একেবারে লুপ্ত হইল ইহাতে কিছু সন্দেহ নাই। ১৭৯২ সালে তের লক্ষ টাকার তাম্র এদেশে আমদানি হয় এবং ১৮২২ সালে একেবারে ত্রিশ লক্ষ টাকার তাম্র আইসে। পাতিলোহার আমদানির অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। ঘড়ি ও রূপ্যময় বাসনের আমদানিরও অতিশয় বৃদ্ধি হইয়াছে ১৭৯২ সালে পঞ্চাশ হাজার টাকার এই সকল দ্রব্য আমদানি হইয়াছে। পশমী কাপড়েরও আমদানি বাড়িয়াছে। ১৭৯২ সালে এগার লক্ষ টাকার কাপড় আসিয়াছিল পরে ১৮২২ সালে পঁয়তাল্লিশ লক্ষ টাকার পশমী কাপড়ের আমদানি হয়।”

আদান-প্রদানের এই নিবিড় সম্পর্কের ভিতরেই সেই প্রয়োজনীয় সূত্রটি নিহিত রয়েছে যা দিয়ে সমকালীন ইংলণ্ড ও বাংলা দেশের অনেক কিছু বোঝার পথ পরিষ্কার হয়। স্ফীত-বাণিজ্য ইংলণ্ডের শিল্প-রূপান্তরের প্রেরণা কোথায় এবং কী থেকে, ইংলণ্ডের সেই surface respectabilityর যুগের চিন্তা-জট, উপন্যাসের সীমিত কল্পনা, দর্শনে-অর্থনীতিতে থিসিস অ্যান্টিথিসিসের কাটাকুটি খেলা প্রভৃতির অর্থনৈতিক-ঐতিহাসিক কারণ সূত্র কোথায় এও যেমন এই বিবরণী থেকে স্পষ্ট হয়, তেমনি ভারতবর্ষের তথা বাংলা দেশের বুদ্ধিজীবীরা দেশীয় জীবনের তৎকালীন প্রেক্ষাপটকে উপলব্ধি কতটা করেননি তাও এর মধ্যে প্রকট। বঙ্কিমচন্দ্র এ অবস্থাতেও protection-এর নীতিকে মহাভ্রমাত্মক বলে আখ্যা দিয়েছিলেন সে কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

লক্ষ লক্ষ টাকা নীলের বহির্বাণিজ্য যেমন ভারতবাসীর কোনো কাজে লাগেনি ঠিক তেমনিই নবাগত ইংরাজি শিক্ষাও সাধারণ দেশবাসীর জীবনে কোনো রূপান্তরের প্রসাদ আনেনি। শুধু তাই নয় ১৮৩০ সালের মধ্যেই ইংরাজি শিক্ষা সীমিতকরণের বিচিত্র প্রস্তাবের গূঢ়ার্থ টুকুও লক্ষণীয় :

সমাচার চন্দ্রিকা থেকে নিচের অংশটুকু দেওয়া হচ্ছে—

> ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সন্তানেরা ইঙ্গরাজি বিদ্যাভ্যাস করিলে উপকার লেশও নাই যেহেতুক তাহারা উভয় বিদ্যায় পারগ হইলে যজন যাজন অধ্যয়ন অধ্যাপন দান প্রতিগ্রহ এই ষট্‌কর্মে তুচ্ছত্ব পরিগ্রহ করিয়া বিষয় কর্মে রুচি করিবেন কিন্তু তাহারো অপ্রাপ্তি কেননা হিন্দু কালেজাদি নানা পাঠশালা দ্বারা অনেক বিষয়ী লোকের সন্তানেরা ইঙ্গরাজি বিদ্যায় পারগ হইয়াছে হইতেছে ও হইবেক। ইহারা কেহ দেওয়ানের পুত্র কেহ কেরানীর ভাই কেহ খাজাঞ্চির ভ্রাতৃপুত্র কেহ গুদাম সরকারের পৌত্র কেহ নীলামের সেল সরকারের সম্বন্ধী ইত্যাদি প্রায় বিষয়ী লোকের আত্মীয় তাহারদিগকে কর্মে উক্ত ব্যক্তিরা অবশ্যই নিযুক্ত করিয়া দিবেন এবং এই প্রথমত কর্ম হইয়া থাকে যদ্যপি কোনো মুৎসুদ্দির গুরু বা পুরোহিতের পুত্র গিয়া কহেন যে আমাকে এক কর্মে নিযুক্ত করুন সেই মুৎসুদ্দি তাহাকে কর্ম করিয়া দেওয়া দূরে থাকুক বরঞ্চ এমত কহিবেন তুমি অশুভক্ষণে জন্মিয়াছ এমন লোকের সন্তান হইয়া চাকরি করিতে চাহ।

অথচ এরই উল্টোপিঠে আদালতে পারসী ভাষার পরিবর্তে ইংরাজি প্রচলনের জন্য যে ধরনের অপূর্ব যুক্তি সরবরাহ করা হয়েছে তার উপভোগ্যতাও কম নয়। আদালতের বিচার কার্যাদিতে ইংরাজির প্রচলনের পর থেকেই মোকদ্দমা ব্যবসায়ের সূত্রপাত এবং তাকে অবলম্বন করেই আদালতাশ্রয়ী বাবুশ্রেণীর উদ্ভব। নিম্নোদ্ধৃত অংশে যে কারণে পারসী বিদায়ের প্রস্তাবনা করা হয়েছে তার অসঙ্গতিও লক্ষ্য করার মতো। যে সংখ্যার জোরে দেশকে ইংরাজি শিক্ষিত বলে ভেবে নেওয়া হচ্ছে তার ক্ষুদ্র চেহারা যে শুধু হাস্যকর তাই নয়—কলকাতাকেই দেশ ভেবে নেওয়ার প্রবণতাও অনুধাবনযোগ্য।

> পূর্বে তাহার (আদালতে ইংরাজি ভাষা প্রচলনের) এই প্রতিবন্ধক ছিল যে বাঙ্গালী লোকেরা ইংরাজি বুঝিতে পারিত না এবং লিখিতেও পারিত না কিন্তু এক্ষণে সে বাধা ঘুচিয়া গিয়াছে যেহেতুক আমরা দেখিতেছি যে কলিকাতায় কালেজে চারিশত বালক ইংরাজি শিখিতেছে এতদ্ভিন্ন কলিকাতার মধ্যে অন্য অন্য ইস্কুলে যত বালক ইংরাজি পড়ে তাহাদের সংখ্যা এক করিলে এক হাজারের ন্যূন হইবে না এবং তাহারা এমত ইংরাজি শিক্ষা করিতেছে যে আদালতের মধ্যে সওয়াল জবাব করিতে তাহাদের আটক হয় না।

এই বিপাকের ফলে—আত্মীয় সভার পুস্তক প্রকাশন, ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্য, তত্ত্ববোধিনীর মননজাত ফসল এবং রামমোহনের-বিদ্যাসাগরের দৃঢ়চিত্ত লক্ষ্য-পরতার যথার্থ ঐতিহাসিক মূল্য শোধ করেও বলা চলে এর কোনো কিছুই জাতীয় ভাববিপ্লবের স্তরে উন্নীত হতে পারেনি। সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সঙ্গে বিচারে রামমোহনের জয়লাভে কলকাতায় দারুণ আলোডন সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু কলকাতার মুষ্টিমেয় তাৎকালিক বুদ্ধিবাদীর ভাবরাজ্যের বাইরে সে আলোডনের মূল্য কতটুকু ? অ্যাডাম সাহেবের ইউনিটেরিয়ান সোসাইটির সঙ্গে রামমোহনের সাময়িক সম্পর্কের চেয়ে তার জোর কোন্ অংশে বেশি সে সময়ের কলকাতার জীবনাচরণের দিকে তাকালে এ প্রশ্ন স্বভাবতই মনে জাগে। হয়তো সমস্ত সামাজিক সংস্কার হিন্দু কলেজ আর সংস্কৃত কলেজের মধ্যবর্তী রেলিং-ভেদ আব প্রাচীর-ভেদের লুপ্তি ঘটাতে চেয়ে নকলবুঁদিগড ধ্বংসের তৃপ্তি অনুভব করেছিল। চেয়ে দেখেনি সাবা দেশের ছুত-অচ্ছুতের সমস্যাকে। তাই সব বিপ্লবেরই নমুনা দেওয়া চললেও সত্যিকাবের বিপ্লব কোথাও ঘটেনি। আমাদের যুক্তি-আদর্শ ধর্ম-বিপ্লব সবই আমদানি কবা কথা মাত্র। পরে 'ভারতী' পত্রিকার সময়ে ঐ পত্রে যখন ভারতবর্ষে বিধবা বিবাহেব তালিকা প্রকাশিত হয় তখন্ সে তালিকার সংক্ষিপ্ততাতেই এ কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে বিদ্যাসাগর মহাশয় এ ব্যাপাবে জাতীয জনচিত্তের গভীরে কোনোও তরঙ্গ সৃজন করতেই পারেননি। বস্তুতপক্ষে কালবৈগুণ্যে তখন আমাদেব নিজস্ব প্রাচীন জীবন-বিন্যাস হতে বসেছিল শতখান্, আর দু-একজন শক্তিশালী কৃষকের মানবর্জমিন চাষের অসামান্য প্রয়াস সত্ত্বেও নতুন কালের ফসল আমরা ঘবে তুলতে পারিনি। সমাজ-সংস্কারের ন্যায্য চেষ্টায় ভুলতে বসলাম গ্রামীণ জীবনের একদা ঐশ্বর্যবান অতীত, ভুলতে বসলাম তার আসন্ন বিপর্যয়কে।

অথচ যে ইংলণ্ডীয় বিদ্যার জন্য উনিশ শতকের প্রথম পাদে এতদ্দেশীয় বালক-দিগের মধ্যে আগ্রহাতিশয্য দেখা দিয়েছিল সে ইংলণ্ডেব তখনকার সমগ্র চেহাবাও যদি আমাদের চিন্তানায়কদেব চোখে পডত তাহলে সমগ্র ইংলণ্ডই জিজ্ঞাসা-চিহ্নের আকারে ফুটে উঠত আমাদের সামনে। ১৮৫০ সাল পর্যন্ত, অগ্নিগর্ভ চার্টিস্ট আন্দোলনের প্রাবল্যে খণ্ডযুদ্ধে ও রুটি অথবা রক্তেব ধ্বনিতে আইনের অস্তিত্বকে পর্যন্ত চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল। দাঙ্গা-হাঙ্গামায় সংক্ষুব্ধ সেই ইংলণ্ডের গোটা রূপকে জানলে যে জিজ্ঞাসার জন্ম সম্ভব হত অ্যাডাম সাহেবের ইউনিটেরিয়ান কমিটির অধ্যাত্ম জিজ্ঞাসায় সে সামগ্রিকতা সম্ভব ছিল না।

আমরা যখন শূদ্রকে বেদাধিকার দানের জন্য সংগ্রাম করেছি রীতিমতো নিষ্ঠার সঙ্গে—শূদ্ররা তখন চিবস্থায়ী বন্দোবস্ত ও নীলের দাদনের নাগপাশে রুদ্ধশ্বাস। আমরা যখন কলকাতার স্বল্পপরিসর আলোকোজ্জ্বল জীবনে গুটি কয়েক বিদ্যোৎসাহী সাহেবের সঙ্গে মিলিত হয়ে শিক্ষা-সংস্কারের খসড়া রচনা করছি তখনই অগ্নিগর্ভ গ্রাম বাংলায় নীলকর সাহেবদের সঙ্গে প্রকাশ্য সংঘর্ষে রত হয়েছে বাংলাব চাষীরা। 'নীল দর্পণ ছাড়া কোনো বাংলা উপন্যাসে নীল চাষাদের সাক্ষাৎ মিলল না। সিপাহী বিদ্রোহের কামান গর্জনও থেকে গেল অশ্রুত। সমকালের প্রধান ঘটনাগুলি সম্বন্ধে বাংলা উপন্যাসের জন্মলগ্নে এই কিম্ভূত-কিমাকার অনাগ্রহ লক্ষণীয়। আমরা গভীর ভাবে গ্রামীণ সমাজের বিপর্যয়-মুখী কাঠামোর প্রাচীন বনিয়াদকে বুঝতে চেষ্টা করলাম না—ভুল বিদেশকে অনুবাদ করতে চাইলাম সভা-সমিতির প্রস্তাবে।

•• চার ••

ফলে আমাদের যে জীবন-তৃষ্ণার জন্ম উনবিংশ শতকে সম্ভব হয়েছিল তাব সঙ্গে অষ্টাদশ শতকের ইংলণ্ডেব নবজাত জীবনাগ্রহের আপাত সাদৃশ্য থাকলেও বস্তুত কোনো মিল নেই। সে যুগেব ইংলণ্ডেব নবোদিত সাধারণ মানুষ জীবনের সমগ্র ব্যাপারে যে অসাম কৌতূহলের পরিচয় দিয়েছিল সে কৌতূহলেব চিহ্ন আমাদের জীবনে তেমন স্পষ্ট ছিল না। চাকরানীর জীবনই হোক আর সমুদ্রবেষ্টিত নিজন দ্বীপ কিংবা শ্বেতিতিমিব হিংস্রতাই হোক—শ্লীল অশ্লীল, তুচ্ছ মহৎ, ক্ষুদ্র বৃহৎ, জীবনের সকল কিছু সম্বন্ধে একটা স্বাস্থ্যকব ক্ষুধা এ যুগেব ইংলণ্ডীয় জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বাংলা দেশের উনবিংশ শতকে উনবিংশ শতকের ইংলণ্ডের সাংস্কৃতিক সংকটের ছায়াই প্রতিফলিত হয়েছে—ইংলণ্ডেরই উনবিংশ শতাব্দী যেখানে অষ্টাদশ শতাব্দীর সে বীযবত্তা হাবিয়ে ফেলেছিল তখন ইংলণ্ড-চোঁযানো সেই জীবনীশক্তি বাংলা দেশে আর কী নতুন ফসল ফলাবে ?

সুতরাং পিকারেস্ক উপন্যাসেব outcast-দের ধাবা বহন করে জীবনেব অতি সামান্য ভগ্নাংশ সম্বন্ধেও অশেষ কৌতূহলী বাংলা উপন্যাস সৃজিত হল না। একটি মাত্র বিষয়ে আমাদের আগ্রহ ছিল, ইংরাজি নীতিশিক্ষার পাঠশালায় পড়া সং-মানুষের মডেল হবার আগ্রহ। জীবনের বিচিত্র ভূমিতে পর্যটন করা বিশেষ আমাদের অদৃষ্টে সম্ভব হয়নি, বহু অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ বর্ণময়তায় আমরা উজ্জ্বল হতে

পারিনি। রামমোহন-বিদ্যাসাগরের অগ্নি-বলয় থেকে জাত দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের ন্যায় অসমসাহসী কর্মীর অভিজ্ঞতা বা জীবন-দৃষ্টি আমাদের কল্পনাকে স্পর্শ করেনি। আমাদের প্রথম উপন্যাস আলালের ঘরের দুলাল একটি গোটা উপন্যাসের সকল প্রতিশ্রুতি পালন করলেও অভিজ্ঞতার সীমাবদ্ধ প্রয়োগে সীমিত শিল্পকর্মই থেকে গেল।

তথাপি যেহেতু আলালের ঘরের দুলাল আমাদের প্রথম উপন্যাস সে কারণে আলালের ঘরের দুলালের সপ্রসঙ্গ আলোচনা হওয়া বাঞ্ছনীয়। এখন চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের আবিষ্কারের পর ফুলমণি এবং করুণার কথা আলালের ঘরের দুলালের প্রসঙ্গে অবশ্যই উত্থাপিত হবে। এবং আমাদের বিবেচনায় শুধুমাত্র সাল-তারিখের বিচারেই প্রথম উপন্যাসের মর্যাদা বিতরণ সীমাবদ্ধ না রেখে উভয় রচনাব তাৎপযের তুলনামূলক বিচার হওয়া প্রয়োজন। এই তাৎপর্য নির্ণয়েই প্রথম সার্থক উপন্যাসেব মযাদা স্থিরীকৃত হবে।
কোনো জাতির সাহিত্যের ইতিহাসে প্রথম উপন্যাস তাকেই বলা চলে যে প্রথম রচনা জাতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির বিশিষ্ট পযায়েব সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত। শুধু প্রথমত্বই তার একমাত্র গুণ নয়। বাস্তব পক্ষে উপন্যাস ব্যাপাবটির সঙ্গে সভ্যতার ও সংস্কৃতিব চলিষ্ণু ইতিহাসের ঘনিষ্ঠ যোগ একটা আবশ্যিক ঘটনা। পরীর গল্প উপন্যাস নয়, বাস্তব জীবনের মর্মমূলের সঙ্গে তার যোগ নেই বলে। তেমনি যদি কোনো গদ্য-গ্রন্থের সন্ধান ফেলে যে বচনায় জাতীয় ভাবাকাশের সাক্ষাৎ ক্ষণেকের জন্যেও মেলে না তাকে আর যাই হোক জাতীয় উপন্যাসের তালিকায় প্রথম স্থান দেওয়া চলে না।
আমরা আগেই বলেছি, এবং পরে বিস্তারিত ভাবেই বলব যে আলালের ঘরের দুলালে প্রচুর সীমাবদ্ধতা। সে সীমাবদ্ধতার মূলেও রয়েছে ঊনবিংশ শতকের স্বদেশের সমাজ ইতিহাসের অষ্টাবক্র অসম্পূর্ণতা। তথাপি সে মূলশায়ী অসঙ্গতি সবার্থেই জাতীয় অসঙ্গতি। পববর্তী স্মরণীয় প্রতিভাধর উপন্যাসেও সে অসঙ্গতির পরোক্ষ-প্রত্যক্ষ নানা প্রকাশ ঘটেছে। কিন্তু এ-কথা সদাই স্বীকার্য যে মূল-লগ্ন সেই দুর্বল মৃত্তিকার সবটাই দেশজ মৃত্তিকা। ফুলমণি এবং করুণাব বিরুদ্ধে আমাদের প্রধান অভিযোগ মূলত এইখানে। একে বড়ো জোর একটা গদ্যকাহিনী বলা যায় হয়তো, এর বেশি কিছু নয়। যে-মৃত্তিকা এর উৎসমূলে তার সঙ্গে ডোম আন্তোনিয়-জেন্ট্ দিগের সহিত কথোপকথনের মিল আছে—উপন্যাসের আকাশ

নানা পরিচয় দিয়েছেন সেগুলিকে পরীক্ষা করা যাক। লেখিকা করুণার মতি পরিবর্তনকে মনে করেছেন ঈশ্বরের দয়া। সে দয়ার সূত্র অবশ্যই মেমসাহেব স্বয়ং। করুণার যথাবিহিত খ্রীষ্ট ধর্মাচরণের ফলে, নিয়মিত গির্জা-গমনের ফলে সে যখন স্বামীসোহাগের অধিকারিণী হল তখন অবহেলায় মৃত জ্যেষ্ঠ পুত্রের কথা তার প্রায়ই মনে পড়ত। পুস্তকের শেষাংশে লেখিকা করুণার কথা বর্ণনা করেছেন

'করুণা শেষে সত্য খ্রীষ্টিয়ান হইল, কিন্তু সে ধর্মেতে কখন প্রফুল্লিতা হইতে পারিল না। কেননা তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের মৃত্যু অনেকবার মনে পড়িত '

চিত্তরঞ্জনবাবু এর ব্যাখ্যায় বলেছেন .

'লেখিকা এখানে তাঁর উদ্দেশ্য ভুলে গেছেন , তিনি যে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারক সে কথা মনে থাকলে কখনো লিখতে পারতেন না যে, ধর্ম করুণাকে শান্তি দিতে পারেনি। শ্রীমতী ম্যালেন্সের প্রচারক সত্তা তাঁর শিল্পী-সত্তার নিকট পরাজিত হয়েছে। করুণা মা এটাই তার সবচেয়ে বড় পরিচয়। তাই ধর্মের উপদেশ সন্তান হারাবার বেদনা ভুলাতে পারেনি।'

দুঃখের বিষয় এর কোনো কথাই সত্য নয়। প্রথমত খ্রীষ্টধর্ম বৈষ্ণব ধর্ম নয়। হরি নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে পাপস্খালনের কথা খ্রীষ্টধর্মে নেই। বরঞ্চ আদি পাপের স্মৃতি সেখানে একটা ভূমিকা অধিকার করে রয়েছে বলেই অনুশোচনার স্থান সেখানে বিদ্যমান। 'প্রায়শ্চিত্ত বিনা ঈশ্বর একটি পাপও ক্ষমা করেন না' — এই হল বাইবেলীয় বিশ্বাস। শ্রীমতী ম্যালেন্সও সেই বিশ্বাসেরই বশবর্তী হয়েছেন। এখানে প্রচারক-সত্তা এবং শিল্পী-সত্তার প্রসঙ্গ এই কারণে নিরর্থক। দ্বিতীয়ত, যদি দেখা যেত করুণার পুত্রের অপমৃত্যুর বেদনা তাকে ধর্মাচরণের মাঝেও অশান্ত করে তুলেছে তবে চিত্তরঞ্জনবাবুর বক্তব্যের কথঞ্চিৎ সার্থকতা পাওয়া যেত। যেটুকু চিত্তরঞ্জনবাবু উদ্ধৃতি হিসাবে ব্যবহার করেছেন তার পরের কথাগুলি হল "এমত সময়ে সে কেবল প্রভুর বাক্য পাঠ করিয়া সান্ত্বনা লাভ করিত।" সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে ধর্ম-নির্দেশ নিরপেক্ষ যে বেদনার কথা চিত্তরঞ্জনবাবু বলেছেন তা একান্তই তার কল্পনা।

চিত্তরঞ্জনবাবু এই পুস্তকে ব্যবহৃত নানা চরিত্রে দ্বন্দ্ব এবং মানসিক সংঘাতাদি দেখতে পেয়েছেন। তিনি এমন কথাও বলেছেন, যে —

'মানসিক দ্বন্দ্বের উপর আলোকপাত করে শ্রীমতী ম্যালেন্স বাংলা সাহিত্যের চরিত্র চিত্রণের ক্ষেত্রে প্রথম আলোকপাত করেছেন।'

অথবা

'আধুনিক উপন্যাসে ঘটনার পৃথক কোন মূল্য নাই, মনে কি দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছে তা দিয়েই ঘটনার মূল্য বিচার করা হয়। শ্রীমতী ম্যালেন্সের উপন্যাসের এই বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট।'

প্যারির খ্রীষ্টান হতে চাওয়া ও স্বামীর বাধাদানের প্রসঙ্গে লেখিকা প্যারির মনোভাব বর্ণনা করেছেন

'আমি একবার মনে করিলাম, যদি ঘরে যাইয়া স্বামীর সাক্ষাতে ঠাকুর পুজা করি, ও সন্তানদিগকে গোপনে খ্রীষ্টের বিষয়ে শিক্ষা দিই তবে আমি তাহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে সন্তানসুদ্ধ খ্রীষ্টান হইতে পারিব।'

এই প্রতারণার ক্ষণিক ইচ্ছা চিত্তরঞ্জনবাবুর মতে দ্বন্দ্ব। অবশ্যই এই তথাকথিত দ্বন্দ্বের পূর্বেই আদর্শ খ্রীষ্টানের মতোই প্যারিকে দিয়ে উচ্চারণ করানো হয়েছে যে:

' কিন্তু তাহাদের বিরহে অদ্যাবধি আমি কখনো খেদ করি নাই কেননা যীশু পরিবার হইতেও ভাল, তিনিই আমার সকল প্রয়োজনীয় দ্রব্য যোগাইয়াছেন।'

সুতরাং এখানেও দ্বন্দ্বের কোনো অবকাশ ছিল না। প্যারির প্রতারণার ইচ্ছা আসলে সেই আদি শয়তানের প্রলোভন, যীশুর কৃপায় এ থেকে মুক্তি ঘটল। চিত্তরঞ্জনবাবু যারে উপন্যাস প্রতিপন্ন করার জন্য ব্যস্ত তাকে বাংলা ভাষায় লিখিত ইংরাজি উপন্যাসও বলা যায় না। ভারতবর্ষের সভ্যতাকে বোঝা এবং ইংরাজি উপন্যাস সাহিত্যের ধারাকে আয়ত্তাধীন করা দুইই লেখিকার ক্ষমতার বাইরে ছিল।

•• পাঁচ ••

পক্ষান্তরে আলালের ঘরের দুলাল একটি যথার্থ উপন্যাসের সকল লক্ষণ অঙ্গীভূত করেই বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে আবির্ভূত হয়েছে। প্যারীচাঁদের সাহিত্য-কীর্তির সমালোচনা বিস্তারিতভাবে আমরা পরে করছি। প্যারীচাঁদের লেখায় বাংলা সাহিত্যে প্রথম যে যে বৈশিষ্ট্যের দেখা পাওয়া গেল বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে সেই বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। বৈশিষ্ট্যগুলি এই—

(ক) উপন্যাসোচিত একটি সমস্যার প্রথম সাক্ষাৎ পাওয়া গেল এই রচনায়।

ঠকচাচী কোনো উপায় না দেখিয়া চুড়িওয়ালী হইয়া ভেটিয়ারি গান 'চুড়িয়ালের চুড়িয়া' গাইতে গাইতে গলি গলি ফিরিতে লাগিল।

লক্ষণীয় যে, পাপেব সাজা পুণ্যেব পরাজয় জাতীয় কোনো মন্তব্য ব্যতীতই প্যারীচাঁদ এই সমাপ্তিবাচন কবেছেন। যে অনাসক্ত জীবন-প্রীতির ফলে উপন্যাস এ যুগেব বিশিষ্ট শিল্পরূপ সেই অনাসক্ত জীবন-প্রীতির প্রথম প্রকাশ আলালের ঘরেব দুলাল।

•• ছয় ••

কিন্তু তথাপি বাংলা দেশের উনবিংশ শতাব্দীতে আধুনিক কালের প্রতিষ্ঠায় যে অসংলগ্নতা যে অসম্পূর্ণতা, সে অসম্পূর্ণতাব দায়ভাব অবশ্যই প্যারীচাঁদকেও বহন করতে হয়েছিল। শিল্পীব প্রয়াস নিজ জীবনবোধের টানেই শিল্পময় হয়ে ওঠে। কিন্তু সে প্রয়াসের বাঁকে বাঁকে তাব স্বাধীন ধাবাকে নিয়ন্ত্রিত করে সভ্যতাব নিজস্ব ছন্দ, কাললগ্নের বিশেষ বিশেষ প্রভাব। আমবা এই আলোচনার প্রথমে জাতীয় প্রেক্ষাপটে কলকাতা নগবীকে স্থাপিত করে তাব স্বরূপ বোঝাব চেষ্টা করেছি। বলেছি যে, ইংলণ্ডে যে-জীবনস্পৃহা থেকে উপন্যাস-সাহিত্যেব জন্ম আমাদের ঔপনিবেশিক জীবনের মিত পরিসবে সে জীবনস্পৃহা ছিল সীমিত। অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংলণ্ডে যে অ্যাভাবেজ মানুষ ছিল সকলের চেয়ে আগ্রহোদ্দীপক বিষয়—ঠিক সেই ধবনেব অ্যাভারেজ মানুষেব সাক্ষাৎ সাধারণ ভাবে এদেশে মেলেনি। নবকালের ফলস্বরূপ যে নতুন মানুষেব উদয় হল উনিশ-শতকের মধ্যভাগে তাদেব কর্মময় জীবনেব পবিসব ছিল গণ্ডিবদ্ধ। সে জীবনেব সমস্যা, সে জীবনের আশা এ সমস্তই ছিল মাঝারি ধবনেব। উপনিবেশেব পাকে বদ্ধ জীবনে মিলের ইউটিলিটি অথবা বেস্থামেব হিতবাদ সবই তত্ত্বানুভূতি—বৃহৎ কর্মময় ভূমিকা ছিল অনুপস্থিত। তাই উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে আমাদের মধ্যবিত্ত জীবনে যেটা সত্যিকাবের বাসনা ছিল তা হল ইংবেজের (উনিশ-শতকীয় ইংরেজ) দেওয়া লেখা পড়া শিখে সৎমানুষ হবার বাসনা। ঐ শতাব্দীর শেষার্ধে ভিক্টোরীয় মেজাজ এই বাসনাকে একটা বিশিষ্ট রূপও হয়তো দিয়েছিল। কিন্তু এই সৎমানুষদের কর্মময় ভবিষ্যৎ কী ছিল? স্বভাবতই তেমন কিছু না। বার্ক আমাদের কাছে তখন ছিলেন উত্তেজনামূলক জনশ্রুতি। কীটসের মৃত্যু অথবা শেলির বিদ্রোহ ছিল আমাদের কাছে কাহিনী মাত্র। আমাদের শান্ত ভদ্রয়ানার সাধনায় রাজার চেয়েও বোধ হয় শৃঙ্খলার দাবিদার ছিলেন ঈশ্বর। স্বভাবতই

অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে ইংরাজ ভদ্রলোকের উদয়ে ইংলণ্ডের ইতিহাস হয়েছিল age of respectability, ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা দেশে আমরা সে ভদ্র-লোকদেরই সন্ধান করেছিলাম। দুঃখের বিষয় যাদের দেখা পেলাম তারা ইংরাজি স্কুলের good boy মাত্র।

ফলে এক ধরনের টাইপ অঙ্কনে বাংলা উপন্যাস যতটা সিদ্ধকাম—নতুন কালের নতুন চরিত্র অঙ্কনে সে-জাতীয় সাফল্যের স্রষ্টা হতে পারেনি। বেণীবাবু এবং বরদাবাবুর চরিত্রে এই সীমায়ন অনেকটা স্পষ্ট। বঙ্কিমের রোমান্সের চরিত্রগুলির বর্ণনাময়তার কথা বাদ দিলে, তাঁর সামাজিক উপন্যাসের নায়কেরা অনেকে, বা রমেশবাবুর সামাজিক-পারিবারিক উপন্যাসের ভদ্রলোক চরিত্রাবলী সকলেই এই সীমায়নের ফলভোগী। ঠকচাচার মতো সার্থক টাইপের সাক্ষাৎ বাংলা সাহিত্যে প্রায়ই মেলে—স্বর্ণলতার জীবন্ত 'ঙ'-র কথা ভিন্ন প্রসঙ্গে স্মরণীয়। আসলে যেমন বলা হয়েছে—ঠকচাচা ভাড়ুদত্তের বংশধর মাত্র। এ চরিত্র রূপায়ণে লেখকের সংসার-চেতনা এবং বাস্তব দৃষ্টির যদিবা সুখ্যাতি করা যায়—কল্পনাশক্তির নয়। প্যারীচাঁদ ঊনবিংশ শতাব্দীর একমাত্র বাঙালী লেখক যিনি আঁকাড়া বাস্তবকে উপন্যাসে উপস্থাপিত করতে পেরেছিলেন। এ ব্যাপারে তাঁর নানামুখী সাফল্যের প্রসঙ্গেই ঠকচাচা এবং বক্রেশ্বরের চরিত্র স্মরণের যোগ্য এবং বলা যায় যে উনিশ-শতকের সহসা-উদ্ভূত নগর-জীবনের অসংগঠিত পরিবেশে ঠকচাচা এবং বক্রেশ্বরের চরিত্র প্রতিনিধিস্থানীয়। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও এ-কথা উপন্যাস আলোচনার ক্ষেত্রে অনস্বীকার্য যে, যে-ব্যক্তির রূপায়ণ উপন্যাস প্রসঙ্গে প্রধান ব্যাপার, টাইপের মাধ্যমে সেই ব্যক্তির সাক্ষাৎ মেলে না। বক্রেশ্বরের হাস্যগর্ভী প্রবঞ্চনা এবং ঠকচাচার অন্তর্নিহিত যন্ত্রণায় প্রভেদ থাকলেও এই উভয় চরিত্রেই নবকালের নেতির দিকটাই অধিক প্রস্ফুট। মূল নায়ক মতিলালেও অনুরূপ ঘটনাই দৃশ্যমান। অবশ্যই নেতি এবং ইতির প্রশ্নই শিল্পীর কাছে একমাত্র মূল্যবান প্রশ্ন নয়। নেতির প্রতিক্রিয়াতেও শিল্পী অনেক সময় জীবনের গূঢ় তাৎপর্যকে উপলব্ধি করেন ও করাতে পারেন যদি জীবনের বোধ-সংক্রান্ত সূত্রগুলিতে কোনো কৃত্রিমতা না থাকে। কিন্তু মতিলালের মধ্যে, ঠকচাচার মধ্যে বা বক্রেশ্বরের মধ্যে জীবনের যে নেতির দিক প্রকাশিত হয়েছে তার মূল্যই বা কতটুকু?

নেতি দৃষ্টি শিল্পে কখনই মাত্র নেতি দৃষ্টির জন্যই মূল্যবান হতে পারে না। কার্টুন রচয়িতাকে যেমন বিষয়ের প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে সচেতন থেকে কার্টুনের অভীপ্সিত

বিকৃতি রচনা করতে হয়—নেতিবাচক চরিত্রকেও শিল্পী তেমনি সাহিত্যে উপস্থাপিত করেন সুস্থ এবং পূর্ণ জীবন সম্বন্ধে নিজে অবহিত থেকে। আলালের ঘবেব দুলালেব ইতিবাচক চরিত্রগুলির মধ্যে প্যাবীচাঁদ মনুষ্যত্ব বলতে কী বুঝতেন সে ধাবণা প্রত্যক্ষভাবে বিদ্যমান। এই চরিত্রগুলির অতি সীমাবদ্ধতাব জন্যই মতিলাল, ঠকচাচা এব' বক্রেশ্ববেব ফাঁকিবাজিব এবং শূন্যমনস্কতাব রূপও পুঁথির পাতাকে বিশেষ অতিক্রম কবতে পাবেনি। ঠকচাচা ছাড়া, মতিলাল এবং বক্রেশ্ববেব যা সা'সাবিক সম্ভাবনা ছিল তা হল বেণী বা ববদাবাবু হযে ওঠা। কিন্তু বেণী বা বরদাবাবুব অতিসীমিত রূপে আমবা এমন কিছু পেলাম না যাব জন্যে মতিলাল এবং বক্রেশ্ববেব ব্যর্থতাকে আমাদেব কাছে জীবন্ত বলে মনে হবে। ফলে উপন্যাসের গঠনগত ভাবসাম্য আহত হয়েছে।

কেননা ববদাবাবুদেব জীবনাচবণে কোনো যন্ত্রণা নেই। নেই কোনো দ্বন্দ্ব। এমন কি এই আদর্শ জীবনাচবণেব কোনো তাৎপযকেও লেখক উপন্যাসেব বস সূত্রে গ্রথিত কবতে পাবেননি। শুধু সদাচাবী এব' সদালাপী চবিত্রেব মডেল হয়ে উঠেছেন ববদাবাবু। বামতনু লাহিড়ী এবং শিবনাথ শাস্ত্রীব মতো ব্যক্তিবৃন্দেব জীবনে ববদাবাবুব আদর্শ কল্পিত হয় না। পরবর্তীকালে শাস্ত্রী মহাশযেব জীবন-কাহিনীতে শুদ্ধতাব জন্য যে জীবনব্যাপী প্রয়াস পবিলক্ষিত হয় তাব একটা ত্রিমাত্রিক রূপ নিঃসন্দেহে বিদ্যমান। কিন্তু ববদাবাবুব চবিত্রে সে ত্রিমাত্রিকতা নেই। শিল্পবোধেব এই ত্রুটি প্যাবীচাঁদেব জীবনবোধেব ত্রুটি থেকেই উৎসাবিত। ববদাবাবুব সদাচারী জীবনেব নিদর্শনকে প্যাবীচাঁদ এই ভাবে একস্থানে উপস্থাপিত কবেছেন

> একজন ভদ্রলোক এক আঘাতিত ব্যক্তিকে ক্রোড়ে কবিয়া বসিয়া আছেন—আঘাতিত ব্যক্তিব মস্তক দিয়া অবিশ্রান্ত রুধিব নির্গত হইতেছে, ঐ বক্তে উক্ত ভদ্রলোকেব বস্ত্র ভাসিয়া যাইতেছে। সাবজন জিজ্ঞাসা কবিল, আপনি কে, ও এ লোকটি কি প্রকাবে জখম হইল। ভদ্রলোক বলিলেন, আমাব নাম ববদাপ্রসাদ বিশ্বাস—আমি এখানে কোনো কর্ম অনুরোধে আসিয়াছিলাম। দৈবাৎ এই লোক আঘাতিত হইয়াছে। এই জন্য আমি আগুলিয়া বসিয়া আছি—শীঘ্র হাঁসপাতালে যাইব তাহাব উদযোগ পাইতেছি। একখানা পালকী আনিতে পাঠাইয়াছিলাম, কিন্তু বেহারারা ইহাকে কোনো মতে লইয়া যাইতে চাহে না, কাবণ এই ব্যক্তি জেতে হাড়ি। সাবজন কহিল—বাবু—বাঙালীবা হাড়িকে স্পর্শ করে

না, বাঙালী হইয়া তোমার এতদূর করা বড়ো সহজ কথা নহে, বোধহয় তুমি বড়ো অসাধারণ ব্যক্তি।

স্বভাবতই বরদাবাবুকে এখানে সংকার্যের জন্য বদ্ধপরিকর সংস্কারমুক্ত উনিশ শতকীয় চরিত্রের প্রতিনিধি রূপেই আমরা পাচ্ছি। কিন্তু উপন্যাসে যে জীবন-বোধের শিল্প-স্পর্শ ঘটলে এ চরিত্র জীবন্ত হয়ে উঠতে পারত তা যে ঘটেনি সেটা যে-কোনো সৌখিন পাঠকের কাছেও স্পষ্ট। এর সঙ্গে গোরা উপন্যাসের প্রায় সমজাতীয় একটি ঘটনাংশ বর্ণনার প্রতিতুলনা করা চলে—

একজন বৃদ্ধ মুসলমান মাথায় এক ঝাঁকা ফল-সবজি আণ্ডা মাখন প্রভৃতি আহার্য সামগ্রী লইয়া কোনো ইংরাজ প্রভুর পাকশালা অভিমুখে চলিতেছিল। চেন পরা বাবুটি তাহাকে গাড়ির সম্মুখ হইতে সরিয়া যাইবার জন্য হাঁকিয়াছিল, বৃদ্ধ শুনিতে না পাওয়াতে গাড়ি প্রায় তাহার ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়ে। কোনো মতে তাহার প্রাণ বাঁচিল কিন্তু ঝাঁকা সমেত জিনিসগুলি রাস্তায় গড়াগড়ি গেল এবং ক্রুদ্ধ বাবু কোচবাক্স হইতে ফিরিয়া তাহাকে ড্যামশুয়ার বলিয়া গালি দিয়া তাহার মুখের উপর সপাং করিয়া চাবুক বসাইয়া দিতে তাহার কপালে রক্তের রেখা দেখা দিল। বৃদ্ধ আল্লা বলিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া যে জিনিসগুলি নষ্ট হয় নাই তাহাই বাছিয়া ঝাঁকায় তুলিতে প্রবৃত্ত হইল। গোরা ফিরিয়া আসিয়া বিকীর্ণ জিনিসগুলা নিজে কুড়াইয়া তাহার ঝাঁকায় উঠাইতে লাগিল। মুসলমান-মুটে ভদ্রলোক-পথিকের এই ব্যবহারে অত্যন্ত সংকুচিত হইয়া কহিল, "আপনি কেন কষ্ট করছেন বাবু—এ আর কোনো কাজে লাগবে না।"

গোরা এ কাজের অনাবশ্যকতা জানিত, এবং সে ইহাও জানিত, যাহার সাহায্য করা হইতেছে সে লজ্জা অনুভব করিতেছে— বস্তুত সাহায্য হিসাবে এরূপ কাজের বিশেষ কোনো মূল্য নাই—কিন্তু এক ভদ্রলোক যাহাকে অন্যায় অপমান করিয়াছে আর এক ভদ্রলোক সেই অপমানিতের সঙ্গে নিজেকে সমান মনে করিয়া ধর্মের ক্ষুব্ধ ব্যবস্থায় সামঞ্জস্য আনিতে চেষ্টা করিতেছে, এ কথা রাস্তার লোকের পক্ষে বোঝা অসম্ভব।

গোরা উপন্যাসে এই ঘটনার তাৎপর্য অনুধাবনযোগ্য। আলালের ঘরের দুলালে বরদাচরণ বিশ্বাসের আচরণে যেখানে ইংরাজি পাঠশালার ইওরোপীয় উদারতাবাদের মাত্র বাস্তবে অনুবাদ, উদ্ধৃত অংশে গোরার আচরণের গূঢ়ার্থ সেখানে তার থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। দুই ঘটনাংশেই দেখা যায় যে শিক্ষিত

উদার-চেতা বাঙালী বাবু দেশবাসীর সংকীর্ণতায় পীড়িত। কিন্তু দুই প্রতিভার তারতম্য স্বীকার করেও একটা প্রশ্ন অক্ষুণ্ন থাকেই, তা হল আলালের ঘরের দুলালের বর্ণিত অংশে জীবিতকল্প সপ্রাণতা নেই, সে-ক্ষেত্রে গোরা উপন্যাসের উদ্ধৃত অংশে বাস্তবিক একটি পীড়িত মানুষের স্পন্দন অনুভব করা যায় কেন? উপন্যাসের রস-সিদ্ধির গূঢ়-কৌশলের মধ্যেই তার উত্তর নিহিত। সভ্যতার যে বিশিষ্ট পর্যায়ের সঙ্গে উপন্যাসের সম্পর্ক প্রত্যক্ষ, সেই বিশিষ্ট পর্যায়ের প্রধান উপাদান বা সূত্রগুলির সাহায্যেই ঔপন্যাসিক গড়ে তোলেন উপন্যাসের শিল্পরূপ। এটাই হল প্রকৃতপক্ষে জীবনকে শিল্প-বিন্যস্ত করা। যেখানে এর ব্যত্যয় ঘটে সেখানে উপন্যাসে আর জীবন জীবনের মতো প্রতীয়মান হবে না। মুসলমান মুটের সংকোচ, গোরার সাহায্যের অনাবশ্যকতা-বোধ এবং সাহায্যের অকিঞ্চিৎকরত্ব সম্বন্ধে লজ্জা, অপর ভদ্রলোকের কৃত অন্যায় অপমানের ফলে অপমানিতের সঙ্গে নিজের একাত্মতা স্থাপনের প্রয়াস—এই সকল কিছুর মধ্যে গোরা অনুভব করেছে বাবু-জীবনের সংকীর্ণ পরিধির সঙ্গে বৃহত্তর দেশ-জীবনের বিচ্ছেদের ঘন যন্ত্রণা। এই যন্ত্রণার রঙে গোরা হয়ে উঠেছে জীবন্ত। বরদা-প্রসাদ বাবুও সমগ্র দেশের জন্য বেদনা অনুভব করেন বটে। কিন্তু সে বেদনার লাঘব সাধনের জন্য তিনি অচিরেই খুঁজে পান সান্ত্বনার কৃত্রিম সূত্রগুলিকে। বেহারারা হাড়ির আহত দেহ বইবে না—আমাদের সমাজ জীবনের রূপ নির্ণয়ে এ ছবি যথার্থ। কিন্তু সার্জেন্টের প্রশংসাপত্রে যে শিক্ষাভিমানের প্রশ্রয়—'বোধহয় তুমি বড়ো অসাধারণ ব্যক্তি', সে সান্ত্বনায় না প্রস্ফুট হয় জীবন, না প্রস্ফুট হয় শিল্প। যে-কোনো পদ্ধতিতেই হোক না কেন গোটা জীবনের প্রতি-ক্রিয়া উপন্যাসের মুখ্য চরিত্রগুলিতে অনুভব করানো ঔপন্যাসিকের একটা কাজ। সে পদ্ধতিতে ত্রুটি থাকলে শিল্পেরও ত্রুটি ঘটে। আলালের ঘরের দুলালের ভদ্রলোক চরিত্রগুলিতে এই মৌল ত্রুটি বিদ্যমান। এখানে তৎকালীন জীবনের বঙ্কিম গতির প্রতিক্রিয়াকে একান্তই ঋজুভাবে প্রতিফলিত করা হয়েছে।

•• সাত ••

কিন্তু ঠকচাচার প্রসঙ্গ পৃথকভাবে আলোচনা না করে আলালের ঘরের দুলালের কথা শেষ করা যায় না। বাংলা সাহিত্যের সমালোচক ঐতি-হাসিক ডাঃ সুকুমার সেন এই মত পোষণ করেন যে, ঠকচাচার দিক থেকে বিচার করলে আলালের ঘরের দুলালকে পিকারেস্ক-জাতীয় নভেলের পর্যায়ে

ফেলতে হয়।) ঠকচাচা পিকারো বা Rogue-এর পর্যায়ে অবশ্যই পড়ে। কিন্তু মাত্র এই কারণেই পিকারেস্ক-উপন্যাসেব প্রয়োজনীয় শর্ত পুরিত হতে পারে না। প্রধানত যে ঐতিহাসিক কাবণ পবম্পবায পিকাবেস্ক নভেলেব নভেলের অব্যবহিত পূর্বপুরুষ হিসাবে আবির্ভাব সেই সামন্ততন্ত্রী সামাজিক কাঠামোর বিপযযেব সমস্ত চাবিত্র্য এদেশে বিদ্যমান ছিল না। কর্নওয়ালিসেব ভূমি-ব্যবস্থাব ফলে সামন্ততান্ত্রিক জীবনধাবাকে কোনোক্রমে জীবিত বাখাব ব্যবস্থাই বব° এদেশে হয়েছিল। ফলে সামন্ততন্ত্রেব বিলয় এব° ধনতন্ত্রেব উদয়েব মহা-সন্ধিক্ষণ এদেশে কখনো পবিস্ফুট হয়নি। পিকাবো-ব সমাজ-উপেক্ষী দুঃসাহসিক কার্যকলাপেব নিদর্শনও সে কাবণেই এদেশে দুলভ। ঠকচাচাব নিরুপায় প্রবঞ্চনাশ্রয়ী জীবনে পিকাবোব দুঃসাহস নেই। কাজেই ব্যঙ্গ দৃষ্টি এব° বঙ্গাত্মক ঘটনাব (Satiric observation and comic episodes) কিছু ব্যবহাব বযেছে বলেই একে পিকাবেস্ক নভেলেব পর্যায় ফেলা যায না। দ্বিতীযত, পিকাবোব চবিত্র ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয—He is not so much a complete individual personality whose actual life experiences are significant in themselves কেননা Picaroব অদৃষ্টে লিখিত সমস্ত দুঃখভোগকেই পিকাবো যেন মন্ত্রে জল কবে দেবাব ক্ষমতা বাখে।* এই চবিত্রে ব্যতিক্রম ছিল বলেই বিখ্যাত সমালোচক আযেন ওয়াট ডিফোব 'মল ফ্লাণ্ডার্স' এব নাযিকাব কাযকলাপে পিকাবো-ব তুলনা পেলেও উক্ত উপন্যাসকে পিকাবেস্ক উপন্যাস বলতে স্বীকৃত হননি। ঠকচাচাব ক্ষেত্রেও ঠকচাচাব বেদনাকে জল কবে দেবাব ক্ষমতাব কোনো পবিচয পাই না। ববঞ্চ ঠকচাচাব স°সাব-বর্ণনায় ঠকচাচা এব° ঠকচাচীব কথোপকথনে যে বেদনাব চিত্র পবিস্ফুট হযেছে তা বীতিমতো চিত্তদ্রাবী। ঠকচাচাব মৃত্যুভয়, ঠকচাচীব চুড়িওযালী হয়ে যাওযা প্রভৃতিতে যে কারুণ্য তা স্পর্শগ্রাহ্য বাস্তবতায রূপান্তবিত হয়ে উঠেছে বলেই ঠকচাচাব ক্রিযাকলাপে Picaro-র ছাযা খুঁজে পেলেও সে শেস পর্যন্ত পিকাবেস্ক নভেলেব নাযক নয। ঠকচাচাব দুঃখী জীবনেব প্রগাঢ় প্রকাশেব জন্যই ঠকচাচা পূর্ণাবয়ব বাস্তব আকৃতি লাভ কবেছে। প্রাথমিক ব্যঙ্গেব দৃষ্টি অচিরেই বিলীন হযেছে অশ্রুর বাষ্পাবেগে।

* Picaro enjoys that charmed immunity from the deeper stings of pain and death Ian Watt

এটা পিকারেস্ক উপন্যাসের লক্ষণ নয়। প্যারীচাঁদ মিত্র ঠকচাচার চরিত্র রূপায়ণে প্রথম দিকে হয়তো কিছুটা ক্যারিকেচারের ভঙ্গি বজায় রেখেছিলেন। ডিকেন্সের ক্যারিকেচারগুলো স্মরণ করলে এ-কথা অবশ্যই স্বীকার্য যে উপন্যাস সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ক্যারিকেচারগুলোও সাদৃশ্য বহনের দিক থেকে প্রয়োজনীয় যাথার্থ্যের দাবি করতে পারে। ঠকচাচা এবং বাহুল্য উনিশ শতকের সামাজিক ডামাডোলের এক কিম্ভূতকিমাকার অবস্থার নিদর্শন। কলকাতা-কেন্দ্রিক নতুন বিচারালয়ের আইন ব্যবসায়গত (বঙ্গদেশের কৃষক প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের কটাক্ষ এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়) জটিল অবস্থার অনিবার্য ফল ঠকচাচা এবং বাহুল্য। বলা যেতে পাবে বাংলা দেশের নতুন কালের আইন-জগন্নাথের এরাই হল পাণ্ডা। বাহুল্যর বেপরোয়া চরিত্রের পটভূমিকায় ঠকচাচার সংসারী মানুষের কারুণ্য ঠকচাচাকে Picaro বা Rogue-এর পর্যায় থেকে পূর্ণ ব্যক্তিত্বে উন্নীত করেছে। ঠকচাচা-বাহুল্য সংবাদের শেষ দৃশ্য সে প্রসঙ্গে অনবদ্য।

এখানে ঠকচাচা ও বাহুল্য জাহাজে চড়িয়া সাগব পার হইয়া চলিয়াছে। দুটিতে মানিকজোড়েব মতো, এক জায়গায় বসে—এক জায়গায় খায়—এক জায়গায় শোয়, সর্বদা পরস্পরেব দুঃখের কথা বলাবলি করে। ঠকচাচা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলে—মোদের নসিব বড়ো বুরা—মোরা একেবারে মেটি হলুম—ফিকির কিছু বেরোয় না, মোর শির থেকে মতলব পেলিয়ে গেছে—মোকান বি গেল—বিবির সাতে বি মোলাকাত হল না—মোর বড়ো ডর তেনা বি পেন্টে সাদি করে।

বাহুল্য বলিল—দোস্ত, ওসব বাত দেল থেকে তফাত করো—দুনিয়াদারি মুসাফিরি—সেরেফ আনা যানা—কোই কিসিকা নেহি—তোমার এক কবিলা, মোর চেট্টে সব জাহান্নমে ডাল দেও, আবি মোদের কি ফিকিরে বেহতর হয় তার তদ্বির দেখ।

বাতাস হু হু বহিতেছে জাহাজ একপেশে হইয়া চলিয়াছে তুফান ভয়ানক হইয়া উঠিল। ঠকচাচা ত্রাসে কম্পিত কলেবর হইয়া বলিতেছে—দোস্ত, মোর বড়ো ডর মালুম হচ্ছে আন্দাজ হয় মোর মৌত নজদিগ।

বাহুল্য বলিল—মোদের মৌতের বাকি কি? মোরা মেমূদো হয়ে আছি। চল মোরা নিচু গিয়ে আল্লামির দেবাচা পড়ি। মোর বেলকুল নোকজাবান আছে যদি ডুবি তো পীরের নাম লিয়ে চেল্লাব।

বাহুল্যর তুলনায় ঠকচাচাকে এখানে অনেক ক্লান্ত বলে মনে হয়। 'যদি ডুবি তো পীরের নাম লিয়ে চেল্লাব' আর 'মোর বড়ো ডর তেনা বি পেন্টে সাদি করে' এই দুই উক্তিব পার্থক্য লক্ষণীয়। সে কারণে ঠকচাচাকে কল্পনাসিদ্ধ চরিত্র না বলা গেলেও, মিকবরের মতো তাতে বলিষ্ঠ কল্পনার আঁচড না দেখা গেলেও, সে যে পূর্ণ-জীবন-প্রমাণ আলেখ্য, ব্যঙ্গচিত্র নয় এ-কথা অনস্বীকার্য।

আলালের ঘরের তুলালের ন্যায় গদ্যময় বাস্তবতার কোনো দ্বিতীয় নিদর্শন গোটা উনবিংশ শতাব্দীব বাংলা সাহিত্যে মেলে না। স্বর্ণলতার ক্ষীণ প্রচেষ্টার কথা বাদ দিলে প্যাবীচাঁদের সৃষ্টিই এ-ক্ষেত্রে একক। এই গদ্যময় বাস্তবতার সীমা বঙ্কিমচন্দ্রেব প্রখর মননে প্রথমেই ধবা পড়েছিল বলে বঙ্কিম স্বতন্ত্র ধারানুবর্তী হযেছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র ও বাংলা উপন্যাসের প্রতিষ্ঠা

ঊনবিংশ শতাব্দীর সর্বাপেক্ষা দুরূহতম বিষয় বঙ্কিম-অধ্যয়ন। সে কারণেই বঙ্কিমচন্দ্রের মনীষা বারে বারে পুঁথিপ্রাণ প্রথা-পন্থী পণ্ডিতবৃন্দকে এবং মননশীল বুদ্ধিজীবীদের আকর্ষণ করে। আনলডীয় প্রথায় সমাজ-সভ্যতার পটে বঙ্কিমকে স্থাপিত করে বিচারের প্রয়াস বা সাহিত্য মূল্যায়নের নাম করে এক ধরনের সরলীকরণের প্রচেষ্টা—বঙ্কিম প্রসঙ্গে এ সমস্তই ঘটেছে। অবশ্য বঙ্কিম কীর্তির বৈশিষ্ট্যের সন্ধানে কিছু না কিছু আনন্দের পুরস্কার বঙ্কিম বরণের শেষে সকলেরই ভাগ্যে সুপ্রাপ্য। তবে, ন্যূনাধিক সকলেই বঙ্কিম-অধ্যয়নের দুরূহতার মূল নির্দেশ করেছেন উনিশ শতকের বাঙালী মানসের আত্ম-প্রতিষ্ঠার কঠিন কর্মে বঙ্কিমচন্দ্রের যুক্তিবাদী ভূমিকা এবং সৃজনশীল শিল্পীস্বাতন্ত্র্যের দ্বৈত লীলায়।

•• এক ••

যদিও বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্প-মহিমার স্বরূপ ব্যাখ্যা আমাদের বর্তমান অধ্যায়ের লক্ষ্যসীমা, তথাপি বঙ্কিমমানসের আধুনিকতার চারিত্র্য নির্ণয়েই যে সেই ব্যাখ্যাকর্মের ভূমিকা, এ-কথা স্বতঃস্বীকার্য। ঔপন্যাসিকের মানসোৎকর্ষের প্রতিফলন ঘটে তাঁর শিল্পকর্মে। শিল্পীর স্বাধীন জীবন-জিজ্ঞাসার নিজস্ব নিয়মে সে মানসোৎকর্ষের ক্রমবিকাশ ঘটলেও দেশকালাধীন চিন্তাসূত্রগুলিকে অনুধাবন না করলে সে মানসোৎকর্ষের সঠিক ঠিকানা মেলে না। ঊনবিংশ শতাব্দীতেই যেহেতু প্রথম আমাদের মনোলোক বিশ্বের চলিষ্ণু জীবনধারার সঙ্গে লগ্ন হবার সুযোগ লাভ করল, সেহেতু বঙ্কিমের দেশকালাধীন ভাব ও

ভাবনার রূপ পরিচয়ে প্রায় বিশ্বপরিচয়ের আনন্দই লভ্য। সে বিচারে রামমোহন এবং বিদ্যাসাগরে নতুন কালের ভাবস্পন্দন অনেক গভীরভাবে অনুভূত হলেও সেকালের ইংলণ্ডীয় শিক্ষার প্রকৃত পরিণাম কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র। রামমোহন এবং বিদ্যাসাগরের মধ্যে যে চাকুরি-বিমুক্ত ঋজুতা বঙ্কিমচন্দ্রে তার অভাব অবশ্যই বিদ্যমান। রামমোহন এবং বিদ্যাসাগর বাবু নন। যে কারণে নন সম্ভবত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যে সে কারণেই বহু বঙ্কিম দুরবগাহ স্রোত। তথাপি বঙ্কিমমানসের উজ্জ্বল এবং শক্তিশালী দর্পণে সমকালীন ইওরোপ এবং ভারতের যুগপৎ ছায়াপাত অনুসন্ধিৎসু পাঠককে জিজ্ঞাসা-চঞ্চল করে তোলে। ইওরোপ বঙ্কিমের কাছে যার অনেকখানিই ছিল সমকালীন ইংলণ্ড—এবং ভারতবর্ষের ঊনবিংশ শতকীয় অবয়বে যে শক্তি এবং দৌর্বল্য, বঙ্কিমের শিল্পে এবং মননে স্বভাবতই তারও ছায়া পড়েছে। পাঠকের প্রেক্ষা-পটের সামনে গোটা বঙ্কিমচন্দ্রকে উপস্থাপিত করা সেকারণেই কঠিন। আমরা অখণ্ড বঙ্কিমমানসকে উপলব্ধির পথে অগ্রসর হবার পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্রের দেশ-দৃষ্টিকে প্রথম সূত্র হিসাবে ব্যবহার করব। পরে এই সূত্রকে অবলম্বন করে তৎকালীন ইংলণ্ড এবং সেই প্রসঙ্গে তাঁর দ্বিধা দ্বন্দ্বের পরিচয় গ্রহণ করব। সমকালীন জীবনের সমস্যা সংক্রান্ত বোধগুলি কথঞ্চিৎ স্পষ্ট হলে তবেই বঙ্কিমের শিল্পকর্মেরও অনন্যতা উপলব্ধি করা যাবে।

এ প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের ২টি প্রবন্ধ বিশেষভাবে ব্যবহার্য বলে আমরা মনে করি। একটি প্রবন্ধ—ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং পরাধীনতা। অপরটি—বঙ্গদেশের কৃষক। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং পরাধীনতা শীর্ষক প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য প্রবন্ধটির সিদ্ধান্তে স্পষ্টভাবে কথিত হয়েছে—

> অনেকে রাগ করিয়া বলিবেন, তবে কি স্বাধীনতা পরাধীনতা তুল্য? তবে পৃথিবীর তাবৎজাতি স্বাধীনতার জন্য প্রাণপণ করে কেন? যাঁহারা এরূপ বলিবেন তাহাদের নিকট আমাদের এই নিবেদন যে, আমরা সে তত্ত্বের মীমাংসায় প্রবৃত্ত নহি। আমরা পরাধীন জাতি—অনেক কাল পরাধীন থাকিব—সে মীমাংসায় আমাদের প্রয়োজন নাই। আমাদের কেবল ইহাই উদ্দেশ্য যে, প্রাচীন ভারতবর্ষের স্বাধীনতার হেতু তথাসিগণ সাধারণত আধুনিক ভারতীয় প্রজাদিগের অপেক্ষা সুখী ছিল কিনা? আমরা এই মীমাংসা করিয়াছি যে, আধুনিক ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় অর্থাৎ উচ্চশ্রেণীস্থ লোকের অবনতি ঘটিয়াছে, শূদ্র অর্থাৎ সাধারণ প্রজার

একটু উন্নতি ঘটিয়াছে।

'অনেক কাল পরাধীন থাকিব'—এ-কথাটি প্রায় তৎকালীন শাসকদের কাছে আশ্বাসবাণী-তুল্য বলে কারো কারো কাছে প্রতীয়মান হতে পারে। 'সে মীমাংসায় আমাদের প্রয়োজন নাই'—এ উক্তিতেও সম্ভবত চাকুরিগত মধ্যবিত্ত মনের অসাহসিকতার অভিব্যক্তি অনেকে খুঁজে পাবেন। কিন্তু এ ধরনের বহিরঙ্গ-বিশ্লেষণে বঙ্কিমমানসের সমগ্র পরিচয় মেলে না। অথচ উদ্ধৃত অংশটি বঙ্কিমচন্দ্রের মানসিকতার সকল বৈশিষ্ট্যের বাহন এ-কথা তখনই বোঝা যায় যখন আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায়-সূত্রটিকে যথার্থ অনুধাবন করতে পারি। 'তদ্বাসিগণ আধুনিক ভারতীয় প্রজাগণ অপেক্ষা সুখী ছিল কিনা'—এই প্রশ্নই বঙ্কিমের কাছে মুখ্য প্রশ্ন। যে সামাজিক উপযোগিতার দৃষ্টিতে বঙ্কিমচন্দ্র জগৎ এবং জীবনের সকল কিছুর বিচার-সন্ধিৎসু ছিলেন, উক্তিটির মধ্যে সেই সামাজিক উপযোগিতাবাদের সাক্ষ্য স্পষ্ট।

বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্য ছিল—'সাধারণ প্রজার একটু উন্নতি ঘটিয়াছে।' একটু উন্নতি greatest good নয়। 'বাবু দ্বারকানাথ মিত্র রামরাজ্যে জজ হইতে পারিতেন না। কিন্তু ইংরেজ রাজত্বে পারেন।' সম্ভবত এই ঘটনাকে স্মরণ করেই বঙ্কিমচন্দ্র 'একটু উন্নতি ঘটিয়াছে' এ-কথা বলেছেন। কেননা greatest good যে ঘটেনি এ সম্বন্ধে বঙ্কিমের নিশ্চিত-দৃঢ়তার প্রমাণ আমরা বঙ্গদেশের কৃষক প্রবন্ধে পেয়ে থাকি। ইংরাজের হাতে স্বেচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক ভারতবর্ষের রূপান্তরকে ইংরাজই যে বাধা প্রদান করেছে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আলোচনায় বঙ্কিম সে-মত দ্বিধাবিমুক্ত লেখনীতেই প্রকাশ করেছেন। এবং সে আলোচনাতেও স্বভাবতই সামাজিক উপযোগিতাবাদের জিজ্ঞাসু ছাত্রেরই সাক্ষাৎ মেলে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আলোচনাকালে আইন শীর্ষক অধ্যায়ে বঙ্গদেশের কৃষক গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন—

> প্রজারাই চিরকালের ভূস্বামী। জমিদারেরা কস্মিনকালে কেহ নহেন—কেবল সরকারী তহশীলদার। কর্নওয়ালিস যথার্থ ভূস্বামীর নিকট হইতে ভূমি কাড়িয়া লইয়া তহশীলদারকে দিলেন। ইহা ভিন্ন প্রজাদিগের আর কোনো লাভ হইল না। ইংরাজ রাজ্যে বঙ্গদেশের কৃষকদিগের এই প্রথম কপাল ভাঙিল। এই "চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত" বঙ্গদেশের অধঃপাতের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত মাত্র। কস্মিনকালে ফিরিবে না। ইংরাজদিগের এ কলঙ্ক চিরস্থায়ী, কেননা এই বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী।

এবং প্রবন্ধের উপসংহারে—

> প্রজাওয়ারি বন্দোবস্ত হইলে, এই দুই-চারিজন অতি ধনবান ব্যক্তির পরিবর্তে আমরা ছয় কোটি সুখী প্রজা দেখিতাম। দেশসুদ্ধ অন্নের কাঙাল আর পাঁচ-সাতজন টাকা খরচ করিয়া ফুরাইতে পারে না, সে ভালো, না—সকলেই সুখস্বচ্ছন্দে আছে, কাহারও নিষ্প্রয়োজনীয় ধন নাই, সে ভালো? দ্বিতীয় অবস্থা যে প্রথমোক্ত অবস্থা হইতে শতগুণে ভালো তাহা বুদ্ধিমানে অস্বীকার করিবেন না।·· কেহ অধিক বড়ো মানুষ না হইয়া জনসাধারণের স্বচ্ছন্দাবস্থা হইলে সকলেই মনুষ্যপ্রকৃত হইত। দেশের উন্নতির সীমা থাকিত না। এখন যে জন পাঁচ-ছয় বাবুতে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের ঘরে বসিয়া মৃদু মৃদু কথা কহেন, তৎপরিবর্তে তখন এই ছয় কোটি প্রজার সমুদ্র-গর্জন-গম্ভীর মহানিনাদ শুনা যাইত।
>
> আমরা দেখাইলাম যে যাঁহারা বিবেচনা করেন যে জমিদার দেশের পক্ষে প্রয়োজনীয় বা উপকারী তাঁহাদের তদ্রূপ বিশ্বাসের কোনো কারণ নাই।*

পূর্বে উদ্ধৃত তিনটি অংশেই দেখা যায় যে বঙ্কিমী-চিন্তার কেন্দ্রবিন্দুতে সামাজিক উপযোগিতাবাদের আদর্শই সক্রিয় ছিল। স্বাধীন এবং পরাধীন ভারতবর্ষের প্রশ্নে বা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ভূমিকা-বিচারে উভয়তই তিনি এই হিতবাদী বিচারদৃষ্টির ব্যবহার করেন। সে বিচারে বঙ্কিমচন্দ্র 'ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও পরাধীনতা' নামক প্রবন্ধে কথিত ইংরাজ আমলে ভারতবর্ষের 'একটু উপকারের' স্বরূপ বঙ্গদেশের কৃষক জীবনের আলোচনায় উদ্ঘাটিতও করেন। সুতরাং আনন্দমঠের শিরোনামায় 'ইংরাজ দেশকে অরাজকতার হাত হইতে উদ্ধার করিয়াছে' এই উক্তির উদ্ধৃতিতে বঙ্কিমমানসের কোনো যথার্থ পরিচয় নেই। এই সামাজিক উপযোগিতাবাদের আলোকেই বঙ্কিমচন্দ্রের কোনো কোনো মানসিক অসম আচরণেরও ব্যাখ্যা সম্ভব। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বহু বিবাহ-নিরোধ-বিষয়ক গ্রন্থের সমালোচনায় বঙ্কিমের বক্তব্যের স্বরূপ এই—

> আমাদের বিবেচনায় বহু বিবাহ নিবারণের জন্য আইনের প্রয়োজন নাই। কিন্তু যদি প্রজার হিতার্থে আইনের আবশ্যকতা আছে ইহা স্থির হয়, তবে ধর্মশাস্ত্রের মুখ চাহিবার আবশ্যকতা নাই।

* সমসাময়িক 'সমাজদর্পণ' পত্রিকায় প্রকাশিত 'বঙ্গদর্শন ও জমিদারগণ' নামক দশ-শালা বন্দোবস্তের সমর্থনসূচক প্রবন্ধের উদ্দেশে কটাক্ষ।

প্রজাকল্যাণকামী আইন ধর্মশাস্ত্রেরও ঊর্ধ্বে এ-কথা একেবারে জন স্টুয়ার্ট মিলের আদর্শ ছাত্রের উক্তি। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উক্ত গ্রন্থের বক্তব্যের বিরুদ্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের কোনোও মোট বক্তব্য ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্রের আপত্তি ছিল প্রধানত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সিদ্ধান্ত প্রতিপাদনের পদ্ধতির বিরুদ্ধে। বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্য ছিল এই যে, প্রজাহিতৈষণার কাছে আর কোনো কিছুই অধিকতর মূল্যবান নয়। মুসলমানেরা বঙ্গীয় প্রজাকুলের অর্ধেক। তাদের ধর্মশাস্ত্রের পাঁতি সংগ্রহ করে কোনো-বিদ্যাসাগরের যেহেতু আবির্ভাব হয়নি সেহেতু বহু বিবাহ হিতকর সামাজিক প্রথা হওয়া সত্ত্বেও সে সমাজে প্রচলিত হবে না এ ব্যাপার বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে যুক্তিসিদ্ধ মনে হয়নি। শাস্ত্র পদাঙ্ক অনুসারী সমাজ হিতের কল্পনায় বাংলা দেশে যে সীমাবদ্ধতার সম্ভাবনা তার কথা স্মরণে রেখেই বঙ্কিম এ উক্তি করেছিলেন।*

•• দুই ••

যে সামাজিক উপযোগিতাবাদের বঙ্কিম ছিলেন অভিনিবেশী ছাত্র, জন স্টুয়াট মিল ঊনবিংশ শতাব্দীর ইংলণ্ডে ছিলেন তাঁর প্রধান প্রবক্তা। মিলের এই সামাজিক উপযোগিতাবাদ বা utilitarianism is a direct continuance of eighteenth-century reasonableness—অষ্টাদশ শতকীয় যুক্তিবাদী চিন্তাধারার প্রভাবেই এই সামাজিক উপযোগিতাবাদের জন্ম। জেরেমি বেন্থাম এর কুলগুরু। বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তায়, বিশেষত জাতির বৈষয়িক উন্নতি সংক্রান্ত চিন্তায় এই মতবাদের প্রভাব খুবই স্পষ্ট। বহুবিবাহ নিবারণ বিষয়ক গ্রন্থের সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র যে প্রজাহিতের সুদৃঢ় অভিপ্রায়কেই স্বাগতম জানিয়ে সে প্রসঙ্গে ধর্মশাস্ত্রের ভূমিকাকে প্রত্যাখ্যান করতে চেয়েছিলেন এটা একেবারেই utilitarian method বা সামাজিক উপযোগিতাবাদী চিন্তা-প্রণালী।—

> The utilitarians alone felt that human society, like every other institution and belief, could afford to rest squarely upon a rational basis, without bringing in either Nature or God to give it firmer support. To them the question

* বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মৃত্যুর পরে পুনর্মুদ্রিত প্রবন্ধটি ধরে আমরা আলোচনা করেছি।

of whether any scheme of society was natural or divine was unimportant , what counted was whether it were reasonable and socially useful They claimed that the human reason was in itself sufficiently cogent to criticize time-honored and ridiculous traditions in politics as in religion.

জেরেমি বেন্থামের মধ্যেই যে এই চিন্তাদর্শের সম্যক স্ফুরণ ঘটেছিল তাই নয়, লক-এর চিন্তাতেও এর নিদর্শন মেলে। ইংলণ্ডে অষ্টাদশ শতাব্দীর গদ্যরীতিতে লকের প্রভাব যে চিন্তাসূত্রকে অবলম্বন করে সক্রিয়—To convey knowledge of things—তার প্রেরণায় অবশ্যই অষ্টাদশ শতাব্দীর যুক্তিবাদের প্রভাব—সামাজিক উপযোগিতাবাদ যার অন্যতম সহগামী। বঙ্কিমেরও বাংলাভাষা বিষয়ক প্রবন্ধের বক্তব্য এই আদর্শানুসরণের ফল। মনের ভাব প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত অশ্লীল ব্যতীত কাহাকেও ছাড়িবে না—বঙ্কিমের এই চিন্তাতেও উপযোগিতাবাদের ছায়া। বঙ্কিমের লিখিত প্রবন্ধের গঠন রীতিতেও এ-ছায়া দুর্লক্ষ্য নয়। যুক্তিমার্গের একমনা পথিক হিসাবেই যেন তিনি প্রবন্ধের উপসংহারে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছনো গেল এ-কথা না বলে শান্তি পেতেন না। প্রধানত মিলের ন্যায়শাস্ত্রই ইওরোপীয় চিন্তারাজ্যে বঙ্কিমের প্রবেশদ্বার। তাই মিলের কাল এবং কর্মের কিছু পরিচয় আমাদের প্রয়োজন।

১৮৩০ থেকে ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মিলের কর্মকাল। ইংলণ্ডের সামাজিক ও অর্থনীতিক ইতিহাসে এ-কালে মিলের চিন্তার স্বাক্ষর স্পষ্ট। অন্যদিকে ১৮১২ থেকে ১৮৫০ পর্যন্ত ইংলণ্ডের শিল্পবিপ্লবজাত বর্ধমান অসন্তোষের শিখাও এ-যুগেই স্পষ্ট।

There was a good deal of lawlessness in eighteenth-century England , particular grievances, like Enclosure Bills, or dear food, or new machines, excited riots in one place or another This kind of violence continued in the next century the riots against the raising of prices for the Covent Garden Theatre lasted several days, and succeeded in their object , there were savage

attacks on the Irish quarter in more than one northern town ; in 1816 mobs were moving about in East Anglia with banners inscribed "Bread or Blood" ; the enclosure of Otmoor provoked small farmers and labourers to a kind of guerilla struggle.........The Luddite rising in the Midlands and the North in 1811 and 1812, the agrarian revolt in the Southern countries in 1830, the passionate movement inspired by Owen which collected the energy and enthusiasm of the working classes throughout England for a great constructive idea in 1833, the Chartist agitation in its several forms in the thirties and forties—all these are expressions of a spirit of which there is little trace in eighteenth-century England. (Bleak Age—J. L. & Barbara Hammond).

মিল প্রথম দিকে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের প্রবল প্রবক্তা ও অবাধ বাণিজ্যের সমর্থক হয়েও ইংলণ্ডের শিল্প-রূপান্তরের উদ্ধৃত চিত্রকে উপলব্ধি করতে ভুল করেননি। তাঁর Political Economy-র তৃতীয় সংস্করণের এই অংশটুকু এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য :

They have increased the comforts of the middle classes. But they have not yet begun to effect those great changes in human destiny, which it is in their nature and in their futurity to accomplish.

ভারতবর্ষে বঙ্কিমচন্দ্রও ইংরাজ শাসনের ফলস্বরূপে কিছু মধ্যবিত্তেরই বাস্তব উন্নতির আভাস দেখেছিলেন। ওদিকে অষ্টাদশ শতাব্দীর যুবক ধনতন্ত্র ঊনবিংশ শতকে প্রৌঢ়ত্বে পৌছে যতই আত্মজ সংকটের চেহারাকে স্পষ্ট করে অনুভব করেছিল ইংলণ্ডের চিন্তাশীলদের চিন্তায় ততই সে সংকটের ছায়া হয়ে উঠেছিল দৃশ্যমান। লাসেফেয়ারের প্রবল ঔজ্জ্বল্য তখন চার্টিস্ট আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে হতে বসেছে হত-মহিমা। মিলের চিন্তার শেষদিকে লাসে-ফেয়ার নীতিকে সীমিত করে আনার দিকে ঝোঁক। মিল বলেছিলেন যে 'মানুষের পক্ষে সেটাই হল কাম্যাবস্থা যে অবস্থায় কেউ দরিদ্র থাকবে না, কেউ

অধিকতর ধনের জন্য চেষ্টিত হবে না ; কারো অপরকে ছাড়িয়ে যাবার প্রচেষ্টায় আর কাউকে আঘাত পেয়ে পিছিয়ে যেতে হবে না।'

কিন্তু লাসেফেয়ারের বেগকে সীমিতকরণের প্রস্তাবনাতেই মিলের চিন্তাগত পরিবর্তনের ইঙ্গিত অনুসন্ধেয় নয়। যুক্তিপন্থী, নীতিশাস্ত্রবাদী ধর্মবিরোধী মিল শেষ পর্যন্ত ধর্ম প্রসঙ্গেও যে দ্বিধাযুক্ত-মানস হয়ে উঠেছিলেন তার প্রমাণ আছে। উনিশ শতকের পশ্চিমী সভ্যতার সংকটের নানা রূপ। ইংলণ্ড কলোনির সাহায্যেও সেই সংকটের প্রধান তরঙ্গাঘাতকে প্রতিহত করতে পারেনি। এই সমাজ-সংকটের চেহারা যত গম্ভীর হয়েছে মিল প্রমুখের চিন্তাকেও তত অষ্টাদশ শতাব্দীর দৃষ্টিবিন্দু থেকে সরে যেতে হয়েছে। এই প্রসঙ্গে Berker তাঁর সুবিখ্যাত আলোচনায় বলেছেন .

> Yet when all these allowances are made, it still remains true that Mill was the prophet of an empty liberty and an abstract individual. He had no clear philosophy of rights, through which alone the conception of liberty attains a concrete meaning. He had no clear idea of that social whole in whose realisation the false antithesis of 'state' and individual disappears.

•• তিন ••

ধনতন্ত্রের নিজস্ব সংকটের চাপে মিলের চিন্তাগত পরিবর্তনের পাশে পাশে বঙ্কিমচন্দ্রের পরিবর্তনের কথা আলোচনা করাও প্রয়োজন। স্বভাবতই ভারতবর্ষে উনবিংশ শতাব্দীর সংকটের প্রকৃতি ইংলণ্ড থেকে মূলেস্থূলে পৃথক বঙ্কিম সর্বত্র এ-বিষয় সমান মনোযোগের সঙ্গে অনুধাবন করেননি। ইংলণ্ড অবাধ বাণিজ্যের সমর্থক স্বভাবতই হবে—কেননা শিল্প-রূপান্তরের ফসল তার ঘরে, হাতে তার অগাধ ক্ষমতার বশীভূত কলোনির বাজার। বঙ্কিম এটা অনুধাবন না করে সংরক্ষণকে বলেছিলেন মহাভ্রমাত্মক নীতি। শিশু শিল্পের যুক্তিকে তিনি ব্যবহার করেননি, এবং দেশজ শিল্পের বিপর্যয়ের ব্যাপারটিও তাঁকে বিশেষ স্পর্শ করেনি। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রসঙ্গে তাঁর যে অখণ্ড দেশ-দৃষ্টির অভিনিবেশ লক্ষ্য করা যায় এ ব্যাপারে সে দেশ-দৃষ্টি নিষ্ক্রিয়। এ প্রসঙ্গে পূর্ব অধ্যায়ে বাণিজ্যিক আমদানি-রপ্তানির যে তালিকা সমাচার দর্পণ

থেকে তুলে দেওয়া হয়েছে তা স্মরণীয়।

অবশ্যই জাতীয় জীবনের তৎকালবর্তী অসম্পূর্ণতায় এই খণ্ডিত দেশচেতনা স্বাভাবিক। কেননা জন স্টুয়ার্ট মিল যে-উনিশ-শতকীয় ইংলণ্ডীয় ভদ্রলোক শ্রেণীর প্রতিনিধি সে ভদ্রলোক শ্রেণী নিজ সীমার (অষ্টাদশ শতাব্দীর তুলনায় স্তিমিত হলেও) মধ্যেও একটা কর্মময় চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। জাতীয় জীবনের নানা পর্যায়ের সঙ্গে, তার স্বাধীন রাজনীতি, ব্রিটিশ লিবারেলদের আবির্ভাব প্রভৃতির ফলে ইংলণ্ডের পাবলিক লাইফ তখনও কর্মচঞ্চল। সাম্রাজ্যের ভোগ মন্থর প্রশান্তি তখনও শোণিতে আলস্যের স্রোতহীনতাকে ডেকে আনেনি। এই ভদ্রলোক শ্রেণীর সঙ্গে উদীয়মান বাঙালী ভদ্রলোকদের চরিত্রগত পার্থক্য সহজেই লক্ষণীয়। সর্ববিধ শুভ প্রচেষ্টা ও সংকল্প সত্ত্বেও অ্যাভারেজ বাঙালী ভদ্রলোকের জীবন ছিল মিত-পরিসর, কর্মচাঞ্চল্যহীন। জীবনের অন্দরে ছিল ভূমিজীবী গ্রামীণ মধ্যবিত্তের সকল জট, এবং বাইরে স্কুলে কলেজে আপিসে আদালতে অপরের প্রয়োজনের দাসত্ব. ইংলণ্ডের পাবলিক লাইফের বিকল্পে স্কুল মিউনিসিপ্যালিটি প্রভৃতিকে ঘিরে চণ্ডীমণ্ডপী ঘোঁট। স্বভাবতই এই জীবনের ব্যর্থতায় এবং ক্লান্তিতে সচেতন এবং সতর্ক মনে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এবং সে প্রতিক্রিয়া ইংলণ্ডের শিল্প-রূপান্তরের ফলে ধনতন্ত্রের সংকটে বুদ্ধিজীবী মহলের যে প্রতিক্রিয়া তার থেকে পৃথক। ইংলণ্ডে অনুভূত হয়েছিল সমৃদ্ধির সংকট এখানে, উপনিবেশে ছিল সংকটের অপচ্ছায়া।

জিজ্ঞাসু বঙ্কিমের সম্মুখে বাংলার নতুন কালের এই গ্রন্থিল জটিলতা ছিল একটা দুরূহ গণিতের মতো। এর সমাধানের পথ খুঁজেছিলেন তিনি অনুশীলন ধর্মে। বেন্থামী হিতবাদ থেকে মিলের অন্তিম প্রত্যয়গুলি যত দূর সেখান থেকে অনুশীলনের আদর্শ তদপেক্ষা আরো দূরে। বঙ্কিম অনুশীলনাদর্শ প্রচারকালে বলেছেন যে, "হিতবাদকে আমি যেখানে স্থান দিলাম তাহা আমার ব্যাখ্যাত অনুশীলনতত্ত্বের একটি কোণের কোণ মাত্র।" হিতবাদী ধর্মতত্ত্বেরই সামান্য অংশ মাত্র। আমাদেরও বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গে বঙ্কিমের ন্যায় ধর্মতত্ত্বে আপত্তি সম্মতির প্রশ্ন নেই। আমাদের ধারণায় বঙ্কিমের বক্তব্যের অসঙ্গতি অন্যত্র। বঙ্কিমের ধর্মতত্ত্ব মানুষের ধর্মের তত্ত্ব। এ ধর্মের লক্ষ্য মনুষ্যত্ব অর্জন। মোক্ষ, অমৃত, অথবা পুণ্য প্রভৃতিকে লক্ষ্যে না ব্যবহার করে বঙ্কিম তদপেক্ষা অনেক বাস্তব (concrete) ব্যাপারকে লক্ষ্য বলে অভিহিত করেছেন। এবং

মনুষ্যত্বেরও সংজ্ঞা স্থির করেছেন স্পষ্ট ভাষায়—"যে অবস্থায় মনুষ্যের সর্বাঙ্গীণ পরিণতি সম্পূর্ণ হয়, সেই অবস্থাকেই মনুষ্যত্ব বলিতেছি।" বলা বাহুল্য এই মনুষ্যত্বের সাধনা ব্যক্তির সাধনা। তীক্ষ্ণধী বঙ্কিমচন্দ্র এটা বুঝেছিলেন যে ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্য মিল কথিত লিবার্টির সূত্র এখানে অপ্রাসঙ্গিক। ইলবার্ট বিলের পূর্বেই তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে এখানে ব্যক্তি এবং রাষ্ট্রের মধ্যে দৃঢ়ভিত্তিক বৈপরীত্য বিদ্যমান। এখানে লিবার্টির প্রশ্ন অক্ষমের শশবিষাণ কল্পনা। অথচ ব্যক্তির বিকাশ যে "সংকীর্ণ-বুদ্ধিসম্পন্ন ইংরাজের"* হাতে, তাদের প্রদত্ত শিক্ষায় সম্ভব নয় এ তত্ত্বও বঙ্কিমের কাছে অস্পষ্ট ছিল না। এদিকে দিনে দিনে ঊনবিংশ শতাব্দীর ইওরোপের সংকট, জাতীয়তাবাদের আতিশয্যের চেহারাও তাঁর কাছে উন্মোচিত হচ্ছে। এমন অবস্থায় চিন্তার সংকট থেকে ত্রাণ-পন্থা হিসাবে কল্পিত হয়েছে অনুশীলন ধর্ম। স্মরণ রাখা দরকার সকল প্রকার ব্যাপক কর্মময়তা থেকে বঞ্চিত বাঙালী মধ্যবিত্তের তখনকার অসহায়তার কথা। তৎকালীন এদেশী মধ্যবিত্ত যেন একটা অদ্ভুত ইঞ্জিন শিক্ষালব্ধ সকল বাষ্পাবেগ সংগ্রহ করা হয়েছে, শুধু ছুটে চলবার চাকা ক-খানা তাদের ছিল না। অনুশীলনতত্ত্বে বঙ্কিমচন্দ্র হয়তো তারই সন্ধানে সচেষ্ট ছিলেন। শুধু দেখতে পেলেন না যে, ব্যক্তি, রাষ্ট্র এবং সমাজের সহযোগে, কখনো বা টানাপোড়েনে, থেকে থেকে বিভিন্ন রূপ ধরে। সে প্রশ্নে অসহায় থেকে ধর্ম ও নিচয়ের সামঞ্জস্যের সাধক ব্যক্তির কল্পনায় বঙ্কিমের মননের অনেকখানি ব্যয়িত হয়েছে এবং মূল সমস্যা থেকে গেছে অস্পষ্ট। উনিশের শতকে বাংলা দেশে—ব্যক্তির এবং পরিবারের জীবনের ছকে এবং তার সামাজিক ধর্মের প্যাটার্নে যে ব্যবধান, ইংরোপীয় জ্ঞান বিজ্ঞানের মুখস্থ করা কথা এবং বাস্তবে মধ্যযুগীয় সংস্কারের অনুসরণে যে পার্থক্য এবং ফাঁকি প্রকৃত-পক্ষে সেটাই ছিল এদেশের তৎকালীন মধ্যবিত্ত জীবনের সর্বাপেক্ষা বড়ো অসামঞ্জস্য। এই অসামঞ্জস্যকে কেমন করে দূর করা যাবে সেটা এক-শ বছরের আগেরও সমস্যা এবং আজকেরও সমস্যা। 'প্রীতি সর্বব্যাপিনী প্রীতি ঈশ্বর' বলে সমাজের আপামর সকলের সঙ্গে অখণ্ড সম্পর্ক রচনা করা যায় না। সামাজিক সম্পর্কগুলি কোনো মনোভাবের ওপর নির্ভরশীল নয়। তাদের জন্য অধিকতর বাস্তব ভূমিভিত্তি প্রয়োজন। এ-দেশে সে ভূমিভিত্তি নষ্ট হয়েছে

* বঙ্কিমচন্দ্রেরই উক্তি।

দু-কারণে।* এক, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। দুই, কলকাতার অসম গঠনের ফলে অনাগরিক বাবু সম্প্রদায়ের উদ্ভব। যাদের গ্রাম-সম্পর্কে স্থাপন করলে মনে হবে পরজীবী গ্রামীণ মধ্যবিত্ত, যাদের কলকাতার আলোকে আনলে অন্তত আলাপনে মনে হবে ইওরোপীয় ভাবাদর্শের সন্তান। ফলে সমাজের বৃহত্তর জনজীবন সম্বন্ধে এঁরা হয়ে উঠেছেন নির্বিকার। আর যাঁরা গ্রামীণ অর্থনীতিক সম্পর্ক থেকে মুক্ত হতে পেরেছেন তাঁরা সুবিশাল কৃষিবাংলার পঙ্গু চেহারার কথা অবলীলায় ভুলে গিয়ে কলকাতার মুক্তিকে মনে করেছেন জীবনের মুক্তি। গোটা সমাজ জীবনের এই অসংগঠিত অসম্পূর্ণ বিন্যাসের ছায়া ছিল ব্যক্তির জীবনে। একে দূর করতে চেয়েছিলেন বঙ্কিম অনুশীলনাদর্শের সাহায্যে। বঙ্কিমের কালের ইংলণ্ডের আকাশে তখন একই আবহাওয়ার ইঙ্গিত ভাসমান।

Craving adjustment amid the peril of change, representative victorians at least until the seventies, sought either in the radiance of God or in the dim consciousness of man some spiritual absolute by which to interpret and control their material advance · whatever misdirections they may frequently have followed their impulse was in essence deeply religious. Victorian Temper (J.H. Buckly).

এই উক্তির সঙ্গে টি-এস এলিয়টের Arnold and Peter নামক প্রবন্ধের শেষ প্যারা প্রায় মিলিয়ে পাঠ করা যেতে পারে। এলিয়ট সাহেবও এই শতাব্দীর প্রচেষ্টাকে Imperfect Synthesis-এর প্রচেষ্টা বলে অভিহিত করেছেন।

•• চার ••

অবশ্যই শিল্পী বঙ্কিমকে সন্ধান করতে হবে উনবিংশ শতকের পটভূমিকায়। সেই হেতু উনিশ শতকের স্বদেশ ও জগৎ তাঁর চিন্তাকে কী ভাবে স্পর্শ করেছিল সে-কথা না জানলে তাঁর শিল্পী হিসাবে যন্ত্রণার স্বরূপ উপলব্ধি করা যাবে না। আমরা সে কারণে এতক্ষণ বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তার একটি রেখাসীমা অঙ্কন করার

* নষ্ট যে হয়েছে সে কথা বঙ্কিমও জানতেন। 'শিক্ষিতে অশিক্ষিতে সমবেদনা নাই'—তাঁরই উক্তি।

চেষ্টা করলাম। এইবাব তাঁব উপন্যাসের আলোচনায তাঁব ব্যক্তিত্বের সৃজনী সমগ্রতাব পবিচয় খোঁজা যাবে। দেখা যাবে যে synthesis-এব যে প্রয়াসে তাঁব মননশীলতা আজীবন নিয়োজিত ছিল শিল্পীরূপেও তাব ব্যত্যয় ঘটেনি। সমগ্র বঙ্কিমী উপন্যাসেব বিশিষ্ট লক্ষণ তিনটি—

(ক) বিষয়বস্তু বা theme-এব গুরুত্বেব বা অ-সাধাবণত্বেব ওপব প্রাধান্য আবোপেব প্রবণতা।

(খ) উপন্যাসেব কাঠামো নির্মাণে নৈযাযিক শৃঙ্খলা বক্ষাব চেষ্টা।

(গ) মননশীলতাজনিত সুসমতাব প্রযাস।

নানাধিক পবিমাণে দুর্গেশনন্দিনী থেকে সীতাবাম পযন্ত সমুদয় উপন্যাসেব পবস্পবেব তাবতম্য ও পার্থক্যেব কথা স্বীকাব কবেও সাধাবণ লক্ষণ হিসাবে ওপবেব তিনটি সূত্রেব কথা বলা চলে। এখন এই তিনটি সূত্রেব বিসযে পৃথক আলোচনা কবা যাক।

Rajmohon's Wife ইংবাজিতে লিখিত বঙ্কিমচন্দ্রেব প্রথম উপন্যাস। এই উপন্যাসেব ব্যর্থতাব কাবণ সাধাবণত সন্ধান কবা হয ইংবাজি মাধ্যমেব ভিতবে। কিন্তু সেটা প্রধানত বহিবঙ্গ-ব্যর্থতা। Rajmohon's Wife একান্তই গদ্য জাতীয বচনা। ঘটনাধাবাও গদ্যগত। ঔপন্যাসিকেব মানস-দৃষ্টিতে কিছুটা ব্যঙ্গবোধ যেন ক্রিযাশীল। এই গদ্যগত-প্রাণতা কখনই বঙ্কিমচন্দ্রেব স্বক্ষেত্র নয। আমবা বাংলা উপন্যাসেব জন্মলগ্ন শীর্ষক অধ্যাযেব শেষ অনুচ্ছেদে বলেছি যে গদ্যময বাস্তবতাকে উপন্যাসে প্রতিবিম্বিত কবাব প্রযাসে আলালেব ঘবেব দুলাল উনিশ শতকীয বাংলা সাহিত্যে প্রায একক। এই গদ্যময বাস্তবতাকে বঙ্কিম Rajmohon's Wife-এ একবাব এবং ইন্দিবাতে দ্বিতীযবাব ধাবণ কবতে চেষ্টিত হযেছিলেন। কিন্তু গদ্যময় বাস্তবতা বঙ্কিমেব কল্পনাব স্বভাবকে আকৃষ্ট কবেনি। গদ্যময় বাস্তবতা একটি জাতিব কর্মময যুগেব যথার্থ দর্পণ হতে পাবে। কর্মশীল কোনো সামাজিক শ্রেণী, নতুন মানুষ বা জাতীয জীবনেব নতুন বিকাশেব কালে এই Formal Realism অবশ্যই একটা তাৎপযপূর্ণ শিল্পধর্ম। ইংলণ্ডেব অষ্টাদশ শতাব্দীতে জাতীয় জীবনেব নববিকাশেব কালে ডিফো, বিচার্ডসন এই ধাবাব জনক। আমাদেব জীবনে এই নববিকাশেব কাল বলে যাকে আমবা মনে কবি তাব ফাঁকি যে বঙ্কিমেব কাছে প্রথমাবধিই ধবা পডেছিল সে-কথা আমবা বলেছি। তাই যেখানে প্রাত্যহিকে নেই কোনো মুক্তিব আকাশ, কোনো বাস্তব কর্মেব প্রচণ্ড আবেগ

সেখানে গদ্যময় বাস্তব মনোভঙ্গি কী কাজে লাগবে? তাই, এই বন্ধ্যা জীবনের সীমাবদ্ধতাকে বঙ্কিম উপলব্ধি করেছিলেন বলেই, বিষয়বস্তুর নির্বাচনে তিনি অ্যাভারেজ ঘটনাকে বা কাহিনীকে পরিহার করেছেন। আলালের ঘরের দুলাল অপেক্ষা দুর্গেশনন্দিনীর লেখকের কল্পনার উচ্চচূড়াবিহারী রূপ দেখে যারা ছন্দিত ভাষায় তারিফ করে সমালোচনার দায়িত্ব শেষ করেন তাঁরা বঙ্কিমী কল্পনার এই নিজস্ব গতির অন্তর্নিহিত কারণকে উপলব্ধি করেন না। অ্যাভারেজ কাহিনীকে সদা সর্বদা পরিহার করেছেন বঙ্কিম, আর করেছেন নাগরিক মধ্যবিত্ত চরিত্রকে পরিহার। প্রাচীন দুর্গ, যুদ্ধ বিগ্রহ, নদী বা সমুদ্রের বিজন গাম্ভীর্য উপন্যাসের পটভূমি হিসাবে প্রায়ই ব্যবহৃত হয়েছে। ব্যবহৃত হয়েছে রাজপ্রাসাদ বা সুরম্য জমিদার-ভবন, বিচিত্র উদ্যান প্রভৃতি। লক্ষণীয় যে, এই কারণেই রজনী এবং ইন্দিরার ঘটনা ছাড়া প্রায় কোনো কাহিনীর ঘটনাস্থল কলকাতায় কল্পিত হয়নি। সমসাময়িক যে সব ঘটনা তার উপন্যাসে ব্যবহৃত হয়েছে তার সবই মফস্বল বাংলার পটভূমিকায় রচিত। সমকালীন কলকাতাই জীবনের ঘূর্ণিপাককে বঙ্কিম উপন্যাসে প্রায়ই এড়িয়ে চলেছেন। অবসর-শিথিল, জীবিকা যন্ত্রণা-শূন্য গ্রামীণ বড়োলোকেরাই তার সমকালাশ্রয়ী উপন্যাসের পাত্রপাত্রী। এই জীবনধারার বিন্যাস থেকে উদ্ভূত সমস্যা বঙ্কিমের উপন্যাসে ব্যবহৃত হয়েছে।

স্বভাবতই এ অবস্থায় রোমান্স এবং রোমান্টিকতাই বঙ্কিমের শিল্পধর্মের পরিপোষক হয়ে উঠবে এটা প্রত্যাশিত। রোমান্সের প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে বঙ্কিমের সৃজিত রোমান্সগুলি সম্বন্ধে আমরা অতিরিক্ত মাত্রায় সশ্রদ্ধ। অথচ দুর্গেশনন্দিনী এবং মৃণালিনী ব্যতীত বঙ্কিমের খাঁটি রোমান্স আর একখানিও নেই। রোমান্সের উপাদান হয়তো কপালকুণ্ডলা থেকে শুরু করে সীতারাম পর্যন্ত সবত্রই উপস্থিত, কিন্তু অমিশ্র রোমান্স রচনায় কখনও বঙ্কিম-মানস শিল্পীর তৃপ্তি পেতে পারেন না—সে কথা বঙ্কিমমানসের রেখাসীমা আলোচনাতে স্পষ্ট। দুর্গেশনন্দিনীর – বঙ্কিমের শিল্পজীবনের ইতিহাস প্রসঙ্গ বাদ দিলে—অন্য তাৎপর্য খুঁজে পাওয়া কঠিন। মৃণালিনী সম্পূর্ণ তাৎপর্যহীন কাহিনী। রোমান্সের সঙ্গে রোমান্টিকতার কোনো বিরোধ অবশ্যই নেই। রোমান্সের আকাশবাতাস এবং পরিমণ্ডল রোমান্টিক কল্পনাকে আকৃষ্ট করে নিশ্চয়, কিন্তু তাই বলে রোমান্স এবং রোমান্টিকতা এক কথা নয়। রোমান্টিকতা তার নিজস্ব কল্পনাগামী পদ্ধতিতে উপন্যাসের ক্ষেত্রে যে কাজ

করে থাকে রিয়ালিজমের ধারকেরাও তাদের ন্যায় শৃঙ্খলার সাহায্যে সেই কাজই করে—তা হল চেতনার বিস্তৃতিসাধন। রোমান্সের ক্ষেত্রে এই চেতনার বিস্তৃতিসাধনের জটিলতা পরিহৃত হয়ে থাকে। বঙ্কিম প্রধানত রোমান্টিক। এখানে পুনরায় উনবিংশ শতকীয় utilitarianism-এর প্রসঙ্গ উত্থাপনযোগ্য। এ-কথা আমরা বলেছি যে উক্ত utilitarianism অষ্টাদশ শতাব্দীর যুক্তিবাদের—(এর ভাবগুরু জেরেমি বেন্থাম যার পূর্ণ বিগ্রহ)—প্রত্যক্ষ ধারাবাহী। নৈয়ায়িক মিল তাঁর নৈয়ায়িক পদ্ধতির জন্য বিশ্রুত। ঐ শতাব্দীর ভাবমণ্ডলও বিখ্যাত হয়ে রয়েছে রোমান্টিকদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ায়।*

Beauty is ultimately irrational and basically beyond intellectual perception—এই হল রোমান্টিকদের বিষয়ে ভিক্টোরীয় প্রতিক্রিয়ার সাধারণ সূত্র। রাস্কিনের বক্তব্যও এই প্রসঙ্গেই স্মরণীয় :

Romantic art, he suggested, lacked, the authority of classic art. Since the classic writer set down only what was "known to be true" while the romantic expressed himself "under the impulse of passion" which might or might not lead to new truths. মিলের যুগ অবশ্যই impulse of passion-কে প্রশ্রয় দেবে না। অপ্রাসঙ্গিক হলেও বলা দরকার—ভিক্টোরীয় যুগের এই সাহিত্য-রুচির পরিবর্তন একমাত্র ক্ষতি করতে পারেনি যাঁর তিনি হলেন ওয়ার্ডসওয়ার্থ। কিন্তু প্রশ্ন হবে বঙ্কিম উনবিংশ শতকীয় ইংলণ্ডীয় আবহাওয়ায় নিজ সাহিত্য রুচিকে গঠিত করেও উপন্যাসের মেজাজে রোমান্টিকতাকে প্রশ্রয় দিলেন কেন—বিশেষত তখন যখন ইংলণ্ডের উপন্যাস-রাজ্যে ডিকেন্স অন্যতম শক্তিধর, যিনি উপন্যাসে আবেগময় প্রকৃতিকে গৌণে রেখে মুখ্য করেছেন বাস্তবালেখ্যকে—বারে বারে আক্রমণ করেছেন উপযোগিতাবাদকে। ডিকেন্স যেখানে লণ্ডন শহরকে উপন্যাসের পটভূমি হিসাবে ব্যবহার করতে সদাই সচেষ্ট ছিলেন বঙ্কিম সেখানে রজনী এবং ইন্দিরা ছাড়া কলকাতাকে পরিহার করেছেন। কাজেই ডিকেন্সের Hard times-এর পরিণতি বঙ্কিমে আসেনি।†

* The Anti-Romantics শীর্ষক অধ্যায় (Victorian Temper নামক গ্রন্থে) দ্রষ্টব্য।

† Especially Hard times should be studied with close and earnest care by persons interested in social questions.—*Ruskin.*

অথচ হিতবাদী বঙ্কিম বেন্থামকেও সর্বাংশে স্বীকার করে নিতে পারেননি। বেন্থাম মানুষের চিরস্থায়ী মানসিক অভিপ্রায়ের বিশ্লেষণে সৌন্দর্য প্রেমকে সে মানসিক-অভিপ্রায়ের অন্যতম অঙ্গ বলে স্বীকার করেননি। মিল তার আত্ম-জীবনীতে এর ক্ষতিকারক প্রভাবের কথা বলেছেন। বলেছেন যে, আশৈশব অনুভূতি-নিরপেক্ষ বুদ্ধিতপ্ত শিখায় শেষ পর্যন্ত তাঁর স্নায়বিক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ওয়ার্ডসওয়ার্থের কাব্যে পরিশেষে তিনি খুঁজে পান শান্তি এবং নিরাময়। পরিহাসের সুযোগ নিলে বলা যায় যে মিল হয়তো এইভাবে ওয়ার্ডসওয়ার্থের ইউটিলিটি খুঁজে পেয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর অনুশীলনা-দর্শের আলোচনায় দেখা যায় যে, তিনি সৌন্দর্যপ্রেম এবং সৌন্দযাস্বাদনকে মানবিক বৃত্তিসমূহের অন্যতম বলে মনে করেন। এবং উপযোগিতাবাদীর মতোই মানুষের সর্বাঙ্গীণ বিকাশে এদেরও ভূমিকার প্রয়োজনকে মানেন। যদি সৌন্দর্য-রচনা করার ক্ষমতা থাকে তাহলে লেখনী ধারণের সার্থকতা আছে—বাংলার নব্য লেখকেব প্রতি বঙ্কিমেব উপদেশ বাণীতে সৌন্দয-রচনাকে সাহিত্য সৃষ্টিব উদ্দেশ্য বলে অভিহিত কবা হয়েছে এই কারণেই।

তথাপি, এর মধ্যে বঙ্কিমের রোমান্টিকতার হেতু নিহিত হয়ে নেই। এ শুধু তার রোমান্টিকতার ব্যাখ্যা। হেতু সন্ধানের জন্য পুনরায় আমাদের কালমুখাপেক্ষা হতে হবে। তবেই বঙ্কিমের অসাধাবণ বিষয়বস্তুর তাৎপযও স্পষ্ট হবে।

স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে বঙ্কিমের কালে রঙ্গলাল থেকে নবীনচন্দ্র পর্যন্ত বাংলা কাব্যের ইংলণ্ডীয় ভাবপুরুষ ছিলেন বায়বন (এবং স্কট, মূর প্রমুখেরা)। বায়রনের বীরত্বব্যঞ্জক উক্তি ওজস্বিতা ইংলণ্ডে রোমান্টিকদের বিরুদ্ধে প্রতি-ক্রিয়ার যুগেও এক শ্রেণীর পাঠক-জনতাকে আকৃষ্ট করে রেখেছিল। কীট্স্ এবং শেলীর সৌন্দয-পিপাসা অপেক্ষা বায়রন নব্য বঙ্গীয় কবিবৃন্দকে প্রভাবিত করেছিলেন অধিক। তার কারণ কেবল অতীত-প্রীতিসম্পন্ন দেশাত্মবোধক কাব্য-প্রয়াসের মধ্যেই অনুসন্ধেয় নয়। ঈশ্বর গুপ্তের পর থেকেই বাঙালী কবিরা বিশেষ এ-যুগে রীতিমতো পাবলিক-সচেতন হয়ে উঠেছিলেন। এই পাঠক-মণ্ডলী সম্বন্ধে সচেতনতা রোমান্টিক কবি-বৃন্দের মধ্যে প্রধানত বায়রনেরই ছিল। তাই, কল্পনার সূক্ষ্ম কম্পন অপেক্ষা তার উচ্ছ্বাসময় বাঁধনহারা লীলাকে শ্রাব্য করে তোলাই যখন বাংলা কাব্যের লক্ষ্য ছিল তখন যে বায়রনকেই ছায়া রূপে বারে বারে কবিকল্পনায় দেখা যাবে এটা আশ্চর্য নয়। বিশেষ লক্ষণীয়

যে বাংলা সাহিত্যে বায়রনের এই প্রতিষ্ঠার কালে ওয়ার্ডসওয়ার্থে ছিল বঙ্কিমের আসক্তি এবং অনুরক্তি দুইই।

এই ব্যাপারে কেবল বঙ্কিমের সাহিত্যরুচির অনন্যতাই সূচিত হচ্ছে না, যে-কারণে বঙ্কিম সাধারণত নগর-জীবনকে তাঁর উপন্যাসের বিষয় করেননি সেই কারণটির প্রকৃত রূপও হৃদয়ঙ্গম করা যাচ্ছে। নগর-জীবনাপেক্ষা শান্ত প্রকৃতি, উদ্বেল করোজ্জ্বল নদীবক্ষ, খদ্যোত সমাকুল ঘোর নিশীথিনী, ফুল, গাছ, পাখি বঙ্কিমের কল্পনায় সাড়া তুলেছে অনেক বেশি। প্রকৃতপক্ষে বলা চলে যে মানব জীবনের ওপরে প্রকৃতির নিগূঢ় প্রভাবকে বঙ্কিমই প্রথম বাংলা সাহিত্যে যথার্থ রোমাণ্টিকের দৃষ্টিতে উপলব্ধি করেন। এবং উপলব্ধি করেন মানুষের জীবনের ব্যাখ্যার অগম্যতাকে। কপালকুণ্ডলায় এবং মনোরমায় মানুষের সেই রহস্যের সাক্ষাৎ মেলে। মনোরমাকে দুর্বোধ্য এবং দুর্জ্ঞেয় রূপে চিত্রিত করার মধ্যেও সেই রোমাণ্টিক বঙ্কিমেরই পরিচয়। সৌন্দর্য যে বিচারাতীত, প্রকৃষ্ট অনুভূতিতে তার স্থিতি, এই চরিত্র দুটি তার প্রমাণ। কিন্তু এহ বাহ্য। শেষ পর্যন্ত বঙ্কিমের সকল উপন্যাসের বিষয়বস্তু কি একই অচরিতার্থ আকাঙ্ক্ষার বেদীমূলে আত্মার হাহাকার নয়? আমাদের প্রার্থনা এবং প্রাপ্তির মধ্যে, বাসনা এবং চরিতার্থতার মধ্যে যে বিরাট ব্যবধান বঙ্কিমের কল্পনাকে তা বারে বারেই স্পর্শ করেছে। বঙ্কিমের সমস্ত নায়ক চরিত্রের বেদনার ও যন্ত্রণার উৎসে এই কল্পনাই বিদ্যমান। প্রতাপের মৃত্যু, গোবিন্দলালের সন্ন্যাস, নবকুমারের বিসর্জন, সীতারামের সমাপ্তি এই সকল কিছুর মূলে সেই সত্য ক্রিয়াশীল। এ প্রসঙ্গে মোহিতলালের ইঙ্গিত যথার্থ। তিনি বলেছেন যে, বঙ্কিম কখনও মানুষকে ছোট করে দেখেননি। স্বভাবতই সে কারণেই মানুষের আকাঙ্ক্ষাকেও তিনি কখনো ছোট করে দেখেননি। বঙ্কিমের উপন্যাসের বিষয়বস্তুর যে গুরুত্ব বা অসাধারণত্ব তার মূল এই রোমাণ্টিকতার মধ্যে। ডিকেন্সের মতো ছোট মানুষের জীবনের নাট্যিকরণে (dramatising the foibles and vitality of little men) তিনি তৃপ্ত হতে পারেননি। তার পক্ষে এটা সম্ভবও ছিল না। অন্য প্রসঙ্গে আমরা 'উপন্যাসে বিষয়বস্তুর তাৎপর্য' নামক অধ্যায়ে এ-কথা আলোচনা করেছি যে উপন্যাসের বিষয়বস্তুকে কদাচ বাইরে থেকে বিচার করা চলে না। উপন্যাসের বিষয় সম্বন্ধে লেখকের সচেতনতা প্রকৃতপক্ষে লেখকের জীবন চেতনা, অথবা সমাজ-সভ্যতা সম্বন্ধে চেতনার নামান্তর। একটা উপন্যাসের বিষয়বস্তু অসাধারণ কিংবা সাধারণ

এ-কথা বললে বস্তুত কিছুই বলা হল না। বিষয়বস্তুর মাধ্যমে ঔপন্যাসিক যে জীবন-চেতনার রূপায়ণ ঘটান সেটাই এ প্রসঙ্গে বিবেচ্য। বঙ্কিমের উপন্যাসের বিষয় সংক্রান্ত আলোচনায় দেখা যায় যে তিনি বিষয়কে কদাচ সরলীকরণের ভিতরে নিয়ে যেতে চাননি। তাঁর সমস্ত উপন্যাসের সমস্যার মূলে রয়েছে নায়ক বা নায়িকার অনুশোচনার বোধ। এই অনুশোচনার হেতু অবশ্যই পাপ চেতনায়। এই পাপ চেতনার ফলে সঞ্জাত অনুশোচনা ব্যতিরেকে বঙ্কিম মানুষের যন্ত্রণাকে অন্য কোনোভাবে বুঝতে চেষ্টা করেননি। বঙ্কিম নিজকালের জীবনের সমস্যাকে অনুভব করেছিলেন এইভাবে : আমাদের প্রাচীন সমাজের এবং সংসারের যেটা আচরণ-বিধি বা ধর্ম তার ব্যত্যয়ে ব্যক্তির জীবনে আসে পাপযন্ত্রণা। এই পাপবোধ বাইরের ঘটনার উদ্দীপন লাভ করলেও একান্ত-ভাবেই মন্ময় বা subjective। কপালকুণ্ডলা বাস্তবিক কোনো পাপাচরণ করেনি। সে মনে করেছিল যে বিধিলিপি লঙ্ঘন করে পাপ করেছে। গোবিন্দলাল আইনের সাজাকে যথারীতি সম্পত্তিবান ঘরের ছেলের মতো ফাঁকি দিয়েছে বটে কিন্তু নিজের অন্তরকে ফাঁকি দিতে পারেনি। কুন্দনন্দিনী প্রকৃতপক্ষে কোনো পাপই করেনি। বিধবা বিবাহ আইনসম্মত ব্যাপার। কিন্তু সে কারণে কুন্দ পাপ বোধেব প্রতিক্রিয়াকে পরিহার করতে পারেনি। সীতারামের প্রসঙ্গেও তাই। প্রতাপের প্রসঙ্গেও তাই। শ্রদ্ধেয় ডাঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত তাঁর বঙ্কিমচন্দ্র আলোচনার ভূমিকায় সুখ এবং কল্যাণের প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে বঙ্কিমের বিশ্বাস ছিল সুখ-সন্ধানী মানুষ যখন সুখস্পৃহার মূলে কল্যাণকে বিসর্জন দেয় তখনই যন্ত্রণারম্ভ। কিন্তু সেই কল্যাণবোধের সামাজিক ভিত্তি কোথায়? স্বভাবতই বঙ্কিমের উত্তর ছিল ধর্মাচরণের মধ্যে। সামাজিক এবং পারিবারিক আচরণ-বিধির মধ্যেই হিন্দু সমাজের কল্যাণবোধ ক্রিয়াশীল হয়ে রয়েছে। আইন এই ক্রিয়াশীলতাকে ক্ষুণ্ণ করতে অথবা স্পর্শ করতে পারে না। কিন্তু কল্যাণবোধের অধিষ্ঠান বুদ্ধিতে। অথচ বাসনার নিধান প্রবৃত্তিতে। সেক্ষেত্রে এই অবস্থার মধ্যে যে সম্ভাবনা বঙ্কিম তাকেই ব্যবহার করেছেন তাঁর বিষয়রূপে। মানুষের আত্যন্তিক দুঃখের সঙ্গে তার মনোলোকের আলোড়নের একটা সম্পর্ক জড়িয়ে থাকে। যে অবস্থাতেই হোক না কেন জীবনের স্থিতাবস্থা যখন ব্যাহত হয়, খণ্ডীভূত হয় জীবনের ধ্রুব রূপ, তখনই মানুষের কল্পনালোকে শুরু হয় ব্যাপক আলোড়ন। তখনই সে সান্ত্বনা খোঁজে অন্তরে, সাড়া পেতে চায় প্রকৃতিতে। এটাই বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের

নৈতিক সমস্যা। বঙ্কিমের বিষয়বস্তুর মধ্যে এই গূঢ় সম্ভাবনার বীজ সুপ্ত ছিল। এই বীজকে সফল করার তাগিদে বঙ্কিম অ্যাভারেজ মানুষকে বাদ দিয়েছেন নায়ক মণ্ডলী থেকে।

•• পাঁচ ••

এই আলোকেই বঙ্কিমের উপন্যাসের গঠন-বৈশিষ্ট্য আলোচ্য। আমরা বঙ্কিমের উপন্যাসের দ্বিতীয় লক্ষণে নির্দেশ করেছি—উপন্যাসের ঘটনা-সংস্থান রীতিতে নৈয়ায়িক শৃঙ্খলা। পূর্ব পরিচ্ছেদে আলোচিত বিষয়ের মধ্যেই এই দ্বিতীয় লক্ষণের বীজ নিহিত। আমরা একবার ডিকেন্সের সঙ্গে সামান্য প্রতিতুলনায় এ-কথা বলেছি যে সাধারণ মানুষের জীবনের অন্তর্গত নাট্য সম্ভাবনাকে আবিষ্কার করা এবং ব্যবহার করা ডিকেন্সের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বঙ্কিমও বাঙালী জীবনের অন্তর্নিহিত নাটকীয় গুণকে ব্যবহার করেছেন। বঙ্কিম সাধারণ মানুষকে বিষয়ীভূত করতে অবশ্যই ইচ্ছুক ছিলেন না। কিন্তু "ঊনবিংশ শতাব্দীর পোষ্যপুত্র" বঙ্কিমের নায়কেরা যে জীবন যন্ত্রণাকে ভোগ করতে পারত বঙ্কিম তাকে বিষয়ীভূত করেছেন।

বঙ্কিমের প্রধান শিল্পসৃষ্টিগুলিতে নাট্যরস প্রচুরভাবে বিদ্যমান। সে নাট্যরস মাঝে মাঝে যে অতিনাটকীয়তায় পর্যবসিত হয়নি তাও নয়। এই নাট্যরস প্রবণতার জন্যই বঙ্কিমের উপন্যাসের দৃশ্য-পরিকল্পনা, পরিচ্ছেদ-বিভাগ, ঘটনা-গতি সমস্তই নাট্যানুগ পরিকল্পনায় বিধৃত। বঙ্কিমের ক্ল্যাসিক-শুদ্ধ মন এই নাট্যানুগামিতার জনক মাত্র এই কথা বললে সমস্তটার ব্যাখ্যা হয় না। আমাদের চরিত্রের মধ্যে আমাদের অদৃষ্টের বীজ নিহিত থাকে। কেমনভাবে এবং কী করে বাইরের ঘটনার সংস্পর্শে এসে সেই বীজ পরিশেষে মহীরুহে পরিণত হয় ঘটনা-সংস্থানের ন্যায়-শৃঙ্খলার ভিতর দিয়ে বঙ্কিম সে কথাটিই স্পষ্ট করে তুলতে চান। কাজেই বঙ্কিমের কাছে ঘটনা-সংস্থানের একটা নিজস্ব অর্থ আছে। একটা পূর্ব-স্থিত স্থির জীবনের প্যাটার্নে বহিঃনিক্ষিপ্ত উপাদান—ব্যক্তিই হোক বা ঘটনাই হোক—একটা বিপর্যয় বা সংকটের ভূমিকা রচনা করে। এই initial incident বা প্রাথমিক ঘটনাই ধীরে ধীরে rising action এবং climax-এর দিকে ঘটনা প্রবাহকে নিয়ে যায়। বঙ্কিমের উপন্যাস-রীতির এই বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নাট্যকারের সংক্ষিপ্তিবোধ। বিষবৃক্ষের বৃহদায়তনের মধ্যে কিছু পরিমাণ এই সংযম বিনষ্ট হয়েছে তাও

এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। উপন্যাসের শেষে denouement-এর সুযোগে শেক্স্‌পীরীয় রীতিতে ট্যাজেডির গম্ভীর ঘনঘটার পর সুসমতা আনয়নের প্রয়াসের লক্ষণেও নাট্যরীতির, বিশেষ শেক্স্‌পীয়রের প্রভাব লক্ষণীয়। প্রতাপের মৃত্যু দৃশ্য অথবা কৃষ্ণকান্তের উইলের পরিশিষ্ট এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য।

বঙ্কিমী উপন্যাসের নৈয়ায়িক শৃঙ্খলা নিজস্ব তাৎপর্যে বিশিষ্ট। কেননা বঙ্কিমের এই উপন্যাসের গঠন-রীতি সম্বন্ধে বিশিষ্ট ধারণা বস্তুত বঙ্কিমের জীবনদর্শন থেকেই উদ্ভূত। আমাদের জীবন-ধর্মাচরণের ব্যত্যয়ে যে সংঘাত বা দ্বন্দ্ব উনিশের শতকের মধ্যভাগে সূচিত হয়েছিল—যে দ্বন্দ্বের মূল নিঃসন্দেহেই নবকালের উপাদানগুলির মধ্যে—যে দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে হিতবাদী, অনুশীলনাদর্শী বঙ্কিমের নিজস্ব ধারণাই তাঁর মানসদৃষ্টি—সেই দ্বন্দ্ব তাঁর উপন্যাসে নাট্য-প্রবণতাব উৎস। লক্ষণীয় যে সমকালাশ্রয়ী যে দুটি রচনায় বঙ্কিম নাট্যানু-গামিতা পরিহার করেছেন, রজনী এবং ইন্দিরা—সেখানে বঙ্কিমের এই বিশিষ্ট জীবন সমস্যারও সম্যক্ ব্যবহার ঘটেনি। কলকাতার তাৎকালিক জীবনের মধ্যে আমাদের জীবন নিহিত দ্বন্দ্ব এক ধরনের বাবু-জীবনের সরলীকরণ লাভ করেছিল। শ্রীশ-কমলমণির সংসার যাত্রাব মতোই তা ছিল বর্ণবিরল, আত্মমুখী। কলকাতার মধ্যবিত্ত জীবনের এই সীমিত পরিসরকে বঙ্কিম নিজ ন্যায় অনুসারে চিনতেন বলেই রজনীর আঙ্গিক-রীতিতে ওই জাতীয় আত্মকথনের রীতি অনুসরণ করেছেন। বঙ্কিমের অন্যান্য উপন্যাসের মতো রজনীতে সেই বিখ্যাত কারণ পরম্পরায় গ্রথিত ঘটনাধারার সাক্ষাৎ মেলে না। অমরনাথের উপস্থাপনা এবং উপসংহার যে পরিমাণে কাব্যময় সে পরিমাণে যুক্তিসিদ্ধ নয়। লবঙ্গলতাদেব বাড়ি উপন্যাসের প্রধান ঘটনাস্থলী। বজনীর মির্জাপুরের খাপরার ঘরের পরিবর্তে এই স্থানে ঘটনা-কল্পনায় কোনো আপত্তিই থাকত না যদি লবঙ্গলতার সংসারের নিজস্ব ছন্দটিও বিকশিত হত। রজনীর আত্মকথনে সকলেই নিজের কথা বলেছে বটে, কিন্তু সবটা মিলিয়ে সকলে পরিস্ফুট হয়নি। আরো বলা চলে যে রজনীর গল্প কলকাতায় ঘটেছে শুধু নামে। কলকাতা—এই শব্দটির এই উপন্যাসে কোনো অর্থ নেই। আমাদের জাতীয় জীবনের অসংলগ্নতায় এবং অসমবিকাশে কলকাতা শুধু বিত্তশালীর সৌখিন আশ্রয় হয়েই সাধারণ মানুষের কাছে রইল। সাধারণ ভাবে মানুষের জীবনের ছন্দে কোনো পরিবর্তন এল না। কলকাতায় তৎকালীন গ্রামীণ জীবনের সংঘাত ছিল না, নগর-জীবনের প্রচণ্ড গতিশীলতাও ছিল না। এই নিরাবেগ

জীবনে বঙ্কিমের ইঙ্গিত নাটকত্ত নেই, ওদিকে গঠন-রীতির নৈয়ায়িক শৃঙ্খলাও নেই। রজনীব আঙ্গিক-রীতিব মূল ব্যাখ্যা এইখানে।

গঠন-রীতির এই নৈয়ায়িক শৃঙ্খলা বঙ্কিমের ক্লাসিক-শুদ্ধ মনের প্রসাদে পুষ্ট। বঙ্কিমেব উৎকৃষ্ট শিল্পকর্মেব সর্বত্রই এই শৃঙ্খলাব পরিচয় মেলে। কপালকুণ্ডলা, কৃষ্ণকান্তেব উইল এবং শেষদিকে বাজসিংহ এ-প্রসঙ্গে সর্বোত্তম নিদর্শন। কৃষ্ণকান্তেব উইল উপন্যাসেব সমগ্র গঠন-বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। উপন্যাসটিকে বঙ্কিম তুটি খণ্ডে ভাগ করেছেন। প্রথম খণ্ডে আছে একত্রিশটি পরিচ্ছেদ, ঘটনাকাল বৎসব খানেকের মতো। দ্বিতীয় খণ্ডে পবিচ্ছেদের সংখ্যা পনেরো—সময়কাল আট বৎসব। প্রথম খণ্ডে ঘটনাগতি দ্রুত এবং জটিল। দ্বিতীয় খণ্ডে ঘটনা সবলরেখা সম্পন্ন। প্রথম খণ্ডে অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত ঘটনাজাল, একটি পূর্ণাঙ্গ পটভূমিকার রূপায়ণ। দ্বিতীয় খণ্ডে শুধু ট্র্যাজেডিব নির্মম আকর্ষণে নিম্নাবতবণ। ঘটনাব বীজ উপ্ত হয়ে গাছে পবিণত হতে লেগেছে এক বছব। তাবপব সে বিষবৃক্ষেব ফসল সকলে মিলে আহবণ কবেছে দীর্ঘ জীবন ধবে। কাজেই প্রথম খণ্ডেব দ্রুত লয় দ্বিতীয় খণ্ডে বিলম্বিত হযেছে। ঘটনাবিরল দ্বিতায় খণ্ডে বোহিণী হত্যাই একমাত্র ঘটনা। বাকি দীর্ঘকালের অসহনীয় শূন্যতাকে ছেঁকে শুধু প্রয়োজনায় কথাগুলিই মাত্র বলা হয়েছে। কাজেই এই কালেব মন্থবতাকে মন্থব লয়ে পনেবোটি পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে। নিচেব বেখাচিত্রটি অনুধাবনযোগ্য। এক, উইলেব কথা, তুই, রোহিণীর চৌর্য ও লাঞ্ছনা, তিন, বারুণী পুষ্কবিণীর ঘটনা এবং গোবিন্দলালের ভ্রমবের সঙ্গে বিচ্ছেদ, চাব, বোহিণী হত্যা, পাঁচ, ভ্রমবেব মৃত্যু, ছয়, গোবিন্দলালের সন্ন্যাস।
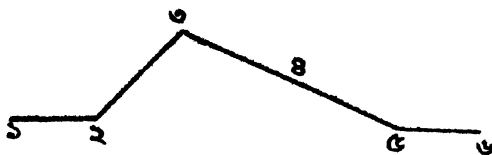
সময়কালেব দিক দিয়ে বিচাব করলে এক থেকে তিন পর্যন্ত ঘটনাকাল এক বছর, এবং তিন থেকে চার পর্যন্ত ঘটনাকালও এক বছব। এক থেকে তিন পর্যন্ত যে ক্ষেত্রে একত্রিশটি পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে, তিন থেকে চার পর্যন্ত আসতে সেক্ষেত্রে লেগেছে নয়টি পবিচ্ছেদ। কেননা তিন থেকে চার—

কেবলমাত্র প্রথম খণ্ডের ঘটনার তাড়নায় সংঘটিত পরিণাম। নতুন ঘটনা কিছু নয়। চার থেকে ছয় সময়কালের দিক থেকে সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ। ছয়টি পরিচ্ছেদে এই গভীর বেদনাবহ কালকে সংযমের সঙ্গে বর্ণনা করা হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। বর্ণনাকালে লেখকের সংযম, চিঠিপত্রে-বাচনে-আচরণে পাত্রপাত্রীদের পরিমিতিবোধ ট্র্যাজেডির দারুণ দুঃখভাবের মর্যাদা সর্বত্র রক্ষা করেছে।

বিষবৃক্ষের কাঠামোরও অনুরূপ বিশ্লেষণ সম্ভব। এবং সেখানেও দেখা যাবে যে উপন্যাসের গঠন-বিষয়ের অনুধ্যানে বঙ্কিম কী পরিমাণে যত্নশীল ব্যক্তি ছিলেন। নিচের রেখাচিত্রটি লক্ষণীয়
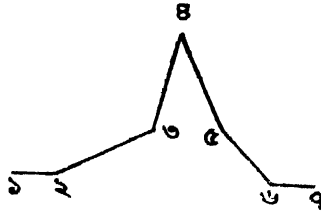
এক থেকে দুই পর্যন্ত মাত্র exposition বা ঘটনাভাস। নবম পরিচ্ছেদে কুন্দর বৈধব্য থেকে প্রকৃত ঘটনারম্ভ। দুই থেকে তিন কুন্দের বৈধব্য থেকে নগেন্দ্র ও কুন্দের পরস্পর আকর্ষণ ও কুন্দের হীরার কবলে পতন। তিন থেকে চার, একবিংশ পরিচ্ছেদ থেকে সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ নগেন্দ্র-সূর্যমুখীর সম্পর্কের জটিলতা, কুন্দ-নগেন্দ্রের বিবাহ, সূর্যমুখীর সংসার ত্যাগ। চার থেকে পাচ সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ থেকে চতুশ্চত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ পর্যন্ত নগেন্দ্রের অনুশোচনা এবং সূর্যমুখীর প্রত্যাবর্তন। পাচ থেকে ছয়, উনপঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ পর্যন্ত কুন্দের বিয়োগান্ত সমাপ্তি। সাত দেবেন্দ্র-হীরার উপসংহার জ্ঞাপন মাত্র। প্রকৃতপক্ষে দুই থেকে ছয় পর্যন্ত উপন্যাসের ঘটনাকাল। নগেন্দ্র কুন্দনন্দিনী সূর্যমুখী উপন্যাসের ঘটনার মুখ্য নায়ক হলেও কুন্দনন্দিনীই উপন্যাসের কেন্দ্র-বিন্দু। কুন্দের জীবনের এই প্রধান ঘটনাবহুল অংশের সময়কালও পরিমিত। সেই সময়কালকে সমানভাবে চল্লিশটি পরিচ্ছেদে বণ্টিত করে, কখনো চিত্রানুগ পদ্ধতিতে, কখনো দৃশ্যানুগ পদ্ধতিতে এবং কখনো নাট্যরসাশ্রয়ে উপন্যাসের পটকে পূর্ণ করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে নানাভাবে। এ ব্যাপারে লেখক কতটা সফল হয়েছেন তা পরে আলোচ্য। কপালকুণ্ডলার পরিকল্পনা অধিকতর

নাট্যাশ্রয়ী বলে এর গতি আরো সরল। কপালকুণ্ডলার গঠন-কৌশলকে এইভাবে কল্পনা করা যায় :

এক থেকে দুই, নবকুমারের সঙ্গে কপালকুণ্ডলার সাক্ষাৎ ও বিবাহ। দুই থেকে তিন, মতিবিবি আখ্যান, নবকুমারের দাম্পত্য জীবনের সংকট, কাপালিকের পুনরাবির্ভাব। তিন থেকে চার, অতিদ্রুত ঘটনাস্রোতের catastrophe-র মোহানায় অবতরণ। রাজসিংহ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, পরিচ্ছেদাশ্রিত ঘটনাগুলি শোভাযাত্রা করিয়া চলিয়াছে। রাজসিংহে ঘটনার শোভাযাত্রা বর্ণাঢ্য এইমাত্র। নতুবা, বঙ্কিমের সমস্ত উপন্যাসেই ঘটনার গতিপ্রাবল্য প্রথমাবধি অনুভূত হয়। এই ঘটনাগতির স্বরূপ কী এবং বঙ্কিমমানসের কোন্ সূত্র থেকে এই ঘটনাধারা-প্রবণতার জন্ম সে কথা কিছু পূর্বে আমরা আলোচনা করেছি। এই সূত্র যেখানে শিথিল সেখানে উপন্যাসেও বঙ্কিম শিথিলতার পরিচয় দিয়েছেন। যেমন মৃণালিনী। মৃণালিনীর জটিল আখ্যায়িকা এক প্রকার তাৎপর্যহীনতায় শেষ পর্যন্ত শিল্পকর্মকেই হানিগ্রস্ত করেছে। কেন করেছে সে-কথা পরবর্তী পরিচ্ছেদে বলা হচ্ছে।

•• ছয় •

মননশীলতা-জনিত সুসমতার প্রয়াসকে আমরা বঙ্কিমের উপন্যাসের ক্ষেত্রে তৃতীয় লক্ষণ বলে আখ্যাত করেছি। বঙ্কিমের বহু জনপ্রিয় উপন্যাসগুলিতে এই সুসমতার অভাব এবং প্রথম দিককার শিল্পোৎকর্ষ সমন্বিত সৃষ্টিগুলিতে উক্ত সুসমতার সার্থকতা এই দুটি বিষয়ই এ প্রসঙ্গে লক্ষণীয়। স্বভাবতই আমরা জানি যে মননশীলতা এবং মননশীলতা-জনিত সুসমতা এক কথা নয়। সুসমতা একটা শিল্পশ্রী। মননশীলতা মাত্র বুদ্ধিচর্চার ফসল। বঙ্কিমের রচনায় তথাকথিত রোমান্টিকতার উপাদান সহজেই সন্ধান করা যায়। কিন্তু জিজ্ঞাসু বঙ্কিমের যে পরিচয় আমরা জানি তাতে স্বভাবত বোঝা যায় যে বঙ্কিমের কল্পনার পরিমণ্ডলেও যুক্তি বা হেতু-জ্ঞানের অসদ্ভাব হবে না। কল্পনার দুরবগাহ লীলাকে তিনি সদাই কল্পনা-রসিকের মতো ধ্যানে ধারণ করতে চাইতেন। কিন্তু

কোম্‌তে-র উপযুক্ত ছাত্র হিসাবে কল্পনার স্বাধীন স্বেচ্ছাবিহারকে হেতুরহিত বলে স্বীকার করতেও পারতেন না। সেই কারণে দেখা যায় যে রোহিণীর বেদনা তাঁর কল্পনাকে স্পর্শ করে। তিনি সেখানে জীবনের রণস্থলীতে শক্তি-সমূহের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াগুলিকে কল্পনায় অনুভব করার চেষ্টা করেন—সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিতে বা যুক্তিতে তার ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন। বঙ্কিমের সমুদয় উৎকৃষ্ট উপন্যাসে—কপালকুণ্ডলা, বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল, রাজসিংহ সর্বত্রই এই রীতি রক্ষিত হয়েছে। বিষবৃক্ষে নগেন্দ্রনাথের আচরণের ব্যাখ্যা দানের প্রয়াস অথবা রজনীতে অমরনাথের আত্মচেতনামূলক স্বগত কথনে এই বিশ্লেষণের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। বঙ্কিম নায়ক-নায়িকার আচরণে যেন কোনো অস্বাভাবিকতা না সঞ্চারিত হয় সে বিষয়ে খুবই সচেতন। বঙ্কিম উপন্যাসের ঘটনা-সংস্থাপনের বেলাতেই এ বিষয়ে স্পষ্টত অবহিত থাকতেন। সে কারণে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে আকস্মিক ঘটনার ব্যবহার বিদ্যমান বটে, কিন্তু আচরণের অসঙ্গতিতে কখনই তাঁর প্রধান উপন্যাসের পাত্রপাত্রীরা দুষ্ট নয়। বুদ্ধিদীপ্ত এই যুক্তিপ্রবণতা বঙ্কিমের উপন্যাসের ভাষাতেও ছায়াপাত করেছে। লক্ষণীয় যে বঙ্কিমের উপন্যাসের ভাষা এবং তাঁর প্রবন্ধের ভাষার মধ্যে তফাত কেবল এইখানে যে উপন্যাসের ভাষা অলংকৃত, তীব্র বিশেষণ সচকিত উচ্চগ্রামের কল্পনার জন্য সদাপ্রস্তুত। তা না হলে প্রবন্ধের ভাষায় যে সতর্ক যুক্তিশীল নৈয়ায়িকতা তাঁর উপন্যাসের ভাষাও আত্মার দিকে তারই আত্মীয়। বিষবৃক্ষ উপন্যাসের নিম্নোদ্ধৃত অংশটি পরীক্ষার যোগ্য

> কার্পাস বস্ত্র মধ্যস্থ তপ্ত অঙ্গারের ন্যায়, দেবেন্দ্রের নিরুপম মূর্তি হীরার অন্তঃকরণকে স্তরে স্তরে দগ্ধ করিতেছিল। অনেকবার হীরার ধর্মভীতি এবং লোকলজ্জা, প্রণয়বেগে ভাসিয়া যাইবার উপক্রম হইল। কিন্তু দেবেন্দ্রের স্নেহহীন ইন্দ্রিয়পর চরিত্র মনে পড়াতে আবার তাহা বদ্ধমূল হইল। হীরা চিত্ত সংযমে বিশেষ ক্ষমতাশালিনী এবং সেই ক্ষমতা ছিল বলিয়াই সে বিশেষ ধর্মভীতা না হইয়াও এ পর্যন্ত সতীত্বধর্ম সহজেই রক্ষা করিয়াছিল। সেই ক্ষমতা প্রভাবেই সে দেবেন্দ্রের প্রতি প্রবলানুরাগ অপাত্রন্যস্ত জানিয়া সহজেই শমিত করিয়া রাখিতে পারিল। বরং চিত্ত সংযমের সদুপায়-স্বরূপ হীরা স্থির করিল যে পুনর্বার দাসীবৃত্তি অবলম্বন করিবে। পর গৃহের গৃহকর্মাদিতে অনুদিন নিরত থাকিলে, সে অন্য মনে এই বিফলানুরাগের বৃশ্চিক দংশনস্বরূপ জালা ভুলিতে পারিবে। নগেন্দ্র

যখন কুন্দনন্দিনীকে গোবিন্দপুরে রাখিয়া পর্যটনে যাত্রা করিলেন, তখন হীরা ভূতপূর্ব আনুগত্যের বলে দাসীত্ব ভিক্ষা করিল। কুন্দের অভিপ্রায় জানিয়া নগেন্দ্র হীরাকে কুন্দনন্দিনীর পরিচর্যায় নিযুক্ত রাখিয়া গেলেন।

অনুচ্ছেদটির শেষ বাক্য হীরার দাসীত্বে নিয়োগ-বার্তা জ্ঞাপন। লক্ষণীয় যে, অনুচ্ছেদটির প্রথম বাক্য থেকে শেষ বাক্য পর্যন্ত সমস্ত বাক্যগুলির মধ্যে কী পরিমাণ নৈয়ায়িক শৃঙ্খলা বিদ্যমান। উপন্যাসেও বঙ্কিম সদাসর্বদাই যেন সম্মুখে কোনো জিজ্ঞাসু প্রতিপক্ষকে কল্পনা করে রাখতেন। বাক্য-বিন্যাসে সেই প্রতিপক্ষের সঙ্গে বিতর্কের ঠাট স্পষ্ট। তিনি যে শুধু তাঁর বাক্যরীতিকে বার্তাজ্ঞাপক বা সংবাদবহ করে তুলতে চাইতেন তাই নয়—কেন ঘটল ঘটনাটি তারও একটা কৈফিয়ত যেন দিতে ব্যস্ত হতেন। পাঠকের গল্প জিজ্ঞাসায় "তার পরের" যে উত্তর, এবং সমালোচকের প্লটের প্রশ্নে "কেন"-র যে উত্তর —এই দুই প্রশ্নেরই তিনি এক সঙ্গে উত্তর প্রদান করতে চাইতেন। অবশ্যই উল্লেখ্য যে এ-পদ্ধতির একটা সমূহ বিপদাশঙ্কা হল লেখকের নিরাসক্তি রক্ষা করা সব সময় সম্ভব নাও হতে পারে। রোহিণীর মৃত্যুর পরে বঙ্কিমের প্রদত্ত কৈফিয়ত এই কারণেই শিল্পসম্মত হয়নি। তাই রোহিণী অত শীঘ্র মরিল— এ ঔপন্যাসিকের প্রদত্ত ব্যাখ্যা কদাচ হতে পারে না। সমালোচকের ব্যাখ্যায় এ উক্তি যদিবা সম্ভব। এই ভঙ্গিই আবার লেখকের অনধিকার প্রবেশের সহায়ক হতে পারে। যেমন সীতারাম উপন্যাসে ললিতগিরির বর্ণনায় প্রাচীন হিন্দু ও বর্তমান হিন্দুর তুলনা।

বঙ্কিমের উপন্যাসের নায়ক-নির্বাচন উপন্যাসের সুসমতা রক্ষায় যথেষ্ট কার্যকরী হয়েছে। বঙ্কিমের কোনো নায়ক বা নায়িকা ভাবাতিরেক-দুষ্ট নয়। যদিও প্রবল ঝঞ্ঝাবাত্যার মতো প্রচণ্ড বাসনাবেগে তারা আন্দোলিত হতে পারে - তথাপি শান্ত বা স্বাভাবিক অবস্থায় তারা প্রশান্ত সমুদ্রের মতোই সুস্থির। সেদিক থেকে সমুদ্রের সঙ্গেই বঙ্কিমচন্দ্রের নায়ক-নায়িকাদের তুলনা করা চলে। এ-প্রসঙ্গে আরো বলা চলে যে, কোনো বঙ্কিমী নায়ক যেমন ভাবাতিরেক-দুষ্ট নয়, তেমন প্রখর মননশীল বা বুদ্ধিবাদীও নয়। অমরনাথই হয়তো কিছুটা এর ব্যতিক্রম। তারা শিক্ষিত বুদ্ধিমান মধ্যবিত্ত সমাজের প্রতিনিধি। সাধারণ স্তরের মানুষ নয় মাত্র এ-কারণে যে, সাধারণ জীবন থেকে তাদের আহরণ করা হয়নি। এ রকম নির্বাচনের ফলে বঙ্কিমের জীবন-বিষয়ক নিরীক্ষণ লেখকের দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছে। প্রখর মননশীল নায়ক, যিনি বঙ্কিমের চিন্তার

প্রতিভূ হতে পারেন তিনি বঙ্কিমী উপন্যাসের অসাধারণ ঘটনাপুঞ্জের মধ্যে পতিত হয়ে অসাধারণ ব্যবহার করতেন। বঙ্কিমের লক্ষ্য কখনই তা ছিল না। বরঞ্চ সাধারণ বুদ্ধিমান শিক্ষিত মানুষের সমস্ত বহিরাবরণের অন্তস্থিত যে মানুষ, তাকে যন্ত্রণামথিত অবস্থায় আবিষ্কার করাই তাঁর ঔপন্যাসিক বাসনা ছিল। সে কারণেই অমরনাথের আত্মসচেতনতার আতিশয্যকে বঙ্কিম যথার্থ শিল্পবিন্যস্ত করতে পারেননি। দুঃখদহনের যন্ত্রণা-উত্তীর্ণ মানুষই যথার্থ আত্মত্যাগের শক্তিসম্পন্ন—এই বিষয় অমরনাথের আত্মকথনের ফলে হালকা হয়ে গেছে এবং সেই লঘূকরণের জন্য একদিক থেকে যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে উপন্যাসের আঙ্গিক-রীতি অপর দিকে তেমনি অমরনাথের ত্যাগজনিত বেদনাও হয়েছে ফিকে। বঙ্কিম বিষয়বস্তুর অসাধারণত্ব পরিহার করে নায়ককে অসাধারণ করতে প্রয়াসী হয়েছেন রজনীতে, আর এই ত্রুটিই আরো শিল্প-বিরহিত হয়ে দেখা দিয়েছে মৃণালিনীতে, যেখানে মনোরমাকে তিনি করে তুলতে গেছেন অনন্য কাব্যময় রহস্যস্বর্গবাসিনী, অসাধারণ। মনোরমার রহস্যময়তা উপন্যাসের নিষ্ঠুর বিশ্বাসঘাতকতার কাহিনীতে অসঙ্গত। উপন্যাসের সুসমতাকে সব দিক দিয়ে ব্যাহত করেছে মনোরমা চরিত্রের উচ্চমার্গী কল্পনা। শ্রদ্ধেয় ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মনোরমার চরিত্রের রহস্যময় দুরবগাহতার কাব্যব্যঞ্জনার বিস্ময়ে প্রশংসোক্তি করেছেন। কিন্তু উপন্যাসের বিচারে কোনো কিছুরই ভালো মন্দ হওয়া-না-হওয়ার একক অধিকার নেই। সামগ্রিকতা ব্যতীত উপন্যাসের অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশেরও বিচার সম্ভব হয়। কাজেই মনোরমার চরিত্রেরও বিচার উপন্যাসের সমগ্রের পরিপ্রেক্ষিতে হওয়া বাঞ্ছনীয়। মনোরমাকে রহস্যস্বর্গবাসিনী করে তুললে সে আর পশুপতি প্রসঙ্গে কোনো তাৎপর্যই সঞ্চার করতে পারে না—উপন্যাসেও কোনো উদ্দেশ্যসাধন তার দ্বারা হয় না। মৃণালিনী উপন্যাসের জটিল আখ্যায়িকাতে মনোরমাই জটিলতর গ্রন্থি —কোনো শিল্প-উদ্দেশ্য ব্যতিরেকেই। অমরনাথ এবং মৃণালিনীতে বঙ্কিমের অখণ্ড ঔপন্যাসিক সত্তা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছে। কাব্য এবং উপন্যাসের প্রতি দ্বৈত আনুগত্য রাখতে গিয়েই এই উপন্যাস দুটিতে সুসমতার হানি ঘটেছে।

সুসমতা বঙ্কিমের উপন্যাসের প্রধান গুণ। উপন্যাসের লজিক্যাল স্ট্রাকচার বা যুক্তিসিদ্ধ গঠন-রীতি থেকেই এই সুসমতার জন্ম। বঙ্কিম যত ধর্মবাদী হয়ে উঠছিলেন—যত তিনি অনুশীলনাদর্শকে মানব-মুক্তির অন্যতম পন্থা হিসেবে অনুভব করছিলেন, ততই বঙ্কিমের উপন্যাসে এই গুণের অভাব স্পষ্ট হচ্ছিল।

মৃত্যুর মুহূর্তে। 'আমি তোমার কেহ নহি'—এই উক্তির মধ্যেই রোহিণীর জীবনের সকল ট্র্যাজেডি নিহিত হয়ে রয়েছে। রোহিণী বলেছিল, যতদিন পায়ে রাখেন ততদিন দাসী। এ আর প্রেমপিপাসিতার কথা নয়। দেহজীবা নারীর কথা। কৃষ্ণকান্তের উইলের অন্য দুটি প্রধান চরিত্রের মতো রোহিণী চরিত্রও বঙ্কিম প্রতিভার উজ্জ্বল নিদর্শন। রোহিণী প্রথম উপস্থাপনা থেকে শেষ পরিণাম পর্যন্ত এক অখণ্ড ন্যায়-পবম্পবায় গঠিত। সে ন্যায়-পরম্পরাকে খণ্ডিত করার ক্ষমতা বুঝি বিধাতারও ছিল না।

•• দশ ••

রাজসিংহ বঙ্কিমের এমন একখানি গ্রন্থ যার আলোচনায় সমালোচকের বিপথে যাবার আশঙ্কা স্বল্প। রবীন্দ্রনাথের আলোচনা এ-ক্ষেত্রে পথ বেঁধে দিয়েছে। এবং রবীন্দ্রনাথের রাজসিংহ প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথেবও উপন্যাস আলোচনার এমন একটা উচ্চতম নিদর্শন যে তাবপবে আব রাজসিংহ সম্বন্ধে নতুনতর কিছু বলার প্রয়াস দুশ্চেষ্টা মাত্র। কেননা সে আলোচনা রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃতি নিয়ে শুরু করতে হবে এবং রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃতি দিয়েই শেষ কবতে হবে। রাজসিংহ উপন্যাসেব গঠন, তার ঘটনাগতি, চবিত্র-নির্মাণ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথই সুন্দরতম ব্যাখ্যাতা।

আমবা তাই এ আলোচনায় বাজসিংহ উপন্যাসেব ইতিহাসবস বিষয়েই আমাদের বক্তব্যকে সীমাবদ্ধ রাখব। আলোচনাকালে রবীন্দ্রনাথেরই অপর একটি প্রবন্ধ 'ঐতিহাসিক উপন্যাসে'র সহায়তা আমবা গ্রহণ কবব। ঐতিহাসিক রস নামটি রবীন্দ্রনাথের দেওয়া। ঐ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ কতকগুলি বিষয়ের আলোচনা করেছেন যা প্রণিধানযোগ্য। তার মধ্যে একটা কথা হল ইতিহাস বনাম জনশ্রুতির সম্পর্ক। ইতিহাসতত্ত্ব ইতিহাসরস নয়। উপন্যাসের কারবার রসকে নিয়ে, তত্ত্বকে সে সাহায্যার্থে আহ্বান করতে পাবে মাত্র। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে আজ যদি নবীন ঐতিহাসিক মহাভাবতের কৃষ্ণ-বলরাম বিষয়ে অনেক নবীন তত্ত্বসমূহ আবিষ্কার করে তাহলেও বেদব্যাসের মহাভারতের সমগ্র লুপ্তি ঘটবে না। ইতিহাসবেত্তা নিঃসন্দেহেই ইতিহাসের তথ্যের নির্ভর প্রামাণিকতাকে সবচেয়ে বেশি সম্মান দেবেন। ইতিহাসবেত্তার তথ্য বিস্মৃতিকে মৃণালিউ ক্ষমা করবে না এও সত্য কথা। কিন্তু যখন কোনো ঔপন্যাসিক ইতিহাসের গভীর কোনো খণ্ডাংশকে বিষয়ীভূত করে উপন্যাস রচনা করেন তখন তার কাছে

ঐতিহাসিক বিষয়ানুগত্য আশা করি কি না? এই প্রশ্নের মীমাংসায় অক্ষম হয়ে সার ফ্রান্সিস পালগ্রেভ বলেছেন যে ঐতিহাসিক উপন্যাস ইতিহাসের এবং গল্পের উভয়েরই শত্রু। অর্থাৎ ইতিহাসকে রক্ষা করতে গিয়ে গল্প এবং গল্পকে বাঁচাতে গিয়ে ইতিহাস এই শ্বশুরকুল পিতৃকুল উভয়েরই সর্বনাশ ঘটে।

স্বভাবতই এ আলোচনায় স্কটের আইভানহো আদর্শ নয়। কেননা যাঁরা নাকি ইওরোপের ধর্মযুদ্ধযাত্রা যুগের সম্বন্ধে কিছু জানতে চান তাঁরা যেন স্কটের আইভানহো পড়া থেকে বিরত থাকেন। কিন্তু ওঅর অ্যাণ্ড পীস নিশ্চয়ই সে জাতীয় উপন্যাস নয়। একটা জাতির উত্থান-পতন, ভাগ্য বিপর্যয়ের সঙ্গে লক্ষ লক্ষ ব্যক্তির ক্ষুদ্র জীবনের পতন অভ্যুদয় কেমন করে বিজড়িত হয়ে যায় ওঅর অ্যাণ্ড পীস নিশ্চয় তারই প্রমাণ। এবং ইতিহাসের মূল স্বরকে বিকৃত না করে ইতিহাসের ঘূর্ণায়মান চাকার রন্ধ্রপথে কেমন করে ঔপন্যাসিক স্বীয় কল্পনাকে বিকশিত করে তুলতে পারেন ওঅর অ্যাণ্ড পীস তারও প্রমাণ বটে। বলা বাহুল্য ওঅর অ্যাণ্ড পীস ইতিহাস-রসাশ্রিত উপন্যাসের ক্ষেত্রে এখন ধ্রুপদী মর্যাদার অধিকারী। কট্টর ঐতিহাসিক ও গোঁড়া সাহিত্য প্রেমিক (জানি না এ দুই বস্তুই সম্ভব কিনা) উভয়েই টলস্টয়ের এই শ্বশুরকুল-পিতৃকুল রক্ষার (কথাটা রবীন্দ্রনাথের) অপূর্ব ক্ষমতায় ও মহাভারতকল্প ঐশ্বর্যে মুগ্ধ হয়ে থাকেন। সেই টলস্টয় ইতিহাস ও ব্যক্তির সম্পর্ক সম্বন্ধে ওঅর অ্যাণ্ড পীস উপন্যাসে বলেছেন :

> The life of man is twofold—one side of it is his own personal experience, which is free and independent in proportion as his interests are lofty and transcendental, the other is his social life as an atom in the human swarm which binds him down with its laws and forces him to submit them. For although a man has a conscious individual existence, do what he will, he is but the inconscient tool of history and humanity.

এইটুকুর জন্য অবশ্যই টলস্টয়ের সাক্ষ্য প্রয়োজনে লাগে না। কিন্তু ঠিক এর পরের বাক্য অনুধাবন করলেই দেখা যাবে যে মানুষের জীবনে অদৃষ্টের এবং অনিবার্যতার বিষয়টিকে টলস্টয় কীভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন :

> The higher he stands on the social ladder, the more

numerous the fellow being whom he can influence, the more clearly do we perceive the predestined and irresistible necessity of his every action.

টলস্টয়ের জীবনদর্শনের ব্যাখ্যা তিনি নিজেই করেছেন। উচ্চাকাঙ্ক্ষা, কীর্তি বা যে কারণেই হোক না কেন মানুষের স্বাধীন সত্তা যতই সামাজিক ভাবে বড়ো জীবনকে আঁকড়ে ধরে ততই তার জীবন অনিবার্য ইতিহাসের নিয়মের বশীভূত হয়। এই নিয়মের বাইরে স্বাধীন মানবিক সত্তার অস্তিত্ব সে পরিমাণেই বিদ্যমান যে পরিমাণে তার interests are lofty and transcendental. ওঅর অ্যাণ্ড পীস উপন্যাসে বোধহয় এ ধরনের স্বাধীন মানবিক সত্তার উজ্জ্বলতম নিদর্শন প্লেটো ক্যারাটিয়েভ—যে স্থূল সাধারণ মানুষটির সঙ্গে নায়ক পিয়েরের বন্দীযাত্রার কালে বন্ধুত্ব হয়েছিল।

টলস্টয়ের ইতিহাস ব্যাখ্যায় একটা প্রশ্ন স্বতঃই উত্থাপনযোগ্য। সামাজিক জীবন এবং মুক্ত ইচ্ছাময় জীবন বলে যে দুই ভাগ তিনি করেছেন তা বাস্তবে কতখানি সম্ভাব্য। বিরাট ঐতিহাসিক ঘটনাচক্রের ঘূর্ণনের কালে ব্যক্তির স্বাধীন বিযুক্ত অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র কি একেবারে অস্পৃষ্ট থাকা সম্ভব? উক্ত ক্যারাটিয়েভ চরিত্রটির সাহায্যে প্রত্যক্ষ ভাবে এবং পরোক্ষে আরো নানাভাবে টলস্টয় হয়তো এ কথা বোঝাতে চেয়েছেন কিন্তু কার্যকারণ পরম্পরার স্রোতে যে ব্যক্তি এবং সমাট সকলেই ভেসে যায় এ কথাকে টলস্টয় অস্বীকার উপন্যাসে প্রমাণিত পারেননি।

বলা বাহুল্য বঙ্কিমের এ জাতীয় কোনো ইতিহাসদৃষ্টি ছিল না। তিনি মানুষের দ্বৈত জীবনের স্বরূপকে স্পষ্টত উপলব্ধির কোনো চেষ্টা করেননি বটে, কিন্তু তাহলেও উপন্যাসের সাক্ষ্য থেকে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া চলে যে বঙ্কিমেরও ইতিহাস চেতনা অনুরূপ খাতেই প্রবাহিত হয়েছিল। যেমন নবাবর-দরিয়ার উপাখ্যান। জেবউন্নিসার আখ্যান। জেবউন্নিসা যতক্ষণ অহংসর্বস্ব অন্তঃপুরচারী লোভের, সংকীর্ণতার এবং শক্তিমদমত্ততার প্রতিভূ ততক্ষণ সে ইতিহাসের চালক এবং ইতিহাসের দ্বারা চালিত বটে। যে মুহূর্তে জীবনের আঘাতে ভাগ্য বিপর্যয়ের নিদারুণ দুঃখ বঞ্চনাতে তার সকল অহংকারের, প্রতিপত্তি ও প্রিয় অভীপ্সার মূলে টান পড়েছে—সে যেখানে চাষার মেয়ের মতন কাঁদছে—সেখানে সে আর ইতিহাসের ঘটনার নিয়ামক জেবউন্নিসা নয়। প্রকৃতপক্ষে সে তখন সাধারণ নারী। নিরভিমান সাধারণ অনুচ্চাকাঙ্ক্ষী মানুষকে ইতিহাস

স্পর্শ করতে পারে না—যদি না বাইরের ঘটনার জাল তার ওপর বিস্তৃত হয়। যেমন চন্দ্রশেখর। জেবউন্নিসার কান্নার মুহূর্তে ইতিহাসের বৃহৎ দায় থেকে তার মুক্তি ঘটেছে। এটা তার মনুষ্যত্বেরও মুক্তি বটে।

টলস্টয় এবং বঙ্কিম উভয়েই ইতিহাসকে নিজ ব্যাখ্যায় আলোকিত করার পক্ষপাতী। সে ব্যাখ্যা তথাকথিত কল্পনা-শাসিত বলে তাকে ছোট করা যাবে না। কেননা এ-ক্ষেত্রে কল্পনা উৎকৃষ্ট মননসঞ্জাত বুদ্ধির বা অন্তর্দৃষ্টির নামান্তর নেপোলিয়নের চেহারা টলস্টয় যেমন দেখিয়েছেন ঐতিহাসিকেরা সে বিষয়ে সকলেই কি একমত? ঐতিহাসিক প্রশ্ন বাদ দিয়েও বলা চলে যে অ্যাবট-এর লেখা নেপোলিয়নের জীবনীতে যে নেপোলিয়নকে পাই তার সঙ্গে বোরো-দিনোর যুদ্ধক্ষেত্রে টলস্টয়ের আঁকা নেপোলিয়নের সাদৃশ্য কোথায়? সেনাপতি কুটজভের ভূমিকা নেপোলিয়নীয় যুদ্ধে কী ছিল তার সম্বন্ধে টলস্টয়ের সিদ্ধান্ত কোন্ ঐতিহাসিকের সঙ্গে মেলে, কার সঙ্গে মেলে না তার কি কোনো স্থিরত্ব আছে? আসলে এ সমস্ত ক্ষেত্রে ঐতিহাসিকের অনুশাসনের মর্যাদা ঔপন্যাসিক সদাই মেনে চলবেন এ-রকম প্রত্যাশা কেউ করেন না। নিজ অন্তর্দৃষ্টি তথা কল্পনায় ঔপন্যাসিক এ-ক্ষেত্রে স্বাধীন। প্রশ্ন—কতখানি স্বাধীন? ইতিহাসের সত্যের যে কাঠামো তার ব্যত্যয় না করা পর্যন্ত স্বাধীন কতক্ষণ স্বাধীন? যতক্ষণ ইতিহাসের মূল সিদ্ধান্তগুলিকে তিনি লঙ্ঘন না করছেন নেপোলিয়ন ভীরু অথবা যুদ্ধবিমুখ, কুটজভ দেশদ্রোহী এমন কোনো সিদ্ধান্ত অচল। কেননা এখানে লোক-মানব-বিধৃত সত্যকে তিনি আঘাত করলেন। সুতরাং ঐতিহাসিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে বলা যায় যে ঔপন্যাসিকের স্বাধীন কল্পনা ইতিহাসের বৃহৎ সত্যের তটভূমিতে বাঁধা। নদী যেমন স্বেচ্ছাগামিনী হয়েও তটবন্দী, ঐতিহাসিক উপন্যাসের কল্পনাও তাই। সুতরাং রাজসিংহ উপন্যাসের ঐতিহাসিকতা বিচারও হবে সেই দৃষ্টিতেই। ডাঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয় যে পদ্ধতিতে রাজসিংহ উপন্যাসের ইতিহাস-বিষয়ক ত্রুটি নির্দেশ করেছেন তাতে ইতিহাসের বিষয়ে বঙ্কিমের জ্ঞান আরো উন্নতির অপেক্ষা রাখত এ-কথা বোঝা গেল। কিন্তু এ-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রশ্নটি খুবই সমীচীন। কবে জানা যাবে যে একটা বিষয় সম্বন্ধে ইতিহাসবেত্তাদের শেষতম কথা বলা আজই হয়ে গেল? কোনোদিনই না। কাজেই প্রশ্নটি অন্যদিক থেকে হওয়া বাঞ্ছনীয় বলে মনে করি। কী ইতিহাস বঙ্কিম পরিবেশন করেছেন সেটা বিবেচ্য নয়—কী পদ্ধতিতে ইতিহাসের মূল সুরকে তিনি

মানব জীবনের ব্যক্তিস্বরূপের সঙ্গে মিলিয়েছেন—সেটাই বিচার্য। বলা যেতে পারে যে ঔরঙ্গজীবের সময়কাল থেকেই মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের কারণাবলী সক্রিয় হতে শুরু করল। বলা যেতে পারে যে ঔরঙ্গজীবের চরিত্রের মধ্যেও সে কারণের অনেকখানি নিহিত ছিল। মনে হতে পারে যে ঔরঙ্গজীবের ন্যায় প্রবলপ্রতাপ মুঘল সম্রাটকে যেন বেশ কিছুটা অসহায় করে অঙ্কিত করা হয়েছে কিন্তু তার জন্যে খ্যাতনামা ঐতিহাসিকদের উদ্ধৃতি সংগ্রহে কোনো লাভ নেই। বোরোদিনোর যুদ্ধক্ষেত্রে নেপোলিয়ন এবং কুটজভ উভয়কেই মনে হবে যুদ্ধের ব্যাপারে এ দুটো লোক একেবারেই বাহুল্য। যে বিপুল জনসমষ্টি সেই প্রান্তরে জড়ো হয়েছে তাদের প্রতিটি অংশের সম্মিলিত ও সমষ্টিগত চেহারাকে যেমন সেই বিপুল জনসমাবেশ চেনে না, তেমনি ঐ সেনাপতি এবং সম্রাটও চেনেন না। এর দ্বারা নেপোলিয়নকে হেয় করা হচ্ছে না। ইতিহাসের কোনো অধ্যায়ের পরিণতি যখন ঘটতে থাকে তখন তার সুবিপুল ঘূর্ণাবেগে সে অধ্যায়ের রচয়িতারাও কেমন অকিঞ্চিৎকর হয়ে যায় সেটা দেখানো টলস্টয়ের উদ্দেশ্য ছিল। ঔরঙ্গজীবকে মুঘল অন্তঃপুরে এবং যুদ্ধক্ষেত্রে সেভাবে বঙ্কিমচন্দ্রও উপস্থাপিত করেছেন। ঔরঙ্গজীবের প্রতিশোধাকাঙ্ক্ষা রাজসিংহ উপন্যাসের জনক। এই জনকেরও আর উপন্যাসটি দুই পরিচ্ছেদ অগ্রসর হবার পর সাধ্য ছিল না যে ঘটনা প্রবাহ প্রত্যাহার করে নেয়। জেবউন্নিসা উদিপুরী প্রমুখের ব্যাপারেও তাই। একটি বিশাল সাম্রাজ্যের পতনের ব্যাপারে স্বভাবতই নানা উপাদান সক্রিয় হতে থাকে। তারই সূত্রপাত জেবউন্নিসায় ও উদিপুরীতে। মুঘল হারেমও অন্তঃপুরের নানামুখী বিভিন্ন জটিলতার ব্যাপারকে স্পষ্ট করে বঙ্কিমচন্দ্র ঔপন্যাসি-কের কল্পনাকে কার্যকরী করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রধান ত্রুটি অবশ্যই জেবউন্নিসায়। জেবউন্নিসাকে এখনকার আলোকে বিচার না করে বঙ্কিম-সৃজিত চরিত্রের পৃথক মর্যাদায় বিচার করলে ইতিহাসের জেবউন্নিসাকে হারিয়ে উপন্যাসের জেবউন্নিসাকে লাভ করা যায়। তাতে নিঃসন্দেহেই ইতিহাসের ক্ষতি।

যে রাজপুত-নীতি ঔরঙ্গজীবের সাম্রাজ্যের পতনের জন্য অনেকখানি দায়ী সে রাজপুত-নীতিও ঔরঙ্গজীবের উগ্র অহং-এর ফল—বঙ্কিম এই রকম বুঝেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন যে সম্রাটের প্রতাপাতিশয্যে ঔরঙ্গজীব বিদ্রোহীকে কিছুই সহ্য করতে পারতেন না। তিনি যোধপুরীকে দেবার্চনা করতে দিতেন কারণ তিনি সম্রাটের মহিমায় সেটা মঞ্জুর করতেন বলে। ইতিহাসের ব্যাখ্যায় যে মুঘল সম্রাটকে ধর্মান্ধবলে পাই তাকে বঙ্কিম এইভাবে রূপায়িত করেছেন। বলা যায় না

কি ইতিহাসের প্রদত্ত ব্যাখ্যাকে অমান্য না করে বঙ্কিম মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের একটি নিজস্ব ব্যাখ্যা দিয়েছেন? একগুঁয়ে এবং জেদী ঔরঙ্গজীবকে, ধূর্ত ঔরঙ্গজীবকে রাজসিংহ উপন্যাসে ঠিক ভাবেই ব্যবহার করা হয়েছে। এবং নানা কিছুর মধ্যে যেমন মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের বীজ অনুসন্ধান করা হয় বঙ্কিমের ব্যাখ্যায় তার কোনোটিকেই অস্বীকার করা হয়নি। বরং নেপোলিয়নের মতোই মহামান্য মুঘল সম্রাটও কেমন ইতিহাসের ক্রীড়নক সাধারণ মানুষ সেটাই দেখানো হয়েছে।

অবশ্য, বঙ্কিম সমকালীন ইতিহাসসূত্র ব্যবহার করেছিলেন, এবং সে সূত্রগুলির তৎকালীন সীমাবদ্ধতার কথাও স্মরণে রাখতে হবে।* কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য হল সেই সীমাবদ্ধতার মাঝখানেও বঙ্কিমচন্দ্র কেমনভাবে নিজ কল্পনায় বা অন্তর্দৃষ্টিতে ঐতিহাসিক সত্যকে নতুন ভাবে আলোকিত করেছেন তা দেখানো। রাজসিংহে বঙ্কিমের একটি অনন্যসাধারণ ত্রুটি আত্মপ্রকাশ করল এবং শেষদিকের উপন্যাসাবলীতে সে ত্রুটি ক্রমশ স্ফুটতর হতে থাকে। সে ত্রুটি হল উপন্যাসের কাহিনীস্রোতের মাঝে মাঝে প্রত্যক্ষভাবে লেখকের অবতরণ। ঔরঙ্গজীবের অন্তঃপুর বর্ণনায় উদীপুরীকে বিবাহ করার কাহিনী প্রসঙ্গে বঙ্কিমের নিজ কণ্ঠে উড়িয়ার গল্প বলা এই শ্রেণীর মহৎ দোষ। চন্দ্রশেখরে প্রতাপের উদ্দেশে শেষ বক্তৃতা যদিবা ক্ষমাহ, উড়িয়ার গল্পের কোনো কৈফিয়ত নেই। মিলের লজিক-পড়া ছাত্রদের এবম্বিধ illogical কাজের ব্যাখ্যা একমাত্র এই যে তার প্রতি পাঠকের বিশ্বাসেরও যে একটি সীমা আছে সেটা তিনি বিশ্বাস করতেন না।

•• এগারো ••

চন্দ্রশেখর, রজনী, আনন্দমঠ, সীতারাম প্রমুখ বঙ্কিমের অন্য সৃষ্টিগুলি সম্বন্ধে আমরা পৃথক আলোচনা করলাম না। এর কারণ এগুলিকে আমরা অনালোচ্য বলে মনে করি এমন নয়। আমরা বঙ্কিম-প্রতিভাকে প্রধানত বুঝতে চেয়েছি উপন্যাসের শিল্পস্রষ্টা হিসাবে। যে চারখানি উপন্যাস আমরা আলোচনা করলাম বঙ্কিমের শিল্পী-জীবনের সম্যক্ শক্তির (এবং দুর্বলতার) দিক থেকে তারা প্রতিনিধিস্থানীয়। বঙ্কিম যে কারণে বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যে রসস্রষ্টা হিসাবে

* সেক্ষেত্রে টলস্টয়ের হাতে ইতিহাসের মূল্যবান উপাদান ছিল। Segur-এর Napoleon's Russian Compaign-এর মতো পুস্তকের পূর্ণ ব্যবহার টলস্টয় করেছিলেন।

চিরস্থায়ী মর্যাদা পাবেন সে কারণগুলির সবকটিই আমাদের আলোচিত গ্রন্থে উপস্থিত।

আমরা যা আলোচনা করলাম তার মূল কথা এই যে, বঙ্কিম ভারতবর্ষের জীবনকে, তার বহুকালগত জীবনাচরণকে নবকালের ঘাত-প্রতিঘাত সমেত উপন্যাসে ব্যবহার করেছেন ও করতে চেয়েছেন। তাঁর প্রায় সকল উপন্যাসের সমস্যারম্ভের মূলে রয়েছে জীবনযাপনের মূলসূত্রগুলিতে কোনো না কোনো প্রকার ব্যত্যয়। বঙ্কিমের কালে এই বিষয়বস্তুর যে মূল্য ছিল তার সীমার বাইরে এসেও যে বঙ্কিমের সাহিত্যকর্মের মূল্যহানি হয়নি এর কারণ জীবনকে শেষ পর্যন্ত বঙ্কিম দু-হাতে ছুঁয়েছিলেন। মানুষের যন্ত্রণাকে, বাসনাকে, বাসনার অচরিতার্থতা-জনিত অশ্রুকে বঙ্কিম কখনও ছোট করে দেখেননি। বরং মানুষের জীবনযাপনে, কর্মে, ধ্যানে এদের প্রভাব কতখানি বস্তুত অপরিহার্য সে-কথাই বলেছেন তাঁর সৃজিত চরিত্রের মাধ্যমে। জীবনই সত্য এবং জীবনাতীত জীবনাতীতই থাকে তা নিয়ে জীবনের কোনো সান্ত্বনা নেই—সচেতন ভাবে বঙ্কিম এ-কথা বলেছিলেন। তাই "তিনিই আমার ভ্রমর, ভ্রমরাধিক ভ্রমর" গোবিন্দলালের সন্ন্যাস-জীবনের এই উক্তিতে পৃথিবীর ভালবাসার অমর স্মৃতিই প্রতিধ্বনিত হয়। তাই শৈবলিনীকে ভালবাসে কি না সন্ন্যাসীর এই জিজ্ঞাসায় প্রতাপ যখন ভীমগর্জন করে বলে ওঠে—তাহা তুমি কি বুঝিবে সন্ন্যাসী—তখনও সেই জীবন-স্মৃতিই শেষবার কথা কয় প্রতাপের কণ্ঠে। জীবনকে বোঝবার অনলস বুদ্ধিদীপ্ত চেষ্টায় বঙ্কিমের শিল্প প্রচেষ্টার ও নৈতিক সচেতনতার মূল্য।

•• বারো ••

আমরা আগেই বলেছি যে উপন্যাসের সঙ্গে তার পাঠকমণ্ডলীর সম্পর্ক নিবিড়। পাঠকের বিশিষ্ট জীবনাগ্রহের প্রভাব উপন্যাসের একটা নিয়ামক উপাদান বটে। স্ব-কাল এবং স্বীয় সমাজ সম্বন্ধে পাঠকমণ্ডলীর কৌতূহলের মূলে রয়েছে নিজেরই জীবন-বিষয়ক জটিলতার নানা প্রশ্নের সদুত্তর প্রার্থনা। যে উপন্যাস পাঠকমণ্ডলীর জীবন-বিষয়ক চেতনার পরিপোষক সে উপন্যাস সাধারণত জনপ্রিয়। বঙ্কিমের কালে আমাদের পাঠকমণ্ডলীর জীবনাগ্রহের মূল ব্যাপার ছিল জানবার পিপাসা। জগৎ সংসারে আমাদের প্রত্যহের চেনা অভিজ্ঞতার বাইরে যা ঘটে তার জন্য একটা আগ্রহ এ-যুগে পাঠকমণ্ডলীর

মধ্যে গড়ে উঠেছিল। এ-যুগের লেখকেরা উপন্যাসের শিল্পকর্মে পাঠকদের এই আগ্রহকে প্রধানত ক্ষুণ্ণ করতে চাইতেন না। পাঠকদের এই জানার ইচ্ছাকে গড়ে তুলেছিল এ-যুগের সংবাদপত্রগুলি। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ থেকে সংবাদপত্রগুলিতে পাঠকদের ক্রমবর্ধমান আগ্রহ একটা রীতিমতো তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার। এই আগ্রহেই প্রকৃতপক্ষে নবযুগের সমকালীন জীবন-বিষয়ক আগ্রহের প্রাথমিক রূপ। সংবাদপত্রের এই পাঠকমণ্ডলীই ধীরে ধীরে বাংলা উপন্যাসের পাঠকমণ্ডলীতে রূপান্তরিত হল। সেকালের নানা সংবাদপত্রে পাঠকমণ্ডলীর প্রেরিত নানা পত্র প্রকাশিত হত। পত্রগুলির অধিকাংশই প্রেরকদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে লিখিত থাকত। দীর্ঘ উদ্ধৃতির সাহায্যে প্রমাণ করা যায় যে সাংবাদিক লক্ষ্য পত্রগুলির সর্বস্ব ছিল না। বহু পত্রে প্রেরকদের বিচিত্র অভিজ্ঞতা সমাজ সমালোচনায়, ব্যঙ্গে, কারুণ্যে শ্রীমণ্ডিত হবার প্রবণতা দেখিয়েছে এ-নিদর্শন বিরল নয়। পত্রগুলির বাহুল্য এ-কথাও প্রমাণ করে যে পাঠকমণ্ডলীর কাছে সংবাদ সমন্বিত পত্রগুলির যথেষ্ট চাহিদা ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্লট-প্রধান উপন্যাসের জন্য মনোভূমি রচনায় সংবাদপত্রগুলির ভূমিকা ন্যূন নয়। কিন্তু আমাদের ঔপনিবেশিক জীবনে ঘটনার চেহারায় ও প্রকৃতিতে কত বৈচিত্র্য সম্ভব? আইন আদালতাশ্রয়ী জীবন গড়ে উঠতে যে সংবাদ ক্ষুধার উদ্রেক হল তা নিঃসন্দেহে দেখতে দেখতে বিচিত্রের চেহারা হারিয়ে ফেলে মিশে গেল বর্ণছুট আ্যাভারেজের দলে। উপন্যাসকারেরা উজ্জ্বল এবং আদর্শ শিল্পকর্মের সাহায্যে ঘটনাকে ব্যক্তির সঙ্গে গ্রথিত করে ব্যক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে নতুন আলোকসম্পাত করলেন। প্লট-প্রধান উপন্যাসের ঘটনাগত গাঁথুনিও ধীরে ধীরে শিল্পের দাবিকে হারিয়ে ফেলতে লাগল সংবাদ কৌতূহলের কাছে। কপালকুণ্ডলার শেষ অবধি কী হল জানতে চাওয়া শিল্প-পিপাসা নয়, সংবাদ-পিপাসা। এইভাবে প্লট-প্রধান গল্পের জের নৌকাডুবি এবং নৌকাডুবির অনুকরণে জাহাজডুবি প্রভৃতি উপন্যাস পর্যন্ত চলেছিল।

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের কালেই ধীরে ধীরে অসাধারণ মানুষদের অসাধারণ ঘটনা সমন্বিত ঐতিহাসিক উপন্যাস এবং সামাজিক ঘটনাবহুল উপন্যাস সম্বন্ধে প্রতিক্রিয়া পাঠকমণ্ডলীতে জেগে উঠছিল। স্বর্ণলতা তার একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। স্বর্ণলতার লেখক তাঁর ভূমিকার স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে যে খুব সচেতন ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র প্রসঙ্গে মাঝে মাঝে স্নিগ্ধ বিদ্রূপে ও বঙ্কিমের রচনাভঙ্গির

প্যারডিতে তার প্রমাণ মেলে। স্বর্ণলতার বৈশিষ্ট্য দুটি। এক, ঘটনাবাহুল্য পরিহার, দুই, গ্রাম সমাজের ব্যাপকতর রূপাঙ্কনের প্রচেষ্টা। গ্রামের সাধারণ মানুষের চিত্র হিসাবে শ্যামা ও নীলকমল অবিস্মরণীয়। লেখকের হাস্যরস চেতনায় সমগ্র রচনাটি হীরক খণ্ডের অন্তর্নিহিত দ্যুতির মতো আলোকোজ্জ্বল। স্বর্ণলতার কোনো কেন্দ্রীয় লক্ষ্য না থাকায় এ কেবলমাত্র পারিবারিক আলেখ্য হয়ে উঠেছে। লেখকের মনন ও কল্পনার অভাব সে কারণে দায়ী। বইখানির তাৎপর্য শুধু বঙ্কিমের সাহিত্য যুগের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার প্রথম প্রকাশে। এই প্রতিক্রিয়াই রবীন্দ্র কথাসাহিত্যে প্রকাশিত হবার আগে কথা বলেছিল ছিন্নপত্রে· বলেছিল যে "উনিশ শতকের পোষ্যপুত্র বাঙালীর" ছবি বঙ্কিমচন্দ্র এঁকে থাকলেও "চন্দ্রশেখর, প্রতাপ প্রভৃতি কতগুলো বড়ো বড়ো মানুষ এঁকেছেন, কিন্তু বাঙালী আঁকতে পারেননি। আমাদের এই চিরপীড়িত, ধৈর্যশীল স্বজনবৎসল, বাস্তুভিটাবলম্বী, প্রচণ্ড কর্মশীল পৃথিবীর এক নিভৃত প্রান্তবাসী শান্ত বাঙালীর কাহিনী কেউ ভালো করে বলেনি।" কিন্তু সেই নিভৃত প্রান্তবাসী বাঙালীর কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন তার গল্পগুচ্ছে। তাঁর উপন্যাসের কথা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

রবীন্দ্রনাথ ও বাংলা উপন্যাসের নবনিরীক্ষা

•• এক ••

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস-সংক্রান্ত আলোচনা সাধারণত এইভাবে আমাদের দেশে শুরু হয়ে থাকে যে তাঁর কলম কবির হয়েও ঔপন্যাসিকের বটে। যেন রবীন্দ্রনাথের কবিসত্তায় এবং ঔপন্যাসিকের সত্তায় একটা বিরোধ আছে। অথবা প্রতি কথায় রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে কল্পনার সম্পদ, তার সূক্ষ্ম লীলা সম্পর্কে আমরা বাগবৈভবের সমারোহ দেখিয়ে থাকি—যেন রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসও তাঁর কবিকীর্তিরই আর এক শাখা। এই সমস্ত তর্কমূল থেকে যাত্রা শুরু করলে সরলীকরণের সুবিধা ব্যতীত আর কোনো বৃহত্তর লাভের আশা করা যায় না। আবার বিপরীত প্রকারের বিপদও কম নয়। যেহেতু তিনি কবি কাজেই ভাবময়তার আতিশয্য, অবাস্তব আদর্শবিলাস তাঁর উপন্যাসে ঘন ঘন আবিষ্কৃত হবে। গোরা এবং চতুরঙ্গ সম্বন্ধে এই বিচার-বিভ্রাটই এখানে স্থায়ী হয়ে রয়েছে। এই বিচার-বিভ্রাটগুলির কারণ এই যে সমাজ ও সভ্যতার যে পযায়ে উপন্যাসের জন্ম অনিবার্য হয়ে উঠেছিল সেই পর্যায়ের জীবনাগ্রহেব বিশিষ্ট চেহারা সম্বন্ধে আমরা সচেতন নই। উপন্যাস আলোচনা যে কেবল গল্প-চরিত্র এবং প্লটের গাঁথুনির বিবরণী প্রদান নয়—জীবনের নিবিড় সম্পর্কে বিশিষ্ট শিল্প বলেই সমাজ এবং সভ্যতার বিভিন্ন আকর্ষণ ও চাপের প্রশ্নটা উপন্যাস আলোচনার ক্ষেত্রে অপরিহার্য, সুখের বিষয় বাংলা সমালোচনা সাহিত্যে ধীরে ধীরে সে বোধ স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

জগৎ এবং জীবন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের যে বিশিষ্ট আগ্রহ তার উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়েছে তার আলোচনার ভিতরেই রবীন্দ্র-উপন্যাস পাঠের ভূমিকা

প্রস্তুত হবে। বুদ্ধদেব বসু তাঁর রবীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্য-বিষয়ক বিখ্যাত গ্রন্থে একস্থানে বলেছেন যে রবীন্দ্রনাথের উদ্ভাবনী শক্তি দুর্বল ছিল। এ কথার উত্তর আমরা গোরা উপন্যাস আলোচনাকালে দেবার প্রয়াস পাব। আপাতত কার্যারম্ভকারী অনুমান সূত্র হিসাবে আমরা কথাটা মেনে নিলাম। বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পার্থক্যটাই এখানে। ঘটনা ব্যতীত বঙ্কিম অগ্রসর হতে পারতেন না। ব্যক্তি এবং ঘটনার পরস্পর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় উপন্যাসের গতি নির্ভরশীল—বঙ্কিম এ-রকম ধারণার পোষকতা করতেন। সেই জন্য তাঁর শেষ দিককার সৃষ্টিতে ব্যক্তিত্বের সমস্যা অপেক্ষা ব্যক্তির সমস্যাই প্রধান হয়ে উঠেছিল। অবশ্য ঘটনা ব্যতীত রবীন্দ্রনাথও (এমন কি জেমস জয়েসও) অগ্রসর হতে পারেন না। অথচ সে ঘটনার চেহারা অন্য। রবীন্দ্রনাথ বৌ ঠাকুরানীর হাট থেকেই ক্রমশ এই ঘটনানির্ভর ঔপন্যাসিক পদ্ধতিকে পরিহার করতে সচেষ্ট হন। রাজর্ষিতে ঘটনানির্ভরতা থাকলেও ববীন্দ্রনাথের নিজস্ব জীবন-বিষয়ক চিন্তা আস্তে আস্তে স্পষ্ট হচ্ছিল সে-কথা সহজেই বোঝা যায়। চোখের বালিতে রবীন্দ্রনাথেব উপন্যাস যাত্রার প্রকৃত আরম্ভ। আমাদের সূত্র অনুযায়ী চোখের বালি তাঁব তাৎপর্যপূর্ণ রচনা। চোখের বালির ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ নিজ শিল্পাদর্শের কিছুটা ব্যাখ্যা করেছেন। বলেছেন :

> সাহিত্যের নব পর্যায়ের পদ্ধতি হচ্ছে ঘটনা-পবম্পরার বিবরণ দেওয়া নয়, বিশ্লেষণ করে তাঁদের আঁতের কথা বের করে দেখানো। সেই পদ্ধতিই দেখা দিল চোখের বালিতে।

অর্থাৎ মানুষের অন্তরাত্মার প্রতিফলনই সাহিত্যের উদ্দেশ্য। অন্তরবাসী মানুষকে যিনি জানেন-চেনেন তিনি যে মানুষের সমগ্র সত্তাকেই উপলব্ধি করেন তাই নয়, তিনি সর্বৈবভাবে আংশিকতা-দুষ্ট মানুষের চিত্রাঙ্কন পরিহার করে চলেন। মানুষ মনোময় নয়, দেহময় নয়, অন্নময় নয়—এমন কি মানুষ আত্মা-সর্বস্বও নয়। সমগ্র সত্তার প্রতিফলনই কাম্য। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য-বিষয়ক নানা আলোচনায়—বিশেষ জোলার সাহিত্য প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে এ সম্বন্ধে তাঁর দৃঢ় মত ব্যক্ত করেছেন। গোতিয়েরের মাদ্‌মোয়াজেল দ্য মোপ্যাঁ প্রসঙ্গেও রবীন্দ্রনাথ এ-জাতীয় আংশিকতার ত্রুটি দেখিয়েছেন। বলেছেন :

> গ্রন্থটির রচনা যেমনই হোক তার মূলতত্ত্বটি জগতের যে অংশকে সীমাবদ্ধ করেছে সেটুকুর মধ্যে আমরা বাঁচতে পারিনে। গ্রন্থের মূল ভাবটি হচ্ছে

একজন যুবক হৃদয়কে দূরে রেখে কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়ের দ্বারা দেশদেশান্তরের সৌন্দর্যের সন্ধান করে ফিরছে। সৌন্দর্য যেন প্রস্ফুটিত জগৎ-শতদলের উপর লক্ষ্মীর মতো বিরাজ করছে না, সৌন্দর্য যেন মণিমুক্তার মতো কেবল অন্ধকার খনি গহ্বরে ও অগাধ সমুদ্রতলে প্রচ্ছন্ন, যেন তা গোপনে আহরণ করে আপনার ক্ষুদ্র সম্পত্তিব মতো কৃপণের সংকীর্ণ সিন্ধুকের মধ্যে লুকিয়ে রাখবাব জিনিস। এইজন্য এই গ্রন্থের মধ্যে হৃদয় অধিকক্ষণ বাস করতে পারে না।

সুতরাং শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকেব জগৎ-বিষয়ক চেতনায় যে সমগ্রতার সন্ধান আমরা অপরিহার্যভাবে লক্ষ্য করে থাকি রবীন্দ্রনাথেব মধ্যেও সেই চেতনাই উপস্থিত ছিল। কোনো নাম বা উপাধির আববণে মানুষকে খণ্ড কবে দেখা তাঁর শিল্পী স্বভাবে ছিল না। আমবা যে অসীম অনন্ত প্রভৃতি বাক্যচ্ছটা রবীন্দ্রকাব্য প্রসঙ্গে সময়ে অসময়ে ব্যবহাব কবে থাকি—সম্ভবত সমালোচনাকে ভারী দেখানোব চেষ্টায়—সেখানেও রবীন্দ্রনাথেব অখণ্ড জীবন চেতনার প্রেরণা বা আকর্ষণই প্রধান কথা। এই সমগ্রতা-সন্ধানী শিল্পীমানস উপন্যাসেও মানুষকেই খুঁজেছে সমগ্রভাবে। সেই জন্যই মনুষ্য সমাজ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের সজীব চেতনা গোটা মানুষকে খোঁজাব কাজে ববীন্দ্রনাথকে সদাই সাহায্য কবেছে। "চতুর্দিগবর্তী মনুষ্য সমাজ তার সমগ্র উত্তাপ প্রয়োগ করে আমাদের প্রত্যেককে প্রতিক্ষণে ফুটিযে তুলছে"—এ বিশ্বাসকে রবীন্দ্রনাথ শিল্পীর দৃষ্টিতে পরীক্ষা কবেছেন তার উপন্যাসে। "মানুষের লক্ষ লক্ষ সম্পর্ক সূত্র আছে—যার দ্বাবা প্রতিনিয়ত আমবা শিকডেব মতো বিচিত্র রসাকর্ষণ করছি"—তাকে পরিচযা করা, এক কথায় সে সম্বন্ধে সচেতন থাকা সাহিত্যের কাজ বলে রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন। সুতবাং সমাজ এবং সভ্যতার গোটা চেহারাকে এবং গূঢ়ার্থকে রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ধরতে চেয়েছেন এটা স্বাভাবিক।

তাই বঙ্কিমের উপন্যাস থেকে রবীন্দ্রনাথ পৃথক পথগামী। বঙ্কিমের কার্য-কারণ পরম্পরা রবীন্দ্রনাথে পৃথক অর্থবহ। বঙ্কিমের চরিত্রচিন্তা রবীন্দ্রনাথের চরিত্র-চিন্তা এক নয়—ব্যক্তি-স্বরূপের সমগ্রতা সন্ধানের চেষ্টায় সে চিন্তা স্বতন্ত্র। কারণ বঙ্কিম এবং রবীন্দ্রনাথের জীবনের মানেও ছিল পৃথক। স্বাভাবিক, দুজনে উত্তীর্ণ হতেও চেয়েছেন স্বতন্ত্রভাবে—দুজনের ন্যায় অনুসারে। তাই রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের বহির্লক্ষণ মিলিয়ে সমস্ত উপন্যাসগুলির সাধারণ সূত্র

আবিষ্কার করতে যাওয়া দুশ্চেষ্টা। এভাবে শুধুই অপ্রাসঙ্গিক কতকগুলি বাইরের কথা বলা যায় মাত্র। হয়তো বলা যায় যে রবীন্দ্রনাথের উদ্ভাবনী শক্তি দুর্বল। হয়তো বলা যায় গোরা বড়ো বেশি তার্কিক উপন্যাস। প্রশ্ন করা চলতে পারে রবীন্দ্রনাথেব নায়ক-নায়িকাবা ওই গদ্যে কথা বলে কেন, যে গদ্য সদাই মনে হয় রবীন্দ্রনাথেব গদ্য? কিন্তু যে-কোনো জিজ্ঞাসু পাঠকই জানেন এ-সবের সাহায্যে ববীন্দ্রনাথেব উপন্যাসেব প্রচণ্ড টানকে ব্যাখ্যা করা যায় না। তাই তাঁবা যথাসম্ভব শীঘ্র বহির্লক্ষণগুলিব উল্লেখ কবেই বিপরীতার্থক বাক্যে সেগুলিকে আবাব সামলে নিযেছেন।

চোখেব বালি, গোবা, চতুবঙ্গ এবং যোগাযোগ এই চাবখানি প্রধান উপন্যাসের ভিত্তিতে ববীন্দ্রনাথেব উপন্যাস-সাহিত্য আলোচনা কবলে আমাদেব স্থিবীকৃত পূর্ব-সিদ্ধান্ত সমর্থিত হয় যে, তিনি অখণ্ড মানুষকে উপন্যাসে ধাবণ করার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি জানতেন যে ব্যক্তি-মানুষেব জীবন আদ্যন্ত একখানা জীবন। একটা ঘটনা শুরু হবাব পব থেকে সে জীবন ঔপন্যাসিকেব কাছে আগ্রহোদ্দীপক হয় না। জীবন আদ্যন্ত সমগ্রতাকে নিয়ে ঔপন্যাসিককে আকর্ষণ কবে। তাই ববীন্দ্রনাথের উপন্যাসে জীবনেব যে প্রচণ্ড টান অনুভূত হয তা কদাচ বাইবেব ঘটনাব সাহায্যে উদ্দীপিত ব্যাপাব নয়। জীবনাচবণেব প্যাটানেব মধ্যেই সে টানেব বীজ নিহিত থাকে। বঙ্কিমেব উপন্যাসে আমবা ঘটনাব ঘোড়ায় চেপে নায়ক-নায়িকাকে উপস্থিত হতে দেখি। সেই ঘটনাব পূর্ববর্তী জীবনটা ঔপন্যাসিকেব পক্ষে অতীত। এবং যেন অতীত বলেই উপন্যাসেব পক্ষে তা বাহুল্য এবং অপ্রয়োজনীয়। নগেন্দ্রনাথ এবং গোবিন্দলালেব অতীত ইতিবৃত্ত আমবা জানি না। তাদেব শিক্ষা-দীক্ষাব বা জীবন সম্বন্ধীয় দৃষ্টিভঙ্গিব কোনোও খবব আমবা বাখি না, বাখলেও কী ভাবে কোন্ বাস্তব পবিবেশেব চাপে তারা গড়ে উঠেছে তাও আমবা জানি না। ভ্রমব বলেছে বটে যে তার শিক্ষা গোবিন্দলালেব কাছে—কিন্তু সেই শিক্ষার প্রকৃত স্বরূপ কী ভ্রমবের আচরণে তাব পরোক্ষ প্রমাণ মিললেও গোবিন্দলালের কাছে তার কোনো প্রত্যক্ষ সমর্থন নেই। নাট্যধর্মী বঙ্কিমী উপন্যাসে উপন্যাসের অতীতে যেন কোনো ঘটনা ঘটে না। অথচ চোখেব বালিব মহেন্দ্রর জীবনে এরই বিপরীত প্রকরণ লক্ষ্য করা যায়। মহেন্দ্রের জীবনেব যে সংকট তাব মূল মহেন্দ্রের জীবনেব মধ্যেই। সে যেভাবে গোটা জীবনটা এ পর্যন্ত (উপন্যাসের কাল পর্যন্ত) কাটিয়ে এসেছে, যা সে পেয়েছে, বিশ্বাস করেছে,

সেই গোটা জীবনব্যাপী আচরণ মনন এবং চিন্তার মধ্যেই তার বিপদের জট লুকিয়ে ছিল। গোরা জন্মাবধি ধীরে ধীরে যা হয়ে উঠেছে বা হয়ে উঠতে চায় তার সংঘর্ষ এবং প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে অপরের সঙ্গে তারাও যা হয়েছে বা হয়ে উঠতে চায় তার সঙ্গে। যোগাযোগের কুমুর ক্ষেত্রেও ঘটনা কিছু নেই। সে যা আশৈশব, তার সঙ্গে আর একজনের আশৈশব জীবনধারা মিলছে না। এই সমস্ত ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে জীবনটাকে কেটে নিয়ে তা থেকে একটা টুকরোর ওপরে উপন্যাসের শিল্পকর্মকে রবীন্দ্রনাথ দাঁড় করাননি।

সে কারণে রবীন্দ্রনাথের নায়ক-নায়িকা পরিকল্পনার স্বতন্ত্র পদ্ধতিও স্মরণীয়। বঙ্কিমচন্দ্রের নায়ক কল্পনার ক্ষেত্রে যে বিশিষ্টতা লক্ষ্য করা যায় রবীন্দ্রনাথ সে ক্ষেত্রেও তাঁর বিপরীতগামী। বঙ্কিম বিষয়বস্তুর অসাধারণত্বের ওপর নির্ভরশীল ছিলেন বলেই নায়ককুলকে উচ্চশ্রেণীর জীবন থেকে আহরণ করলেও তাদের অসাধারণ করে গড়ে তুলতেন না। হত্যা, যুদ্ধ, নদীতে ঝাঁপ প্রভৃতি অসাধারণ কার্যাবলীর অনুষ্ঠাতা তারা হলেও মানুষ হিসাবে তারা সাধারণ মনন-চিন্তনের উর্ধ্বে নয়। বঙ্কিমের উপন্যাসের মননশীলতাজনিত সুসমতার আলোচনায় এ-কথা আমরা সকারণ ব্যাখ্যা করেছি। হত্যা, যুদ্ধ, নদীতে ঝাঁপ রবীন্দ্রনাথের নায়কদের নেই। তাঁর নায়কেরা অসাধারণ কার্যাদির স্রষ্টা নয়। কিন্তু মানুষ হিসাবে তারা কেউ সাধারণ মনন, সচরাচর অনুভূতির মানুষ নয়। চোখের বালির মহেন্দ্র ছাড়া, গোরা, কুমু, শচীশ, নিখিলেশ এমন কি যদি ধরতেই হয় অমিতও বুদ্ধি, অন্তর্দৃষ্টি, কল্পনার মননে রীতিমতো অগ্রসর মানুষ। এরা কেউ সাধারণ মানুষ নয়। চোখের বালির প্রধান চরিত্রদ্বয়ের মধ্যে বিহারী-লাল আর বিনোদিনী এই অগ্রসর মানুষের পর্যায়ে পড়ে। মহেন্দ্র-আশা দম্পতিই শুধু ব্যতিক্রম। তা বলে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে অসাধারণ মানুষের মেলা বসে যায় না। এমন আশ্চর্য অ্যাভাবেজ মানুষ রবীন্দ্রনাথ কল্পনা করতে পারেন যার তুলনা একমাত্র রবীন্দ্র সাহিত্যেই। বিনয়, মহেন্দ্র, শ্রীবিলাস, এদের কথা এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

নায়ক পরিকল্পনার এই বিশিষ্টতায় রবীন্দ্রনাথের জীবনাগ্রহের বিশিষ্টতা প্রতিফলিত। একটা গোটা জীবনের সমগ্রতার পটভূমিকায় যখন ভিতর এবং বাইরের চাপ নানা দিক থেকে অস্তিত্বের মূলে-স্থূলে টান সৃষ্টি করে, তখন সেই অস্তিত্বের যন্ত্রণায় শুদ্ধতাকাঙ্ক্ষী জীবনেই রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ। বৃহৎ ঘটনার এজন্য কোনোও অবশ্যম্ভাবী প্রয়োজন নেই। কিন্তু সেই মনের

প্রয়োজন, যে মন সাড়া দিতে পারে সহজে। যে-মন নিজেকেও পরীক্ষার মধ্যে ফেলে নিবিষ্ট নিরীক্ষায় রত হতে পারে। যে-মন সমাজ-সংসারের জটিল অঙ্ক-রাশির মধ্যে নিজেকে একটা রাশি হিসাবে জেনেও গাণিতিকের মীমাংসামুখী শুদ্ধ নিরাসক্তির অধিকারী হতে পারে, আবার কখনও ঝটিকা-দীর্ণ সমুদ্রের বুকে কূল-সন্ধানী নাবিকের মতো উদ্বেগক্লান্ত কিন্তু স্থির কম্পাস-লক্ষ্য হতেও সেই মন প্রস্তুত। কেননা এই মন ব্যতীত অস্তিত্বের ঐ যন্ত্রণাকে ধারণ করা সম্ভব নয়। খুব সাজানো বা মাপাজোখা পদ্ধতিতেও যখন রবীন্দ্রনাথ এ-রকম পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছেন তখনও এক ধরনের সাফল্য অর্জন করেছেন যার মূল্যও একান্ত কম নয়। ঘরে বাইরের নিখিলেশ চরিত্র এর একটা বড়ো নিদর্শন। নিখিলেশ নিজেকে যে নিরীক্ষাব মধ্যে স্থাপিত করেছে তার শিল্পমূল্যকে রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত গভীর করে তুলতে না পারলেও যে পদ্ধতিতে তিনি নিখিলেশকে বারে বারে আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন তা যথেষ্ট ইঙ্গিতবহ। তিনি এখানে নায়কের সমস্ত মানসিক টানাপোড়েনকে মোটা ও সূক্ষ্ম নানা ঝংকারে নানাভাবে রূপময় ভাবময় কবে তুলেছেন। ঘটনার জোর বা সমর্থনের জন্য পুবনো পদ্ধতিতে রবীন্দ্রনাথেব বিশ্বাস নেই।

তাই বলে এ-কথাও আবার ঠিক নয় যে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে ঘটনার কোনো ভূমিকাই নেই। এখানে ঘটনারও মানে রবীন্দ্রনাথের উপকরণ এবং রূপায়ণের মধ্যেই খুঁজতে হবে। ঘটনা রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে স্থূল অর্থে কিছু ঘটে যাওয়া নয়। ঘটনার অর্থ এখানে এই . যে-ব্যক্তি যে-জীবন বিন্যাসের অন্তর্বর্তী সেই জীবন বিন্যাসে অপর একটা ব্যক্তিত্বের সংঘর্ষে সুগভীর একটা আলোড়ন সৃষ্টি হয়। ঘটনা এবং নাটক দুই-ই রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে এই পথে প্রবেশ করে থাকে। সুচরিতা এবং গোরার প্রেমের বিষয়ে দেখা যায় যে উভয়ে উভয়ের মর্মের গভীরে যে আলোড়ন সৃষ্টি করছে তা প্রেমের গল্পের প্রেমজ আলোড়ন নয়। এ আলোড়নের উৎস উভয়ের ব্যক্তিত্বে—যে ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠেছে তাদের নিজেদেরই ব্যক্তি জীবনের নানা কিছুব সমাহারে ও প্রতি-ক্রিয়ায়। প্রেম, রিরংসা, স্নেহ-ভালবাসা কোনো কিছুকেই রবীন্দ্রনাথ কেবল স্বাধীনা প্রবৃত্তি বলে ব্যাখ্যা করে ছেড়ে দেননি। বা এদের আকস্মিকতার কোনো সুযোগ তিনি উপন্যাসে গ্রহণ করেননি। সমস্ত প্রবৃত্তিকে তিনি সমগ্র ব্যক্তিত্বের পটে রেখে পরীক্ষা করার পক্ষপাতী ছিলেন। সে কারণে এ জাতীয় উপন্যাসে যা হওয়া স্বাভাবিক ব্যক্তিত্বের বিশিষ্টতা অনুসারে স্নেহ-

ভালবাসা-প্রেম-ঈর্ষা সব কিছুই বিশিষ্ট বলে এরা সদাই আগ্রহোদ্দীপক হয়ে থাকে। বলা বাহুল্য গল্প এবং গাঁথুনি বা প্লটের ওপর এ-আগ্রহ নির্ভর করে নেই। এ-কৌতূহল বা আগ্রহ সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিত্বের মুখাপেক্ষী। নায়ক নায়িকার ব্যক্তিত্বের সমস্যাই রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের সমস্যা। নিখিলেশের পরিস্থিতিতে নিখিলেশ যে-কোনো স্পষ্ট উপসংহার জোর করে টেনে দিতে পারে না সেটা নিখিলেশের ভীরুতা নয়। ভীরু চরিত্রের ব্যক্তি নায়ক হলে উপন্যাসে কী পরিস্থিতি সৃজিত হয় এটা রবীন্দ্রনাথের পরীক্ষার বিষয় নয়। কোনো বহিরারোপিত উপসংহার সৃজনে নিখিলেশের বিমুখতা নিখিলেশের ব্যক্তিত্বের ফল। যে বিশিষ্ট চিন্তায় এবং ভাবনায় সে নিখিলেশ হয়ে উঠেছে সেই নিখিলেশই অনুরূপ উপসংহারের প্রতিবন্ধক। কুন্দনন্দিনী বিষ খেতে প্রথম থেকেই প্রস্তুত ছিল না। সে কেমন করে বিষ খেল অথবা ভদ্র-শান্ত গোবিন্দলাল কেমন করে হত্যাকারী হল এটা বঙ্কিমের গল্প। বঙ্কিমকে মেনে চলতে হয়েছে ঘটনা এবং চরিত্রের পরস্পর প্রতিক্রিয়ার লজিক। রবীন্দ্রনাথকে মেনে চলতে হয়েছে পুরো ব্যক্তি মানুষটার ন্যায়। এবং সেই ন্যায় ক্রমানুসারে রবীন্দ্রনাথের নায়ক-নায়িকাদেরও একটা কিছু হয়ে ওঠা আছে। তা নইলে গোরার উত্তরণকে কী বলে ব্যাখ্যা করা যাবে। কিন্তু এই হয়ে-ওঠার সম্মুখের বাধাগুলি, পিছনের পিছুটানগুলি বাইরে কোথাও বিশেষ নেই। বাধা এবং পিছুটানগুলো মানুষটার ব্যক্তিস্বরূপে। সাধারণ মানুষ হলে গোরার সুচরিতাকে গ্রহণ করতে বা কুমুর মধুসূদনের সঙ্গে কোনো একটা মীমাংসা করে ফেলতে বেশি সময় লাগে না। ব্যক্তিস্বরূপের বনিয়াদ এদের জীবনে এত বেশি বলিষ্ঠ-ভিত্তিক যে সে-জাতীয় প্রশ্ন ওঠেই না। বাংলা উপন্যাসের ইতিহাসে সে কারণে রবীন্দ্রনাথ এক অন্যতর শক্তি যিনি খুব অল্প উত্তরসূরী সৃষ্টি করতে পারলেন। তাঁর বাকসম্পদের অনুকারী অনেক, তার নায়ক-নায়িকাদের মতো ভঙ্গিও অনেক, কিন্তু এগুলিকে বাদ দিয়েও যা থাকলে বাংলা উপন্যাসে রবীন্দ্র সাধনা সম্পূর্ণ হত, নেই সেই বলিষ্ঠ বুদ্ধিদীপ্ত গরীয়ান উত্তরাধিকার।

থাকা সম্ভবও নয়। কেননা রবীন্দ্রনাথই বাংলা দেশের সর্বপ্রথম সেই লেখক (পরবর্তীকালে উপন্যাসে অন্নদাশঙ্কর এবং ধূর্জটিপ্রসাদ এবং কাব্যে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও বিষ্ণু দে মহাশয়ের কথা বলা চলে) যিনি স্পষ্ট অর্থে নাগরিক মনের অধিকারী ব্যক্তি ছিলেন। এ-নাগরিকতা কলকাতা শহরের ইট-কাঠ-পাথর এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজি শিক্ষা থেকে সংগৃহীত হয়নি। এ-নাগরিকতা নগরবাসী

ভদ্রলোক শ্রেণীর কতকগুলি মানসিক বঙ্কিমতাও নয়। সৌন্দর্য ও রুচিবোধ, মানসিক সাহস এবং মানুষের সত্তার বন্ধনহীনতাকে অঙ্গীকার এ-নাগরিকতার একদিকে, আর নিয়ত অগ্রসরতা এবং সভ্যতা সম্বন্ধে সদাজাগ্রত চেতনা এর আর একদিকে। মানুষের সৌন্দর্যবোধের সঙ্গে নগর-জীবনের ক্রমবৃদ্ধির একটা যোগ আছে। সৌন্দর্যের উপকরণ এবং প্রকরণ যাই হোক না কেন সৌন্দর্য সৃজনের মৌল প্রেরণায় জনপদের জীবন নানাভাবে সাড়া তোলে। সারা দেশটা যখন গ্রামীণ কাঠামোয় গাঁথা—সামন্ত-কেন্দ্রিক সে জীবনে সৌন্দর্যের জিজ্ঞাসা স্বাধীন হতে পারে না। যখন গ্রামীণ কাঠামোয় আঘাত পড়ে নানা দিক থেকে তখনই জীবনের দ্বান্দ্বিক চেহারা ধরা পড়ে ধ্যানী মননে। এখানেই সৌন্দর্য বোধের স্বাধীন ছন্দিত বিকাশের প্রারম্ভ। আমরা আগে বলেছি (বাংলা উপন্যাসের জন্মলগ্ন অধ্যায়ে) যে এ-দেশের নগর-জীবন, শিল্প-যুগে রূপান্তরের ঐতিহাসিক অনিবার্য নিয়মে গড়ে ওঠেনি। গড়ে উঠেছে কলোনি গড়ার তাগিদে। ফলে এ-দেশে গ্রামীণ কাঠামোর পুরনো কঙ্কালখানা রয়ে গেল ঠিকই—নতুন জীবনবোধকে স্বীকরণের চেষ্টায় রইল নানা ব্যাঘাত। প্রতিভার নিজস্ব নিয়মে এই জীবনাবস্থা ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথের হাতে, জীবনের সমস্যা হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। বিস্তৃত দেশপটেব ব্যবহাবও তিনি কবেছেন এই প্রসঙ্গেই। পুরনো জীবনেব গ্রামীণ জট এবং আধুনিক ভারতবর্ষের বামন চেহাবার অপূর্ণ নাগরিক জট—এই দুয়েব বিরুদ্ধে ববীন্দ্রনাথেব প্রাগ্রসব নায়ক-নায়িকাদের আমরা সদাই দেখি যন্ত্রণা-মথিত। নিখিলেশ, কুমু এবং গোরা তার উজ্জ্বল এবং অভ্রান্ত নিদর্শন।

আসলে যন্ত্রণাটা যে অনুভব করছে সে তো অনুভব করছে খণ্ডায়নের যন্ত্রণা। তার মনের মধ্যে কোথাও একটা অভ্রান্ত পূর্ণতার বা সমগ্রতার আদর্শ আছে বা তাকে উপলব্ধি করার সক্রিয় প্রচেষ্টা আছে। বহু ভগ্নাংশ পবিকীর্ণ জীবনের মাঝখানে পূর্ণমানের বোধ যার আছে তার যন্ত্রণাই খণ্ডিত চতুষ্পার্শ্বের যন্ত্রণার রূপ-কে যথার্থ আলোকিত করে। সে যন্ত্রণাকে ঐ খণ্ডিত চতুষ্পার্শ্ব ঠিকভাবে চেনে না। এ-কারণেই দেখা যায় যে রবীন্দ্রনাথের সমুদয় নায়ক-নায়িকা নাগরিক। এবং ঘরে বাইরে ছাড়া কলকাতা হল তাঁর সকল উপন্যাসের ঘটনাস্থল। তার মানে কিন্তু এ নয় যে গ্রামের মানুষকে তিনি ব্যবহার করেননি। প্রয়োজন হলে এ ব্যাপারে তিনি মোক্ষম উদাহরণ ব্যবহার করতে পারেন। হরিমোহিনী এবং কৈলাস তার প্রমাণ। গল্পগুচ্ছের অসংখ্য সৃষ্টি না

হয় এ-প্রসঙ্গে ছেড়েই রাখলাম। তথাপি তাঁর নাগরিক নায়ক-নায়িকার সংখ্যাধিক্য আমাদের এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেছে যে আধুনিক ভারতবর্ষের দ্বান্দ্বিক সমগ্রতার ব্যাপারটি তিনিই যথার্থ অনুধাবন করেছিলেন।

•• দুই ••

সে-কারণেই, এই মননদীপ্ত অন্তর্দৃষ্টির প্রসাদেই তাঁর উপন্যাসের কাঠামোতেও যথেষ্ট শিল্পী সংযম। মানুষের অন্তরাত্মাকে, ঘটনার "আঁতের কথাকে" টেনে বের করার কাজ ঔপন্যাসিকের এ-কথা তিনি বলেছিলেন বটে, কিন্তু তাই বলে মনস্তাত্ত্বিক লেখক হতে গিয়ে তিনি কদাচ এক দল মনশ্চিকিৎসকের গবেষণার বিষয়কে উপন্যাসে জড়ো করেননি। দেহে-মনে সুস্থ ব্যক্তির কথাই বলেছেন। উপন্যাসের সংস্থানগত সৌন্দর্যের বিষয় সম্বন্ধেও তিনি সচেতন ছিলেন এই মনোভাব থেকেই। তাঁর উপন্যাসের কাঠামো বিন্যাসের দোষগুণের বিচারও হবে সেই মনোভাবের প্রসঙ্গেই। কবি এবং ঔপন্যাসিকের বিরোধের ব্যাপারটিরও মীমাংসা হবে এই পথেই।

পূর্ব পরিচ্ছেদে কথিত কারণে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের, বঙ্কিমচন্দ্রের মতো, কাঠামো বিশ্লেষণ সম্ভব নয় এ-কথা পাঠক মাত্রেই উপলব্ধি করেন। উপন্যাসের তাৎপর্য সম্বন্ধে দুই লেখকের পৃথক চিন্তার জন্যই এটা সম্ভব নয় আশাকরি সে কথাও আমরা পরিষ্কার করে বলেছি। তথাপি কয়েকটি সাধারণ সূত্র রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসেরও আছে। যেমন ধরা যাক রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে বন্ধুদের ভূমিকা। এ ভূমিকার কথা সর্বজনবিদিত। বিনয়, বিহারী, শ্রীবিলাস এবং যোগাযোগের নবীন এর প্রমাণ বটে। এই বন্ধুবর্গের অধিকাংশের ভিতরেই একটা সাদৃশ্য বিদ্যমান। এদের ব্যবহারে তাদৃশ প্রচণ্ডতা নেই, নেই সকল ঘটনায় প্রবল ভাবে প্রতিক্রিয়ান্বিত হবার শক্তি। এরা যাদের বন্ধু—যারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নায়ক—সে তুলনায় গোরার মতোই প্রবল। কিন্তু তাই বলে লক্ষ্য করার বিষয় যে. এই বন্ধুরা শ্রীকান্ত-ইন্দ্রনাথের শ্রীকান্তের মতো কেবল ইন্দ্রনাথের গুণগ্রাহী নয়। নায়ক বন্ধুরা যতই প্রবলচরিত্র হোক না কেন তাতে তাদের স্বকীয়তাটুকু হারিয়ে যায় না। গোরার জন্য বিনয়কে আমরা হারিয়ে ফেলি না। সীমিত পরিসরে হলেও বিনয়ের ব্যক্তিত্ব বিনয়ের নিজের। গোরার সঙ্গে মতানৈক্যে এবং ঐকমত্যে সে নানাভাবে স্পষ্ট। এমনই নবীন, এমনই শ্রীবিলাস। এবং এরা কেউই পথের দাবির সব্যসাচীর কাছে অপূর্বের মতো মাত্র নেতিবাচক

একটা উপস্থিতি নয়। সব্যসাচী যা অপূর্ব তা নয়—এই ধরনের বিচিত্র বৈপরীত্য বোঝানোর জন্য রবীন্দ্রনাথের পাত্রপাত্রীরা কেউই কখনো ব্যবহৃত হয়নি। বিনয়ের গুণাবলীর সাহস গোরার থেকে ন্যূন কি অধিক এ প্রশ্নের ওপরে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস-সাহিত্যের মীমাংসা হবে না। বরঞ্চ বিনয়কে আপনার আমার মনে হতে পারে অনেক স্বাভাবিক। অনেক সময়ই আমরা গোরা এবং বিনয়ের যুদ্ধে বিনয়ের পক্ষাবলম্বন করে থাকি। এখানেও আগেই বলেছি ব্যক্তি-পুরুষ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ধারণাই কার্যকরী হয়েছে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ ব্যক্তি-জীবনের প্যাটার্ন থেকেই উপন্যাসে চলে ফেরে, ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়, প্রভাবিত হয় এবং প্রভাবিত করে। সেখানে গোরার চলাফেরা একরকম এবং বিনয়ের চলাফেরা আর একরকম। এখানে আর একটা ব্যাপারের দিকে আমাদের দৃষ্টি না পতিত হয়ে যায় না যে রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিত্বের প্রসঙ্গে পরিবেশের ন্যায়কে স্বীকার করেও, কী ভাবে ব্যক্তিত্বের নিজস্ব ন্যায়কেও মর্যাদা দিয়েছেন। বিনয় গোরার সঙ্গে আশৈশব অতিবাহিত করলেও সে গোরার বিকল্প নয় কখনই।

সেই কারণে ব্যক্তিত্বের মুখাপেক্ষী উপন্যাসে কাঠামোর প্রশ্নটা অনেকখানিই গৌণ। এটার দায় রবীন্দ্রনাথের কবিত্বের ওপরে চাপিয়ে যারা নিশ্চিন্ত থাকেন তারা রবীন্দ্রনাথের কবিত্বের প্রতি যে পরিমাণে শ্রদ্ধাশীল সে পরিমাণে তাঁর সমগ্র জীবনের সাহিত্যকর্মের মূল সূত্র সম্বন্ধে সচেতন নন। তা না হলে তাঁরা দেখতে পেতেন যে আমাদের শ্রেষ্ঠ রোমান্টিক কবি কেমন করে আমাদের শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিবাদী উপন্যাসের জনক হন। বুদ্ধদেব বসু "রবীন্দ্রনাথ : কথাসাহিত্য" শীর্ষক গ্রন্থে বলছেন :

> তাহলে মোটের ওপর দাঁড়াচ্ছে কী? দেখা যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথ কবি আর কথাশিল্পীর সম্পূর্ণ সঙ্গতি ঘটাতে পারেননি—এত বড়ো কবির কাছে সেটা আশা করাও অন্যায় হয়। দুয়ের বিরোধে ক্ষতি হয়েছে উপন্যাসের, কবিত্ব যখন দমিত হয়েছে তখন এসেছে নৌকাডুবির কৃত্রিমতা, আর যখন প্রশ্রয় পেলো তখন দেখি ঘরে বাইরের আতিশয্য। শেষের কবিতার বিষয়বস্তুতে যাথার্থ্যের অভাব। আবার সেই সঙ্গে এও দেখি যে তাঁর কথাসাহিত্যের একটি বড়ো রকমের প্রতিপত্তির কারণই তার কবিত্বগুণ।

দুঃখের বিষয় এর কোনোটাই সত্য নয়। বুদ্ধদেববাবুর মতো সুরসিক কবির বিচারে যে এ-জাতীয় ভ্রান্তি দেখা দেয় তার কারণ সাহিত্যকর্মের বিভিন্ন

শাখাকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বিশ্লিষ্ট করে দেখার প্রচেষ্টা। প্রথাবদ্ধ আলোচনা সমূহেই এ-ত্রুটি নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। কিন্তু বুদ্ধদেববাবুদের কাছে স্বভাবতই আমাদের প্রত্যাশা একটু ভিন্ন থাকে। উদ্ধৃত অনুচ্ছেদাংশের সমস্ত মন্তব্যগুলি ভ্রান্ত সিদ্ধান্তবাচক।

এক ॥ "ববীন্দ্রনাথ কবি আর কথাশিল্পীর সঙ্গতি ঘটাতে পারেননি।" কথাটি হবে সম্পূর্ণ বিপবীত। কবি হিসাবে তাঁর লক্ষ্য বিষয়ের আন্তর সত্তাকে বিষয়ীর নিজেব ন্যায়ে আবিষ্কার, ঔপন্যাসিক হিসাবেও তাঁর লক্ষ্য বিষয়-ব্যক্তি-ঘটনার অন্তরকে নিজ মননের ন্যায়ে প্রতিফলিত করা। একই লক্ষ্যের পদ্ধতি কাব্যে কবির ন্যায়ে, উপন্যাসে ঔপন্যাসিকেব ন্যায়ে। তাঁর সারা জীবনেব সাহিত্যকর্মের মূল সূত্রই হল জগৎ-জীবনেব সমগ্রতাকে শুদ্ধভাবে ধারণ। এই প্রয়াসে একমাত্র অন্তর্দৃষ্টিই তাঁর সহায। কবিত্ব বা ঔপন্যাসিকত্ব এ সমস্ত একেবারে এ প্রসঙ্গে বাইরেব কথা। এই অন্তর্দৃষ্টি বুদ্ধদেববাবু ন্যাযতই বলতে পাবেন কল্পনা। কিন্তু এ-কল্পনা বিষযান্তবঙ্গিনী নয। বিষয-স্বরূপ উন্মোচিনী। ববীন্দ্রনাথ যে versatile হবার জন্যই কখনও ছবি, কখনও গান বা কখনও গল্প, কখনও উপন্যাসে হাত দেননি, তাঁব কোনো কিছুই যে একটা কিছু হযেও আব একটা কিছু হবার জন্য নয়, জানি না এ-কথা আমবা কবে বুঝব। কবে বুঝব শিল্পসূত্রে জীবনেব সমগ্র নিহিত শুদ্ধ স্বরূপকে ধাবণ কবাব যন্ত্রণাবেগেই তাঁর বাব বাব সমুদ্রাভিযান এবং সে সমুদ্র জীবন? তাঁব উপন্যাসেব ত্রুটি আবিষ্কাবে এই যে সবলীকরণ—কবি আর কথাশিল্পীব অসঙ্গতি—এব উদ্ভব হচ্ছে ঔপন্যাসিক হিসাবে রবীন্দ্রনাথেব জীবন-দৃষ্টিকে না বোঝা থেকে। ব্যক্তিব জীবনেব ঘাত-প্রতিঘাতে তাব অস্তিত্বেব যে যন্ত্রণা—সেটাকে সমাজ সভ্যতা নিরপেক্ষ ভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। ববীন্দ্রনাথ সেই শুদ্ধতাকাঙ্ক্ষী যন্ত্রণাকে উপন্যাসে ধবতে চেয়েছেন। তাই বুদ্ধদেববাবু যখন বলেন—"ভিতবকাব কবিটি যাতে প্রশ্রয পায়, কবিত্ব সহযোগী হয় কথাশিল্পে" তাই ছিল রবীন্দ্রনাথেব লক্ষ্য—তখন বিস্মিত হওয়া ছাডা উপায় থাকে না। গোবাব টানাপোডেনেব সহযোগী কি রবীন্দ্রনাথের কবিত্ব? চতুরঙ্গের শচীশ ও দামিনীর অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথের দুঃসাহসিক নিরীক্ষাও প্রশ্রয় পাচ্ছে কবিত্বের কাছ থেকে? কুমু গান জানে এবং বিপ্রদাস সেতার বাজায় বলেই কি যোগাযোগের জীবন-নাট্যের অপরিহার্য টানকে কবিত্বের টান বলব? রবীন্দ্রনাথের নায়ক-নায়িকারা ববীন্দ্রনাথের বাংলায় স্বগত চিন্তা করেছে শুধু এই দেখেই কি মনে কবব যে তাঁব উপন্যাস কবি-স্বভাবের অনুকূল? নাকি

দেখব যে বাংলা উপন্যাসে উপন্যাসের একটা নতুন মানে তিনি নিয়ে এলেন জীবনোৎসারিত ঘটনার মানসিক তাড়নায় পাত্রপাত্রীর নানা আক্ষেপে, নানা মোচড়ে, নানা মোড় ফেরায়—যেখানে হয়তো ঘটনার রূপ পাল্টেছে (এ-বিষয়ে আমরা পূর্বে বলেছি) কিন্তু তা "ছল" (বুদ্ধদেববাবুর উক্তি) নয়।

দুই ॥ "কবিত্ব যখন দমিত হয়েছে তখন এসেছে নৌকাডুবির কৃত্রিমতা।" যেন নৌকাডুবিতে কবিত্বকে যদি রবীন্দ্রনাথ আর কিছুটা উদ্দীপিত করতে পারতেন তাহলেই কেটে যেত উক্ত উপন্যাসের কৃত্রিমতা। অথচ একটু মনোযোগী হলেই বুদ্ধদেববাবু দেখতে পেতেন যে নৌকাডুবির ব্যর্থতার কারণ তার কাহিনীর ঘটনা-বাহুল্যের মধ্যে বা কাহিনী-রসের মধ্যে নেই। বাইরের দিক থেকে জটিল এই কাহিনী অন্তরের দিক থেকে কোনো জটিলতা সৃজন করেনি। অথচ রবীন্দ্রনাথের কাহিনী বাইরের দিক থেকেই সরল—ভিতরে ভিতরে এর প্রক্রিয়ার নানামুখী জটিলতায় উপন্যাসের প্রাণ, সেখানেই এ কৌতূহলের স্রষ্টা নৌকাডুবিতে এটি ঘটেনি। এখানে আকস্মিক ঘটনা থেকে যে সমস্যা উদ্ভূত হল তার মূল ব্যক্তিমানসের গভীর উৎসে নয়, ব্যক্তিত্বের গোটা সমস্যার সঙ্গে তার কোনো যোগ আছে কিনা তাও উপন্যাসে স্পষ্ট হয়নি। এ-কারণেই এটা খুব সীমিত ব্যাপার।

তিন ॥ "আর যখন প্রশ্রয় পেলো তখন দেখি ঘরে বাইরের আতিশয্য।" রবীন্দ্রনাথের গল্পে নিখিলেশের আর্তনাদকে অথবা বিমলার স্বভাবানুযায়ী উচ্ছ্বাসময় আত্মকথনকে বুদ্ধদেববাবু মনে করেন কবিত্বের আতিশয্য। তিনি ভুলে গেলেন যে এখানে তিনজন পাত্রপাত্রী আত্মকথনে রত। তারা তাদের চরিত্রের ন্যায় রক্ষা করে নিজেদের ব্যক্ত করবে এখানে এটাই কাম্য। নাটকের উদ্দিষ্ট ভাবপ্রবণ কোনো চরিত্রের জন্য আমরা নাট্যকারকে ভাবপ্রবণ বলি না। বরঞ্চ ঘরে বাইরের ব্যর্থতার মূল সন্ধান আর একটু অভিনিবেশের সঙ্গে করলেই দেখা যায় যে প্রস্তাবিত বিষয় থেকে পশ্চাদপসরণের ফলেই এই উপন্যাসের সৌন্দর্য নষ্ট হয়েছে। যে ত্রিমুখী চাপে উপন্যাসের ভারসাম্য ঠিকমতো বজায় থাকত, রবীন্দ্রনাথ নিখিলেশের বেলায় সে ভারসাম্যের ব্যত্যয় ঘটালেন। ফলে এই উপন্যাস নষ্ট হয়েছে। উপন্যাস নষ্ট হওয়ার পর তাকে বাঁচানোর জন্য রবীন্দ্রনাথ কবিত্বের শুশ্রূষা প্রয়োগ করেছেন। আমরা জানি যে কবিতা সর্ব রোগহর বিশল্যকরণী নয়। সর্বোপরি, বিশল্যকরণীও অমূল-লতা নয়। কাজেই উপন্যাসের দৃঢ়বদ্ধ মৃত্তিকায় কবিত্বকে প্রোথিত করে, উপন্যাসের সমগ্রে তাকে

মিলিয়ে দিতে পারেননি। শিল্পের গূঢ় নিয়ম যে নিয়তির মতোই দুরতিক্রম্য। রবীন্দ্রনাথের কবিত্বকেও আত্মবলি দিয়ে তার অবহেলার খেসারত পোয়াতে হয়।

চার ॥ ঠিক সে কারণেই "তার কথাসাহিত্যের একটা বড়ো রকমের প্রতিপত্তির কারণ তাঁর কবিত্বগুণ" এ-কথাটার অর্থও খুব পরিষ্কার নয়। এই লক্ষ্যহীন, দুর্বল বাক্যে বুদ্ধদেববাবু যে 'প্রতিপত্তি' কথাটি ব্যবহার করেছেন তার অর্থ কী? তিনি যদি বলতেন যে তাঁর কথাসাহিত্যের প্রধান মূল্যের কারণ তাঁর কবিত্বগুণ, তাহলে তাঁর বক্তব্যের যা হোক একটা অর্থ বোঝা যেত। কিন্তু তিনি বলেছেন 'বড়ো রকমের প্রতিপত্তি'। কার কাছে প্রতিপত্তি? বুদ্ধদেববাবুদের মতো অগ্রণী পাঠকদের কাছে? আমার ধারণা তার শ্রেণীর পাঠকেরা কেউই তাঁদের কাছে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস-সাহিত্যের প্রতিপত্তির কারণ হিসাবে রবীন্দ্রনাথের প্রধানত কবিত্বের উল্লেখ করবেন না। আর প্রতিপত্তি কথাটি তো আশ্চর্য কথা। শেক্‌স্‌পীয়রেব কালে তাঁর নাটকেরও একটা বড়ো বকমের প্রতিপত্তির কারণ ছিল—অন্তত সে আমলের প্রাকৃত দর্শকমণ্ডলীর কাছে,—শেক্‌সপীয়রীয় নাটকের খুনজখম, ভূত প্রেত, ডাইনী প্রভৃতি। নিশ্চয় এই প্রতিপত্তির কারণটাই শেক্‌সপীয়রীয় নাটকেব সাফল্যেব কারণ নয়। বুদ্ধদেববাবু কি সে জন্যই সাফল্য কথাটি পরিহাব কবে প্রতিপত্তি কথাটি ব্যবহার করেছেন?

রবীন্দ্রনাথেব উপন্যাসের শেষবক্ষাবও ব্যত্যয় যেখানে যেখানে ঘটেছে গোড়ায় গলদই সেখানে একমাত্র কারণ। কবিত্ব সেই গোডায় গলদেব ফল। কারণ নয়। চোখের বালি, চতুরঙ্গ, যোগাযোগ—বলা যায় গোবা ব্যতীত রবীন্দ্রনাথের কোনো প্রধান উপন্যাসেই শেষরক্ষা হয়নি। উপন্যাসের সমাপ্তিতে এই দুর্বলতার জন্য আমরা রবীন্দ্রনাথকে নিশ্চয় দায়ী করব। কিন্তু তাঁর সমস্ত উপন্যাসেব যে স্বভাব তাকে ভুলে যাব না। ভুলে যাব না রবীন্দ্রনাথের নিরীক্ষার স্বভাবকে। বিষয়কে—অন্তত উপন্যাসে—নিরীক্ষাশালায় নিক্ষেপ করতে রবীন্দ্রনাথ সদাই ইচ্ছুক ছিলেন। সেই জন্য দেখা যায় যে ব্যক্তি-স্বরূপকে রবীন্দ্রনাথ যে রকম পরীক্ষার মধ্যে ফেলেন আব কোনো বাঙালী ঔপন্যাসিকের সে রকম সাহস নেই। এই পরীক্ষাব প্রমাণ নিখিলেশ, কুমু, শচীশ। সেই পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রশ্নেই বরং বলা যায় যে শরৎচন্দ্র-বিষয়ক জনশ্রুতিটা ভুল। প্রকৃতপক্ষে সমস্যা রবীন্দ্রনাথই উত্থাপন করেছিলেন—শরৎচন্দ্র ধামাচাপা

দিয়েছিলেন। দুঃখের বিষয়, সব নিরীক্ষা রবীন্দ্রনাথের শেষ হয়নি। সব নিরীক্ষা শেষ করার ক্ষমতাও রবীন্দ্রনাথেব ছিল না। যেগুলো অসমাপ্ত সে-গুলিতে ববীন্দ্রনাথেব দুর্বলতাও যেমন প্রকট সবলতাও তেমন। যে বলিষ্ঠতায় তিনি যোগাযোগেব বিষয়কে ধবেছেন, বিষয়বস্তুব সেই উচ্চাভিলাষী বলিষ্ঠতা সদাই স্মবণীয়। পরে এ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা কবা হবে। আমাদেব ধাবণা, জটিলতাব দিক থেকে উচ্চাকাঙ্ক্ষায় গোবা ন্যূন বলেই গোবাব উদ্দিষ্ট সাফল্য ববীন্দ্রনাথেব কবতলগত হযেছে। যোগাযোগ এবং চতুবঙ্গে বিষয ছিল শিল্পীব কাছে দুবতিক্রম্য গৌরীশৃঙ্গ। তাই সেখানে এসেছে ব্যর্থতা। পবিসমাপ্তিতে দুর্বলতা। কিন্তু এটাও তো ঠিক কথাই যে সুগোল এবং নিখুঁত পবিসমাপ্তিই শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্মেব সার কথা নয়। জীবনেব মতো শিল্পেও ব্রাউনিঙেব আপ্তবাক্য ব্যর্থ নয়। প্রচেষ্টাব গভীরতায় ও তাৎপর্যেও শিল্পীর একটা বড়ো বকমেব বিচাব বটে। আব ববীন্দ্রনাথেব ব্যর্থতাও সেই কাবণেই আধুনিক বাঙালী ঔপন্যাসিকদেব কাছে যথেষ্ট শিক্ষাদাতা—যাকে বর্তমানেব বাঙালা কথাশিল্পীর বৃহৎ অংশ সাফল্য-ব্যর্থতাসমেত এড়িয়ে চলেছেন। তাবা বুঝলেন না যে ববীন্দ্র-নাথ আমাদেব শিখিয়েছেন ব্যক্তিত্বেব নিগূঢ় প্রশ্নকে বিশিষ্ট রূপে উত্থাপিত কবতে।

•• তিন ••

এই আলোকেই ববীন্দ্রনাথেব উপন্যাসেব বাণী-ভঙ্গিমাও আলোচিত হওয়া উচিত। যেহেতু উপন্যাসেব ভাষা শীর্ষক অধ্যায়ে ববীন্দ্রনাথেব উপন্যাসেব ভাষা বিষয়ে কিছু আলোচনা আমবা কবেছি এবং পবে গোবা প্রমুখ উপন্যাসেব বিষয়ে এ-আলোচনা বিস্তৃত ভাবে কবাব বাসনা বইল সেহেতু এখন শুধু এ-আলোচনাব প্রসঙ্গটুকু ধবিযে দিয়েই ক্ষান্ত হব। আমবা জানি যে ববীন্দ্রনাথেব গদ্যে কাব্য-ধর্মিতা বিদ্যমান। এবং এও জানি যে কাব্যধর্মিতা ও কাব্য এক কথা নয়। শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ দত্ত 'ছন্দোমুক্তি ও ববীন্দ্রনাথ' শীর্ষক প্রবন্ধে লিপিকাব গদ্য এবং ক্ষুধিত পাষাণের গদ্যেব প্রতিতুলনা কবে দেখিযেছেন যে লিপিকাব সবল গদ্যেব মধ্যেও যে কাব্য তার মূল খুঁজতে হবে লিপিকাব আত্মায। আমবা যখনই কোনো গদ্য-রচনায় কবিত্বের কথা বলে থাকি সেটা এই আত্মাব ব্যাপাব। কাব্যধর্মী ছোপেব ব্যাপাব নয়। অতিথি গল্পেব বিষযবস্তুতে বযেছে কবিত্ব। কপালকুণ্ডলাব মতো কাব্য সেখানে সমস্ত শিল্পসৃষ্টি প্রক্রিয়াবই নিয়ামক। যে

প্রেরণায় ও নিষ্ঠায় সেখানে শিল্পকর্মকে ধারণ করা হয়েছে সে প্রেরণা-নিষ্ঠা কাব্যোৎসারিত। এই প্রেরণা রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের নয়। সেখানে পুরোদস্তুর ব্যক্তিস্বরূপের পরীক্ষা-নিরীক্ষার নানা স্তর-পরিক্রমা বিদ্যমান।

সেকারণে দেখা যায় যে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের ভাষায় যেমন মুড অনুযায়ী বহুচারিতা, উপন্যাসের ভাষার আদর্শ তা নয়। কৌতুকে, ব্যঙ্গে, রহস্য-ঘনতায়, রসোচ্ছলতায় ছোট গল্পে রবীন্দ্রনাথ নানা চাল দেখিয়েছেন। কখনো কৃত্রিম গাম্ভীর্যে কৌতুকময় (প্রায়শ্চিত্তে), কখনও সরল নিরলংকার কাব্যে সমৃদ্ধ (মণিহারা)। ছোটগল্পের নানা মুড অনুযায়ী রবীন্দ্রনাথের গদ্যের এক আশ্চর্য বিকাশ ঘটেছে—বুদ্ধদেব বসুর গল্পগুচ্ছের আলোচনা এ প্রসঙ্গে বার বার স্মরণীয়। কিন্তু উপন্যাসের ভাষায় দেখা যায় অন্য গুণ। ঔপন্যাসিকের নিরাসক্তির সঙ্গে অপূর্ব আত্মীয়তা রক্ষা করে চলে এই ভাষা। উপন্যাসের পাত্রপাত্রীর প্রয়োজনে এ-ভাষা উচ্ছ্বাস এবং প্যাশনকে প্রশ্রয় দিয়েছে বটে, কিন্তু কাব্যধর্মিতায় প্লাবিত হয়নি। বরঞ্চ ঔপন্যাসিকের দৃঢ় অনুশাসন এর সর্বত্র উপস্থিত। উপন্যাসের প্রয়োজনেই এ হতে পারে উপমাময়। শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বলেন—

> সকলে দেখেছেন যে রবীন্দ্রনাথের গদ্য তাঁর পদ্যের মতোই উপমাবহুল, কিন্তু তাঁর গদ্যোপমার সঙ্গে তাঁর পদ্যোপমার কোনোও মিল নেই। গদ্যে তিনি উপমা প্রয়োগ করেন সাধারণত অর্থের খাতিরে, সেখানে উপমার সাহায্যে তাঁর বক্তব্য স্পষ্টতর। পক্ষান্তরে তাঁর কাব্যে উপমার উৎপত্তি ভাবসঙ্গতির প্রয়োজনে অথবা ধ্বনি মাধুর্যের তাগিদে।

এবং আমরাও দেখেছি যে প্রয়োজনের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের উপমাময়তা কতখানি অর্থবহ হতে পেরেছে। (পরবর্তী অধ্যায়ে গোরা আলোচনা দ্রষ্টব্য) এবং এটাও ঠিক কথা যে রবীন্দ্রনাথের গদ্যোপমা তাঁর বক্তব্যকে স্পষ্টতর করে তোলে। তাহলে উপন্যাসে নিশ্চয় উপন্যাসের বক্তব্যকে পরিস্ফুট করাই তার কাজ। কিন্তু জানি এ-বক্তব্যে বাইরের ঘটনা প্রধান নয়। কাহিনীগামিনী চিন্তা নয় তাঁর। বরং মনেরই বিচিত্র আক্ষেপ, তাড়না, যন্ত্রণা, মোচড় তাঁর বিষয় বা বক্তব্য। কাজেই এখানেও তাঁর ভাষায় উপমাপ্রদানের পদ্ধতিতে মনেরই সূক্ষ্মতার অভিব্যক্তি ঘটে। পাত্র-পাত্রীর মনের টান ফুটে ওঠে ভাষায়। যেখানে সে টান কৃত্রিম, সেখানে ভাষাও কৃত্রিম। যেমন শেষের কবিতা। যেখানে সে টান জোরালো সেখানে ভাষাও বেগময়। যেমন চতুরঙ্গ।

•• চার ••

চোখের বালি রবীন্দ্রনাথের প্রথম শক্তিমান সৃষ্টি। এই উপন্যাসেই তিনি প্রথম উপন্যাসের ক্ষেত্রে সমসাময়িক সমাজের পাত্র-পাত্রীকে ব্যবহার করলেন। এই উপন্যাসেই তিনি প্রথম কাহিনীর ভার পরিহার করে ব্যক্তিত্বের ফলস্বরূপ নানা সংকটকে উপন্যাসের বিষয় হিসাবে ব্যবহার করলেন। এই উপন্যাসেই তাঁর শক্তি এবং শক্তির সীমা দুয়েরই আভাস পাওয়া গেল। অথচ এর জন্যে রবীন্দ্রনাথকে আগাগোড়া নতুন হতে হয়নি। এমন কি রবীন্দ্রনাথের দুঃসাহসিকতম লেখাও নয় চোখের বালি। সেদিক দিয়ে বরঞ্চ নষ্টনীড় অনেক সাহসিক পদক্ষেপ। তথাপি চোখের বালিতেই জানা গেল রবীন্দ্রনাথ আর বৌ ঠাকুরানীর হাট, রাজর্ষি লিখবেন না। জানা গেল যে বাংলা উপন্যাসের তখনও-পর্যন্ত-প্রচলিত ছক ভেঙে তিনি এবার এগুবেন।

তাই বঙ্কিমচন্দ্রের দীর্ঘ ছায়া চোখের বালিতে দৃশ্যমান, কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও সত্য যে সে ছায়া বিলীয়মান এবং অবসন্ন। যদি পুরনো কালের অনুসরণে আমরা বিষয়বস্তুর আলোচনা করি তাহলে দেখতে পাই কৃষ্ণকান্তের উইলের সঙ্গে চোখের বালির বিষয়ের সাদৃশ্য বর্তমান। একটি বিবাহিত দম্পতির জীবনে একটি নারী, যে বিধবা, সে কেমন প্রতিক্রিয়া সৃজন করল এবং নিজের প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হল এটাই দুই উপন্যাসের বিষযবস্তু। কিন্তু আমরা আগেও বলেছি যে এভাবে বিষয়বস্তু বিচার সম্ভব নয়--এখানেও আলোচনা করে দেখাব যে এই দৃশ্যত সাদৃশ্যেরও কোনো অর্থ নেই। যদিও কৃষ্ণকান্তের উইলের বেড়াল মারতে গিয়ে ভ্রমরের নিজের মাথায় লাঠি মেরে বসার মতো এ-উপন্যাসেও খাঁচার ভিতর থেকে মরা পাখি আবিষ্কারে ইঙ্গিত দানের চেষ্টা বিদ্যমান; যদিও মুগ্ধা নায়িকা আশার সঙ্গে বিনোদিনী-ভাবাতুর মহেন্দ্রের দাম্পত্য প্রেমের লীলায় মুগ্ধ ভ্রমর ও গোবিন্দলালের চুম্বনদৃশ্যের কথা মনে পড়বে, যদিও বিনোদিনীর আচারে-ব্যবহারে লজ্জাশীলা গ্রাম্য বধূর চেয়ে প্রেমবাসনাতুরা প্রগল্‌ভা রোহিণীর ছায়া অধিক স্পষ্টতর, তথাপি এ সমস্তই বাইরের ব্যাপার। বিধবা হলেই ক্ষুধিতহৃদয়া হবে—বিশেষ যদি যুবতী হয়—এ হল বাংলা নভেলের ত্রিকালগত ধারণা। রোহিণী থেকেই সে ধারণা চলে আসছে। এবং সেই সব উপন্যাসসম্ভব বিধবাদের উপন্যাসে উপস্থাপিত করার কৌশলটিও লক্ষণীয়। ভ্রমরের সুখ দেখে রোহিণীর মনে ক্ষুধার জ্বালা জাগ্রত হয়েছে। তারও মনের মধ্যে, সম্মুখে এক দম্পতির পূর্ণ জীবন দেখে, সুখ বাসনার

সঞ্চার হয়েছে। বিনোদিনীর ক্ষেত্রেও তাই—

> ক্ষুধিতহৃদয়া বিনোদিনীও নববধূর নবপ্রেমের ইতিহাস মাতালের জ্বালাময় মদের মতো কান পাতিয়া পান করিতে লাগিল। তাহার মস্তিষ্ক মাতিয়া শরীরের রক্ত জ্বলিয়া উঠিল।·····
>
> তাহার শিরায় শিরায় যেন আগুন ধরিয়া গেল। সে যে দিকে চায় তাহার চোখে যেন স্ফুলিঙ্গ বর্ষণ হইতে থাকে। এমন সুখের ঘরকন্না—এমন সোহাগের স্বামী। এ-ঘরকে যে আমি রাজার রাজত্ব, এ স্বামীকে যে আমি পায়ের দাস করিয়া রাখিতে পারিতাম। আমার জায়গায় কিনা এই কচি খুকি, এই খেলার পুতুল।

স্মরণীয় যে রোহিণী এই ভাবেই চিন্তা করেছিল—গোবিন্দলালবাবুর স্ত্রী আমাপেক্ষা কোন্ গুণে গুণবতী? সুতরাং এখানেও বিনোদিনীর উপস্থাপনাতে রোহিণীর ছায়া মনে আসে। আবার গিলটির গয়নার প্রসঙ্গে রোহিণীর যে ব্যাপিকা মনোভাব—মহেন্দ্রর সঙ্গে বিভিন্ন ব্যবহারে বিনোদিনীতেও তারই স্মৃতি। রোহিণীর নির্লজ্জতা আর বিনোদিনীর নির্লজ্জতা একই সূত্রে যেন বিধৃত হয়ে রয়েছে এ-কথা কখনো কখনো না মনে হয়ে যায় না। রোহিণীর অপরের সর্বনাশের ইচ্ছা এবং বিনোদিনীর সকল কিছুর ধ্বংস বাসনা তুলনীয়:

> ক্রুদ্ধা মধুকরী যাহাকে সম্মুখে পায় তাহাকেই দংশন করে, ক্ষুব্ধা বিনোদিনী তেমনি তাহার চারিদিকের সমস্ত সংসারটাকে জ্বালাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। যে যাহা চায় তাহাতেই বাধা? কোনো কিছুতেই কি সে কৃতকার্য হইতে পারিবে না। সুখ যদি না পাইল তবে যাহারা তাহার সকল সুখের অন্তরায়, যাহারা তাহাকে কৃতার্থতা হইতে ভ্রষ্ট, সমস্ত সম্ভবপর সম্পদ হইতে বঞ্চিত করিয়াছে, তাহাদের পরাস্ত ধূলি-লুণ্ঠিত করিলেই তাহার ব্যর্থ জীবনের কর্ম সমাধা হইবে।

লক্ষণীয় যে রোহিণী এবং বিনোদিনী উভয়েই নিজ জীবনের নিরুপায় তৃষ্ণার কথা স্মরণ এবং স্বীকার করেছে। বারে বারে বিভিন্নভাবে। বিনোদিনী এবং মহেন্দ্রের সংসার ছেড়ে যুগল যাত্রায় রোহিণী-গোবিন্দলালের প্রসাদপুর যাত্রার কথা স্মরণীয়।

শুধু এইটুকুতে নয়, আকস্মিক ঘটনার প্রভাবে উপন্যাসের জটিলতায় গ্রন্থিবৃদ্ধির ব্যাপারে কিছু কিছু গত শতাব্দীর জের তখনও রবীন্দ্রনাথে বর্তমান। চিঠি ধরা পড়া, অসতর্ক প্রেম-ঘন-মুহূর্তে অপরের দৃষ্টিগোচর হওয়া এ-সবই সেই আকস্মিক

ঘটনার ওপর নির্ভরশীলতা এ-কথা সকলেরই জানা। কিন্তু এ-সমস্ত ঘটনা লক্ষণ একান্ত ভাবে বাইরের ঘটনা ও লক্ষণ। ছায়া যেটুকু বঙ্কিমের তা যত দীর্ঘ হোক উপন্যাসের স্বাধীন ছন্দকে প্রভাবিত করতে পারেনি। কিন্তু তৎপূর্বে রবীন্দ্রনাথ নিজে চোখের বালি সম্বন্ধে এবং এই সাহিত্যকর্মের উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে যা বলেছেন সেটির ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণ হওয়া দরকার। রবীন্দ্রনাথ নিজের লেখার নিজেই ব্যাখ্যা করতেন এ-কথা সুবিদিত। বঙ্কিম যেমন উপন্যাসের গতিকে থামিয়ে ব্যাখ্যা দিয়ে কৈফিয়ত দিতেন—কেন এরূপ ঘটিল, রবীন্দ্রনাথ অবশ্যই সেভাবে ব্যাখ্যা দিতেন না, কিন্তু গুরুনির্ভর দেশে গুরুব্যাখ্যা না হলে বোধহয় আশ মেটে না। অথচ প্রতি ক্ষেত্রেই যে এ-ব্যাখ্যা নির্ভুল হতে পারে না এ-নিদর্শনও কম নয়। রবীন্দ্রনাথের প্রদত্ত চোখের বালির টীকা গ্রহণেও এই গোলমাল। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

> চোখের বালির গল্পকে ভিতর থেকে ধাক্কা দিয়ে দারুণ করে তুলেছে মায়ের ঈর্ষা। সেই ঈর্ষা মহেন্দ্রের সেই রিপুকে কুৎসিত অবকাশ দিয়েছে যা সহজ অবস্থায় এমন করে দাঁত নখ বের করত না। যেন পশুশালার দরজা খুলে দেওয়া হল, বেরিয়ে পড়ল হিংস্র ঘটনাগুলো অসংযত হয়ে।

এই ভ্রান্তিসৃজনী বিবৃতিটির জন্যই চোখের বালিকে বহু অভিযোগের সম্মুখীন হতে হয়। এখনি আমরা আলোচনা করব যে এই বিবৃতিটির একটি কথাও সত্য নয়। এই ক্ষুদ্র মন্তব্যের ফলে চোখের বালি সম্বন্ধে আমাদের আকাঙ্ক্ষা উচ্চাশার পাহাড়ে চড়ে বসে। অথচ চোখের বালিতে তার সমর্থন নেই। মহেন্দ্রের জীবনে বিনোদিনীর সূত্রে যে-সব অভিজ্ঞতার সঞ্চার হল মায়ের ভূমিকা সে অভিজ্ঞতা-রচনায় কতটুকু? রবীন্দ্রনাথ যেভাবে বলেছেন যে মায়ের ঈর্ষা সমস্ত ব্যাপারটাকে দারুণ করে তুলেছে—ঈর্ষার সে জাতীয় কোনো স্থায়ী ভূমিকা ছিল কিনা? চোখের বালি দুটি প্রশ্নেরই না-বাচক উত্তর দেবে। রাজলক্ষ্মীর গ্রাম-বাসে গমনের পশ্চাতে অবশ্যই পুত্রের প্রতি বিরক্তি, এবং আশার পুত্রবধূ হিসাবে অক্ষমতা প্রধানত তার মূলে।[১৮] এখানে রাজলক্ষ্মীর ঈর্ষার ভূমিকা রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট করেই দেখিয়েছেন, বিশেষ বিনোদিনীর আতিথেয়তায়-সেবায় আশার বিপরীত তুলনা রাজলক্ষ্মীর মনে ক্রিয়াশীল হয়েছে। ঈর্ষার ভূমিকা এইটুকুই। বিনোদিনীকে রাজলক্ষ্মী গ্রাম থেকে প্রত্যাগমনের সময় কলকাতার বাড়িতে নিয়ে এলেন। কেন নিয়ে এলেন, নিয়ে আসার পশ্চাতে কোনো জ্বালা, কোনো উদ্দেশ্য ক্রিয়াশীল ছিল এমন কোনো প্রমাণ নেই। সুতরাং মায়ের ঈর্ষায় বিনোদিনীকে আশার

বিকল্প হিসাবে (মহেন্দ্রের বধূর বিকল্প নয়, পুত্রবধূর বিকল্প) কলকাতার বাড়িতে আনা হল এ-কথা কী সাক্ষ্যে বিশ্বাস করা যায়। যদি ধরা যায় যে তখনও মায়ের ঈর্ষা কার্যকরী ছিল, কেননা বিনোদিনীকে মহেন্দ্র দেশে পাঠিয়ে দেওয়ার কথা বলাতে রাজলক্ষ্মী বললেন—'ও বেহারি তুই একবার মহিমকে বুঝাইয়া বল্। বিপিনের বউ আছে বলিয়াই এই বৃদ্ধ বয়সে আমি একটু বিশ্রাম করিতে পাই। পর হউক যা হউক আপন লোকের কাছ হইতে এমন সেবা তো কখনও পাই নাই।' তা হলেও এ ঈর্ষার মূল্য কতটুকু ? প্রথম কথা এটা ঈর্ষা না অভিমান ? বৃদ্ধবয়সে সেবা-বাসনাতুরা শাশুড়ীর অভিমানের স্বরই এর মধ্যে পরিস্ফুট হয়েছে অধিকতর। এ অভিমানের ভূমিকা এ-উপন্যাসের জটিল পরিস্থিতি সৃজনে একটা সামান্য অংশ দাবি করতে পারে—তার বেশি নয়। কেননা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—মায়ের ঈর্ষা। মায়ের ঈর্ষা হলে পুত্রের ওপর অপরের অধিকারকে—এখানে বধূর অধিকারকে বিচলিত করার একটা সচেতন প্রয়াস, অথবা অচেতন বাসনা সদাই লক্ষ্য করা যেত। রাজলক্ষ্মীর উদ্ধৃত উক্তি থেকে দেখা যায় এ জাতীয় কোনো উদ্দেশ্যই তাঁর ছিল না। শাশুড়ী হিসাবে পুত্রবধূর ওপর একটা অধিকার মনে মনে সাব্যস্ত করে আছেন। আশা সেদিক দিয়ে তাঁকে ক্ষুণ্ণ করেছে। বিনোদিনীকে দিয়ে তিনি সেই সাধটুকু মেটাতে চান। শাশুড়ী হিসাবে পুত্রবধূর ওপর তাঁব অধিকার-চেতনাই এখানে ভূমিকা গ্রহণ করেছে। মা হিসাবে নয়। বিনোদিনী আশা-মহেন্দ্রের মধ্যে কোনো ছায়া বিস্তার করে এ-জাতীয় চিন্তা, কাজেকাজেই, রাজলক্ষ্মীর ছিল না। রাজলক্ষ্মী যে বিনোদিনীকে আশার কাছ থেকে দূরে সরে থাকতে বলেছিলেন—('তুমি পাড়াগাঁয়ের গৃহস্থঘরে ছিলে—আজকালকার চালচলন জানো না। তুমি বুদ্ধিমতী, ভালো করিয়া বুঝিযা চলিও')—তার মধ্যেও রাজলক্ষ্মীর ব্যর্থ শাশুড়ীর অধিকার-চেতনাই প্রকট। বিনোদিনী একমাত্র তাঁরই অনুগত থাকুক। আশার ব্যাপারে তার যেন আকর্ষণ না থাকে এই ছিল রাজলক্ষ্মীর অভিপ্রায়। পুত্রবধূ হিসাবে আশার ব্যর্থতা, ভ্রাতুষ্পুত্রবধূর সাহায্যে ফুটিয়ে তুলতে হবে এই ভূমিকাটুকু মাত্র রাজলক্ষ্মী পালন করেছিলেন। 'মায়ের ঈর্ষা' কথাটা অনেক বড়ো কথা। সে ঈর্ষাকে উপন্যাসে ব্যবহার করতে হলে যে জাতীয় মর্মদাহী সহ্যাতীত অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে পড়তে হত রবীন্দ্রনাথ স্বভাবতই তার পক্ষপাতী ছিলেন না। এ-উপন্যাসে তাঁর লক্ষ্য তা ছিল না। তাঁর ব্যাখ্যাই এই বিচার-বিভ্রাট ডেকে এনেছে।

কাজেই বিনোদিনী যখন বলছে যে নিজের মনকে সবাই চেনে না রাজলক্ষ্মীও

চিনতেন না, যখন বলছে—'নিজের মনও সবাই জানে? তুমি কি কখনও তোমার বউয়ের দ্বেষ করিয়া এই মায়াবিনীকে দিয়া তোমার ছেলের মন ভুলাইতে চাও নাই? একবার ঠাওর করিয়া দেখ দেখি'—তখন বিনোদিনীর অভিযোগের জন্য উপন্যাস প্রস্তুত নয়। কেননা পূর্বে বিনোদিনী যখন আশার অবর্তমানে মহেন্দ্রের সেবার ভার গ্রহণে অনিচ্ছুক হয়েছিল, তখন রাজলক্ষ্মী বিরক্ত হয়েছিলেন, বিনোদিনীর কথায় সমাজ নিন্দার আভাস দেখে। মহেন্দ্রের মতো ভালো ছেলে কোথাও নেই, এবং তার সম্বন্ধে যদি কেউ কিছু বলে তো জিভ খসে যাক—এমনই গভীর পুত্র-গৌরব তাঁর ছিল। কাজেই বিনোদিনী মহেন্দ্রের সে জাতীয় কোনো ক্ষতি করতে পারবে না এ-ধরনের দৃঢ় বিশ্বাস থেকেই বিনোদিনীকে তিনি মহেন্দ্রের সেবাব ভাব নিতে বলেছিলেন। এরই সঙ্গে সঙ্গতি রেখে রাজলক্ষ্মীর পরের আচরণটিও লক্ষণীয়। মহেন্দ্র যখন বিনোদিনীর সঙ্গ একাকী লাভ করার জন্য ব্যাকুল, এবং বিনোদিনী মহেন্দ্রকে এড়িয়ে যাবার জন্য কাজের ছল সৃষ্টি করে উঠে যেতে চাচ্ছে তখন মহেন্দ্র মাকে বলছে 'মা এইমাত্র অনুতাপ করিতেছিলে উঁহাকে খাটাইয়া মারিতেছ, আবার এখনই কাজে টানিয়া লইয়া চলিলে?'—উত্তরে তখন রাজলক্ষ্মী বলছেন—'আমাদের লক্ষ্মীমেয়ে যে কাজ করিতেই ভালবাসে।' বিনোদিনীব অভিযোগ সত্য হলে নিঃসন্দেহে রাজলক্ষ্মীর আচবণ অন্যরূপ হত। এবং সে আচরণ মহিনের যাতে কষ্ট না হয় এ-বোধ থেকে উৎসাবিত হত না।।

তাছাড়া অন্যদিক থেকেও দেখা যায় রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যার কোনো সঙ্গত কারণ নেই। বিনোদিনীর অভিযোগ সত্য হলে রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যা সত্য হয় নচেৎ নয়। বিনোদিনী রাজলক্ষ্মীকে বোঝাল যে মানুষ তার নিজের মনকে সবসময় জানে না, সবটা জানে না। রাজলক্ষ্মী বিনোদিনীকে অজ্ঞাতে ছেলের মন ভোলানোর জন্যই ব্যবহার করেছেন--এটা বিনোদিনী রাজলক্ষ্মীকে স্পষ্ট করে অবিচলিতভাবে বলেছিল। আমরা তর্কের খাতিরে ধরে নিচ্ছি বিনোদিনীর অভিযোগ সত্য। তাহলে এটা স্বাভাবিক যে রাজলক্ষ্মীর আচরণে বিনোদিনীর উক্তির পর একটা প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে। এবং মহেন্দ্রের ও বিনোদিনীর পরবর্তী জটিলতর পরিস্থিতির জন্য রাজলক্ষ্মী (নিজের কাছে নিজে ধরা পড়েছেন বলেই) সমুদয় ঘটনার জন্য নিজেকে দায়ী করবেন অথবা নিজের মনের সঙ্গেই যুদ্ধ করবেন নিজেকে নির্দোষ প্রতিপন্ন করার জন্য। রাজলক্ষ্মীর আচরণে ব্যবহারে তিলমাত্র সে লক্ষণ নেই। তাঁকে মরণাপন্ন দেখেও মহেন্দ্র বিনোদিনীর

সন্নিধানে চলে গেল এই অভিমানাহত মূর্তিতেই বরঞ্চ তাঁকে আমরা দেখতে পাই।'

সুতরাং রবীন্দ্রনাথের কথিত মায়ের ঈর্ষা এই উপন্যাসের নিদারুণতার স্রষ্টা নয়। অথচ এই ব্যাখ্যাকে বাদ দিয়ে উপন্যাসের নিজস্ব ন্যায় অনুসরণ করে চললে উপন্যাসটির প্রকৃত চেহারা আমাদের নজরে পড়ে। তখন হয়তো আর মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের যাবতীয় চাহিদা—যথা ঈর্ষা-জট প্রভৃতির দাবি—চোখের বালি মেটায় না, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের তাৎপর্যপূর্ণ উপন্যাস হিসাবে এ-উপন্যাসের মর্যাদার কিছুমাত্র লাঘব হয় না। সে কারণেই কোনো উপন্যাসকে কোনো প্রকার লেবেল মেরে বিচার করে বা বিচার করে লেবেল মেরে দেওয়া অসঙ্গত। যে উপন্যাসই হোক না কেন জীবনের একটা সমস্যা—তা সে অভিজ্ঞতাকে যাচাই করার সমস্যাই হোক, বা চরিত্রের নিজের কোনো উপলব্ধির সমস্যাই হোক—সেখানে উপস্থিত থাকবে। উপন্যাসের শিল্পবিচার সেই সমস্যার সঙ্গে গ্রথিত করে করা বাঞ্ছনীয়।

জিজ্ঞাসাহীন সমালোচনায় এক কথায় এ-সমস্যা কী তা ব্যাখ্যা করে দেওয়া যায়। মহেন্দ্রের জীবনে বিনোদিনীঘটিত সংকটই এই সমস্যার উপন্যাসধৃত চেহারা। কিন্তু এ-ব্যাখ্যা আমরা জানি যে একেবারে বহিরঙ্গ-বিষয়ক। বিস্তৃত রসসন্ধানী আলোচনায় ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই উপন্যাসের পাত্রপাত্রীর জীবনের ঘূর্ণিঝড়ের কেন্দ্র বলে আখ্যাত করেছেন মহেন্দ্র-বিনোদিনীর সম্পর্কের টানা-পোড়েনকে। প্রকৃত ব্যাখ্যার কাছাকাছি গেলেও, এ-মন্তব্যও জিজ্ঞাসা-সাপেক্ষ। মহেন্দ্র-বিনোদিনীর সম্পর্ক উপন্যাসের ঝড়ের কেন্দ্র না উপন্যাসের ঝড়ের পরিণাম? অর্থাৎ এই কেন্দ্র থেকে ঝড় উদ্ভূত হয়নি। ঝড় উদ্ভূত হয়েছে অন্যত্র। সেই ঝড়ের ফলে সৃজিত হয়েছে মহেন্দ্র-বিনোদিনীর সমস্যা। এরা উপন্যাসের মূল ঘটনার পাত্রপাত্রী। কিন্তু ঘটনার স্রষ্টা নয়। ঘটনার সৃজন। বাস্তবিক পক্ষে এইখানেই উপন্যাসের মূল শিল্পরহস্যটি নিহিত রয়েছে। ঘটনা-প্রবাহের স্রষ্টা বিনোদিনী। এবং বিনোদিনীকে ভিতর থেকে ধাক্কা দিচ্ছে বিহারী। বিনোদিনীর সংকটের ফলেই মহেন্দ্রকে সংকটাপন্ন হতে হয়েছে।

এ-কথাটির আর একটু বিস্তৃত আলোচনা করা দরকার। শুধুমাত্র চরিত্র ব্যাখ্যা করে উপন্যাস আলোচনা কদাচ সমাপ্ত হতে পারে না। যে জীবন উপন্যাসে বিধৃত হয়েছে সেই জীবনের বিশিষ্টতাও ব্যক্তিবৃন্দের পরস্পর সম্পর্কে সেই জীবন-বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলনের ব্যাখ্যা ব্যতিরেকে উপন্যাস সংক্রান্ত কিছুই

ব্যাখ্যাত হতে পারে না। উক্ত জীবন-বৈশিষ্ট্যের ধারক শেষ পর্যন্ত মানুষের মন। তাই সেটা স্থিতিধর্মী নয়। অন্তর-বাহির, উভয়ের আঘাতেই তা পরিবর্তনমুখী হতে পারে। তখন সে তার জীবন-বৈশিষ্ট্যকে যাচাই করে নিতে চায়। উপন্যাসের আলোচনায় এই সমগ্রের আলোচনা দরকার। মহেন্দ্রকে শুধুমাত্র আত্মাভিমানী মূঢ় (ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উক্তি) বললে এই কারণেই তার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা হল না।

মহেন্দ্র যেভাবে এই উপন্যাসের মূল ঘটনা পর্যন্ত, অর্থাৎ বিনোদিনী-বৃত্তান্ত পর্যন্ত জীবন যাপন করেছে, সে অবধি তার জীবনকে বলা চলে মোটামুটি পরিবার-কেন্দ্রিক জীবন। তার মা, তার বন্ধু, তার বৌ—এই অধিকার চেতনাই এই জীবনযাত্রার ফল। এখানে ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায় ঠিকই বলছেন যে কোনো কিছুর জন্যই তাকে কষ্ট কবতে হয়নি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও লক্ষণীয় যে এব ফলে মহেন্দ্রের মনে অনায়াস-লব্ধ অধিকারের সামগ্রীগুলোর ওপর একটা দারুণ অবহেলাবোধও আছে। অধিকাব-স্ফীত বিত্তশালী ব্যক্তির যেমন অনায়াসে অর্জিত ধন সম্বন্ধে অপ্রকাশ্যে একটা অবহেলাবোধ থাকে, মহেন্দ্রেরও মা, বৌ সম্বন্ধে সেই ধারণাই ছিল। এদিক থেকে মহেন্দ্রের মনে আমাদের কিম্ভূতকিমাকার মধ্যবিত্ত অধিকাব-বোধেব ছায়া পড়েছে। সে, অবলীলাক্রমে শিশু যেমন সন্দেশ দেখে আবদার ধবে, সেইভাবে আশাকে দেখেই বিবাহ করার সংকল্প ঘোষণা করেছে। সে অবলীলায় আশাব জন্য মাকে, বিনোদিনীর জন্য আশাকে এবং বিনোদিনী ও আশার জন্য বিহারীকে পরিহার করেছে অথবা করতে চেয়েছে। জগৎ সংসার যেন তার জন্যই সৃজিত হয়েছে—এই অন্যায় অধিকার-বোধই মহেন্দ্রের চরিত্রের মূলকথা। এবং এই চরিত্র-বৈশিষ্ট্য প্রকৃত পক্ষে তার জীবন-বৈশিষ্ট্যেরই ফল। সে যে অবলীলাক্রমে বিনোদিনীকে বিয়ে করব না বলেছিল সেই ভাবেই অবলীলাক্রমে আশাকে বিয়ে করব বলে। কারো রাজী-অরাজীর প্রশ্ন সে মানে না, সম্ভত খোঁজও রাখে না সে প্রশ্নের। মহেন্দ্রের জীবনের এই ছকে বিনোদিনী একটা প্রথম এবং প্রবল প্রতিক্রিয়া। বিনোদিনী শুধু আত্মীয়া নয়, নারী নয়, সে একটা ব্যক্তি। আর সকলে যেখানে স্নেহাতিশয্যে তার আতিশয্যকে সৃষ্টি করেছে—সৃষ্টি করেছে তার অধিকার বোধকে—আর সকলে যেখানে ব্যক্তিত্ব বিবর্জিত হয়ে মহেন্দ্রের প্রসাদপ্রার্থী—বিনোদিনী সেখানে তার কৃপাকণা-ভিখারিণী নয়। সে অনায়াসে কাছে আসতে পারে, অনায়াসে দূরে যেতে পারে। সে অতি সহজে নিষ্ঠুর কৌতুকে মহেন্দ্রের

মাথাধরার ব্যথাকে যথাস্থানে আঘাত করর্তে পারে। এই বিনোদিনী মহেন্দ্রের অভিজ্ঞতার মানুষগুলো থেকে পৃথক বলেই বিনোদিনী সম্বন্ধে তার মূল্য বোধের প্রশ্ন ওঠে। এবং মহেন্দ্রের বিনোদিনীর প্রতি মনোভাবের অন্তত একটা নৈতিক ব্যাখ্যা না থাকলে মহেন্দ্র গোবিন্দলাল থেকে পৃথক হবে কী করে। মহেন্দ্র বিনোদিনীকে মূল্য দিতে গিয়ে চারিদিকের মূল্যহীনতাকে পরিহার করে যেতে চেয়েছে। আত্মসম্বিতের অভাবে এই মূল্যহীনতা যে তারই প্রজাবৃন্দ, তারই রাজ্যপাট এই কথাটা শুধু সে বোঝেনি। ফলে তার যাত্রাও হয়েছে উদ্দেশ্য-হীনতায় খণ্ডিত।

এই প্রসঙ্গে আমরা আর একবার ডাঃ বন্দোপাধ্যায়ে উক্তি স্মরণ করব। তিনি বলেছেন, "সে (মহেন্দ্র) যে সত্য সত্যই আন্তরিকতার সহিত চিত্তজয়েব চেষ্টা না করিয়াছে তাহা নহে, এবং বিনোদিনী যে অনিবার্য বেগের সহিত তাহাকে আকর্ষণ করিয়াছিল তাহাও ঠিক নয়"--স্থতরাং বিহারীর প্রতি বিনোদিনীর অনুরাগের সম্ভাবনাতে সে ঈর্ষা-কাতর হয়ে আত্মদমনেচ্ছাকে বিসর্জন দিয়েছে এমন সিদ্ধান্ত অনিবার্য। তাহলে এই প্রতিযোগিতা-পরায়ণ ঈর্ষাকেই মহেন্দ্র-বিনোদিনীর ঘটনা সমন্বিত উপন্যাসের মূল চালিকাশক্তি বলতে হয়। আমাদের মনে হয় উদ্ধৃতাংশের শেষাংশ সত্য নয়। মহেন্দ্র চিত্তজযের চেষ্টা করেছে সত্য, বিনোদিনীর আকর্ষণও অনিবার্য মনে হয়েছে তার কাছে এও সত্য। বিনোদিনীর জীবনোৎকর্ষে এর একটা কারণ অনুসন্ধান করা চলে। আশার চারুপাঠ এবং বিনোদিনীর কপালকুণ্ডলার মধ্যে এই জীবনগত তার-তম্যের ব্যাপারটির ইঙ্গিত হয়তো আছে। বিনোদিনীর মাজিত বাগবৈদগ্ধ্য যে সূক্ষ্ম রুচি ও অনুভূতিশীলতারই পরিচায়ক এ-ইঙ্গিতও বিদ্যমান। এইগুলো যখন বিনোদিনীর তারুণ্যশ্রীর সঙ্গে মিশ্রিত হযে মহেন্দ্রের সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছে তখনই মহেন্দ্র বিনোদিনীর মূল্যকে আবিষ্কার করবে এ-রকম একটা আশা বিনোদিনীর ছিল। কিন্তু আমরা জানি যে বিনোদিনীর আকর্ষণ তার কাছে তার পূর্বেই অনিবার্য হয়ে উঠেছে। মনে রাখা দরকার যে বিনোদিনী নিজে বাস্তবিকপক্ষে তাকে আকর্ষণ করেনি। কেননা বিনোদিনীর মহেন্দ্রের সম্বন্ধে ব্যঙ্গবোধ প্রেমিকার পরিহাস-রসিকতা নয়। ওডিকলোন-কাহিনীতে বিনোদিনীর ব্যবহারে সেই ব্যঙ্গ, মহেন্দ্র সম্বন্ধে বিনোদিনীর উক্তি—মাটি হইবার ক্ষমতা থাকা চাই—এবং আরো নানাবিধ সংখ্যাতীত আচরণে ও উক্তিতে বিনোদিনীর এই শানিত ব্যঙ্গের মনোভাব স্পষ্ট। মহেন্দ্রের জীবনের প্রতি,

জীবনধারা ও পদ্ধতির প্রতি বিনোদিনীর সমালোচনা থেকেই এই ব্যঙ্গের মনোভাবের জন্ম। এটাই প্রথমে মহেন্দ্রকে আকর্ষণ করেছে। মহেন্দ্রের কাছে এ-ব্যাপার অভিনব। কেউ যে তাকে সাধারণ বলে মনে করবে, কেউ যে তার সম্বন্ধে নিশ্চেষ্ট থাকে, এই রকম ব্যঙ্গ করে, এ-অভিজ্ঞতা তার ইতোপূর্বে হয়নি। অথচ বিনোদিনী যদি নিশ্চেষ্ট না থাকত, যদি সে সত্যই সাধারণ হত তাহলে মহেন্দ্রই বরং অচিরে তাকেও বিহারী, আশা ও রাজলক্ষ্মীর মতো তার রাজ্যপাটের একজন মনে করে শান্ত হয়ে যেত। মহেন্দ্রের সাম্রাজ্যে জিজ্ঞাসাহীন আনুগত্যে বিনোদিনীও মিশে থাকত। বিনোদিনী তা থাকেনি।

কেন থাকেনি? মহেন্দ্রের জীবনযাপনের ধারা ও পদ্ধতিকে সে সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখত বলে। বিনোদিনীর দীর্ঘ ব্যবহারে এ-সমালোচনা যেমন ফুটে উঠেছে, তার পত্রে এ তেমনি সাপের মতো তীব্র রোষে বিষ ছড়িয়েছে। মহেন্দ্রের আশৈশব জীবনযাত্রা প্রণালীকেই সে সর্বত্র আঘাত করেছে। এর কারণরূপে ব্যাখ্যা করা হয় বিহারীর প্রতি বিনোদিনীর অনুরাগের সম্ভাবনা বা অনুরাগবোধ। ঈর্ষা বা অনুরাগবোধকে একটা উপন্যাসের ঘটনাসমূহের চালিকাশক্তি বলে আখ্যাত করা আর রোগ লক্ষণকেই রোগ বলে ঘোষণা সমান ভ্রান্তিকর। সুতরাং বিনোদিনী মহেন্দ্রে আশ্রয় খুঁজে পেল না কেন এর জবাবে শুধু বিহারীকে দেখিয়ে দিলেই চলবে না, দুটো ব্যাপারই এক মূল থেকে উৎসারিত হচ্ছে। বিনোদিনীর স্বতন্ত্র মর্যাদাকে কেউ উপলব্ধি করুক বিনোদিনীর জীবনোৎকর্ষের ফলে এ পিপাসা বিনোদিনীর মধ্যে সদাজাগ্রত ছিল। মহেন্দ্রের রাজ্যপাটের মধ্যে সে সম্ভাবনা ছিল না। মহেন্দ্র বিনোদিনীর বশ্যতা স্বীকারেই সুখী হবে এমন ধারণাই মহেন্দ্রের প্রথমে ছিল। কিন্তু বিহারী বিনোদিনীর শান্ত স্বাতন্ত্র্যকে প্রথমাবধি মূল্য দিয়েছে। দমদমে চড়ুইভাতির দিনে বিহারী-বিনোদিনীর আলাপনে বিহারীর কাছে বিনোদিনীর এতদিনের অভিজ্ঞতা থেকে পৃথক মূল্য আবিষ্কৃত হয়েছে। এবং আবিষ্কৃত যে হয়েছে সেটা বিনোদিনীর কাছে অজানা ছিল না। মহেন্দ্রের জীবনযাত্রার মধ্যেই এই নারীর পৃথক স্বতন্ত্র মূল্যকে উপলব্ধি না করার অভ্যাসটুকু সঞ্চিত হয়েছে। নিঃসম্পর্ক বিহারীর সে ক্ষেত্রে কোনো দাবি বা অধিকার—(মহেন্দ্র যে সম্বন্ধে প্রথমে ভ্রান্তভাবে সচেতন সে জাতীয় দাবি) ছিল না। পরস্পরকে শ্রদ্ধার এবং উভয়ের ব্যক্তিত্বকে স্বীকার করার ভিতর দিয়ে বিহারী-বিনোদিনীর সম্পর্কের সূত্রপাত। মনে রাখতে হবে এর আগেই বিহারী বিনোদিনীকে বলেছে যে সে তাকে সাধারণ বলে মনে করে

না। সে সমস্ত ভিড়ের মধ্যে বিনোদিনীর কাছেই নতুন পথের আশা করে। দমদমের চড়ুইভাতির শৈশব স্মৃতিচারিণী বিনোদিনীকে দেখে বিহারীর মনোভাব লক্ষণীয় :

(ক) বিনোদিনীর চক্ষে যে কৌতুক-তীব্র কটাক্ষ দেখিয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টি বিহারীর মনে এ পর্যন্ত নানা প্রকার সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল, সেই উজ্জ্বল কৃষ্ণ জ্যোতি যখন একটি শান্ত সজল রেখায় ম্লান হইয়া আসিল তখন বিহারী যেন আর একটি নতুন মানুষ দেখিতে পাইল।

(খ) বিহারী দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে বলিল, 'প্রকৃত আপনাকে মানুষ আপনিও জানিতে পারে না, অন্তর্যামীই জানেন, অবস্থাবিপাকে যেটা বাহিরে গড়িয়া ওঠে সংসারের কাছে সেইটাই সত্য। বিহারী কথাটাকে থামিতে দিল না—প্রশ্ন করিয়া করিয়া জাগাইয়া রাখিতে লাগিল। বিনোদিনী এ পর্যন্ত এ সকল কথা এমন করিয়া শোনাইবার লোক পায় নাই—বিশেষ কোনো পুরুষের কাছে সে এমন আত্মবিস্মৃত স্বাভাবিক ভাবে কথা কহে নাই—আজ অজস্র কলকণ্ঠে নিতান্ত সহজ হৃদয়ের কথা বলিয়া তাহার সমস্ত প্রকৃতি যেন নব-বারিধারায় স্নাত, স্নিগ্ধ ও পবিতৃপ্ত হইয়া গেল।

উদ্ধৃতাংশের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের শেষ বাক্যটি যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। শেষ বাক্য একটি উপমা। আমরা রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের গদ্য-ভঙ্গির আলোচনায় বলেছি যে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে ব্যবহৃত উপমা উপন্যাসের অন্তর্নিহিত বিষয়ার্থকেই স্পষ্ট করে। 'নব বারিধারায় স্নাত প্রান্তরের' উপমা এর একটি সার্থক উদাহরণ। প্রান্তরের বিশুষ্কতা বোধে তার এত দিনের মহেন্দ্রের সাহচর্য সম্বন্ধে সমালোচনার মনোভাবটি স্পষ্ট। নব বারিধারায় বিহারীর কাছে নিজ ব্যক্তিত্বের সহজ অভিব্যক্তির প্রশ্রয়ের ইঙ্গিত দ্যোতিত হচ্ছে। বলা বাহুল্য বিহারীর কাছে নিজ ব্যক্তিমূল্যের উপলব্ধি বিনোদিনীকেই আত্মাবিষ্কারে প্রবুদ্ধ করেছে। স্বভাবতই এই পর্যায় থেকেই বিনোদিনীর আত্মার যন্ত্রণার আরম্ভ। নইলে এ পর্যায়ের পূর্ব পর্যন্ত মহেন্দ্র-বিনোদিনীর অধ্যায়ে বলা যায় বিনোদিনীতে রোহিণীর ছায়াই কিছুটা উপস্থিত। বিনোদিনী মহেন্দ্রকে মাত্র পুরুষ হিসাবেই তার ছলাকলা বিস্তারের উপযুক্ত ক্ষেত্র বলে মনে করেছে। নিশাকর প্রসঙ্গে রোহিণীর যা মনোভাব ছিল মহেন্দ্র প্রসঙ্গে বিনোদিনীর মনোভাব প্রথমে তার থেকে পৃথক কিছু নয়। লক্ষণীয় যে এ-প্রসঙ্গে উপন্যাসের প্রথম দিকে মহেন্দ্র এবং বিনোদিনী উভয়ে উভয়কে যে দৃষ্টিতে দেখত তার একটা সাধর্ম্য বিদ্যমান। বিনোদিনী শুধুই নারী,

শুধুই পুরুষ। দমদমে চড়ুইভাতির পর বিহারীলালের কাছে নিজ মূল্য আবিষ্কারের পর বিনোদিনী আত্মসচেতন হয়েছে। এবং মহেন্দ্রও এইবার বুঝতে পেরেছে যে বিনোদিনী তার কাছে অনায়াসলভ্য ব্যাপার নয়। এইবার ঈর্ষা প্রভৃতির কথা ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু মহেন্দ্র, বিনোদিনী, বিহারীলাল এই তিনজনের ব্যক্তিত্বের মৌল প্রশ্নের সঙ্গে উপন্যাসের সমস্ত সমস্যাকে ব্যক্তিত্বগুলির পরস্পর সংঘাত সম্পর্কজাত এবং স্বনিয়ম সম্ভূত বলে উপলব্ধি না করে ঈর্ষার প্রশ্ন অবান্তর।

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে মহেন্দ্রকে আকর্ষণ করার কোনো প্রয়োজন বিনোদিনীর ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও এর পর থেকেই বিনোদিনীর আকর্ষণ মহেন্দ্রের কাছে অনিবার হয়ে উঠেছে। এই ব্যাপার এবং মহেন্দ্র-বিনোদিনীর ব্যাপার এ উপন্যাসের ঘূর্ণি-বায়ুর প্রাণকেন্দ্র নয়, এ দুটো ব্যাপারেরই মূল বিনোদিনীর ব্যক্তিত্বে। অপরের কাছে নিজের প্রকৃত মূল্যের উপলব্ধি হোক এই প্রাণময়ী পিপাসা তার মূল কথা। সে মূল্য কেবল মিঠাই প্রস্তুত করায় নয়, রুমালে নাম তোলায় নয়, পশমের গলবন্ধ বোনায় এবং সেবাময় ব্যবহারে নয়। বিহারী যখন এইভাবে বিনোদিনীর স্নেহবোধকে জাগ্রত করল তখন থেকেই বিহারী এই উপন্যাসের ঘটনার বা ঘটনাজাত মানসিক ঝঞ্ঝাবাত্যার স্রষ্টা। এখন দেখা যাক যে মহেন্দ্রের প্রতিক্রিয়ার স্বরূপ কী?

এরও যদি এক কথায় ব্যাখ্যা করা যায় যে ঈর্ষা—তাহলে শুধু লক্ষণ-বিচারই হবে। এ-ক্ষেত্রেও মহেন্দ্রের গোটা জীবনের প্রসঙ্গে মিলিয়ে তার প্রতিক্রিয়ার স্বরূপকে বুঝতে হবে। প্রথম দিকে তার মনোভাব যাই হোক ধীরে ধীরে সে বিনোদিনীর মূল্য অনুভব করেছে। এবং মহেন্দ্র নিজের ভালোত্বের অহংকারকে সগর্বে আঘাত করে বলেছে যে 'আমি ভালো নই, কিন্তু আমি ভালবাসি'। এ ভালবাসায় আন্তরিকতা নেই এ-কথা মিথ্যা। বরঞ্চ বিনোদিনীর প্রেমে সে সর্বস্ব বিসর্জন দিতে পারে এ-কথা মনে রাখলে তার আন্তরিকতাকে ভুল বোঝার অবকাশ থাকে না। তার সংকট এইখানে যে এই প্রেম তাকে কোথাও উত্তীর্ণ হতে দিল না। এ-কথা অবশ্যই সত্য। কিন্তু দিল না কেন এই প্রশ্নের উত্তরে দেখা যায় যে তার সারা জীবনই এ-পথে বাধা। বিহারী সম্বন্ধে জাগ্রত মনোভাব বিনোদিনীকে যতই যন্ত্রণায় টেনে নিয়েছে—যতই সে-যন্ত্রণার শুদ্ধতাকাঙ্ক্ষীরূপ মহেন্দ্রের কাছে স্পষ্ট হয়েছে ততই মহেন্দ্র নিজের অক্ষমতা বুঝতে পেরেছে এবং এই অক্ষমতায় বিনোদিনীর ব্যক্তিত্বের কাছে গিয়ে বারে বারে নিজের পঙ্গু

চেহারার উপলব্ধিই মহেন্দ্রের উদ্দেশ্যহীন কার্যাবলীর স্রষ্টা। কাজেই এলাহাবাদের ঘটনায় যখন মহেন্দ্রের কাছে তার পরাজয় স্পষ্ট হয়েছে তখনও সে সমান উদ্দেশ্যহীন থেকে গেছে। উপন্যাসের এই পর্যায়ে দেখা যায় মহেন্দ্র এইবার বাড়ি ফিরবে। অমিতব্যয়ী সন্তান এইবার অনুতপ্ত হৃদয়ে প্রত্যাবর্তন করবে। কিন্তু প্রশ্ন—মহেন্দ্রের কোনো পরিবর্তন হল কি? যেমন বিহারীর জীবনে একটা সঠিক নতুন সুর এল, বিনোদিনী উত্তীর্ণ হল তার যন্ত্রণা থেকে, মহেন্দ্র সে ক্ষেত্রে কী লাভ করল তার সমুদয় অভিজ্ঞতা থেকে? কিছুই না। গোবিন্দলাল যেমন বলেছে যে তুমি কে রোহিণী যে তোমার জন্য আমি ভ্রমরকে ত্যাগ করেছি, মহেন্দ্রেরও তেমনি মনে হল বিনোদিনী স্ত্রীলোক মাত্র। এবং এরই জন্য সে মাকে কাঁদিয়েছে, স্ত্রীকে কাঁদিয়েছে। এর পরে নতমস্তকে স্বস্থানে প্রস্থান। এইটাই উপন্যাসের ত্রুটি। মহেন্দ্র পাপকর্মের চেতনা নিয়ে ফিরে গেল। সঙ্গে রইল অনুশোচনাবোধ। বড়ো জোর সে আর এমন কর্ম করবে না। কিন্তু কোন্ বিশ্বাস তার ভাঙল, কোন্ বিশ্বাস তার গড়ল এ-সম্বন্ধে কোনো ইঙ্গিত নেই। ফলে বিনোদিনীঘটিত অধ্যায় যেন তার জীবনে একটা দুঃস্বপ্নের মতো কেটে গেল মাত্র। আগেই বলেছি যে গোরা ছাড়া রবীন্দ্রনাথ কোনো উপন্যাসেই শেষরক্ষা করতে পারেননি। এখানে সেই ত্রুটি মহেন্দ্রকে ঘিরে সবচেয়ে বেশি প্রকট হয়েছে। অনেকে ওপর ওপর আলোচনায় এ-কথা বলে দিতে পারেন যে বিনোদিনীর বিধবা বিবাহে অসম্মতিটাও রবীন্দ্রনাথের আর এক ত্রুটি। কিন্তু সেটা ত্রুটি বলে পরিগণিত হত অন্য উপন্যাস হলে। বিনোদিনীর চরিত্রের সঙ্গে এই অসম্মতিটা বরং আশ্চর্যভাবে মিলে গেছে সেটা যে-কোনো সমালোচকেরই চোখে পড়ার কথা। এখানে মোটেই ত্যাগজনিত উচ্ছ্বাস নেই। বিনোদিনী আজীবন ব্যবহৃত হয়েছে। আশা তাকে ব্যবহার করেছে, রাজলক্ষ্মী তাকে ব্যবহার করেছে, মহেন্দ্র তাকে ব্যবহার করেছে। আজীবন বিভিন্ন ভাবে ব্যবহৃত হয়ে ব্যবহারের সঙ্গে স্বার্থের চেহারা সে মিশিয়ে ফেলেছে। কাজেই নিজের পরম স্বপ্নকে সে আর ব্যবহার করতে চাইল না। এর সঙ্গে জীবনের বিস্তৃত যন্ত্রণা তাকে একটা প্রশান্ত নিরাসক্তির মাঝখানে নিয়ে গেল। কিন্তু এ জাতীয় কোনো উত্তরণ মহেন্দ্রের নেই। তার কারণ মহেন্দ্রের অনুশোচনা দ্বন্দ্বময় যন্ত্রণার স্তরে উঠেও নেমে গেল। মহেন্দ্রের একটা দৃঢ় ধারণা ছিল যে সব কিছুর মতো ক্ষমাও চাইলেই পাওয়া যাবে। আশার ব্যক্তিত্বহীনতা এর প্রথম কারণ। বিনোদিনীর ব্যক্তিত্ব এর দ্বিতীয় কারণ। আশাকে যদি কৃষ্ণকান্তের

বিষয়বস্তুর দিক থেকে গভীর মূল্যের অধিকারী হয়েও চোখের বালি, যোগাযোগ, চতুরঙ্গ প্রভৃতি উপন্যাস অপেক্ষা জটিলতার দিক থেকে উচ্চাভিলাষী নয়। শচীশ-দামিনী এবং কুমু-মধুসূদনে, এমন কি নিখিলেশ-বিমলাতেও রবীন্দ্রনাথের নিরীক্ষার বিষয় ছিল অত্যন্ত জটিল। এই উপন্যাসগুলিতে কেউ না কেউ প্রচলিত জীবন-বিন্যাসের কতকগুলো ধারা-ধরনকে আঘাত করেছে। এবং স্বাধীন মুক্ত ব্যক্তিসত্তার পক্ষ থেকেই প্রশ্ন উত্থাপন করেছে। কুমুব প্রশ্ন, নিখিলেশের প্রশ্ন সে দিক থেকে ব্যক্তির নিজস্ব জীবন ধারণা প্রসূত স্বাধীন প্রশ্ন। এ-প্রশ্ন যেমন জটিল তেমনি দেশ-কালেব নিযমে অনুত্তর। গোরায় সমস্যার এই জাতীয় জটিলতা নেই। সেদিক থেকে এ অনেকাংশে সরল। তার কারণ গোরার সমস্যা তার ব্যক্তি জীবনের সমস্যা হলেও সে সমস্যার একটা জাতীয় মূল বিদ্যমান। সমস্যাব একটা সর্বজনীন চেহারা গোরা উপন্যাসে উপস্থিত বযেছে। সেই জন্যই এই উপন্যাসে দেখা যায় যে গোরার সমস্যা কোনো না কোনো ভাবে প্রত্যেককেই স্পর্শ কবেছে। নিজের জন্য নয়, গোরা বিনষ্ট মূল্য-বোধেব উদ্ধার সাধন চেযেছে সকলের জন্য। তার ফলে প্রত্যেকেই গোরাকে বুঝতে চেয়েছে, গোবাব অসামান্য যন্ত্রণাকে, তীব্র আবেগকে সকলেই কম বেশি করে সহানুভূতির চোখে দেখেছে। এটা রবীন্দ্রনাথের অন্য উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য থেকে কিঞ্চিৎ পৃথক। কুমুকে মধুসূদন কুমুব ন্যায়ে উপলব্ধি করতে চাইলে যোগাযোগ উপন্যাসেব টানাপোড়েন সৃজিত হতে পারে না। নিখিলেশকে সন্দীপ উপলব্ধি করতেই চাযনি। মহেন্দ্রের পক্ষে বিহারীর ভূমিকা উপলব্ধি করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। অথচ গোবা উপন্যাসে অন্তত পক্ষে আনন্দময়ী-পরেশবাবু-সুচরিতা-বিনয়-ললিতা এদের সকলেরই মধ্যে গোরাকে উপলব্ধি করার সচেতন প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয। উপন্যাসটি শেষ অবধি সমান আগ্রহোদ্দীপক থেকেছে এই কারণে যে প্রত্যেকেরই প্রত্যেককে উপলব্ধি করার পথে প্রতিবন্ধক হিসাবে দেখা দিযেছে তাদের নিজ নিজ ব্যক্তিত্ব, নিজ নিজ জীবনাচরণ। কেমন করে গোরা সকলকে উপলব্ধি করল এবং সকলে গোরাকে উপলব্ধি করল এটাই এ-উপন্যাসের সমস্যা। সেদিক থেকে দেখতে গেলে রবীন্দ্রনাথের অন্য উপন্যাসের তুলনায় গোরা জটিলতার দিক দিয়ে উচ্চাভিলাষী নয। নিরীক্ষাব বিষয়ের দিক থেকে উচ্চাভিলাষের কথাই অবশ্য বলা হচ্ছে। নতুবা অন্যদিক থেকে আবার গোরাব ব্যক্তি সমস্যার মূলরূপের এইভাবে সরল ব্যাখ্যা করে তাকে অগভীর বলা যাবে না। বলা যাবে না বেগহীন। ববঞ্চ এ সরল বলেই তীব্রতায় এবং

মানসিক আক্ষেপ ও টানাপোড়েনে অন্য সমস্ত উপন্যাসকে ছাড়িয়ে গেছে। গোরার যন্ত্রণার বলিষ্ঠতায় এই গুণগত সমৃদ্ধি ঘটেছে। বলাই বাহুল্য যে রবীন্দ্রনাথ নিজে এই যন্ত্রণাকে উপলব্ধি না করলে গোরা চরিত্রে এর প্রতিফলন সম্ভব হত না। আমরা গোরা আলোচনায় প্রথমে দেখাবো যে রবীন্দ্রনাথের মন নানাভাবে এই যন্ত্রণাকে তখন উপলব্ধি করছিল। তারপর দেখাবো যে এই যন্ত্রণাকে উপযুক্ত আধারে স্থাপন করার প্রস্তুতিও তখন রবীন্দ্রমানসে নানাভাবে সমাপ্ত হয়েছে। জীবনগত প্রস্তুতি এবং শিল্পগত প্রস্তুতির এই উপযুক্ত মাহেন্দ্রক্ষণে 'গোরা'র জন্ম। বলা যেতে পারে যে ১৮৯০ থেকে গোরার প্রস্তুতি রচনা শুরু হয়েছে। দেশ নামক বৃহৎ ব্যাপারটা অবশ্য ছিন্নপত্রের কালেই রবীন্দ্রনাথের কাছে স্পষ্ট হতে আরম্ভ করেছিল। কিন্তু দেশের সমগ্রতা থেকে বিচ্ছিন্নতার বোধ এবং তজ্জনিত যন্ত্রণা সর্বপ্রথম বৃহৎ আকারে দেখা দিল মেঘ ও রৌদ্র গল্পে। যে একাকিত্বের যন্ত্রণা গোরায় শিল্পসুন্দর ভাবে দেখা দিল তারই পরোক্ষ প্রস্তুতি এই গল্পে। এই গল্পটির বিষয়বস্তুর এবং শিল্পকর্মের বিশ্লেষণ আমরা রবীন্দ্রনাথের দেশবোধকে উপলব্ধির জন্যই প্রয়োজন মনে করি।

বলা বাহুল্য ছিন্নপত্রের কালে গ্রাম বাংলার রূপটি রবীন্দ্রনাথের কাছে নানাভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। গ্রামীণ প্রকৃতি এ-কালে রবীন্দ্রনাথের কল্পনাকে বহু সূত্রে স্পর্শ করে। কিন্তু শিল্পী হিসাবে রবীন্দ্র প্রতিভার স্বভাব অনন্যসাধারণ বলে রোমান্টিক কল্পনাচারিতায় তিনি শুধু সেই প্রকৃতি চেতনাকে সঞ্চিত করলেন না, প্রকৃতি এবং মানুষকে মিলিয়ে নানা প্রশ্নের সৃজন করলেন নিজের মধ্যে। এই প্রশ্ন সৃজনের মধ্যেও তাঁর শিল্পী স্বভাবের সমগ্রতা সন্ধানী বোধ উপস্থিত। তারই ফলে দুই বিঘা জমির ভূমিহারা কৃষকের যন্ত্রণা, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের চেহারা তাঁর কাব্যের বিষয় হতে বাধে না। পুরাতন ভৃত্য দুই বিঘা জমির মতো এ-জাতীয় অভিজ্ঞতার বিষয় নিয়ে লেখা কাহিনী কবিতা বা কবিতায় গল্পকে ধারণ করার চেষ্টা এ যুগে আর লক্ষিত হয় না। গল্পগুচ্ছের বৃহৎ পরিসরে তাদের সকলেরই ঠাঁই মিলেছে। পলাতকার কালে গল্প লেখা যখন স্তিমিত হয়ে এসেছে তখন আবার দৈনন্দিন জীবনের আটপৌরে রূপকে ছন্দে ধরতে চেয়েছেন পলাতকায়।

দুর্বুদ্ধি গল্পগুচ্ছের যুগের আর একটি গল্প যাতেও রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার একটি বিশেষ চেহারাকে রূপায়িত করেছেন জ্বলন্ত স্পষ্টতায়। এই সমস্ত গল্পে-কবিতায় মধ্যবিত্ত জীবনের নানা বিকার, তার সীমাবদ্ধ জীবন-

চেতনা এবং জীবনের বিচিত্র সম্পর্ক সূত্রগুলির বাধ্যতায় তার অসহায় পুরুষকারের কথা ব্যবহৃত হয়েছে। এগুলি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের চেতনাও নানা ভাবে প্রকট হয়েছে এ-সময়ে। দুর্বুদ্ধি গল্পের কথা এ-প্রসঙ্গে অসহায়তার ব্যঞ্জনায় তাৎপর্যপূর্ণ। পুলিসের দারোগা এই গল্পের একটা প্রধান চরিত্র। স্টেট নামক একটি বৃহৎ যন্ত্রের পুলিস একটি যন্ত্রাংশ। এবং সে স্টেটও যেহেতু আমাদের সমাজ-বহির্ভূত একটা ব্যাপার (আত্মশক্তির প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য) তাই এই দারোগা কোনো অর্থেই মানুষ নয়। না স্বদেশী সমাজের অর্থে, না বিদেশী অর্থে। সাধারণ মানুষ হিসাবে গল্পের নায়ক—এখানে গল্পের 'আমি'—দারোগার সঙ্গে বন্ধুত্ব রক্ষার যথেষ্ট চেষ্টা করেছে। কিন্তু মানুষের নিজ জীবনের দুঃখের মূল্য মানুষের কাছে অসীম। এই দুঃখ তার চিৎবৃত্তির বিস্তার সাধন করে। দুঃখের হোমানলে পুড়িয়ে তাকে শুদ্ধতার দিকে নিয়ে যায়। দুর্বুদ্ধি গল্পের নায়কের কন্যা-বিয়োগ গল্পের সুবিধাবাদী মেরুদণ্ডহীন নায়ককে সেই দুঃখের প্রসাদ খানিকটা এনে দিল। ফলে নিজ দুঃখে আর্দ্র মনের সহানুভূতিতে সে একদিন সর্পদষ্ট মৃত সন্তানের পিতাব ওপরে অত্যাচারপরায়ণ দারোগার হৃদয়হীন নৃশংসতার তীব্র প্রতিবাদ করে ওঠে। এইটাই তার দুর্বুদ্ধি। কেননা বহু কালের অনভ্যাসে মধ্যবিত্ত পৌরুষ যে পরিমাণে ফোঁস করে উঠল—সে পবিমাণেই দ্রুত দারোগার পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে বিরোধ মিটিযে নিতে চাইল। মধ্যবিত্তেব ক্ষণিক শুভেচ্ছাব ক্লীব চেহাবা পরিস্ফুট হল। মেঘ ও রৌদ্র এর চেয়ে অনেক বিস্তৃত পটে ধৃত গল্প। যে দেশ-দৃষ্টি, খণ্ডিত অস্তিত্বের যে চেতনা গোরা উপন্যাসে আরো সুগভীব তাৎপর্যে বিকশিত এই ছোট গল্পে তারই অঙ্কুর। বস্তুত মেঘ ও রৌদ্র গল্পটি তার না-হোক দশটি পরিচ্ছেদ, কিছু ঘটনা-বাহুল্য এবং মনোবেদনায, ব্যঙ্গে ও ভাবাতিরেকে রবীন্দ্রনাথের গল্প সাহিত্যের ইতিহাসে একটি অক্ষুণ্ণ গৌরবের স্থানে দাঁড়িয়ে আছে। হয়তো এ-কথা ঠিক যে ছোট গল্পের কাঠামোর কঠিন অনুশাসনেব মর্যাদা গল্পটি রাখতে পারেনি, হয়তো এও সত্যি যে এই গল্পে লেখক বহুবাব গল্পের ভিতরে প্রবেশ কবেছেন, তার মধ্যে দু-একবাব হয়তো অনধিকার প্রবেশ, তবু গল্পের সঙ্গে আমাদের এক সময়ের জাতীয় চরিত্র ও দেশকালের চেহারা এমনভাবে জড়িত হয়ে রয়েছে যে রবীন্দ্রনাথের এই বহুপঠিত গল্পটির আলোচনা করা বোধ হয় কেবলমাত্র লেখনী কণ্ডূয়ন নয়। এই গল্পের মাধ্যমেই বোঝা যাবে যে মধ্যবিত্ত জীবনের খণ্ডায়নের ব্যাপারটিকে রবীন্দ্রনাথ কী রূপে দেখেছিলেন। মেঘ ও রৌদ্র রবীন্দ্রনাথের

সেই শ্রেণীর গল্প যেখানে কবি মানবিক আবেগের তাড়নায় গল্পের শিল্পধর্মকে ক্ষুণ্ণ করেছিলেন। দুর্বুদ্ধি রবীন্দ্রনাথের যে শ্রেণীর গল্প, অর্থাৎ গল্পের মূল লক্ষ্য ঘটনার মানবিক মর্মান্তিকতা বর্ণনা, মধ্যবিত্ত জীবনের ঔপনিবেশিক নিঃসহায়তার আক্ষেপ অঙ্কন—মেঘ ও রৌদ্রও সেই ধরনের অনন্য গল্প।

গল্পটির রচনাকাল বাংলার তের-শ দুই সাল। সময়টি জাতীয় ভাবাকাশে নবগ্রহ সমাবেশের যুগ। কংগ্রেসের জন্য হোক বা না হোক, সিপাহী-বিদ্রোহের অতি প্রত্যক্ষ প্রভাবেই মধ্যবিত্ত বুদ্ধিবাদী সন্ত্রাসবাদে আসক্ত হয়ে পড়েছিল। সিপাহী-বিদ্রোহে গণ-বিস্তৃতি কল্পনা করা এঁদের পক্ষে যদিও সম্ভব ছিল না, তথাপি সশস্ত্র অভ্যুত্থান ব্যতীত উদ্ধার নেই, এ-সত্য মধ্যবিত্ত সমাজের কল্পনাপ্রবণ অংশ অনুভব করেছিল।

কিন্তু এ-আলোচনার পূর্বে মেঘ ও রৌদ্র গল্পের কাঠামো সূত্রাকারে বর্ণিত হওয়া দরকার বোধ হয়। শশিভূসণ গল্পের নায়ক। ক্ষীণজীবী, স্বল্পদৃষ্টি বাঙালী ইন্‌টেলেকচুয়ালের চরিত্র। টুর্গেনিভের নিহিলিস্ট ইন্‌টেলেকচুয়ালের মতো সেও গ্রামবাসী। গিরিবালা, দশম বর্ষীয়া নায়িকা, শশিভূষণের· · · সখি বলাই সঙ্গত। এই সংবেদী কাহিনী গল্পটিতে একটি করুণ আবহ সঙ্গীতের মতো সর্বদাই বেজে চলেছে। আর এই সঙ্গে জড়িয়ে আছে ইংরেজ সাম্রাজ্যগর্বীর ঔদ্ধত্য, পরজাতিক বণিক শক্তির হাতে দেশী গ্রামীণ সমাজ প্রেস্টিজের ও স্বল্পোন্নত যন্ত্রশক্তির নির্মম, নিষ্ঠুর পরাজয়, এবং জনসাধারণের বিমূঢ়তা তৎসহ দেশী সামন্তবর্গের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আভূমিপ্রণত সেলাম গল্পটির মধ্যে একের পর এক বা একসঙ্গে ছায়াপাত করেছে।

এদিক দিয়ে গল্পটি আমাদের জীবনের এক বিমূঢ় আর্তির আর তজ্জনিত চাঞ্চল্যের প্রতীক হয়ে রইল। বলা যেতে পারে গল্পের জাতীয় পটভূমির বিস্তারে এবং ঋজুবাচনের সঙ্গে অসহায় দেশপ্রেমিকের ব্যর্থতার যাতনায় গল্পটির ভিতরে 'গোরা' রচনার বীজ নিহিত। একই দেশকালের ধারণা এখানে সবে অঙ্কুরিত। ওখানে তা বনস্পতির মর্যাদায় পূর্ণ। মেঘ ও রৌদ্র গল্পে ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদী বিচারবত্তার প্রতি কবির মনোভাব মোটে অপ্রকট থাকেনি। নীলদর্পণ রচনার সময়েও বাঙালী বুদ্ধিজীবীর ব্রিটিশ গবনমেণ্টের সেন্স অফ জাস্টিসের প্রতি আস্থা ছিল এ-প্রমাণ পাওয়া যায়। মহারানীর হৃদয় প্রজাপুঞ্জের দুঃখে সতত কাতর, এক্সিকিউটিভ যাই হোক না কেন, এই সিপাহী-যুদ্ধোত্তর ভাবনায় লেখকবর্গ কিছুটা আচ্ছন্ন ছিলেন এ-কথা ঠিক। বলা বাহুল্য চাকুরি-প্রাণ মধ্যবিত্তের

আর্থিক নির্ভরতাই এর একমাত্র মূল নয়—ইংরাজি পাঠশালার বাধ্যতামূলক শিক্ষানবিশীও এর মূলে। তবে সেই সেন্স অফ জাস্টিসের প্রতি বিশ্বাসের ভিত টলেছে এ-সাক্ষ্যও নীলদর্পণে পাই।*

মধ্যবিত্ত কংগ্রেসী আবেদন-নিবেদনের পালা শুরু হবার আগে—অনেক আগে থেকেই জাতির শ্রমজীবী জনসাধারণের মধ্যে সশস্ত্র প্রতিরোধের ধারা বয়ে চলেছিল এ-কথা ঐতিহাসিক সত্য। নীলকরদের বিরুদ্ধে নদীয়ার দিগম্বর বিশ্বাস ও বিষ্ণুচরণ বিশ্বাসের সশস্ত্র আন্দোলন সংগঠন (১৮৬০) এবং আরো খণ্ড খণ্ড ঘটনা এর সাক্ষ্য। 'জ্যোতি-দাদা'র উদ্যোগে স্থাপিত সঞ্জীবনী হিন্দুমেলায় সাহেব পুলিসদের সঙ্গে ইষ্টক যুদ্ধ বা সভার কাহিনী এই প্রসঙ্গেই স্মরণীয়।

১৮৭৪-৮০ সালের মধ্যে উপেন্দ্রনাথ দাসের নাটক 'শরৎ-সরোজিনী'র বা 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী'র যে পরিচয় শ্রদ্ধেয় সুকুমার সেন মারফত আমরা পাই তাতেও দেখি সশস্ত্র সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ ব্যতীত সাফল্য নেই এমন দেশপ্রেমাত্মক ইঙ্গিত। এব মধ্যে দ্বিতীয নাটকের অভিনযের জন্যই ইংরাজ সরকার দেশীয রঙ্গালয় নিয়ন্ত্রণ আইন পাস করে। এ-কথা দুটি বলাব উদ্দেশ্য এই যে সে-সময় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চিত্তবৃত্তি এবং জনতার প্রতিরোধবৃত্তি কোন পন্থার পন্থী হয়েছিল তা বিবৃত করা। দিগম্বব বিশ্বাস এবং বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস যে ভাবে বাস্তবে অভ্যুত্থান সংগঠিত করেছিলেন আর উপেন্দ্রনাথ যে ভাবে নাটকে রোমান্টিক বিপ্লবী উন্মাদনার সন্ত্রাসবাদিতার উদ্গাতা হয়েছিলেন, লক্ষ্য করলেই তার মধ্যে একটি পার্থক্য নজরে পড়বে। তা হল এই যে আন্দোলনের স্বারূপ্য ও বেগবত্তা নির্ণয়ে উপেন্দ্রনাথ দাস, তথা বাঙালী মধ্যবিত্তের অক্ষমতা। নিশ্চয় এ-কথা অপ্রাসঙ্গিক নয় যে অসহায় বিক্ষোভের পাদপীঠে সন্ত্রাসবাদের জন্ম, উপেন্দ্রনাথ তার প্রথম লেখক। এভাবে সে-সময়ে বাস্তবে ও সাহিত্যে, ঘটনার তির্যক ও ঋজু দুই রূপ আমরা দেখি।

রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত গল্প মেঘ ও রৌদ্র সাহিত্যে জাতীয় বেদনার উৎস-সন্ধানের প্রথম সার্থক চিহ্ন—কোনো কোনো ক্ষেত্রে তার আংশিকতা সত্ত্বেও। এবং এ-আংশিকতা নানাভাবে দূর হয়েছে পরবর্তীকালে গোরা উপন্যাসে।

নৈবেদ্যের কবিতা রচনার কাল এই গল্পটির রচনাকালের কাছাকাছি। লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় যে রবীন্দ্রনাথের জাতীয় যন্ত্রণার মৌল ভাবভূমিতে সৃজিত কবিতার সঙ্গে ঐ একই ভাবভূমিতে গঠিত গল্পের একটি স্বাভাবিক পার্থক্য

* সভ্যতার সংকটে রবীন্দ্রনাথের এ-বিষয়ে উক্তি স্মরণীয়।

আছে। দেশপ্রেমাত্মক কবিতায় রবীন্দ্রনাথ অনেকখানি abstract ভাবাদর্শী এবং ভগবৎনির্ভর। কিন্তু এ-শ্রেণীর ছোট গল্পে এক কথায় বলতে গেলে রবীন্দ্রনাথ সার্বজনীন জাতীয় বাস্তবতার স্বরূপ-ব্যাখ্যাতা। এ সকল ক্ষেত্রে আমরা রবীন্দ্রনাথকে অনেকখানি প্রত্যক্ষ, ব্রিটিশ প্রজার প্রাকৃত ঘৃণার প্রদীপ্ত ভূমিকায় পাই। দেশপ্রেমী কবিতায় রবীন্দ্রনাথ মধ্যবিত্তের আত্মিক প্রার্থনার শ্রেষ্ঠ ঋষি। নৈবেদ্যের যে-কোনো সনেটই এর প্রমাণ। কবির গল্প উপন্যাসে ফরুসর্দারকে দেখি, (গোরা-চরঘোষপুরে) সে সটান লাঠি চালিয়ে নীলকর সাহেবের হাত ভেঙে দিয়েছিল। এই রক্তমাংস সমন্বিত ক্রোধকে লিরিকে বা লিরিকাল সনেটে ধরা যায় কিনা—সে প্রশ্ন না তুলেও বলা যায় রবীন্দ্রনাথ ধরেননি। মেঘ ও রৌদ্রে সেই জাতীয় ক্রোধ-বিক্ষোভ ঠাঁই পেয়েছে।

এখন আমরা শশিভূষণ, মেঘ ও রৌদ্রের নায়কের পূর্ণ পরিচয় গ্রহণ করব। শশিভূষণ বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রীধর। সে যুগের ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল। তার স্বল্পদৃষ্টি ভ্রূকুঞ্চনকে লোকে ভাবত ঔদ্ধত্য। ইংরাজি শিক্ষা জনসাধারণের বৃহত্তর অংশের সঙ্গে শিক্ষিত মধ্যবিত্তকে কেমন করে সম্পর্কশূন্য করে ফেলেছিল, শশিভূষণের একক নৈঃসঙ্গ্য তারই চিহ্ন। শশিভূষণ জনতাকে এড়াতে চাইতেন— 'বিচ্ছিন্নের যন্ত্রণাই বর্তমানে স্বাভাবিক' এই মনোবৃত্তিতে। তাঁর আইনজ্ঞান ছিল। শুধু ছিল যে তা নয়, আইনের সর্বশক্তিমত্তায় উনবিংশ শতকের এই বিচ্ছিন্ন ইন্‌টেলেকচুয়াল প্রথমে বিশ্বাসীও ছিলেন। হয়তো আদালতের ধর্মাবতারকে তার সাধনার ন্যায়াধিকরণ বলেই মনে হত। স্বভাবতই সকল প্রকার ইহ-কর্মের প্রতি অনাস্থাশীল, নব্য ইতিহাসের পানপাত্রে ফরাসী-বিপ্লবের ভাবমন্ত্রের আসব-পায়ী এই যুবক তীব্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মাধ্যমে সকল ঔপনিবেশিক বিক্ষোভের যুক্তি খুঁজবে এতে আশ্চর্য কী। শশিভূষণ হয়তো হিতবাদী, বা বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষকের কথা পড়া মধ্যবিত্ত যুবক। ফলে কৃষকজনতার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংযুক্ত না থেকেও সে জমিদারী জটিলতার শিকার এই বিমূঢ় মানুষগুলি সম্বন্ধে মানবিক সমবেদনা অনুভব করত। এই মানবিকতাবাদ উনবিংশের বুর্জোয়া শিক্ষালব্ধ পাশ্চাত্ত্য মানবতাবাদ। এই শিক্ষার আলোকেই সে নিজের বিষয় সম্পত্তিতেও নিস্পৃহ ছিল।

শশিভূষণের কাব্যবোধ কিন্তু জীবন থেকে প্রয়াণের মাধ্যম। কেননা যে জ্ঞানচর্চার আড়ালে নিজেকে উহ্য করে রাখার দিকে তার আগ্রহ, তার ভিতরেও আমরা এক যুগবৈশিষ্ট্য-চিহ্নিত মধ্যবিত্তের সাক্ষাৎ পাই। টুর্গেনিভের নিহিলিস্ট চরিত্র

বাজারভেও এমন ধারাই জ্ঞান-বিজ্ঞানের আসক্তি, বিরক্তি কেবল তার কাব্যে। আমাদের শশিভূষণ কাব্যের ভক্ত এবং গিরিবালার প্রীতি-মুগ্ধ।

গল্পের উদ্দিষ্ট এবং অভীপ্সিত ঘটনাজাল বিস্তৃত হবার আগেই শশিভূষণের শান্তদৃঢ় নিস্পৃহতার ফলস্বরূপ নায়েব হরকুমারের সঙ্গে প্রজাশাসন নিয়ে বিবাদ হল। এইখান থেকে মেঘ ও রৌদ্রের ঐতিহাসিক ঘটনাত্রয় ও শশিভূষণের প্রতিক্রিয়া শুরু। শশিভূষণ গ্রাম ছাড়ি-ছাড়ি করছে এমন সময় জয়েণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের তাঁবু পড়ল গ্রামে। ব্যাপারটি যেন নিস্তরঙ্গ ডোবায় প্রকাণ্ড একটি প্রস্তর খণ্ড। তারপর সাহেবের মেথরের সঙ্গে নায়েবের সংঘাত—সাহেনের কুকুরের জন্য চারিসের ঘৃত-আবদার এবং সাহেবের হুকুমে প্রকাশ্য জনারণ্যে মেথরের হাতে হরকুমারের লাঞ্ছনা, মেঘ ও রৌদ্রের পাঠকেবা সবই জানেন।

শশিভূষণ এই অত্যাচার প্রত্যক্ষ কবল। ব্রাহ্মণ্যেব জাত্যভিমান অসৎ ঘুষখোর সাহেবের কাছে কিছু নয়, অত্যাচারের এই চারিত্র্য ও এই স্বারূপ্যই তখনকার মতো আমাদের আর শশিভূষণের ভরসা। প্রাচীন ভারতবর্ষের প্রতীক অবশ্যই হরকুমার হোন এ-অভিপ্রায় রবীন্দ্রনাথের ছিল না। কিন্তু ব্রাহ্মণের জাত্যভিমান সাহেব লোকেব সহজেই অসহ্য বোধ হয় এই উক্তির মধ্যে ভারতীয় যা-কিছুর প্রতি সাহেব-লোকদের মনোভাবে যে ঔপনিবেশিক স-বুট দাপটের দেখা মিলত তার ছবি যথাযথ হযে ফুটেছে। মেথব যে হরকুমারের বিরুদ্ধে সাহেবের কাছে নালিশ কববেই এব মধ্যে উচ্চবর্ণেব প্রতি ‘অন্ত্যজে’ব ঘৃণা না হোক সহানুভূতিব অভাবের সাক্ষাৎ পাই। নালিশের চবিত্রটি অন্তত বর্ণবিভক্ত ধর্মীয় সমাজের ব্যর্থতাব পরিচয় এতে সন্দেহ নেই। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যগর্বীব দাপটের যে বৈশিষ্ট্য এখানে প্রতিবিম্বিত হয়েছে তা কিন্তু অত্যাচারেব একটা প্রাথমিক রূপ। এই অমানবিক লাঞ্ছনার চোট দেহে যতটা তাব থেকে অনেক বেশি মনে। কাপুরুষ হরকুমার হয়তো দ্বিধায এ-লাঞ্ছনা পকেটস্থ করতেন। কিন্তু শশিভূষণ তখন গ্রামের তিলমাত্র বিবেক। স্বভাবতই শশিভূষণেব ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যজনিত মর্যাদাবোধ হরকুমারকে উত্তেজিত কবল। লক্ষ্য করলেই এটা ধরা পড়ে যে প্রতিবাদের বা প্রতিরোধের যে বীজ অঙ্কুবিত হল তা যেন একান্তই আইনাশ্রয়ী। ই'বাজের বিচারবত্তার প্রতি যে আস্থা শশিভূষণেব তা এককালের সমস্ত শেক্‌স্‌পীয়র-বার্ক-মেকলে-বায়রন পড়া বাঙালীর। তখন আমরা স্বজাতির স্বাধীনতার প্রাথমিক সাধনা আরম্ভ কবেছিলাম, কিন্তু অন্তরে ছিল ইংবাজ জাতির ঔদার্যের প্রতি বিশ্বাস। কিন্তু এই ‘law and order-এব

দরোয়ানিতে' বিশ্বাস যে বেশিদিন আব বাখা চলে না শশিভূষণেব অভিজ্ঞতা থেকে তখনকাব দিনেব অসংখ্য শশিভূষণ এই কথাই শিখল। এই ব্রাহ্মণ-ঘটিত আখ্যানেব কিছুকাল পবে ববীন্দ্রনাথ অনুরূপ বিষয়েব ওপব স্থাপিত 'ভাবতবর্ষ' গ্রন্থেব 'ব্রাহ্মণ' প্রবন্ধ লেখেন। তাতে সামাজিক প্রেস্টিজেব স্বরূপ ব্যাখ্যা কবেন।* আইনেব বৃহৎ যন্ত্রেব বন্ধ্রগত শনি শশিভূষণেব ন্যায়পিপাসা অকালে মিটিয়ে দিল, যেমন গোবায গোবাব আইনেব কাছে সুবিচাব প্রার্থনাব আশা অচিবে মিটে গিয়েছিল। এই নব্য-ইতিহাস পডা যুবক এই কথাটি বোঝেনি যে চিবস্থাযী বন্দোবস্তেব দাসানুদাস জমিদাব নন্দন বিদেশী পণ্যপতিব স্বার্থবক্ষী ম্যাজিস্ট্রেটেব ইঙ্গিতের অপেক্ষা বাখেন মাত্র। আব শশিভূষণেব আইনজ্ঞান যথেষ্টই ছিল, কেবল কাণ্ডজ্ঞানেব একটু অভাব ছিল। কাবণ হবকুমাব তোবাপ নয বা ফরুসর্দার নয়—সুতবাং হবকুমাব শম্বুকেব মতো গুটিয়ে গেলেন।

এ-ঘটনা যখন ঘটছে তাব পববর্তীকালই বাঙালী মধ্যবিত্ত যুবকদেব সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপেব যুগ। জাতীয় চেতনাব ক্রমবিকাশেব যে অভিজ্ঞতাব স্তবগুলি পাব হযে ক্ষিপ্ত মধ্যবিত্ত ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদী চিন্তায সন্ত্রাসেব আশ্রয নেয এখানে তাবই সুস্পষ্ট কযেকটি স্তব চিহ্নিত হযেছে। জানলাব কাছে দাঁডিযে হাত-পা নেডে বক্তৃতা ভেঁজে বাতাবাতি বার্ক হবাব প্রযাসে চিত্তেব যে চাঞ্চল্যেব প্রকাশ তাই ব্যর্থতাব পব ব্যর্থতাব ভিতব দিয়ে সন্ত্রাসবাদী বিক্ষোভেব আশ্রয নিল।

স্টিমাবেব সঙ্গে নৌকাব প্রতিযোগিতাব যে ঘটনা পববর্তী পবিচ্ছেদে ব্যবহৃত হয়েছে তাও সবিশেষ ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্যেব দ্বাবা চিহ্নিত। দেশী গ্রামীণ অনুন্নত যন্ত্র ইওবোপেব পণ্যবিপ্লবেব অভূতপূর্ব যন্ত্রশক্তিব সঙ্গে কী অসম প্রতি-যোগিতাব মধ্যে পডল মেঘ ও বৌদ্রেব এই ঘটনাটি তাবই প্রতীক। দেশী নৌকাগুলি ববে ডুবিয়ে দেওযাব সঙ্গে দেশী তাঁতিদেব বুডো আঙুল কেটে দেওয়াব খুব বেশি পার্থক্য নেই। এই সঙ্গে দেশী শিল্প প্রচেষ্টাব যে-কোনো ব্যর্থতাব কথাই হযতো ববীন্দ্রনাথেব মনে ছিল। 'জীবন স্মৃতি'তে বর্ণিত সেই নবোদ্ভাবিত গামছাব কলেব, বা জ্যোতিবিন্দ্রনাথেব স্টিমাব কোম্পানিব সঙ্গে ইংবাজ কোম্পানিব ব্যর্থ প্রতিযোগিতাব কাহিনী এ-প্রসঙ্গে স্মবণীয। ববীন্দ্রনাথ

* কোনো মহাবাষ্ট্রীয ব্রাহ্মণেব পৃষ্ঠে কোনো সাহেব পাদুকাঘাত কবেছিলেন। মফস্বল বাংলাযও হয়তো এ-জাতীয ব্রাহ্মণ অবমাননাব দৃষ্টান্ত দুর্লভ ছিল না। ববীন্দ্রনাথ বলেন যে প্রেস্টিজ কর্মনির্ভর। ব্রাহ্মণের কর্ম-চ্যুতিব পব প্রেস্টিজেবও অবসান ঘটেছে। তাই অপবেব পক্ষে অপমান সহজ হযেছে।

তাঁর শুদ্ধ তেজস্বী মানবতার জন্য এই অসম প্রতিযোগিতার যেদিকে প্রভুত্বের মদগর্ব সেদিকে ক্রুদ্ধ দৃকপাত করেছিলেন।

গল্পে প্রভুত্বগর্বী ইঙ্গ-শক্তির এই দ্বিতীয় অত্যাচারের রূপ প্রথমটি অপেক্ষা অনেক বেশি ইঙ্গিতবহ, অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। স্বাভাবিক, ফ্লোটিলা স্টিমার কোম্পানির সঙ্গে উক্ত অক্ষম প্রতিযোগিতার কথা কবির মনে এ-ক্ষেত্রে কাজ করেছিল। কেবল সামন্তযুগীয় মর্যাদাবোধই ধূলাবলুণ্ঠিত হল তা নয়, এই পাশ্চাত্ত্য সাম্রাজ্যশক্তি তার চেয়ে বড়ো এক ইতিহাসের হাতিয়ার হয়ে এদেশে এসেছে—এই তত্ত্বের আভাসও এই ঘটনায় আছে। শশিভূষণের প্রতিক্রিয়াও লক্ষ্য করার মতো। এখানেই ঘটনার ক্ষরণার স্পর্শে সে প্রথম অনুভব করল যে ক্ষুধার সঙ্গে খাদ্যের মতো, ক্রোধের সঙ্গে শাস্তির একটা আশু সম্বন্ধ থাকা দরকার। আইনের মন্দ গতিতে শশিভূষণের শান্ত রক্ত টগবগিয়ে উঠল। এই আইনের পরিণামে সে বিস্মিত না হয়ে এবারে বিচলিত হল।

এর পরের ঘটনা সংক্ষিপ্ত কিন্তু কেন্দ্রীয় গুণসম্পন্ন। জেলেদের জাল শ্বেতাঙ্গ সাম্রাজ্যবাদী প্রভুপ্রবর কেটে দিলেন। যা তার কাছে ক্রীড়া তা অপরের কাছে পীড়া। শশিভূষণ এই তৃতীয় ঘটনায় আর আইন খুঁজলেন না, পুলিসে গেলেন না।—সাহেবকে প্রহার করলেন। প্রহার ক্রিয়ার বিশেষণে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'বালকের মতো, পাগলের মতো, শশিভূষণ মারিতে লাগিলেন।' (গোরাও মোকদ্দমায় ব্যর্থ হয়ে অন্য ঘটনায় পুলিসকে প্রহার করেছিল।) বালকের মতো, কেননা তোরাপ, বিষ্ণু বিশ্বাস, দিগম্বর বিশ্বাস ফকসদারের আন্দোলন ও সংগ্রামের শিক্ষা যে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত গ্রহণ করেনি। বালকের মতো, কেননা বিক্ষোভের জ্বলন্ত মুহূর্তের অরাজনৈতিক পদক্ষেপে শশিভূষণ, ক্ষুদিরাম কানাই সকলেই যে একক। বালকের মতো, কারণ আঘাতের প্রাথমিকতায় সকলেই যে অক্ষম। আর পাগলের মতো, যেহেতু বিক্ষোভের চণ্ডমুহূর্তে ঔপনিবেশিক দাসরক্তও ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। সন্ন্যাসী মাত্রেই সে উদ্দীপনায় পাগল। ক্রোধের সঙ্গে শাস্তির নিকট-সম্পর্ক চিন্তা আবেগ-কম্পিত মুহূর্তের চিন্তা। তার মধ্যে বয়স্কের মননের স্থৈর্য নেই, ফলে তোরাপেরা মারে এবং ধরা পড়ে না—শশিভূষণেরা মারে এবং My mission is over বলে ধরা পড়ে। তোরাপের মার দর্শককে প্রবুদ্ধ করে, শশিভূষণের মার বালকের এবং পাগলের মতো বলেই শুধু সহানুভূতি আনয়ন করে আর কিছু নয়। তাই সন্ত্রাসবাদকে লোকে সমবেদনা জানিয়েছে কিন্তু এ-রাজনীতিকে জনতা জীবনস্থ করেনি। জেলে যাওয়ার কালে

শশিভূষণেব যে নৈবাশ্যমণ্ডিত উক্তি তাও সন্ত্রাসবাদী বা নিহিলিস্টেরই নৈরাশ্যের সদৃশ। 'অপবাধীব সংখ্যা জেলে পবিমিত, জেলের বাইরে অপবিমিত' এ সিদ্ধান্তে শশিভূষণেব বিক্ষুব্ধ নৈরাশ্যেব পরিচয় মেলে। অবশ্যই শশিভূষণ চার অধ্যায়েব অতীনেব মতো সংগঠিত সন্ত্রাসবাদী দলভুক্ত নয়—কিন্তু আমাদের বক্তব্য এই যে, যে-ঐতিহাসিক ঘটনান্তব পাব হয়ে বাঙালী যুবক সন্ত্রাসবাদী হল শশিভূষণে তাব নিশ্চিত স্বাক্ষর। গোবার কাবাববণের সঙ্গে এই অংশের গভীর সাদৃশ্য বর্তমান তা সহজেই নজবে পডে। গল্পেব সঙ্গে সোনাব সুতোব মতো জডিয়ে আছে গিবিবালাব কাহিনী। কিন্তু প্রশ্ন এই যে গল্পেব সঙ্গে গিবিবালার যোগাযোগ কতখানি অনিবার্য এবং কতখানি আরোপিত। এক অজাত-যৌবনা, দশমী কন্যাব অকাল বিবাহ শশিভূষণেব সাহেব প্রহাবেব পূর্বেকাব বিচলিত চিত্ততাব জনক এ-কথা বললে শশিভূষণকে সবটা ব্যাখ্যা কবা হয় না, না বললেও আবাব ব্যাখ্যা অসম্পূর্ণ থাকে। শশিভূষণ ও গিরিবালাব অসম সাথীত্বও বাল্যপ্রণযেব অভিশাপকে এডাতে পাবেনি। গিবিবালা ও শশি-ভূষণেব পুনর্দর্শনেব অধ্যায যদি চেখভের হাতে পডতো তাহলে চেখভ নিশ্চয়ই লিখতেন যে জটিলতাব এবাব থেকেই শুরু। ববান্দ্রনাথ তা না কবে একেবাবে বিপুল লিবিক ভাবাবেগে শশিভূষণেব টেববিজমেব পবেব অনিবায সিনিসিজমেব হাত থেকে তাকে বাঁচাতে চেযেছেন।

বিধবা গিবিবালাকে দেখে শশিভূষণেব অশান্ত নৈবাশ্যেব উপশম হল। গল্পেব এই অংশে নিঃসন্দেহে শিল্পবুদ্ধিব ব্যত্যয ঘটেছে এবং ববীন্দ্রনাথ নিঃসন্দেহে বাস্তবকে পবিহাব কবে উর্ধ্বপ্রয়াণ কবেছেন। গিবিবালা ও শশিভূষণের পুনর্মিলন হৃদয়েব কোন ধর্মেব ভিত্তিতে হল তা গল্পেব পবেও অবোধ্য থাকবে। গিরিবালা বিধবা। কিন্তু তাব সংসাব-ভূমিকা আমাদেব কাছে স্পষ্ট হল না। গিবিবালাব বাডিতে কাবামুক্তির পব শশিভূষণেব আশ্রয়েব স্বরূপই বা কী তাও ঠিক বোঝা গেল না। মিলনেব অশ্রু-বাষ্পোচ্ছ্বাসে গিবিবালা, গল্পেব প্রথম থেকেই যেমন জানলাব বাইবে, গল্পেব শেষেও তেমনি গল্পেব বাইবেই বয়ে গেল।

কিন্তু জ্ঞাতে অজ্ঞাতে শশিভূষণেব বিক্ষোভেব মুহূর্তে যেমন সন্ত্রাসবাদিতাব জন্মকাল সূচিত হযেছে, গল্পেব উপসংহাবে তেমনি তাব মবণও সংকেতায়িত হয়েছে। কেননা গিরিবালাব আহ্বানে আব যাই থাক সংগ্রামের সংকেত নেই—শুশ্রূযা বা সান্ত্বনা থাকতে পাবে। সেই শুশ্রূষায় এবং সান্ত্বনায শশিভূষণের ব্যক্তি-জীবনেব আর্তিই লক্ষণীয়—জাতীয় মানসের বিক্ষুব্ধ পটভূমিকা হিসাবে

ব্রিটিশ কলোনি সেখানে স্থান পায়নি। ফলে শশিভূষণ গল্পের শেষে কিছুটা নঙর্থক না হয়ে গিয়ে পাবেনি।

এর কাবণ এই যে শশিভূষণ কর্মময় জীবনে কিংবা সে-জীবনের ক্রমপবিণতি ও বিস্তৃতিতে আস্থাশীল ছিল না। গোবাব প্রবল পুরুষকার শশিভূষণেব নয়। তাই গোবা যেমন চবঘোষপুবেব মুসলমান প্রজাদেব সক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলনের সশ্রদ্ধ-সংবাদ রাখত শশিভূষণ তা বাখত না। ফলে শশিভূষণেব আইনানুগ প্রতিবিধান-প্রয়াসে হিতবাদ এবং শাবীবিক বিক্ষোভ প্রদর্শনে মধ্যবিত্তেব একক সন্ত্রাসবাদী প্রচেষ্টা। প্রচেষ্টা যখন বিডম্বিত হল তখন সে অতটা নিবাশ হয়ে পডল।

নিহিলিস্টদেব-অ্যানার্কিস্টদেব একটা 'যেনতেন' দর্শন ছিল। বাষ্ট্র, প্রেম, ব্যক্তি সম্বন্ধে তাদেব একটা সংজ্ঞা নির্দিষ্ট বাখাব চেষ্টা ছিল। শশিভূষণবা সেই শ্রেণী-ভুক্ত বাজনৈতিক সন্ত্রাসবাদী নয়। এ-উপনিবেশেব কেবানী-উকিল-মাস্টাব অধ্যুষিত মধ্যবিত্তেব স্বাধীনতা যুদ্ধেব প্রথম স্তব মাত্র। সুতবাং এব যেমন দুর্বলতা তেমন আন্তবিকতা। শশিভূষণে তা সর্বদাই প্রতিফলিত হয়েছে। গোবা উপন্যাসে গোবাকেও বাষ্ট্র ভাবনায় বিশেষ ভাবিত দেখা যায় না। তাব কাবণ পবে ব্যাখ্যা কবা হবে।

মেঘ ও বৌদ্রেব গল্প বচনাব সময থেকেই গোবা বচনাব মানসিক প্রস্তুতি পর্ব। এই গল্পে যেমন ঘটনাব বিস্তাব, যেমন বিলম্বিত লয়, যেমন প্রকৃতি-মানুষ-সমাজ ও ব্যক্তিব একত্র প্রতিফলন তা উপন্যাস লক্ষণাক্রান্ত। সর্বোপবি এখানেই প্রথম জাতীয বেদনা, তাব পবাধীনতাব স্থূল ও সূক্ষ্ম রূপ সাহিত্যভাত হযেছে। গোবায় যে মহাকাব্যোচিত বিস্তাব এবং গোটা ভাবতেব মর্ম ও কর্মেব প্রতিনিধিত্বেব পবিচয মেলে তাব সূত্রপাত মেঘ ও বৌদ্রে। সেদিক দিযে গল্পটিব সার্থকতা অনন্য। মেঘ ও বৌদ্রেব শৈথিল্য মহাকবিব জাতীয় বেদনায অতি উত্তেজনা-জনিত। এই বেদনাকে গডে পিঠে সাজিয়ে গোবা-বচনা। গোবায় যা সূর্য বা মহীরুহ, ১৩০২ সালেব অনধিকাব প্রবেশ ও মেঘ ও বৌদ্র গল্পে তাই উদীয়মান বা অঙ্কুবিত।

গল্পে শশিভূষণেব উপসংহাবে যে শিল্পগত ক্রটি গোবা তা থেকে অনেকটা বেঁচেছে এ-কথা কিছুতেই সম্পূর্ণ পবিষ্কাব হতে পাবে না যদি না আমবা ঐ শিল্পগত ক্রটিব মূলীভূত কাবণটি তুলে ধবি। ব্যক্তি হিসাবে শশিভূষণের সমস্যাব উৎস আমাদেব নিশ্চয় সন্ধান কবতে হবে তাব ব্যক্তিত্বেব মধ্যে।

শশিভূষণ গ্রামবাসী ব্যক্তি হয়েও গ্রামের সমাজ-জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী যুক্ত নয়। সে শহরের শিক্ষিত যুবক। সেদিক থেকে উনিশের শতকের ইংরাজি শিক্ষার ফলস্বরূপ গ্রামের মানুষের সঙ্গে তার মর্মগত সম্পর্ক একেবারেই শূন্য। সেই শূন্যতার বোধ তার মধ্যে উপস্থিত। কিন্তু এই বিচ্ছিন্নতার জন্য তার কোনো যন্ত্রণা আছে কি না তা আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়। শূন্যতাটাকে ভরাট করবার জন্য সে দুটো বস্তুর আশ্রয়ী, এক বই, দুই গিরিবালা। এর ফল হয়েছে এই গিরিবালার প্রেম তার কাছে তার বই-এরই মতো আশ্রয়প্রার্থনার শিবির। তাই সে যখন বৃহৎ ঘটনাচক্রের মধ্যস্থলে গিয়ে দাঁড়ালো তখন গিরিবালা রইল মুলতুবী। আবার সে যখন বৃহৎ ঘটনাবর্তের উপসংহারে কারাগৃহ থেকে ফিরে এল তখন গিরিবালাও পরিশিষ্টের মতো ফিরে এল। গ্রামে গিরিবালার কৈশোর-প্রেমেরও যেমন স্থিতিশীল রূপ, সেই প্রেম শশিভূষণকে যেমন কোথাও উত্তীর্ণ করেনি, উপসংহারে গিরিবালার বাড়িতেও শশিভূষণ এবং গিরিবালা যে কোথায় উপনীত হল তাও তেমন বোঝা গেল না। তার কারণ শশিভূষণের সমস্ত জীবনটাই উদ্দেশ্যহীন। সে গ্রামের জীবনের দিকে তাকিয়েছে ক্লান্ত হয়ে, সে গ্রামের ঘটনাচক্রে ঝাপিয়ে পড়েছে ক্রুদ্ধ হয়ে, এই দুয়েরই মূল্য শেষ পর্যন্ত খুব বেশি নয়।

অথচ গোরা সেদিক থেকে পরিণত কল্পনার সৃষ্টি। গোরা বিচ্ছিন্নতার যন্ত্রণাকে উপলব্ধি করেছে। এবং লেখকের পক্ষ থেকে উপলব্ধির মূলটা রয়েছে ১৯০৫-এর বাংলা দেশের দেশব্যাপী আলোড়নে। এই বিচ্ছিন্নতার এবং ব্যবধানের মাঝখানে যে সেতুবন্ধন প্রয়োজন রবীন্দ্রনাথ সেটা সে-সময়ে উপলব্ধি করেছিলেন এবং ঘোষণা করেছিলেন

> আমি যে একা আমি নহি, আমার যেমন এই ক্ষুদ্র শরীর তেমনি আমার যে একটি বৃহৎ শরীর আছে, আমার দেশের মাটি জল আকাশ যে আমারই দেহের বিস্তার, তাহারই স্বাস্থ্যে যে আমারই স্বাস্থ্য, আমার সমস্ত স্বদেশীদের সুখদুঃখময়চিত্ত যে আমারই চিত্তের বিস্তার, তাহারই উন্নতি যে আমারই চিত্তের উন্নতি, এই একান্ত সত্য আমরা যতদিন না উপলব্ধি করিয়াছি ততদিন আমরা দুর্ভিক্ষ হইতে দুর্ভিক্ষে, দুর্গতি হইতে দুর্গতিতে অবতীর্ণ হইয়াছি—ততদিন কেবলই আমরা ভয়ে ভীত এবং অপমানে লাঞ্ছিত হইয়াছি। একবার ভাবিয়া দেখুন, আজ যে বহুদিনের দাসত্বে পিষ্ট অন্নাভাবে ক্লিষ্ট কেরানী সহসা অপমানে অসহিষ্ণু হইয়া ভবিষ্যতের বিচার

বিসর্জন দিয়াছে তাহার কারণ কী। তাহার কারণ তাহাবা অনেকটা পরিমাণে আপনাকে সমস্ত বাঙালীব সহিত এক বলিয়া অনুভব কবিয়াছে।

লৈঙ্গিক ক্রিয়াপদগুলি সবিয়ে দিলে এটিকে গোবাব বক্তৃতা বলা যেতে পাবে। গোবাব মধ্যে প্রথমাবধি দেখা যায় সে নিজেকে বিস্তাবিত কবতে চাইছে। জীবনেব ভগ্নাংশরূপ তাব কাছে স্পষ্ট হয়েছে বলে সে বুঝেছে যে আমাদের সমাজেব প্রাচীন প্রাণশক্তিব পুনরুজ্জীবন প্রয়োজন। তবেই আবাব জীবন ভগ্নাংশতাকে পবিহাব কবে বিস্তৃত পূর্ণতাব সঙ্গে যুক্ত হতে পাববে। এই কাবণে গোবা নিজেব মূল মেলে দিতে চেয়েছে ভাবতবর্ষেব যা কিছু প্রাচীন তাব মধ্যে। সঙ্গে সঙ্গে কৃষক, কামাব, মুটে-মজুব, হিন্দু-মুসলমান নিচুতলাব লোকজনদেব সঙ্গে নিজেব আত্মীয়তা স্থাপন কবতে চেয়েছে। দেশেব সেই বৃহৎ স্বরূপের সন্ধানই গোবাব সন্ধান। এই সন্ধানেব পথে নানা বাঁক, নানা বঙ্কিম ডুবতিক্রম্যতা। গোবা খ্রীষ্টান দাসী লছমিযাব হাতে জল খায না। কিন্তু চবঘোষপুবে গিয়ে মাধব চাটুজ্যে, যে দাবোগাব বন্ধু, তাব বাড়িতেও জল খায না। বিমূঢ় বমাপতিকে ফেলে বেখে সে চলে যায় সেই নাপিতেব বাড়ি জল খেতে, যেখানে পিতৃহাবা মুসলমানেব ছেলে মানুষ হচ্ছে—যে নাপিত হিন্দুব হবি ও মুসলমানের আল্লাব মধ্যে কোনো তফাত দেখে না। কিন্তু মাধব চাটুজ্যে আব ফরুসদাবেব তফাতটা যে জানে। গোবা অবশ্য ওখানেও নাপিতেব হাতে জল খাযনি। ঘটি মেজে নিয়ে নিজেব হাতে জল তুলে খেয়েছে। কিন্তু মাধব চাটুজ্যেব জল যে অস্পৃশ্য এটা সে বুঝেছে। লাঞ্ছিত দেশবাসীব পক্ষালম্বনে ও তাব জন্য কাবাববণে গোবার ক্ষোভ নেই, কিন্তু গোবা কদাচ বাষ্ট্রনৈতিক বক্তৃতা দিল না— এটাও আবার সঙ্গে সঙ্গে লক্ষণীয। বাষ্ট্রেব থেকে সমাজ আমাদেব কাছে অনেক বেশি তাৎপয-পূর্ণ। সেই স্বদেশী সমাজ বাইবেব বাষ্ট্রশক্তিব ধাক্কায ভেঙে পড়েছে। শক্তিব আয়োজনটা শুরু কবতে হবে সমাজেব শক্তি উদ্ধাবেব ভিতব দিয়ে। এবং সমাজকে পুনরুজ্জীবিত কবাব প্রথম শর্ত তাকে চেনা, জানা, ভালবাসা। সেই সমাজেব ব্যর্থতায চতুর্দিকে পবিকীর্ণ ভাঙাচোবা মানুষগুলোকে কাছে টানা। গোবাব যাত্রা এইপথে। সে আহত মুসলমান ডিমওয়ালাব দুঃখে একাত্ম হতে চেয়েছে। সে ছুতোব-কামাবেব ছেলেদেব নিয়ে ক্রীড়াসংঘ কবেছে। সে হিন্দু-হিন্দু কবলেও পবেশবাবুব পায়েব কাছে চলে যাবাব বীজ তাব মধ্যেই ছিল। সে বীজ শুধু তার জন্মবহস্যে নেই।

এই প্রবল কর্মপরায়ণ এবং প্রবল তর্কপবায়ণ ব্যক্তিটিকে এই আলোকেই অনু-ধাবন করতে হবে। মানুষ যে কেবল হজম কববার যন্ত্র এবং কাপড় টাঙাবাব আলনা নয় বিদ্যাসাগর-চবিত আলোচনা প্রসঙ্গে ববীন্দ্রনাথ সে কথা বলেছেন। Hero কে? এই কথাব জবাবে কার্লাইলেব উদ্ধৃতি ব্যবহাব কবে ববীন্দ্রনাথ বলছেন যে "তিনিই বীর যিনি বিষয়পুঞ্জের অন্তরতর বাজ্যে সত্য এবং দিব্য এবং অনন্তকে আশ্রয় কবিয়া আছেন—যে সত্য, দিব্য ও অনন্ত পদার্থ অধি-কাংশের অগোচরে চাবিদিকেব তুচ্ছ এবং ক্ষণিক ব্যাপাবের অভ্যন্তবে নিত্যকাল বিরাজ কবিতেছেন, সেই অনন্তবাজ্যেই তাঁহাব অস্তিত্ব, কর্ম-দ্বাবা অথবা বাক্য-দ্বাবা নিজেকে বাহিবে প্রকাশ কবিয়া তিনি সেই অনন্তবাজ্যকেই বাহিবে বিস্তার কবিতেছেন।"* গোবাব প্রচণ্ড তর্কপবায়ণতা চাবদিকেব তুচ্ছতা, ব্যর্থতা এবং মূঢ়তাব মাঝখানে একটি সজীব মনেব আলোড়নেব অভিব্যক্তি। তর্কেব জন্যই গোবা কখনও তর্ক কবেনি। যন্ত্রণামথিত পুরুষকাবেব হাহাকাব গোবাব সমস্ত কর্মে এব' বাক্যে প্রতিফলিত।† চাবদিকেব এই ভগ্নাংশরূপেব যন্ত্রণাব মূল খুঁজতে গিযে সে নিজেব ভগ্নাংশরূপকেও আবিষ্কাব কবেছে সুচবিতাব সংস্পর্শে এসে। যে তিনটি লোকেব কাছে সে স্পষ্ট হতে চেযেছে এবং যে তিন জন তাকে ভালবেসেছে তাবা হলেন আনন্দময়ী, পবেশবাবু এবং সুচবিতা। এব মধ্যে সুচবিতাব প্রশ্ন স্বভাবতই তীক্ষ্ণ হয়ে দেখা দিযেছে। উপন্যাসেব এই অধ্যাযেই গোবাব সমস্ত যন্ত্রণা চূড়া স্পর্শ ববেছে।

এই উপন্যাসেব সমস্ত শিল্পকর্মেব অ'শে উপন্যাসেব মৌল কল্পনাব প্রসাদ কেমন-ভাবে উপস্থিত ও কেমন কবে নানা দিক থেকে উপন্যাসটি বিশিষ্ট হযে উঠেছে এবাব তাবই আলোচনা কবা যাক। আমবা এই গ্রন্থেব উপক্রমণিকায বলেছি কোনো উপন্যাসের শিল্পকর্মেব মহিমা একমাত্র সে উপন্যাসেব নৈতিক তাৎপর্যেব সম্পর্কেই উপলব্ধি কবা যায—অন্য কোনো ভাবেই নয। সে কারণেই উপন্যাসে উত্থাপিত নৈতিক প্রশ্নাবলী বা নৈতিক গভীবতাব বিষযটিব পৃথক অনুসন্ধান অথবা উপন্যাসটিব শিল্পমহিমাব স্বতন্ত্র সূত্রানুসন্ধান দুইই ভ্রান্ত কাজ। প্রকৃত সমালোচক কদাচ এই খবিত পথেব পথিক হন না। কেননা তিনি জানেন যে উপন্যাসে উত্থাপিত নৈতিক আগ্রহেব গভীরতা আছে অথচ উপন্যাসেব আঙ্গিকরূপে তার

* আত্মশক্তিব স্বদেশী সমাজ-বিষযক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

† এই প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগর চবিত্রেব অনন্যতন্ত্রতাব স্মৃতি আমাদেব মনে আসা স্বাভাবিক। কযেক বছর পূর্বে "সাহিত্যপত্র" পত্রিকায় বৌধায়ন চট্টোপাধ্যায়েব গোরা-বিষযক প্রবন্ধ উল্লেখ্য।

কোনো অভিব্যক্তি ঘটল না, কিংবা আঙ্গিকরূপের উজ্জ্বল সৌকর্য সত্ত্বেও উপন্যাসে কোনো নৈতিক গভীরতার সাক্ষাৎলাভ হল না, এই উভয় ক্ষেত্রেই (যদি এতাদৃশ অসম্ভব ঘটনা ঘটেই) শিল্পহীনতার নিদর্শনই বিদ্যমান। পক্ষান্তরে কোনো উপন্যাসের শিল্পবান রূপ যদি যথেষ্ট চিত্তগ্রাহী হয় তবে তা জীবনের অমেয় সম্ভাবনা সম্বন্ধে পাঠককে সচেতন করেই হতে পারে—নচেৎ নয়। নৈতিক প্রশ্নের বেলায় শূন্যতা অথচ শিল্প-কৌশলে সম্পন্নতা—এ শশবিষাণ অলীক কল্পনাতেই সম্ভব। তার কল্পনাতেই ত্রুটি আছে। আঙ্গিকরূপের ত্রুটি বা গুণ নিয়ে আমরা যখন আলোচনা করি তখন পরিশেষে সে আলোচনা লেখকের জীবনবোধের অপূর্ণতার বা পূর্ণতার দিকেই অঙ্গুলি সংকেত করে।

এ-কারণেই সম্ভবত এমন কথা বলা হয় যে উপন্যাসের প্রতিটি অংশে, স্তরে এবং পর্যায়ে তার সমগ্রতারই প্রতিফলন ঘটে থাকে। অর্থাৎ যেহেতু লেখকের জীবন সচেতনতা বা নৈতিক বোধ উপন্যাসের চিত্র, চরিত্র, নাটক, কাব্য ইত্যাদির মাধ্যমেই রূপান্তরিত হয়ে থাকে সেই হেতু কোনো একটিরও পৃথক আলোচনাতে উপন্যাসের সামগ্রিক বক্তব্যের আলোচনা প্রাসঙ্গিক। এ প্রাসঙ্গিকতা না মানলে কন্‌রাড কেন জাতীয়তায় পোল এবং ভাষাভিজ্ঞতায় ফরাসীর কাছাকাছি হওয়া সত্ত্বেও ইংরাজিকে তাঁর উপন্যাসরাজির ভাষা হিসাবে নির্বাচন করলেন তা বোঝা যাবে না। বোঝা যাবে না কেন কমল (শেষ প্রশ্নে) এবং গোরা তথাকথিত তার্কিক চরিত্র হয়েও এত পৃথক। কেনই বা একটির ক্ষেত্রে আমাদের পাওনা বাস্তবতার সঙ্গে ভাবপ্রবণতার অসম সংযোগের শিল্প-বিনাশী প্রয়াস, আর একটির ক্ষেত্রে বাস্তবতার সঙ্গে আদর্শের যোগ্য মিলন।

গোরা উপন্যাসের শিল্পকর্ম আলোচনা প্রসঙ্গে এ-কথাগুলো আরও গভীরভাবে বিবেচ্য। আমাদের পণ্ডিতী আলোচনার ক্ষেত্রে গোরাকে যথার্থ পরিপ্রেক্ষিতে স্থাপন করে আলোচনা কদাচ হয়নি। সেই জন্যই বোধহয় যখন অন্য কোনো রসিক মহল থেকে বলা হয় গোরা সার্থকতম বাংলা উপন্যাস তখন সাধারণ বাঙালী উপন্যাস-পাঠক ঈষৎ বিব্রত বোধ না করে পারেন না। বস্তুত গোরা সার্থকতম বাংলা উপন্যাস এই উক্তির সঙ্গে 'গোরার চরিত্রে জীবন রহস্যের প্রকাশ ঘটেনি' অথবা 'পরেশবাবু এবং আনন্দময়ী পিঙ্গল এবং রক্তহীন' এই সমস্ত উক্তি-নিচয়ের মাঝখানে পাঠকের দিশাহারা হবার কথা। এ-ক্ষেত্রে আমরা "গোরা বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসই শুধু নয়, বাংলা জীবনের ও সংস্কৃতির দু-ধারার ব্যর্থ সমন্বয় চেষ্টায় আমাদের জাতীয় রূপকও বটে"—এ-কথা মেনে

নিয়ে এর শিল্পকর্মের বৈশিষ্ট্য আলোচনা কবব।

গোরা উপন্যাসে শিল্পকর্মের বৈশিষ্ট্য আলোচনা কালে প্রথমেই গোরা-র প্রধান মৌল প্রশ্নগুলিব কিঞ্চিৎ পবিচয় প্রদান কর্তব্য। এই মৌল প্রশ্নগুলিব সঙ্গে উপন্যাসকাবেব বাস্তবতাবোধেব দোষ-গুণেব প্রশ্নও বিজড়িত। প্রতিটি মোটামুটি সার্থক উপন্যাসই আমাদেব বাস্তব জীবন সম্বন্ধে সচেতন কবে। কিন্তু মোটামুটি সার্থক উপন্যাসেব সঙ্গে একটি মহৎ উপন্যাসেব তফাত এইখানেই যে মহৎ উপন্যাসেব কাজ শুধু উপন্যাসকাবেব বাস্তব-জ্ঞানেব পবিচয প্রদান নয়, পাঠকেব বাস্তব-সচেতনতাব পবিধিকে সম্প্রসাবিত কবা, তাকে শুদ্ধ কবাও তাব কাজ বটে। এ-কাজে ব্যর্থ হলে সে বচনা মহৎ উপন্যাসেব মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হয়। এবং উপন্যাসেব বনিযাদী পাঠক সমাজ জানেন যে বাস্তব সচেতনতাব এই শুদ্ধীভবন ও সম্প্রসারণ উপন্যাসের ব্যবহৃত চবিত্রেব বাস্তব, ইতিবাচক এবং ইতোপূর্বে অনাবিষ্কৃত কোনো গূঢ় তাৎপর্য সৃজন ব্যতিবেকে ঘটতে পাবে না। এখন প্রশ্ন এই গোবা চবিত্রে ইতোপূর্বে অনাবিষ্কৃত কোন্ বাস্তব ইতিবাচকতা উপস্থিত?

গোবা চবিত্রেব মেরুদণ্ড তাব "দেশপ্রেম' (এই শব্দটিকেই সমালোচকেবা ব্যবহাব করেছেন)। কিন্তু এ-কথাও আমাদেব জানা আছে যে এই দেশপ্রেমেব স্বরূপ বাংলা উপন্যাসে ব্যবহৃত দেশপ্রেম থেকে পৃথক। গোবা-ব আগে পর্যন্ত বাংলা নাটক-নভেলে দেশভক্তি ছিল দেবীভূত মাতৃভক্তিরই নামান্তব। গোবাব বচনাকাল ও প্রকাশকালও এই বন্দেমাতবম্ প্রসঙ্গে অতিভক্তিব কাল। কিন্তু গোবাব দেশপ্রেম দেশমাতৃকা সম্বন্ধে কোনো ভাবানুভূতি নয়। দেশেব মানব-গোষ্ঠী সম্বন্ধেই তাব আগ্রহ। এবং এটাই তাব দেশপ্রেম। সেই কাবণে গোবা কখনই সন্দীপেব মতো দেশজননীব কথা বলেনি। সে সুচবিতা অথবা পানুবাবু এদের সকলেব কাছে ভাবতবর্ষেব কথা বলেছে। গোবাব যন্ত্রণাটা আসলে ভাবতবর্ষেব সন্ধানেব যন্ত্রণা। বাবু কালচাবেব অপবিহায ফল হিসাবে গোবা এ কথাটা ঠিকই উপলব্ধি কবেছিল যে সে দেশেব বৃহৎ জনগোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন। যেটাকে বঙ্কিমচন্দ্র অস্পষ্টভাবে বুঝেছিলেন, বলেছিলেন শিক্ষিতে-অশিক্ষিতে সমবেদনা নাই সেই খণ্ডীভবনের যন্ত্রণাব পূর্ণ নিদর্শন গোবা।

সেই খণ্ডীভবনেব পবিণামস্বরূপ জীবনাচবণের অসঙ্গতি মহিম এবং পানুবাবুতে যেমন গোবাতেও তদপেক্ষা কম কিছু নয। সে চবঘোষপুরেব মুসলমান প্রজাদেব পক্ষ নিয়ে পুলিসী জুলুমেব বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে অথচ লছমিব হাতে জল

থেকে তার আপত্তি। সে সমগ্র ভারতের সন্ধানী অথচ ব্রাহ্মদের জাতিভেদহীন জীবনাদর্শকে পশ্চিমী অনুকরণ বলে মনে করে। কিন্তু পানুবাবু বা মহিমের অসঙ্গতি থেকে এটা পৃথক এই কারণে যে তার মধ্যেই একমাত্র এই অসঙ্গতির যন্ত্রণা বিদ্যমান এবং এই অসঙ্গতি থেকে উত্তীর্ণ হবার জন্য নিজের অভ্রান্ত সত্তার জন্য সে অনলস। তার উত্তরণই গোরা উপন্যাসের বিষয়। এই উত্তরণের পথে এসেছিল সুচরিতার প্রেম। গোরার দেশানুভূতির সঙ্গে সুচরিতা সংক্রান্ত প্রেমের বোধের প্রথমে সংঘাত ও পরে সমন্বয় গোবার জীবনের প্রধান সমস্যা ছিল। গোবার কাছে গোরার জন্মরহস্যের বৃত্তান্ত উন্মোচিত হওয়ার পবে একই পথে তার দুটো প্রশ্নেবই মীমাংসা হল।

এইভাবে আবো দেখা যায় যে এই উপন্যাসেব সকল কিছুই উপন্যাসের চরিত্রগুলির ব্যক্তিত্ব সংক্রান্ত প্রশ্ন হিসাবে দেখা দিয়েছে। সুবৃহৎ উপন্যাসেব এই অন্তরঙ্গ বৈশিষ্ট্য তার বহিরঙ্গ নির্মাণেও নানাভাবে ছায়াপাত করেছে। নানা দিক থেকে সেটিকে আলোচনা কবাই আমাদেব উদ্দেশ্য।

এই উপন্যাসের আলোচনায আমরা প্রথমেই যেটিকে গুরুত্ব প্রদান করবো সেটি হল উপন্যাসের গঠনে গোরা উপন্যাসে ব্যবহৃত সময বা কালখণ্ডের তাৎপর্য। এখানে অবশ্য প্রথমেই ব্যক্ত কবা প্রযোজন যে সময বা কালখণ্ড বলতে লেখক বাংলা দেশেব ইতিহাসের কোন্ অংশকে গোরা উপন্যাসে ব্যবহাব কাবছেন সে কথা বোঝানো হচ্ছে না। এখানে প্রশ্ন অধিকতব সহজ। গোবা উপন্যাসের ঘটনা ঘটতে কত সময় ব্যযিত হয়েছে এবং তা উপন্যাসের দিক থেকে কোনো তাৎপর্যবহ কি না। উপন্যাসের ঘটনায় ব্যয়িত সময়কালেব বৈশিষ্ট্যগুলি এই :

(ক) এই সুবৃহৎ উপন্যাসের সমুদয় ঘটনার সময়কাল ছযমাস মাত্র। শ্রাবণ মাসের এক সকালে উপন্যাসের ঘটনার প্রারম্ভ এবং মাঘ মাসের মধ্যেই উপন্যাসের সমস্ত ঘটনার উপসংহার ঘটেছে।

(খ) এর মধ্যে বর্ষা থেকে হেমন্তের এই কয-মাসের জন্য একবিংশ পরিচ্ছেদ বা ১৮৪ পৃষ্ঠা ব্যয়িত হয়েছে। একবিংশ পরিচ্ছেদে গোবার আত্মচিন্তায় হেমন্ত-রজনীর উল্লেখ আছে। ("আজ এই হেমন্তের রাত্রে নদীর তীরে নগরের অব্যক্ত কোলাহলে এবং নক্ষত্রের অপরিস্ফুট আলোকে গোরা বিশ্বব্যাপিনী কোন্ অবগুণ্ঠিতা মায়াবিনীর সম্মুখে আত্মবিস্মৃত হইয়া দণ্ডায়মান হইল।") উপন্যাসের বাকি পঞ্চান্নটি পরিচ্ছেদ বা ৪৩১ পৃষ্ঠা হেমন্ত থেকে শীতের মধ্যভাগের অন্তর্বর্তী কালে ঘটেছে। এই অতিপরিমিত সময়ই উপন্যাসের মূল ঘটনার কাল।

(গ) এবং পূর্বে কথিত কালখণ্ডের শেষাংশে একমাস গোরা উপন্যাসে প্রত্যক্ষ ভাবে উপস্থিত ছিল না।

(ঘ) উপন্যাসের এই অতিপরিমিত কালখণ্ডে প্রত্যক্ষ ঘটনাই উপন্যাসের সম্বল। উপন্যাসের স্ফীত কলেবর নায়ক-নায়িকার অতীত ইতিবৃত্ত কথনের জন্য বা চিন্তাস্রোতের অতীতানুসরণের জন্য হয়নি। একমাত্র হরিমোহিনীর কাহিনী ছাড়া কোথাও সে আয়োজন দেখা দেয়নি। এই সব বৈশিষ্ট্যগুলি হয়তো সাধারণভাবে দেখতে গেলে এমন কিছু মূল্যবান নয়। কিন্তু ঔপন্যাসিকের শিল্পগত প্রয়োজন সিদ্ধিতে এরা নানাভাবে সহায়ক হয়েছে। সেগুলি এই :

(ক) ঘটনাকালের পরিসর সীমিত বলেই উপন্যাসের গতিতে এক সাবলীল খরস্রোত সদাসর্বদা বিদ্যমান। অথচ ঘটনাকালের পরিসর-স্বল্পতা উপন্যাস পাঠকের দৃষ্টিতে সহজে ধরা পড়ে না। গোরার জীবনে উপন্যাসের অতিরিক্ত কোনো অতীত ঘটনা উপন্যাসে নেই তা পূর্বেই বলা হয়েছে। কিন্তু উপন্যাসে শুরু থেকেই প্রত্যক্ষভাবে বর্ণিত ঘটনাবলীর ছক পেরিয়ে গোরা যখন উপসংহারে সুচরিতাব হাত ধরে পরেশবাবুর দিকে অগ্রসর হল তখন এ-কথা না মনে হয়ে যায় না যে গোরা যেন এক দীর্ঘ যাত্রাপথের শেষে উপনীত হল। মাত্র কয়েক মাসের পরিসরে তথাকথিত হিরোয়িক ঘটনা সমাবেশ পরিহার করেই অগাধ জীবনের এই বিপুল প্রতিবিম্ব রচনা করা হয়েছে।

(খ) এবং এইভাবেই গোরা যথার্থ এপিক উপন্যাসে পরিণত হতে পেরেছে। কল্পনার একমুখী গতি রসপরিণামশীল বলে এপিক উপন্যাসে ভাষাগত অখণ্ডতা এবং সংহতি সর্বদাই নিখুঁতভাবে রক্ষিত হয়ে থাকে। এপিক উপন্যাসে হিরোয়িক ইম্প্রেশন প্রধান কথা। এই ইম্প্রেশন, অনুপ্রাণিত ও প্রাণবন্ত ভাষা ব্যতীত সম্ভবপর নয়। গোরা উপন্যাসে ঘটনাকালের পরিসরস্বল্পতা কল্পনার একমুখী অনুপ্রাণিত গতির পক্ষে সহায়ক হয়েছে। ফলে উপন্যাসকে কোনো পরিচ্ছেদে বা কোনো চরিত্রের ক্ষেত্রেই শিথিল বা শ্লথ হতে হয়নি। উপন্যাসের ভাষায় যে কবিত্ব এবং যে চিত্রকল্পরাজির সাক্ষাৎ মেলে যা আমরা এখনি আলোচনা করব তা আসলে পূর্বোক্ত কল্পনার সংহতি এবং তার একমুখী রস-পরিমাণশীল গতিরই ফল। ঘটনাকালের পরিসর স্বল্পতা এই কল্পনাগত সংহতি ও অখণ্ডতা নির্মাণে সাহায্য করেছে এবং তারই ফলে এপিক উপন্যাসের উপযুক্ত ভাষা-সম্পদে গোরা উপন্যাস অনন্য মর্যাদায় অধিষ্ঠিত—বর্তমান পরিচ্ছেদের প্রধান বক্তব্য এটাই।

গোরা যে মহাকাব্যোচিত বা এপিক জাতীয় উপন্যাস এ-কথা গোরা সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্যের সময়েও সমালোচকেবা মনে রেখেছেন। কিন্তু সম্ভবত মহাকাব্যোচিত উপন্যাসেব চরিত্র সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা তাঁদেব আছে তা আংশিক বলেই গোরার বিচারে নানা ভ্রান্তি দেখা দিয়েছে। মহাকাব্যোচিত ঘটনা সমাবেশই কোনো উপন্যাসকে (বা কোনো কাব্যবস্তুকে) মহাকাব্যোচিত বা মহাকাব্যেব লক্ষণাক্রান্ত এই আখ্যায় ভূষিত কবে না। বস্তুত মহাকাব্যেব সার্থক ইম্প্রেশন সৃষ্টিব জন্য দান্তের আশ্চর্য বচনা থেকে সমালোচকেবা যে শিক্ষা গ্রহণ কবেছেন তার কথা স্মরণে বাখলে কোনো এপিক সৃষ্টিব কাছ থেকে প্রকৃতপক্ষে আমাদেব কী চাওয়া উচিত সে সম্বন্ধে অবহিত হওয়া যায়। মহাকাব্যেব ফলশ্রুতি পাঠকমানসে সঞ্চাবিত কবাই যদি এপিক উপন্যাস লেখকেব কর্তব্য হয় তাহলে বিষয়ের বিন্যাসের দিকে লেখককে অধিক দৃষ্টিশীল হতে হয়। নিশ্চয় টলস্টয়ের ওঅব অ্যাণ্ড পীস উপন্যাসে যুদ্ধবিগ্রহ বাজারাজড়া প্রভৃতিব কাহিনী বর্ণিত আছে বলেই বা বহু বর্ণাঢ্য ঘটনাব শোভাযাত্রায় উপন্যাসটি পবিপূর্ণ বলেই ওঅব অ্যাণ্ড পীস মহাকাব্যোচিত উপন্যাস নয়। সমগ্র উপন্যাসেব ফলশ্রুতিতে মহাকাব্যেব আস্বাদ লভ্য বলেই উক্ত উপন্যাস মহাকাব্যোচিত।

এ-ক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠতে পাবে যে কী এই মহাকাব্যোচিত ফলশ্রুতি? এ-প্রসঙ্গে ভাবতীয় মহাকাব্য (যেমন মহাভাবত) সম্বন্ধে পণ্ডিত সমালোচকেবা অলংকার শাস্ত্রসম্মত যে আলোচনাব পন্থা নির্দেশ কবেছেন তা অনুধাবনযোগ্য। মহাকাব্য শেষ পযন্ত শান্তবসপবিণামী। মহাভাবতেব মহাপ্রস্থানেব ট্র্যাজেডির মধ্যেও (ডাঃ শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত) সেই শান্ত বসেবই জাগবণ। বস্তুত মানবজীবনেব বিশাল উত্থান পতন, তাব ব্যাপকতা এবং গভীরতা সম্বন্ধে সচেতনতার বোধ থেকেই এই শান্তবসপবিণামী ফলশ্রুতিব জন্ম। অনেক রূঢ়তা, ক্রুরতা তামসিকতা বাজসিকতাব পবে, বহু অশ্রু এবং বক্তেব শেষে মহাপ্রস্থানেব অধ্যায়ে না পৌছলে, আত্মনিগ্রহেব যন্ত্রণায় না উপনীত হলে, জীবনের সুসমতায় প্রত্যাবর্তন সম্ভবপব হত না। পূর্ণ জীবনবোধই এই সুসমতাব জনক। এবং এইখানেই নৈতিক গভীরতার নিধান।

মহাকাব্য যেমন, মহাকাব্যোচিত উপন্যাসেও তেমনি ঘনীভূত নৈতিক চেতনা শিল্প-কর্মের অতিবিক্ত, অথবা বাইরে থেকে সংযোজিত কোনো বস্তু নয়। উপন্যাসের শিল্পকর্মেই এর অভিব্যক্তি। অন্যান্য নানা বিষয়ের সঙ্গে উপন্যাসের ভাষার ভূমিকাও এ-ক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্যময়। টিলিয়ার্ড সাহেব তো এ-বিষয়ে সুকঠিন নিয়মের

পক্ষপাতী। মহাকাব্যোচিত উপন্যাসের উপযুক্ত ভাষা ব্যতিরেকে কোনো রচনাই (বিষয়-মহিমা থাকলেও) 'মহাকাব্যোচিত' এই মর্যাদায় চিহ্নিত হতে পারে না। টিলিয়ার্ড বলেছেন—

> If an author treats his subject 'heroically', if he can maintain the pressure of his will, he will densify his language and persuade us in so doing that his work was conceived and carried through with intense energy and application. And, in the easy and fluid medium of prose fiction it is a lack of intensity that so often presents itself as the reason why a work, admirable in other ways, can not be considered as an epic.

গোরা উপন্যাসের ভাষায় এই অনুপ্রাণিত ঘনবদ্ধতার সাক্ষাৎ মেলে। অবশ্যই এই অনুপ্রাণিত ঘনবদ্ধতার মূলে রয়েছে পূর্বকথিত অন্তর্নিহিত গতিবেগ। গোরার চরিত্র, তার যন্ত্রণা, নবকালের ভারতবর্ষ এবং গোরার অগ্রণী মনে খণ্ডিত অস্তিত্বের বেদনা—জীবনের স্থায়ী সূত্রানুসন্ধানের জন্য তার তীব্র আকুলতা এই অনুপ্রাণিত ঘনবদ্ধতার জন্মদাতা এবং গোরার ইতিবাচকতা যে আমাদের স্বকালীন ফ্রাসট্রেশনের অনেক দূরের ব্যাপার, বিশ্বাসভঙ্গের নয়, গোরার যন্ত্রণা যে বিশ্বাস অর্জনেরই যন্ত্রণা গোরা উপন্যাসের আলোচনাকালে সে কথাও স্মরণীয়। কল্পনার সেই সুদৃঢ় অনুশাসন, যার বিদ্যমানতায় আমরা (অন্য সব দিক বজায় থাকলে) একটা উপন্যাসকে মহাকাব্যোচিত এই আখ্যা দিতে পারি গোরা উপন্যাসের ভাষায় সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি লাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথের প্রধান প্রধান কাব্যপুস্তকের বেলায় যেমন আমরা দেখেছি যে কবিজীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে কবি ভাবনার বিশিষ্ট অনুষঙ্গে একটি বিশেষ চিত্রকল্প পর্যায়ের প্রতি কবির পক্ষপাত দৃষ্ট হয়। গোরা উপন্যাসের ভাষায় ঔপন্যাসিকের কল্পনার সেই তাৎপর্যপূর্ণ একটি চিত্রকল্পের প্রতি পক্ষপাতের সাক্ষাৎ মেলে। এই চিত্রকল্পটি নদী, সমুদ্র, তরী, তরঙ্গ এবং কূল উল্লঙ্ঘন সংক্রান্ত কোনো চিত্রকল্প। গোরা উপন্যাস থেকে আমাদের বক্তব্যের পক্ষে কতকগুলি প্রমাণ দেওয়া যাচ্ছে।—

(ক) কম্পাস ভাঙা কাণ্ডারীর মতো তোমার পূর্ব-পশ্চিমের জ্ঞান লোপ পেয়ে যাবে—তখন মনে হবে জাহাজ বন্দরে উত্তীর্ণ করাই কুসংস্কার, সংকীর্ণতা—কেবল না হক ভেসে চলে যাওয়াই যথার্থ জাহাজ চালানো। (১৮ পৃঃ)

(খ) এই দৃশ্যটুকু অন্ধকারের মহাসমুদ্রের মধ্যে একটা বুদ্বুদের মতো মিলাইয়া গেল। (৩১পৃঃ)

(গ) ডুবে মরতে পারি কিন্তু আমার সেই লক্ষ্মীর বন্দরটি আছে। (৩২পৃঃ)

(ঘ) আর সমস্ত ভুলে কেতাবের বিদ্যে, খেতাবের মায়া, উঞ্ছবৃত্তির প্রলোভন সব টান মেরে ফেলে দিয়ে সেই বন্দরের দিকেই জাহাজ ভাসাতে হবে। (৩৩ পৃঃ)

(ঙ) এই জনসাধারণের সঙ্গে এক করিয়া মিলাইয়া দেশের একটা বৃহৎ প্রবাহের মধ্যে আপনাকে সম্পূর্ণ করিতে ও দেশের হৃদয়ের আন্দোলনকে আপনার হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিতে চায়। (৭৭ পৃঃ)

(চ) এই একটা বাঁধ ভাঙিয়া যাইতেই বিনয়ের হৃদয়ের নূতন বন্যা যেন আরও উদ্দাম হইয়া উঠিল। (৫২ পৃঃ)

অবশ্য এইভাবে যদি নদী, তরঙ্গ, তরী সংক্রান্ত উপমা বা চিত্রকল্পের তালিকা করা যায় তাহলে তার সংখ্যা শেষ পর্যন্ত নিরূপণ করা মুশ্‌কিল। যখনই এই উপন্যাসে ঘটনাস্রোত জটিল এবং বঙ্কিম হয়ে উঠেছে লেখকের ভাষা হয়ে উঠেছে আবেগান্বিত, তখনই এই জাতীয় চিত্রকল্পের আধিক্য লক্ষ্য করার বিষয়।

(ক) দু-নৌকায় পা দেওয়া যার স্বভাব আমার নৌকা থেকে তাকে পা সরাতে হবে। এতে আমারই কষ্ট হোক আর তারই কষ্ট হোক। (১০৮ পৃঃ)

(খ) হোক অন্যায় আর তা ঠেকাইয়া রাখা যায় না। এই স্রোতেই যদি কোনো একটা কূলে তুলিয়া দেয় তো ভালো, আর যদি ভাসাইয়া দেয় তলাইয়া দেয় তবে উপায় কী। (১১২ পৃঃ)

এবং উক্ত দুই উদ্ধৃতির মধ্যবর্তী চার পাতায় 'আকাশ ভাঙিয়া যাওয়া' 'পরিপূর্ণ বেগে বন্ধনমুক্ত মন' 'পথিক প্রবাহ' প্রভৃতি চিত্রকল্পের ব্যবহারও উল্লেখযোগ্য। এবং এর পরেই ১৪৪ পৃষ্ঠায় ব্যবহৃত অনুরূপ চিত্রকল্প লক্ষণীয়

স্বদেশের সেই সত্যমূর্তি যে কী আশ্চর্য অপরূপ, কী সুনিশ্চিত সুগোচর তার আনন্দ, তার বেদনা যে কী প্রচণ্ড প্রবল যা বন্যার স্রোতের মতো জীবন মৃত্যুকে এক মুহূর্তে লঙ্ঘন করে যায়, তা আজ তোমার কথা শুনে মনে মনে অল্প অল্প অনুভব করতে পারছি।

এই নদী-প্রাসঙ্গিক চিত্রকল্পগুলির সঙ্গে গোরা উপন্যাসের শিল্পপ্রাণের একটি নিবিড় যোগ বিদ্যমান। গোরা-চরিত্রের মৌল গতিবেগ—যা নদীরই মতো দীর্ঘ-পথবাহী, আবর্তসংকুল, এবং সমুদ্রসন্ধানী—স্বভাবতই নদী প্রাসঙ্গিক চিত্রকল্প-

গুলিতে আপন সাযুজ্য খুঁজে পেয়েছে। নিজের চতুষ্পার্শ্বকে অতিক্রম করে যাওয়ার পথের দ্বন্দ্ব-সংঘাত, বেদনা, যন্ত্রণা, বারম্বার ফিরে ফিরে নিজেরই সম্মুখীন হওয়া, তাই গোরা উপন্যাসের বীজ-কল্পনা। যেহেতু মহাকাব্যোচিত উপন্যাসের চরিত্রসৃষ্টি, ভাষা ব্যবহার, চিত্রকল্পসৃজন, এবং সব কিছুই, একটা অখণ্ড কল্পনাবিন্দু থেকে, এক অনাহত প্রয়াসে উৎসারিত ব্যাপার তাই গোরা উপন্যাসের স্থায়ী চিত্রকল্প পর্যায়েও নদী প্রাসঙ্গিক চিত্রকল্পেরই সুপ্রয়োগ ঘটেছে।*

এবং এই সঙ্গেই আখ্যানভাগের কোনো অংশের পটভূমিকা হিসাবে নদীর ব্যবহারও বিশেষ লক্ষ্য দাবি করতে পারে। উপন্যাসের একবিংশ পরিচ্ছেদ এবং অষ্টবিংশ-উনত্রিংশ পরিচ্ছেদের কথা এ-ক্ষেত্রে স্মরণীয়। উক্ত দুটি পরিচ্ছেদের প্রথমটিতে গোরার আত্মচিন্তা এবং দ্বিতীয়টিতে বিনয় ও ললিতার স্টিমারে কলকাতা প্রত্যাবর্তন বর্ণিত হয়েছে। উপন্যাসের দিক থেকে দুটি পরিচ্ছেদই ঘটনাধারার নবরূপান্তরের স্রষ্টা।

একবিংশ পরিচ্ছেদের বিষয় গোরার আত্মজিজ্ঞাসা। এই আত্মজিজ্ঞাসারই পরিণতিতে দেশের আত্মার সন্ধানে গোরা কলকাতার বাইরে কিছুদিনের জন্য পরিভ্রমণে বেরুবে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হল। গোরার জীবন-জিজ্ঞাসার সঙ্গে নদীর পটভূমিকাগত সংযোগ এবং সংঘাত সমগ্র পরিচ্ছেদে এক নানা রাগে মিশ্র আবেগের সৃষ্টি করেছে। আবেগের এই ঘনত্ব গোরার নিজেকে উপলব্ধির সমস্যার সঙ্গে জড়িত বলেই নদী এবং গোরা এই পরিচ্ছেদে একার্থক হয়েছে।

—আজ কিন্তু নদীর উপরকার ওই আকাশ আপনার নক্ষত্রলোকে অভিষিক্ত অন্ধকার দ্বারা গোরার হৃদয়কে বারম্বার নিঃশব্দে স্পর্শ করিতে লাগিল। নদী নিস্তরঙ্গ। কলিকাতার তীরের ঘাটে কতকগুলি নৌকায় আলো জ্বলিতেছে আর কতকগুলি নিস্তব্ধ। ওপারের নিবিড় গাছগুলির মধ্যে কালিমা ঘনীভূত। তাহারই ঊর্ধ্বে বৃহস্পতি গ্রহ অন্ধকারের অন্তর্যামীর মতো তিমিরভেদী অনিমেষ দৃষ্টিতে স্থির হইয়া আছে।

—আজ এই বৃহৎ নিস্তব্ধ প্রকৃতি গোরার শরীর মনকে যেন অভিভূত করিয়া দিল। গোরার হৃৎপিণ্ডের সমান তালে আকাশের বিরাট অন্ধকার স্পন্দিত হইতে লাগিল।· ···

* গোরা উপন্যাসের উপসংহারের কিছু পূর্ব পর্যন্ত এ-জাতীয় উপমার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। তার পৃথক তালিকাও দেওয়া যায়—সম্ভবত তার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ-উপমার বোধকরি সর্বাপেক্ষা যোগ্য ব্যবহার ঘটেছে বিনয়কে লিখিত পরেশবাবুর পত্রে।

—নদী তাহাকে লোকালয়ের অশ্রান্ত কর্মক্ষেত্র হইতে কোন্ অনির্দেশ্য সুদূরের দিকে আঙুল দেখাইয়া দিল। সেখানে নির্জন জলের ধারে গাছগুলি শাখা মিলাইয়া কী ফুল ফুটাইয়াছে, কী ছায়া ফেলিয়াছে। সেখানে নির্মল নীলাকাশের নিচে দিনগুলি যেন কাহার চোখের উন্মীলিত দৃষ্টি এবং রাতগুলি যেন কাহার চোখের আনত পল্লবের লজ্জাজড়িত ছায়া।

—আজ এই হেমন্তের রাত্রে, নদীর তীরে, নগরের অব্যক্ত কোলাহলে এবং নক্ষত্রের অপরিস্ফুট আলোকে গোরা বিশ্বব্যাপিনী কোন্ অবগুণ্ঠিতা মায়াবিনীর সম্মুখে আত্মবিস্মৃত হইয়া দণ্ডায়মান হইল।

নদীর রূপবতী পটভূমিতে গোরার নবার্জিত অভিজ্ঞতার সংযোগ-সংঘাতেই এ অধ্যায়ের ভূমিকা নিঃশেষিত নয়। নিজের অন্তরে এবং বাহিরে আত্মবিস্তার ও সমন্বয় সাধনের চেষ্টাই গোরা চরিত্রের মূল কথা। সেইজন্য 'প্রকৃতিকে গোরা স্বীকার করিয়া লইল' উদ্ধৃত অনুচ্ছেদের বক্তব্য এই। কিন্তু প্রেম ও প্রকৃতি চেতনা সঞ্জাত এই নবার্জিত অভিজ্ঞতা একটু পরেই এক প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হল অবিনাশের আগমনে এবং এইখান থেকেই গোরা গ্রাম বাংলা পরিক্রমণের সিদ্ধান্তে আসে। সুতরাং নদী যে শুদ্ধ অনুভূতির সৃষ্টি করছে গোরার মনে, পরিবেশের বাস্তবতা তাকে আঘাত করে। বুদ্ধি এবং অনুভূতির টানাপোড়েনই শুধু লক্ষণীয় নয়। মানুষ প্রতি মুহূর্তে নিজের অজানিতে নিজের সৃজিত মূর্তির সম্মুখীন হয়। আধুনিক মন নিজের এই প্রতি মুহূর্তের নবরূপান্তরের বেদনা ও বিস্ময়ের রেখায় দীর্ণ। গোরার যন্ত্রণা তারই প্রতিনিধি। তাই এইখানে গোরা একক। চারদিকে যখন 'শশকের সংহতি' তখন 'সিংহের নৈঃসঙ্গ্য' যন্ত্রণাময় অথচ সত্তার অভ্রান্ত রূপের সন্ধানও ক্লান্তিহীন। ব্যক্তি মানুষের এই সমস্যায় প্রকৃতির ভূমিকা সম্বন্ধে মহৎ শিল্পীরা সদাই ঐকমত্যে পৌছান। প্রকৃতির ভূমিকা পবিত্র শুশ্রূষাকারিণীর ভূমিকা নয়। প্রকৃতি বরং ব্যক্তিত্বের সামনে গূঢ় থেকে গূঢ়তর প্রশ্নই সদাসর্বদা তুলে ধরে। উদ্ধৃত অনুচ্ছেদে নদীর ভূমিকাও তাই।*

আবার ২৮-২৯শ পরিচ্ছেদেও বিনয় ও ললিতার স্টিমার ভ্রমণের পটভূমিকাও নদী। কিন্তু ২১শ পরিচ্ছেদে সে পটভূমিকার যে তাৎপয ২৮-২৯শ পরিচ্ছেদে তথা বিনয়-ললিতার একত্র প্রত্যাবর্তনের ক্ষেত্রে সে তাৎপর্য অন্যরূপ। ললিতার

* হেমচন্দ্রের 'সেই জানে প্রকৃতির প্রাঞ্জল মূরতি' • প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতিকে নিজের প্রতিধ্বনি করে তোলা। বড়ো কবির কাছে প্রকৃতি গভীর জিজ্ঞাসাকে সূচিত করে।

প্রেমের অনুভূতিতে গোরার অতিপ্রভাব থেকে বিনয়ের মুক্তি পরবর্তী ঘটনা। কিন্তু জাগ্রত বুদ্ধির তাড়নায় জীবনের প্রচলিত ছক থেকে ললিতার মুক্তি-প্রয়াসের মধ্যে যে অস্বাভাবিক আবেগ বিদ্যমান তাকে স্বাভাবিক সুসমতায় স্বচ্ছন্দ করে তোলার জন্যই নদীর ভূমিকা অপরিহার্য ছিল। উপন্যাসের এই অংশটুকুকে নদীবক্ষ ছাড়া কল্পনাই করা যায় না। বিনয়ের জীবনের এই চূড়ান্ত মুহূর্ত তার মধ্যে যে দার্শনিকতাটুকু সৃষ্টি করল একমাত্র নদীর মধ্যেই তার প্রতিরূপ।—

—আজ একই রাত্রে বিনয় তাহার একদিকের শূন্যতা এবং আর একদিকের পূর্ণতাকে একসঙ্গে অনুভব করিয়া জীবনের সৃজন প্রলয়ের সন্ধিকালে স্তব্ধ হইয়া অন্ধকারের দিকে তাকাইয়া রহিল।

কিন্তু এই সন্ধিকালের সংশয়কে পরিহার করে বিনয় এবং ললিতা প্রভাত আলোক কম্পিত নদীকূলের ন্যায় এক নূতন অনুভূতির উপকূলে উপনীত হল। নদী সেই উপনয়নের উপযুক্ত সহায়।

—ইহার পরে দুইজনে আর কথা হইল না। শিশিরসিক্ত কাশবনের পর-প্রান্তে আসন্ন সূর্যোদয়ের স্বর্ণচ্ছটা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। ইহারা দুইজনে জীবনে এমন প্রভাত আর কোনোদিন দেখে নাই। আলোক তাহাদের এমন করিয়া কখনও স্পর্শ করে নাই। আকাশ যে শূন্য নহে, তাহা যে বিস্ময় নীরব আনন্দে সৃষ্টির দিকে অনিমেষ চাহিয়া আছে, তাহা ইহারা এই প্রথম জানিল। এই দুইজনের চিত্তের চেতনা এমন করিয়া জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে যে সমস্ত জগতের অন্তর্নিহিত চৈতন্যের সঙ্গে আজ যেন তাহাদের একেবারে গায়ে গায়ে ঠেকাঠেকি হইল।

বস্তুত ললিতার আচরণে আপাত অস্বাভাবিকতা সত্ত্বেও এই অংশে যা আমাদের অভিভূত করে তা হল সমস্ত ঘটনাংশটির নৈতিক তাৎপর্য। ব্রাউনলো সাহেবের ঘটনা এর সঙ্গে জড়িত না থাকলে ললিতার বিনয়ের সঙ্গে কলকাতা গমন এতটা লক্ষ্যভেদী হত না। এই নৈতিক তাৎপর্যকে অধিক ঘনীভূত করার কাজে নদী-প্রকৃতি একটি প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এইভাবেই একটা সার্থক উপন্যাসে লেখকের নৈতিক সচেতনতা রূপ বীজের পরিণতি ঘটে তার ঘটনা, ঘটনাংশ, চরিত্র, বর্ণনা, এবং ভাষার সহিত তুলনীয় শাখাপ্রশাখা পল্লব কুঁড়ি এবং ফুলে।

এইভাবেই যদি উপন্যাসের মূল বক্তব্যের সঙ্গে মিলিয়ে উপন্যাসের সর্বাংশের

বিচার করি তাহলে দেখা যাবে যে গোরা উপন্যাসের যেগুলি ত্রুটি বলে প্রতিভাত হয়েছে সেগুলি অংশত বিচারের ফলেই হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের দুর্বল উদ্ভাবনী শক্তি, অথবা 'জীবন রহস্যের যেটা প্রধান কথা বিস্ময়কর অতর্কিততা' গোরায় নেই এ-কথাগুলি সেই আংশিক বিচারেরই সাক্ষ্য দিচ্ছে। গোরার উপন্যাস-শিল্পের পরীক্ষায় দেখা যায় যে এ-ধরনের 'বিস্ময়কর অতর্কিততা' লেখকের শিল্প অন্বেষার অঙ্গীভূত নয়। বরঞ্চ বিস্ময়কর অতর্কিততায় যে নাটকীয়তার সম্ভাবনা রয়েছে লেখক তাকে বরাবর পরিহার করতে চেয়েছেন। যদি গোরার প্রধান ঘটনাংশগুলিকে অথবা পরিচ্ছেদগুলিকে নিরীক্ষণ করা যায় তাহলে দেখা যাবে যে উপন্যাসের কোনো অংশ থেকেই নাট্যরস নিষ্কাশনের চেষ্টা লেখক করেননি। যদিও এই উপন্যাসে একটা আশ্চর্য গতি আছে, যদিও কোথাও এ-উপন্যাস অতীত সূত্রসন্ধানে পশ্চাদনুসরণ করেনি, তথাপি গতির ফলস্বরূপে অনুভূত সেই আবেগের জন্য উপন্যাসের ঘটনাবলীতে কোথাও নাট্যরসসম্মত কৌশলের প্রয়োজন হয়নি—যে প্রয়োজন বঙ্কিমের উপন্যাসে ঘন ঘন হয়েছে। এ-প্রসঙ্গে গোরার জন্মবৃত্তান্তের কথা বলা যেতে পারে। এ নিয়ে একটা ভুয়ো নাটকীয় কৌতূহল রচনার প্রয়াস উপন্যাসের কোথাও নেই। উপন্যাস আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গেই পাঠক জানেন যে গোরা মেমসাহেবের সন্তান। কিন্তু তাতে উপন্যাসের আকর্ষণের কোনো হানি হচ্ছে না। কেননা উপন্যাসটা সত্যিই গোরার কাছে গোরার জন্মবৃত্তান্ত ফাঁস হয়ে যাওয়ার গল্প নয়। সমস্যাটা একটা যুগের। একটা দেশ বা জাতির চঞ্চল জীবনে যখন স্বীয় সত্তার নিগূঢ় প্রশ্নগুলিই নানা আকারে মূর্তি গ্রহণ করতে থাকে তখনকার প্রশ্নগুলিই এ-উপন্যাসের প্রধান কথা। গোরার প্রতি মুহূর্তই গোরার কাছে জিজ্ঞাসার নব নব চিহ্ন—সে জিজ্ঞাসা তার নিজেরই কাছে। এই প্রতি মুহূর্ত পেরিয়ে নিজের জন্মবৃত্তান্তের মুখোমুখি হয়ে তবে সে পরম উত্তরের কাছে উপনীত হয়। এখানে উপন্যাসের ছকে বিস্ময়কর অতর্কিততার কোনো স্থান নেই। উদ্ভাবনী শক্তিরও কোনো ভূমিকা নেই।*

---

* রবীন্দ্রনাথের উদ্ভাবন শক্তিতে দৌর্বল্য রয়েছে গোরা থেকেই এ-উদাহরণ আরো দেওয়া যায়। যেমন উপন্যাসে পানীয় জলেব ভূমিকার কথা বলা যায়। লছমির হাতের জল, রামদীনের দুধের জল এবং চরঘোষপুরের পুকুরের জলের কথা বলা চলে—কিন্তু বস্তুত এ-জাতীয় উপন্যাসে উদ্ভাবন নৈপুণ্যের ভূমিকাই অকিঞ্চিৎকর।

আর এই প্রসঙ্গ (গোরার জন্মবৃত্তান্ত নিয়ে লেখক অযথা কোনো কৌতূহল রচনা করতে চাননি) স্মরণে রাখলে আনন্দময়ীর সমুদয় ব্যবহারের একটা উপযুক্ত ব্যাখ্যা পাওয়া সম্ভব, নচেৎ তাঁকে পিঙ্গল এবং রক্তহীন বলেই মনে হবে।* আনন্দময়ী এবং পল্লীসমাজের বিশ্বেশ্বরীর প্রতিতুলনায় বিশ্বেশ্বরীকেই বরং সেই জাতীয় আদর্শ জীব বলে মনে হয় যাঁরা পিঙ্গল এবং রক্তহীন। কেননা বিশ্বেশ্বরীর আদর্শীভূত মূর্তির কোনো বাস্তব ভিত্তিভূমি নেই, কিন্তু আনন্দময়ীর মুখ থেকে উপন্যাসের ৪৪ পৃষ্ঠায় গোরার জন্মবৃত্তান্ত শোনবার পর আনন্দময়ীর সমস্ত আচরণের এবং উক্তি-প্রত্যুক্তির একটা মানে খুঁজে পাওয়া যায়। তাঁর কথাগুলোকে কেবল কোনো আদর্শ চরিত্রের মুখ-নিঃসৃত বাণী বলে মনে হয় না। মনে হয় জীবনের এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা থেকে এর জন্ম। ঠিক তেমনি পরেশবাবুর প্রহেলিকাকে আর প্রহেলিকা বলে মনে হবে না যদি পরেশ-ব্যবুর নিঃসঙ্গতার বিষয়ে আমরা অবহিত থাকি। সুচরিতা, ললিতা এবং শেষ পর্যন্ত পরিজনবর্গ-পরিবৃত এই ব্যক্তিটির একাকীত্ব সাধারণ স্তরের নয় বলেই এই ব্যক্তিত্বের বিপুল যন্ত্রণার সূক্ষ্ম কম্পন সহজে ধরা পড়ে না। তাই সুচরিতাকে 'ললিতা আমার ঘর থেকে একেবারে বিদায় নিয়ে এসেছে' এ-কথা বলতে গিয়ে 'পরেশবাবুর কণ্ঠস্বর কম্পিত হইয়া যায়' অথবা আনন্দময়ীর কাছ থেকে ললিতা সম্বন্ধে আশ্বাস পাবার পর 'ললিতার বিবাহের আন্দোলন আরম্ভ হইবার পর হইতে এই প্রথম পরেশবাবুব চিত্ত সংসারের মধ্যে এক জায়গায় একটা কূল দেখিতে পাইল এবং যথার্থ সান্ত্বনা লাভ করিল' এই সমস্ত অংশ আমাদের অগোচর থেকে যায়। অগোচর থেকে যায় এই সাধারণ তথ্যটি যে গোরার সমস্ত অস্থিরতার পটভূমিতে পরেশবাবুর শান্তদৃঢ়তা উপন্যাসের ছকে একটা সুসমতা আনয়ন করেছে। হয়তো পরেশবাবুর সঙ্গে বরদাসুন্দরীর দাম্পত্য জীবনে যে অসঙ্গতি তার দিকে অধিকতর আলোকসম্পাত করলে পরেশবাবুর নিঃসঙ্গতাকে আরো বাস্তব করে তোলা যেত এমন ধরনের একটা অভিযোগ তোলা যায়। এবং এও হয়তো বলা যায় যে কৃষ্ণদয়াল এবং আনন্দময়ীর মধ্যে গোরাজনিত ব্যবধানকে যতটা প্রত্যক্ষ করানো হয়েছে বরদাসুন্দরী এবং পরেশ-বাবুর সম্পর্ককে ততটা প্রত্যক্ষ না করানোর ফলেই পরেশবাবুকে শুধুই আদর্শ-

* সে ভাবে না দেখলে রবীন্দ্রনাথেব আলোচিত বিদ্যাসাগর জননী ভগবতীদেবীকে পিঙ্গল বলে মনে হয়। কিন্তু তা যে হয় না, তার কারণ সে চরিত্র বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গেই সত্য। আনন্দময়ীও তাই।

সিদ্ধ পুরুষ বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু পূর্বেই বলা হয়েছে যে সর্বপ্রকার নাটক পরিহার রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য, এবং মহাকাব্যোচিত উপন্যাসের আংশিক যাথার্থ্যের আতিশয্য অপেক্ষা টোটালিটির বা সামগ্রিকের অনুভূতি সৃজনই বড়ো কথা। পরেশবাবু এবং বরদাসুন্দরীর পরস্পর সম্পর্কে লেখকের শৈথিল্য এই সামগ্রিকতার অনুভূতি সৃজনে প্রতিবন্ধক হয়নি এটাই বড়ো কথা।

কেননা এ-আলোচনায় দেখা যায় যে উপন্যাসে পরেশবাবুর ভূমিকা আনন্দময়ীর মতো প্রত্যক্ষ নয়। ললিতা বা সুচরিতা-নিরপেক্ষ ভূমিকা পরেশবাবুর নেই যেমন আনন্দময়ীর আছে। সম্ভবত সে কারণেই পরেশবাবু এবং আনন্দময়ীর একত্র বিচার সঙ্গত হবে না।

আসলে গোরার যন্ত্রণাই এই উপন্যাসের সমুদয় ঘটনার জনক। গোরার চরিত্রে এবং আচরণে সে যন্ত্রণার নৈতিক রূপ সুস্পষ্ট। তাই গোরার তার্কিকতা গোরা থেকে বিশ্লিষ্ট কোনো ব্যাপার নয়। তার অনন্য-সাধারণ দৈর্ঘ্য, ঝড়ের গতিতে হাঁটা, বাঘের থাবার মতো পাঞ্জা, চওড়া হাড়, টেবিলে ঘুষি-মারা এবং তার্কিকতা তার চরিত্রেরই বিভিন্ন রূপ। তেমনি এই উপন্যাসের সময়কালের পরিসর স্বল্পতায় অথচ গতির উত্তেজনায়, ভাষার ঘনবদ্ধ রূপে, চিত্রকল্পে এবং ঘটনাংশ নিয়ন্ত্রণের কৌশলে, যে-কল্পনায় গোরা বিধৃত সে কল্পনারই নানা প্রকাশ ঘটেছে।

এবং এইভাবেই একটা উপন্যাসের শিল্পকর্মের সঙ্গে সেই উপন্যাসের নৈতিক সচেতনতার প্রশ্ন অঙ্গাঙ্গীভাবে বিজড়িত থাকে। আবার এইভাবেই গোরা উপন্যাসের গঠন বৈশিষ্ট্যের আর একটি দিকের ব্যাখ্যা সম্ভব। আপাত বিচারে দেখা যায় যে এই উপন্যাসে আশ্চর্য সব বৈপরীত্যের সমাবেশ। বুদ্ধিমান পাঠক দেখে থাকেন এদিকে কৃষ্ণদয়ালবাবু, ওদিকে পরেশবাবু, এদিকে আনন্দময়ী, ওদিকে বরদাসুন্দরী। গোরা এবং পানুবাবু। ললিতা এবং সুচরিতা। আবার আনন্দময়ীর স্বামী কৃষ্ণদয়ালবাবুতে যে বৈপরীত্য, পরেশবাবুর স্ত্রী বরদাসুন্দরীতে ঠিক ততখানি বৈপরীত্য। গোরায় প্রচণ্ড আবেগের প্রচণ্ড অভিব্যক্তি, সুচরিতায় শান্ত সমাহিত ভাব। বিনয় স্থিরবুদ্ধি, ললিতা চঞ্চল এবং আবেগপ্রবণ। স্বভাবতই এ-ব্যাপার অল্প ক্ষমতাসম্পন্ন কারো হাতে ঘটলে সীমাবদ্ধ কল্পনায় সমস্তটা হয়ে দাঁড়াত যান্ত্রিক পরিকল্পনা। এখানে অন্যপক্ষে, ধরিয়ে না দিলে এই বিপুল বৈপরীত্যের সমাবেশ দৃষ্টিপথে আসে না। পরেশ-বাবুকে পৃথকভাবে পিঙ্গল, রক্তহীন যদি বা বলা চলে—এই পুরো কাঠামোর

মধ্যে তাঁর স্থান সেই কারণে সম্পূর্ণ শোভন এবং সঙ্গত। রসিক পাঠক তাঁর অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে ন্যায্যতই বলেন, যে, গোরার সমস্যার বিস্তৃত গভীরতা গোটা উপন্যাসে সেই শক্তি, যার ফলে পটের বিশালতার বোধ পাঠকের মনে সদা জাগরূক থাকে। এই বিশালতাবোধের জন্য এই বৈপরীত্যেই মনে হয় সুসমতা এবং ভারসাম্য।

গোরা আলোচনার উপসংহারে গোরার উত্তরণের বিষয়ে কিছু আলোচনা অবশ্য কর্তব্য। গোরা সুচরিতার হাত ধরে পরেশবাবুর কাছে গিয়ে শরণ নিল। তার বক্তব্য এই যে পরেশবাবুর কাছেই সেই মুক্তির মন্ত্র আছে। পরেশবাবুর নির্ভীক সত্যনির্ভরতায় একদিক থেকে পরেশবাবুরও মুক্তি ঘটেছে। বরদাসুন্দরীর কলকাতা ত্যাগ এবং ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে পরেশবাবুর সম্পর্কচ্ছেদ সেই মুক্তির পূর্ণরূপ। গোরার প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বের সঙ্গে কারাবরণের সংবাদ শুনে ব্রাউনলো সাহেবের কুঠির নাটকের পূর্বেই বিনয়ের এবং ললিতার কলকাতা আগমনে যে আলোড়ন সৃজিত হল তা পরেশবাবুকেও নানাভাবে স্পর্শ করেছে। গোরা সেই বিমুক্ত সত্তাটির উদ্দেশেই প্রণাম জানিয়েছে। অবশ্য পরিমাপের দিক থেকে ছোট কিন্তু ব্যঞ্জনায় বলিষ্ঠ অথচ তাৎপর্যপূর্ণ এমন একটি চরিত্রের দেখা গোরা চরঘোষপুরে পেয়েছিল, যে তার কাছে অবিস্মরণীয় থাকা উচিত ছিল। সেই সাধারণ মানুষটিও জানে হিন্দুর হরি এবং মুসলমানের আল্লা সমান। সে তার অসামান্য লৌকিক বুদ্ধির সাহায্যেই এই পরম মানবিক উপলব্ধিতে পৌঁচেছিল এবং মুসলমানের ছেলেকে অস্পৃশ্যতার দোহাই দিয়ে দূরে ঠেলে দেয়নি। সে অবশ্য ভারতবর্ষের দেবতাকে সন্ধান করেনি। সন্ধান করেছে স্বগ্রামের মানুষকে। কিন্তু গোরার জীবনে, এক মুহূর্তের জন্য হলেও, সে পরিণামগর্ভ সাক্ষাতের ফলেই গোরার কারাবরণের ব্যাপার পর্যন্ত ঘটেছে। অথচ গোরা কারাগার থেকে বেরিয়ে আসার পরে প্রায়শ্চিত্তের চিন্তার মুহূর্তে অথবা পরেও এ-প্রমাণ একবারও দিল না যে সেই চরঘোষপুরের অধ্যায় তাকে কোনো বৃহত্তর জিজ্ঞাসায় নিয়ে গেল কিনা।

গোরার যাত্রা শেষ পর্যন্ত ভারতবর্ষের দেবতার সন্ধানে—গোরাকে আমরা ভালবাসি বলে এ-কথাটা স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হই। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য এ-ব্যাখ্যা দিতেই পারেন যে সে-দেবতা মানুষের মধ্যেই। কেননা পরেশবাবুর কোনো সমাজে স্থান নেই এ-কথার মানে হচ্ছে সকল দেবালয়ের দ্বার বন্ধ যখন, তখন মানুষের মাঝেই তাকে সন্ধান করতে হবে। হয়তো লছমির হাতে জল খেতে

চাওয়ায় তারই ইঙ্গিত। এমনও হতে পারে যে সে ইঙ্গিতকে আমরা স্বীয় কল্পনার সাহায্যে বড়ো করে তুলছি মাত্র—কিন্তু সেটাও কি গোরা আমাদের ভালবাসাকে কতখানি আকর্ষণ করেছে তার প্রমাণ নয়?

•• ছয় ••

গোরার দেশ-সন্ধানের যে স্পষ্ট ভূমিকা উপন্যাসে উপস্থিত তারই একটা অন্যরূপ ঘরে বাইরে উপন্যাসের সমস্যা। ঘরে বাইরে রবীন্দ্রনাথের নিরীক্ষাশীল উপন্যাসগুলির অন্যতম এবং এই নিরীক্ষার ব্যর্থতার কথাও সুবিদিত। ঘরে বাইরে উপন্যাসের কবিত্বের আতিশয্য অথবা সন্দীপ চরিত্রের প্রতি রবীন্দ্রনাথের অন্যায় ব্যবহার—এই প্রকার নানা কিছুকে ঘরে বাইরের ব্যর্থতার কারণরূপে অভিহিত করা হয়। কিন্তু আমবা পুর্বে বলেছি যে ব্যক্তিত্বের সমস্যা রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের প্রধান আকর্ষণ। বাইরেব দিক থেকে এই সমস্যাকে বিচার করতে যাওয়া এক রকম নিরর্থক। বিমলা নিখিলেশের স্বাধীন ব্যক্তিসত্তাটিকে স্বাধীন ব্যক্তি হিসেবে উপলব্ধি করুক, নিখিলেশের এই ছিল অভিপ্রায়। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের উদ্দীপ্ত আলোকে উদ্ভাসিত নিখিলেশ সমাজ শৃঙ্খলমুক্ত বিমলাব কাছে নিজেকে যাচাই করতে চেয়েছে। স্বভাবতই এই পবীক্ষায় অভিনবত্ব বিদ্যমান। কিন্তু পরীক্ষাব সূচনাতেই আমরা দেখি যে বিমলা নিখিলেশের গভীরতা অপেক্ষা সন্দীপের ফেনিলতাতে যখনই আসক্তির লক্ষণ প্রকাশ কবেছে, তখনই নিখিলেশের আর্ত হাহাকার কাব্যময় ভাষায় প্রকাশিত হতে শুরু করেছে। নিখিলেশের পরীক্ষার দুঃসাহসকে অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু যে বাস্তব-নিষ্ঠ পরিপূরক অবস্থার সৃষ্টি করতে পাবলে এই হাহাকাব পরাজয়মুখী পুরুষকারের হাহাকারে পরিণত হতে পাবত ঘরে বাইরে উপন্যাসে তার একান্ত অভাব।

এই ত্রুটির মূল খুঁজতে হবে প্রধানত সন্দীপ চবিত্রে। সন্দীপের কোনো ব্যাপারই আমাদের কাছে স্বচ্ছ নয। সন্দীপের চরিত্রের লোভার্ত স্থূলতার ব্যাখ্যা কোথায় সন্ধান করব আমবা? রবীন্দ্রনাথ তথা নিখিলেশের সন্দীপের সমালোচনাটি কোথায় প্রযোজ্য তা বোঝাও মুশ্‌কিল। সন্দীপেব রাজনীতি তার চবিত্রের ফলে বিকৃত, না তার চরিত্র তার রাজনীতির বিকারের পরিণতি? যদি এমন হয় যে সন্দীপের রাজনৈতিক মত্ততা লেখকের মতে তার চরিত্রেরই নগ্ন লোভা-তুরতার পরিণাম তাহলে বইখানি হয়ে ওঠে প্রতিনায়ক বনাম নায়কের দ্বন্দ্ব-

স্বটিক্ত কাহিনী। আব যদি এমন হয় সন্দীপের স্থূলতা এমন একটা অভ্যাস, ভ্রান্ত রাজনৈতিক আদর্শ পালনের জন্যই যা দেখা দিয়েছে তাহলে যেমনই হোক আদর্শের একটা বোধ সন্দীপে উপস্থিত থাকতই। সে ক্ষেত্রে শিল্পরূপের অন্ত পবিণতি আমবা লাভ কবতাম। ববীন্দ্রনাথ সে জায়গায় দু-ভাবে সন্দীপকে দুর্বল করেছেন। সন্দীপের রাজনীতি ভ্রান্ত। সন্দীপেব চবিত্রে স্থূলতা। এ-অবস্থায় উপন্যাসের ঈপ্সিত যন্ত্রণা সৃষ্টি কবা দুরূহ। এখানে "বাল্মীকিব দোহাই" অপ্রাসঙ্গিক।

এমন যদি হত একটা বলিষ্ঠ চবিত্রেব ব্যক্তি একটা ভ্রান্ত বাজনীতির শিকার হয়েছে, তাহলে উপন্যাসে সন্দীপকে নিরীক্ষার যন্ত্র, বিমলাকে নিবীক্ষাশালাব গিনিপিগ এবং নিখিলেশকে বিভ্রান্ত বৈজ্ঞানিকেব বেশে আমাদের দেখতে হত না। নিখিলেশেব সন্দীপেব ঘোষিত বাজনীতি সম্বন্ধে বিমুখতাকে ঈর্ষা মনে হত না। বিমলাকেও শেষ পযন্ত টাকাব থলিব প্রসঙ্গে সব বুঝতে হত না। এবং রবীন্দ্রনাথের নাটকের স্বভাবানুযায়ী নায়কেব আত্মদানে জটিলতাব মীমাংসাসাধনও প্রয়োজন হত না।

●● সাত ●●

চতুবঙ্গ ঘবে বাইবেব আগে বচিত। চতুবঙ্গেব প্রাবম্ভে ববীন্দ্রনাথ বলেছেন—"এই বইখানির নাম চতুবঙ্গ। জ্যাঠামশাই শচীশ দামিনী ও শ্রীবিলাস ইহার চাবি অংশ।" কিন্তু বইখানিব এই চাবি অংশেব জন্যই একে চতুরঙ্গ নাম দিয়েছেন ববীন্দ্রনাথ এ-কথা মেনে নিলে বইটিব প্রতি সুবিচাব কবা হয় না। বরঞ্চ নায়ক-নায়িকাব জীবনেব দিকে তাকালে চতুবঙ্গ আখ্যাব তাৎপর্য বোঝা যায়। এবং সেদিক দিয়ে জগমোহন সম্বন্ধে শ্রীকুমাববাবুব যে অভিযোগ একটা—জগমোহন অংশ অনাবশ্যক দীর্ঘ—তাব উত্তবও মেলে। বইখানিব প্রধান পাত্র-পাত্রী শচীশ ও দামিনী। শচীশেব জীবনেব সুস্পষ্ট চারটি পযায়। জ্যাঠামশাই, লীলানন্দ, দামিনী এবং সর্বোত্তীর্ণ অবস্থা। দামিনীব জীবনেও অনুরূপ চাবটি ভাগ বা পর্যায়—গুরু লীলানন্দ, গুরু বিদ্রোহ, শচীশ এবং শ্রীবিলাস। চতুবঙ্গ নাম এই দিক দিয়ে সার্থক।

এই উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথেব শিল্প কৌশলেব বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। ঘটনার মুখাপেক্ষী ববীন্দ্রনাথ কোনো দিনই নন। তবু অন্যান্য উপন্যাসে ঘটনার একটা স্বাভাবিক গতিকে তিনি বজায় রেখেছেন। ঘটনার মূল প্রবাহকে ক্ষুণ্ণ কবার

দরকার সে সব ক্ষেত্রে তাঁর হয়নি। এ-উপন্যাসে দেখা যায় যে ঘটনা-প্রবাহকে একেবারেই রবীন্দ্রনাথ প্রশ্রয় দেননি। চতুরঙ্গের উদ্দেশ্য উপলব্ধি করলে এর কারণ কিছুটা অনুমান করা চলে। চতুরঙ্গের প্রধান পাত্র-পাত্রী শচীশ ও দামিনীর জীবনের বিভিন্ন ছকে ঘুরছে। প্রতি ছকের ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়ার ধাক্কায় ছকগুলোই একটা একটা করে ভেঙেছে। এই ভাঙার ক্রিয়া রবীন্দ্রনাথ অতি নিপুণভাবে বর্ণনা করেছেন এবং বিশ্লেষণ করেছেন। ছকগুলো গড়ে উঠেছে কেমন করে এটা রবীন্দ্রনাথ ব্যাখ্যা করেননি। জগমোহনের মৃত্যুর পর লীলানন্দ স্বামীর কাছে শচীশ কী ভাবে উপনীত হল, কী ভাবে সে আবিষ্ট হয়ে পড়ল রসকীর্তনে তার কোনো ব্যাখ্যা আপাতদৃষ্টিতে উপন্যাসে দেওয়া হয়নি। মধ্যবর্তী স্তরটিকে লেখক সম্পূর্ণ লঙ্ঘন করে, উপেক্ষা করে এগিয়ে গেছেন। আবার শচীশের ফের মতেব বদল হওয়া ব্যাপারটা পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ কবা হয়নি। ফেব মতের বদল হইয়াছে—এই মন্তব্যেই এ-প্রসঙ্গ শেষ করেছেন। বাস্তবিক পক্ষে এই মধ্যবর্তী স্তরগুলি এই উপন্যাসে ততটা প্রয়োজনীয় নয়, যতটা প্রয়োজনীয় একটা ছক থেকে আর একটা ছকে উপনীত হয়ে যে ভিন্ন ভিন্ন প্রতিক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পাত্রপাত্রীদের মথিত করেছে তাকে রূপায়িত করা। সে দিক থেকে অস্তিত্বের ভিন্নমুখী সমস্যার টানাপোড়েনে শচীশ ও দামিনী কীভাবে জ্বলেছে এবং নিভেছে সেটাই এ-উপন্যাসে বড়ো কথা। মধ্যবর্তী স্তরগুলোকে উপেক্ষা কবার জন্যই এ-উপন্যাসকে আংশিকতা দুষ্ট বলে কাবো কাবো কাছে মনে হয়েছে।

এই ভুল ধারণা থেকেই জগমোহন অধ্যায়কে ভুল বোঝা হয়। জগমোহন যে উপন্যাসে একটা দীর্ঘ স্থান অধিকার করে রয়েছে সেটা শুধু শচীশের ওপর তার প্রভাব প্রদর্শনের জন্য নয়। প্রকৃতপক্ষে চতুরঙ্গেব চারতলার জগমোহনই হচ্ছে ভিত্তিভূমি। এই ভিত্তিভূমিটিকে শক্ত না করলে উপন্যাসের চারতলা বাড়িটি তাসের প্রাসাদের মতো গুঁড়িয়ে যেত। জগমোহন আখ্যায়িকা এই কথা বোঝায় যে উপন্যাসের কাঠামো সম্বন্ধে, সংস্থান-কৌশল সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের জ্ঞান কত গভীর ছিল। প্রকৃত পক্ষে জগমোহনেই উপন্যাসের সমস্যার আরম্ভ। জগমোহনের নীরস নাস্তিক্য বুদ্ধির মধ্যে যে মানুষের সমস্ত শৈশব কৈশোর যৌবনের প্রথমাংশ অতিবাহিত সে সেখান থেকে কী আহরণ করল এটা লক্ষণীয়। নীরস বুদ্ধিচর্চায় জীবনের খাত পূর্ণ হতে পারে না—এবং জীবন যে ছকে-ফেলা ব্যাপার নয় জ্যাঠামশাই জগমোহন অধ্যায়ে সেটা পরিস্ফুট। জগৎসংসার

যে সত্যি নিউটনের গাণিতিক নিয়মে চলে না, সেটা যে শুধু মিল্ বেন্থামের তত্ত্ব পরীক্ষার ল্যাবরেটারি নয়, এটা এই অধ্যায়ে স্পষ্ট। অসহায়া আশ্রিতা ননীকে সামাজিক মঙ্গলের নিমিত্ত বিয়ে কবতে চাইলেই যে তাকে বিয়ে করা যায় না , এবং মানুষের মন যে যুক্তি পবম্পরাকে অনুসরণ করেই সর্বত্র চলে না সেটা ননীর আত্মহত্যা এবং শেষ চিঠিতে পরিস্ফুট। নীরস বুদ্ধিচর্চার ভাঙন আরও কোন্ কোন্ দিক থেকে আসে শচীশের সঙ্গে জগমোহনেব বিচ্ছেদে এবং ননীকে জগমোহনের আশীর্বাদ করতে চাওয়ায় তা পরিস্ফুট হয়েছে। এ-প্রসঙ্গে জগমোহনেব উক্তি, জগমোহনের তৈরি করা ছকের ভাঙন কোনদিক থেকে আসছে তার ইঙ্গিতবহ :

> মা, আমি স্পষ্টই দেখিতেছি বুড়োবয়সে তুমি এই নাস্তিককে আস্তিক করিযা তুলিবে। আমি আশীর্বাদে সিকি পযসা বিশ্বাস করি না, কিন্তু তোমার ওই মুখখানি দেখিলে আমার আশীর্বাদ করিতে ইচ্ছা করে।

জগমোহন যে নিজের খণ্ডিত অস্তিত্বকে উপলব্ধি করতে শুরু কবেছিলেন এই উক্তি তাবই ইঙ্গিত। ননীর মৃত্যু জগমোহন এবং শচীশ উভয়ের কাছে তাদের তৎকালীন জীবনধাবাব ভয়াবহ আংশিকতাকে স্পষ্ট কবে তুললো। জগমোহনও যে এদিক থেকে হরিমোহনের উল্টোপিঠ এটাও এখানে পরিস্ফুট। জগমোহনেব মৃত্যুটা বাইবের ঘটনা। স্বভাবতই এব জন্য রবীন্দ্রনাথেব কোনো মাথা-ব্যথা নেই। ননীব মৃত্যুব সঙ্গে সঙ্গে জগমোহনেব ছক ভেঙে পডেছে। এর পবেব অধ্যায়ে আমবা শচীশকে দেখছি লীলানন্দ স্বামীব শিষ্যরূপে। নাস্তিক শচীশ পুবোদস্তব গুরুবাদী। কীর্তনানন্দে মাতোয়ারা। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে জগমোহনের ছক ভেঙে পডার প্রতিক্রিয়াতেই শচীশের লীলানন্দ অধ্যায়ের জন্ম। এই প্রতিক্রিয়াকে সবেজমিনে দেখানো হয়নি। শ্রীবিলাসের মতো আমরাও হঠাৎ খবব পেয়েছি যে শচীশ পৌছে গিয়েছে সম্পূর্ণ বিপরীত এক ছকে। মরুবালু থেকে সুধাশ্যামলিম কূলে পৌছনোর স্তর পর্যাযের পরম্পরা আমরা জানি না। বাস্তবিকপক্ষে এ-উপন্যাসের পক্ষে জানাটা খুব প্রয়োজনীয়ও নয়। লীলানন্দ স্বামীর কীর্তন বাসরের অধ্যাত্মরসের স্রোতও অচিরে শচীশের কাছে তার ভগ্নাংশ স্বরূপ নিয়ে প্রকট হল। এ ছকও দেখা গেল শচীশের মনের মধ্যে ভেঙে গেল। মনের মধ্যে ভেঙে যাওয়াটাই আসল কথা এখানে। কেননা ছকগুলোর অস্তিত্বও প্রকৃতপক্ষে মনেব মধ্যেই।

শচীশের পক্ষে এই দ্বিতীয় পর্যায় সর্বাপেক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথম অধ্যায়ে ননী

যেমন শচীশের কাছে প্রচুরতম লোকের প্রভূততম উপকারসাধনের একটা সংখ্যা-মাত্র—দামিনীও তেমনি লীলানন্দের মাতোয়ারা অসংখ্য জীবকুলের একটি জীব মাত্র—শচীশ প্রথমটা এই রকম মনে করতে চেয়েছিল কিন্তু দামিনী ননী নয় বলেই সে ভবিতব্যের কাছে আত্মসমর্পণ করতে চায়নি। সে যে আশ্রমবন্দী হয়েছিল এটা প্রকৃত পক্ষে তার বিবাহিত জীবনেরই জের। আশ্রমের ছককে যখন দামিনী ক্রমশই ভাঙতে লাগল তখন দামিনীর নিজস্ব চেহারা ক্রমশই ফুটে উঠতে লাগল শচীশের কাছে। শচীশও ননীবালা এবং দামিনীর প্রতিতুলনা করেছিল। এ-সম্বন্ধে তার দিনলিপির খাতায় সে লিখে রেখেছিল—

> ননীবালার মধ্যে আমি নারীর এক বিশ্বরূপ দেখিয়াছি···যে নারী মরিয়া জীবনের সুধাপাত্র পূর্ণতর করিল। দামিনীর মধ্যে নারীর আর এক বিশ্বরূপ দেখিয়াছি। সে নারী মৃত্যুর কেহ নয়, সে জীবন রসের রসিক··· সে সন্ন্যাসীকে ঘরে স্থান দিতে নারাজ, সে উত্তুরে হাওয়াকে সিকি-পয়সা খাজনা দিবে না পণ করিয়া বসিয়াছে।

দামিনীর এই মর্ত্য-বসন্তেব ধাক্কায় রসের স্বর্গলোকের লীলানন্দী ছক ভাঙতে লাগল শচীশের মনে। রূপের সঙ্গে রূপকের ঠোকাঠুকিতে রূপকের পাত্রটাই যে কাত হয়ে পড়েছে এ-কথাও স্পষ্ট হতে লাগল। শচীশ যে মুহূর্তে দামিনীকে দূরে সরিয়ে রেখে সাধনাকে বিপদমুক্ত করতে চেয়েছে সে মুহূর্তেই শচীশ দ্বিতীয় ছকের ভগ্নাংশস্বরূপকে উপলব্ধি করতে শুরু করেছে। এব পর নবীনের স্ত্রী—দামিনীর মতো সেও আশ্রমবাসিনী—বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করল। নবীনের স্ত্রীর আত্মহত্যা প্রচলিত দৃষ্টিতে একটি ঘটনা। রবীন্দ্রনাথ সে ঘটনার সুযোগ নিলে অবশ্যই উপন্যাসের দিক থেকে ত্রুটি বলে পরিগণিত হত। কিন্তু এ ঘটনাও জগমোহনের মৃত্যুব মতো বাইরের একটা ধাক্কা মাত্র। শচীশের মনে দামিনী তখন আশ্রমের ছক অনেক পূর্বেই মুছে দিয়েছে। এবং এই মুছে দেওয়ার ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ কোনো বিশ্লেষণ বাদ দেননি। প্রত্যেকটি স্তরকে সযত্নে পার হয়েছেন লেখক। গুহার ঘটনাব পর থেকে নবীনের স্ত্রীর আত্মহত্যা পর্যন্ত এই ছকের ভাঙন সর্বতোভাবে রবীন্দ্রনাথ ব্যাখ্যা করেছেন। কাজেই নবীনের স্ত্রীর আত্মহত্যার পর দামিনীর শচীশের কাছে আত্মনিবেদনের উচ্ছ্বাস সঙ্গত। এই উচ্ছ্বাসময় আত্মনিবেদনের জবাবে শচীশ বলেছিল—তাই হবে। সংক্ষেপে এর পর পুনরায় শচীশের মত পরিবর্তন হয়ে গেছে এটা আমাদের জানানো হল। বলা বাহুল্য মত পরিবর্তনের হেতু বলা হয়েছে।

এই পর্যায়ে তবে এ-অংশ আকস্মিকতা-দুষ্ট বলে মনে হত। আমাদের অনুভূতি ও চেতনা কোনো ভাবে শচীশ-দামিনীর জীবন সম্বন্ধে বিস্তৃতি লাভ কবত না। সে হিসেবে এই বিস্তৃতি লাভের ক্ষেত্র সারা উপন্যাসে প্রস্তুত ছিল বলে এটা অপ্রত্যাশিত নয়। চতুরঙ্গের এই শেষ অঙ্কের আবেগের জন্য আগের তিন অঙ্কেব প্রস্তুতি ছিল বলেই এই সমস্তের সাহায্যে রবীন্দ্রনাথ যে বৃত্তটি সম্পূর্ণ করতে চাইছিলেন তাও নিটোলভাবে পূর্ণ হল। নবীনের স্ত্রীর মৃত্যুর পরে শচীশের পায়ের কাছে দামিনীর আত্মনিবেদন ও মুক্তি প্রার্থনায় (আমাকে এমন কিছু মন্ত্র দাও যা এ-সমস্তের চেয়ে অনেক উপরের বড়ো জিনিস—যাহাতে আমি বাঁচিয়া যাইতে পারি।) শচীশ বলেছিল—তাই হইবে। তারপর শচীশ যখন বিস্তৃত বেদনাকে বক্ষে ধারণ করে অনুভব করল এ-বাঁধনও খোলা দরকার তখন সে নিজে মুক্তি প্রার্থনা করল দামিনীর কাছে—যাঁকে আমি খুঁজিতেছি তাঁকে আমার বড়ো দরকার—আর কিছুতেই আমার দরকার নাই। দামিনী তুমি তুমি আমাকে দয়া করো, তুমি ত্যাগ করিয়া যাও। দামিনী বলল—তাই আমি যাইব। শচীশের 'তাই হইবে' থেকে দামিনীব 'তাই আমি যাইব', এই সিদ্ধান্ত পর্যন্ত সেই নিটোল বৃত্তের আশ্চর্য অঙ্কন। এই বৃত্তের এক অর্ধাংশ লীলানন্দ স্বামীর অধ্যায়ে, দ্বিতীয় অর্ধাংশ দামিনীর সেবায়। জগমোহনে এবং লীলানন্দে মিলে দুই অর্ধে তৈরি হয়েছিল আর এক বৃত্ত। দুই বৃত্তের চারি অর্ধেও চতুরঙ্গের চারি অংশ।

উপন্যাসটির প্রধান ত্রুটি দামিনীর মৃত্যু-ঘটিত উপসংহার। শচীশ নিজ জীবনের মধ্যে যে প্রশ্ন জাগিয়েছে সে প্রশ্নের উত্তর শচীশের কাছে আছে কিনা আমরা জানি না। জানা আমাদের পক্ষে খুব প্রয়োজনীয় নয়। শচীশের যন্ত্রণা আমাদের কাছে প্রত্যয়গ্রাহ্য হয়েছে কিনা এটাই প্রশ্ন। বলা বাহুল্য উপন্যাসটি প্রধানত শচীশের সমস্যা বলেই, শুধু শচীশ-দামিনীর সমস্যা নয় বলেই রবীন্দ্রনাথ শচীশের পরীক্ষাটিকে সম্পূর্ণ করার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছিলেন। সেই কারণে শচীশের শেষ রূপান্তরের পর রবীন্দ্রনাথ মনে করেছেন উপন্যাসের বক্তব্য শেষ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু শিল্পের নিজ নিয়মের টানে দামিনী তখনই সৃষ্টি করে বসেছে আর এক নতুন ছক। এই ছক হল শ্রীবিলাসের সঙ্গে বিবাহিত জীবনের ছক। এবং এই অধ্যায়েই দামিনীর মৃত্যুতে গল্পের পরিসমাপ্তি। অথচ এই বিবাহিত জীবনের নতুন ছকের ভিতরে দামিনীর পবীক্ষা তখনও বাকি। শিবতোষবাবুর সঙ্গে, দাম্পত্য জীবনে, সে কোনো দিন নিজের অন্বয় ঘটাতে পারেনি। তার সমস্ত জীবন ব্যাপারটি

এরই প্রতিক্রিয়ার ফল কি না সে-কথা উপন্যাসে নিঃসংশয়িত রূপে প্রমাণিত হয়নি। কাজেই শ্রীবিলাসের সঙ্গে তার বিবাহিত জীবনে শিবতোষের ভূমিকা নেই বলে তার সমস্ত জিজ্ঞাসা নিভে যায় কি না এটা একটা বড়ো প্রশ্ন। শচীশকে দামিনী কোনো বন্ধনে বাঁধতে পারবে না—এই অক্ষমতাটুকু উপলব্ধি করার পর সে শ্রীবিলাসকে বিয়ে করেছে। এই অংশে দামিনীর প্রশ্নকে যেন অকস্মাৎ মাঝ পথে ছেড়ে দেওয়া হল। কিংবা দামিনী হয়তো বুঝতে পারল যে শচীশকে সে ভালবাসে বলেই শচীশকে মুক্তি দেওয়া তার কর্তব্য। তাহলে তার মুক্তির স্বরূপটি কী? অথবা সে মুক্তিই চায়নি, বন্ধনই চেয়েছে, শুধু হয়তো বৃহত্তর বন্ধন? যে ভাবেই হোক দামিনীর মৃত্যু উপন্যাস সমাপ্তির ছেদচিহ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। দামিনীর স্বাধীন সত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়েই রবীন্দ্রনাথ তাকে ফিরিয়ে এনেছেন। বলা যায় শচীশ এবং দামিনী, এই দুই অরণি কাষ্ঠের সংঘর্ষে সে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়েছিল, যেন মনে হয় সাহসের অভাবে রবীন্দ্রনাথ তার একটিকে ফুৎকারে নিভিয়ে অগ্নিশিখাকে স্তিমিত করে আনলেন। অথচ দামিনী চরিত্রের এই উপসংহারের ত্রুটি দামিনীর উপস্থাপনায় বীজ আকারে ছিল না, এ-কথা ভাবলে ত্রুটিটা আরও বেশি প্রকট হয়।)

•• আট ••

যোগাযোগ সম্বন্ধে কিছুটা আলোচনা উপন্যাসের বিষয়বস্তু সংক্রান্ত আলোচনায় করেছি। এখন আমরা যোগাযোগ উপন্যাসের সংকট কোন্ রন্ধ্রপথে প্রবেশ করেছে সে প্রসঙ্গেই আলোচনাকে কেন্দ্রীভূত রাখবো। সাধারণত সকল সমালোচকই যোগাযোগ উপন্যাসের প্যাটার্ন সম্বন্ধে একমত। মধুসূদনের অধিকার চেতনা এবং কুমুর স্বাধীন সত্তার বিরোধ থেকেই যে এ-উপন্যাসের শিল্পগর্ভ টানাপোড়েনের জন্ম এ-কথা সমালোচকদের দৌলতে সুপরিজ্ঞাত। উপন্যাসটির কাঠামো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে বিলম্বিত লয়ে দীর্ঘ কালখণ্ডকে এই উপন্যাসে ব্যবহার করবার প্রতিশ্রুতি নিয়ে এই উপন্যাসের শুরু। উপন্যাসটি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথেব প্রথম নামকরণের মধ্যেও সে ইঙ্গিত সুস্পষ্ট ছিল। এবং সেই প্রসঙ্গে এ কথাও পরিষ্কার হয় যে নারী-পুরুষের সমানাধিকারবাদের প্রশ্নই এ-উপন্যাসের প্রধান প্রশ্ন নয়। আসলে আমরা যেমন পূর্বে বলেছি সমস্ত ব্যাপারটা দুটো পৃথক জীবনযাত্রার ব্যাপার। এবং এই পৃথক দুটি জীবনযাত্রাকে ঠিকমতো বিচার করতে গেলে দেশ-কালের প্রসঙ্গও স্বাভাবিক।

আমরা বলেছি যে আপাতত আমরা এই উপন্যাসের ত্রুটির প্রসঙ্গেই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখবো। দুই পৃথক জীবনযাত্রার প্রশ্ন আলোচনায়, সেই কারণে আমরা সর্ব প্রথমে এই উপন্যাসের প্রধান ত্রুটি যে চরিত্রের কল্পনাগত দৈন্য সেই মধুসূদন চরিত্রটির কথা আলোচনা করব। মধুসূদন সম্বন্ধে আমাদের অভিযোগ সংক্ষেপে ব্যক্ত করতে গেলে বলতে হয়—উপনিবেশের হাটের বণিক-আত্মা মধুসূদনের চরিত্রে যেমন পরিস্ফুট তার ব্যক্তিসত্তার নিজস্ব অভিজ্ঞান ততটা নয় অর্থাৎ সে টাইপ হিসাবে যতখানি সার্থক ইনডিভিজুয়াল হিসেবে সে ততখানি ব্যর্থ। যে আশ্চয নৈপুণ্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ মধুসূদনের বাড়ির অন্দরমহল ও বহির্মহলকে চিত্রিত করেছেন সেই দ্বন্দ্বকে মধুসূদনের জীবনে প্রতিফলিত করতে পারেননি। কুমুর সঙ্গে মধুসূদনের সম্পর্ক যেন মধুসূদনের মনের অন্দরমহলের ব্যাপার—যে মহলে ঘুঁটের চক্রে আচ্ছন্ন প্রাচীর, ক্রমাগত পাতা-কেড়ে-নেওয়া নিমগাছ, অন্ধকার স্যাঁৎসেতে ধোঁয়াব ঝুলে কালো ঘর, চুলোর ছাই, ভাঙা গামলা, ছিন্নধামা প্রভৃতির একত্র সমাবেশ। শুধু কুমুব ঘরখানি "কাঁথা গায়ে দেওয়া ভিখারীর মাথায় জরিজহবৎ দেওযা পাগড়ী।" সুতবাং এই যার অন্দরমহলের চেহারা সেই মধুসূদন অবশ্যই কোথাও না কোথাও একটা দ্বন্দ্ব সৃজন করবেই যে দ্বন্দ্ব ব্যতিরেকে মধুসূদন ত্রিমাত্রিক হতে পারে না। অথচ বণিকবৃত্তিসম্পন্ন মধুসূদনকে রুচিহীন এবং স্থূল কবে গড়ে তোলার জন্য রবীন্দ্রনাথ মধুসূদনের বাইবের চেহারাটাকেও পবিস্ফুট করে তুললেন না। যে দোর্দণ্ড প্রতাপের সাহায্যে সে তার অধিকারচেতনাকে সংগ্রহ কবেছে তাব কোনো পরিচয় না থাকায় সে হয়ে দাঁড়িয়েছে একটি মনোভাবের পুতুল। এমন কি নিপুণ ব্যবসায়ী হয়েও স্ত্রীর মনোরঞ্জনের জন্য যে স্থূল পদ্ধতি সে গ্রহণ করলো তাতে তার ব্যবসায়ের নৈপুণ্যের কথা জনশ্রুতিই থেকে গেল।

কুমু মধুসূদনের সংসাবে আসার পর থেকে মধুসূদনের চিত্তচাঞ্চল্য সে কারণে একটা অব্যাহত দ্বন্দ্বের পযায়ে উঠতে পারল না। ব্যবসাযী মধুসূদনের ছায়া অবশ্য মাঝে মাঝে পড়েছে। কিন্তু সে ছায়া কখনো শীর্ণ, কখনো দুর্বল। কুমুর সঙ্গে সংঘর্ষে মধুসূদন কখনো অতি সহজে নিজের সত্তার বণিক অংশকে প্রকাশিত করেছে, কখনো বা অতি সহজে এমন কথা বলেছে যে-কথা বলার ক্ষমতা মধুসূদনের কোথা থেকে অকস্মাৎ এল তা বোঝা যায় না। "এইখানেই আমি বসে রইলুম, যদি আমাকে ডাকো তবেই যাব, বৎসরের পর বৎসর অপেক্ষা করতে রাজি আছি।" এ-উক্তি যদিও রবীন্দ্রনাথের সমস্ত প্রেমের আখ্যানের পুরুষ

চরিত্রের মূল কথা, তথাপি এ-কথা মধুসূদনকে মানায় না। মনে হয় আরোপিত। কেননা অন্য ক্ষেত্রে নিখিলেশ, মহেন্দ্র, এরা যে ধরনের ব্যক্তি—মধুসূদন তা থেকে পৃথক। মধুসূদন ছাড়া রবীন্দ্রনাথের আর কোনো নায়কের বৈষয়িক দিক আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়। একমাত্র মধুসূদনের বৈষয়িক-জীবিকা-কর্মের দিক রবীন্দ্রনাথ সকারণেই তুলে ধরেছেন। এই তুলে-ধরা স্পষ্ট হত যদি রবীন্দ্রনাথ মধুসূদনের বৈষয়িক কর্ম-জীবনের নীতি-সূত্রকে উপন্যাসে প্রথম থেকে প্রতিষ্ঠিত করতেন। কতকগুলো বলিষ্ঠ বর্ণনায় ব্যবসায়ীদের টাইপ হিসাবে মধুসূদনের প্রতিষ্ঠা হয়েছে মাত্র। ফলে সে হয়ে দাঁড়িয়েছে লোভ, স্বেচ্ছাচার, অধিকারবোধ প্রভৃতির প্রতীক—যে প্রতীকের ওপব কুমুর শান্ত সুদূর সৌন্দর্যের প্রতিক্রিয়া দমকা বাতাসেব মতো মাঝে মাঝে এসে পড়েছে। স্পষ্টই রবীন্দ্রনাথ এটা উপলব্ধি করেছেন, কিন্তু এই বাইরের জীবন ও ভিতরের জীবনকে একত্রে বিজড়িত করে যখনই দেখতে চাওয়া হয়েছে তখনই উপন্যাসে সঞ্চারিত হয়েছে কৃত্রিমতা। বেঙ্কটশরণমেব কাছে হাত দেখানোর অধ্যায় তার বড়ো প্রমাণ। এই সম্পত্তিবাদী ব্যক্তিটির যে দুর্বলতা প্রতিপন্ন করাব জন্য হাবুলেব মতো বালকেব সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃজন, সেই দুর্বলতা প্রতিপালনের জন্যই তাকে বেঙ্কটশবণমের কাছে নিয়ে যাওয়া। সে দুর্বলতা হল হাবানোব ভয়। স্বভাবতই এব মূল্য খুব বেশি নয়। এবং মধুসূদনেব চরিত্রে প্রথমাবধি হারানোর ভয়টাই প্রবল। এ-কারণে কুমুর সঙ্গে দ্বন্দ্বে বা কুমুকে অবলম্বন কবে অন্তর্দ্বন্দ্বে একটা সমগ্র ব্যক্তির যন্ত্রণাব সাক্ষাৎ পাওয়া গেল না। যাকে পাওয়া গেল সে একটা লোভাত দুর্বল চেহারার পরাজয়-ভীরু কুসংস্কারাচ্ছন্ন ব্যক্তি। এই সংকীর্ণ অধ্যাযেব ফলে কুমুর পবীক্ষাও সীমিত হয়ে গেছে। কম বেশি করে মধুসূদন যেখানে সমাধানমুখী বা আপসমুখী হয়েছে, সেখানে তার গলায় কুমুর কণ্ঠস্বরই আমবা শুনতে পেয়েছি। ফলে দ্বন্দ্ব হয়েছে স্তিমিত।

এর কারণ মধুসূদন সত্যিই নিজ ইতিহাস রচনাকারী বণিকবীর নয়। একটা সং বাণিজ্যব্রতী যে আবেগে একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে, গড়ে তোলে স্বনামের সুদীর্ঘ ইতিহাস (বাডেনব্রুকস অথবা ফরসাইট সাগা স্মরণীয়) স্বভাবতই সে দৃঢ়তা, সে আবেগ, সে সততা মধুসূদনেব নয়। এই ব্যক্তি উপনিবেশের হাটের কাঞ্চনসন্ধিৎসু মাত্র, যার কোনো বিবেক নেই, নীতি নেই। বলা বাহুল্য আমাদের জীবনে স্বাধীন শিল্পপতিদের কোনো ভূমিকা উপস্থিত থাকলে কুমু-মধুসূদনের সমস্যার গভীর রূপকে সত্য করে তোলার দায় কেবল কুমুর হাতে

তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে হত না। এর ফলে অবশ্য এই খণ্ডিত উপন্যাসের উপসংহারে একটা সুবিধা হয়েছে। কুমুর দিক থেকে যাই হোক, মধুসূদনের সীমাবদ্ধ পরিসরে এ-উপসংহার মানিয়ে গেছে; মধুসূদন তার ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানেব উত্তবাধিকারী পেতে চলেছে। এ-উত্তরাধিকারীকে সে হারাতে চায় না। কুমুর দিক থেকে যে মীমাংসা হয়নি সে কথা তো সর্বজনবিদিত। অবশ্য শোনা যায় সে পরীক্ষার নাকি তখনও অনেক বাকি ছিল। এই অসমাপ্তির জন্য উপন্যাসটি খণ্ডিত।

এখানে বিষয়বস্তুটা ছিল এমনই দেশকালাধীন যে মধুসূদনের এই অপরিপূর্ণতা অনিবার্য। টমাস মানের বাডেনব্রুক্‌স অথবা গলসওয়ার্দির ফরসাইট সাগায় যে ব্যবসায়ী পরিবাবের কথা আমরা পড়ি তারা এক একটা জাতির মনোলোকের প্রতিবিম্ব সহজেই বহন করতে পারে। কেননা সেখানকার বণিকজীবনও জাতীয় জীবনের অবিচ্ছেদ্য পরিপূরক। ফলে সোম ফরসাইট ও আইরিন ফরসাইটের যে বিরোধ তাকে গলসওয়ার্দি নায়কের দিক থেকে সম্পূর্ণ করে গড়ে তুলেছেন। সেখানে স্বামীর অধিকার চেতনা মধুসূদনের মতো স্থূল কর্কশ পথে আবির্ভূত হয়নি। সে অধিকার চেতনাতেও জাতীয় সূক্ষ্ম রুচিবোধ এবং সংস্কৃতি-মনস্কতা প্রকাশিত হয়েছে। ফলে আমাদের সদাই মনে হয় যে এই দুই স্বামী-স্ত্রীর দ্বন্দ্বে-বিচ্ছেদে সোম ফরসাইট সম্পূর্ণ নির্দোষ এবং স্বামী হিসাবে সে ফুলমার্ক পাওয়ার উপযোগী। কিন্তু আমরা ভালবেসে ফেলি আইরিনকে। এই দ্বৈত পরীক্ষায় রবীন্দ্রনাথ জয়ী হতে পারেননি। মধুসূদন থেকে গেল লোভী ব্যবসায়ী এবং স্থূল স্বামী। হয়তো বাডেনব্রুকস বা ফরসাইটদের মতো একটা স্বাধীন জাতীয় বণিক জীবনকে এই উপনিবেশের পটে কল্পনা করা সম্ভব ছিল না। এই দেশকালাধীন অনিবার্যতাই যোগাযোগের ভারসাম্যের বিনষ্টির মূলে। একে সংযত করার জন্য কুমুর ওপরে প্রাধান্য আরোপ করা হয়েছে বেশি। কুমুর পরীক্ষা যে তাৎপর্যপূর্ণ সে আলোচনা আমরা পুর্বে করেছি।

আসলে একটা জাতির জীবনার্থ এবং জীবনযাপনের ধারার ওপরে সে জাতির উপন্যাসের শিল্পকর্মের প্রতিষ্ঠা। মধুসূদনের ভূমিকায় আমাদের ঔপনিবেশিক পটে অন্যতর কিছু আশা করা অসঙ্গত। আমরা অবশ্যই উপনিবেশের জটিলতাকে মুশ্‌কিল আসান বলে ব্যবহার করতে চাই না। কেননা উপনিবেশ তো পৃথিবীতে নানা স্থানেই হয়েছে। কিন্তু উপনিবেশেব পটেও বাংলাদেশের সাহিত্য এমন শক্তি সঞ্চয় করেছিল কী করে—যে শক্তি নিজ সীমার মধ্যে

থেকেও তাৎপর্যপূর্ণ? তার কারণ ভারতবর্ষের মহান সভ্যতার ভিতরেই অনুসন্ধেয়। সেই প্রসঙ্গেই বলা যায় যে ভিলেন বা ঐ জাতীয় চরিত্রাঙ্কনে ভারতবর্ষ চিরকাল বিমুখ। যে-সমস্ত চরিত্রে ভারতবর্ষের বিপুল ঐতিহ্যের ধারণা সক্রিয় এবং যারা জীবনের পূর্ণাদর্শকে কোনো দিক থেকেই ভগ্নাংশ করে ফেলেনি বাংলা সাহিত্যের অমর চরিত্রশালায় তাদের স্থান সবার ওপরে। কুমু, ভ্রমর, আনন্দময়ী এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। যোগাযোগের ঔপন্যাসিক সার্থকতার দায় তাই কুমুর ওপরেই শেষ পর্যন্ত বর্তিয়েছে।

যোগাযোগেও রবীন্দ্রনাথেব নাটকেব আদর্শ কার্যকরী। মধুসূদন যেন যন্ত্রপুরীর সেই রাজা। বাইরের দিক থেকে যে প্রচণ্ড, অধিকারবাদী। কুমু বাইরের দিক থেকে দুর্বল। কিন্তু তাব অন্তবেব শক্তিতে সে বিশিষ্ট। সে শক্তির প্রধান কথা সৌন্দর্য এবং স্বাধীনতা। আইরিনেব বেলায় যেমন লেখক অপরের ওপর তার প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে তাকে জীবন্ত করতে চেয়েছেন—কুমু লেখকের সে দুর্বলতা থেকে মুক্ত।)
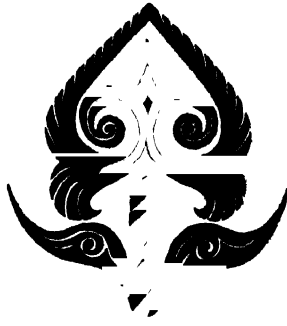
শরৎচন্দ্র ও ঔপন্যাসিকের দ্বিধা

•• এক ••

কোনো বাংলা উপন্যাস যদি গভীরভাবে শরৎচন্দ্রকে প্রভাবিত করে থাকে তবে তা হল চোখের বালি। যে সমস্ত নারী চরিত্রের স্রজন-কর্তা হিসাবে শরৎচন্দ্রের উদ্দেশে বাংলা সাহিত্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা হয়ে থাকে তারা সকলেই হয় বিনোদিনীর ভগ্নাংশ, আর নয় বিনোদিনীর কাঠামোয় অন্য শরীরের রূপরঙ। সমগ্র বাংলা সাহিত্যের মধ্যে তিনি গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে এই চরিত্রটিকে অনুধাবন করেছিলেন। চোখের বালি বেরনোর প্রায় এক যুগ পরে শরৎচন্দ্র যখন সমাজ-বিগর্হিত প্রেমকে উপজীব্য করে তাঁর উপন্যাসাবলী প্রকাশ করতে লাগলেন যখন দেখা গেল যে প্রতিপত্তির সাফল্যে এবং জনচিত্ত দখলে তার স্রজিত নারী চরিত্রগুলি বিনোদিনীকে বহু পশ্চাতে ফেলে এগিয়ে গেছে। শরৎচন্দ্রের লেখক চারিত্র্যের ভিতরেই এই মনোহরণের সাফল্যের বীজ নিহিত ছিল। কিন্তু তৎপূর্বে কী অবস্থায় শরৎচন্দ্র বাংলা উপন্যাস পাঠকের চিত্ত জয় করলেন সেটা আলোচিত হওয়া দরকার।

বাঙালী উপন্যাস পাঠকমণ্ডলীর অ্যাভারেজ অংশকে রবীন্দ্রনাথ একমাত্র নৌকা-ডুবিতে ছাড়া আর কোথাও ব্যাপকভাবে স্পর্শ করতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথ সংক্রান্ত আলোচনায় আমরা সে কারণ কতকটা ব্যাখ্যা করেছি। এখন পাঠকদের দিক থেকে ব্যাপারটি বোঝার চেষ্টা করব। উনবিংশ শতাব্দীর ইংরাজি শিক্ষার প্রথম দিবসাবধি যে পাঠকমণ্ডলীর পরিধি দিনে দিনে বেড়ে চলছিল তার চেহারা মোটামুটি এক। ইংলণ্ডে অষ্টাদশ শতাব্দীর কর্মী পাঠক—জাতির ভবিষ্যৎ রচনাকারী কীতিগর্ভ পাবলিক। তার কর্মসূত্রের সঙ্গে মর্মসূত্রের

প্রত্যক্ষ গ্রন্থিবন্ধন বিদ্যমান ছিল। ন্যায্যতই ইংলণ্ডের এই পাঠকমণ্ডলীর চেহারা উনবিংশ শতাব্দীতে পরিবর্তিত হয়েছে। জাতির কর্মময় যুগের সর্বব্যাপী আগ্রহ, সাম্রাজ্যের অবসর-স্তিমিত দিনে সীমিত হতে বাধ্য। রুচি, নীতি, বিবেকের প্রশান্ত আশ্রয়ে সমস্ত বিক্ষোভকে আবৃত করে আত্মগোপনের যুগ এটা। এ যুগেই কীট্‌সের চিঠি পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে, বেরিয়েছে কেটে ছেঁটে শেক্‌সপীয়রের পারিবারিক সংস্করণ। সেদিক থেকে বাংলা দেশের দুই শতাব্দীর পাঠকমণ্ডলীর গুণগত কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। পরিমাণগত পরিবর্ধন হয়েছে মাত্র। পাঠক-সচেতনতা ঔপন্যাসিকের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য। আলালের ঘরের দুলাল-এর লেখকও প্রতি সংখ্যা 'মাসিক পত্রিকা' প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির স্ত্রীলোকেরা পত্রিকা পড়ে কী অভিমত দিলেন তা জানবার জন্য ব্যস্ত থাকতেন। সেই সময় থেকে শরৎচন্দ্রের কাল পর্যন্ত যে পাঠক-জনতা (Reading-Public) গড়ে উঠেছে তা স্পষ্টত দু-ভাগে বিভক্ত। একভাগে সচেতন পাঠকমণ্ডলী ও আর একভাগে গল্পপিপাসু সাধারণ পাঠক সমাজ। এই শেষোক্তদের অনুক্ত অনুরোধেই লিখিত হয়েছে দামোদরবাবুর (কপালকুণ্ডলার পরবর্তী অধ্যায়) মৃন্ময়ী। সে-যুগের পাঠকমণ্ডলীর বৃহত্তর অংশ মৃন্ময়ীতেই গল্পস্পৃহার নিবৃত্তি খুঁজে পেত। এই শেষোক্ত পাঠকমণ্ডলীর চরিত্র বৈশিষ্ট্য অনুধাবনযোগ্য। প্রতি দেশে প্রতি যুগেই এই ধরনের বিস্তৃত পাঠক সমাজের দেখা পাওয়া যায়। বস্তুতপক্ষে এরাই হলেন চলিষ্ণু ধারার বিস্তৃততম খাত যেখানে গভীরতা কম, বেগ কম, কিন্তু প্রশস্ততা বেশি। এই পাঠকমণ্ডলী উপন্যাসের কাছ থেকে কোনো বৃহত্তর প্রশ্ন আশা করেন না, প্রচলিত চিন্তা এবং জীবনযাত্রার প্যাটার্নকে কোনো রকম নিরীক্ষা বা পরীক্ষার ভিতর পতিত দেখতে চান না। উপন্যাসের নায়ক-নায়িকাদের জন্য ঔপন্যাসিকের সহানুভূতিকে এরা খুব মর্যাদা দিয়ে থাকেন। এক কথায় জীবনকে বিস্তৃত জটিল পটে দেখার ব্যাপারে এদের উৎসাহ কম, সেই কারণে এই ধরনের অ্যাভারেজ পাঠকমণ্ডলী সব সময়েই বিগত যুগের ঔপন্যাসিক ধারার রক্ষক কিন্তু নবীন ভবিষ্যতের জনক নন।

শরৎচন্দ্র যে কালে লেখনী ধারণ করেছিলেন তার প্রাক্কাল এবং সমকাল এই দিক থেকে ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থায় অনড় হয়ে পড়েছিল। কেননা রবীন্দ্রনাথের অসমসাহসিক নিরীক্ষা এবং সৎসাহসিক সার্থকতা বাঙালী অ্যাভারেজ পাঠক-মণ্ডলীর আত্মীয় ছিল না। স্বাধীন ব্যক্তিসত্তার যে প্রশ্ন রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের দেশকালের পটে বারে বারে স্থাপিত করেছেন তাকে ব্যাপকভাবে উপলব্ধির

জন্য জনজীবনের ব্যাপক রূপান্তরের প্রয়োজন ছিল। শতবন্ধন-জাল-জটিল, খিন্ন-অপরিতৃপ্ত আমাদের ঔপনিবেশিক জীবনে গ্রামে এবং শহরে, পরিবারে এবং সমাজেও সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোর শেষ বাঁধন সহজে ছিঁড়ে পড়েনি এবং পড়ে না। ফলে উপন্যাসের দর্পণে ব্যাপক পাঠকমণ্ডলী যখন আত্মপ্রতিবিম্ব দেখতে চাইতেন তখন রবীন্দ্রনাথের দিকে চাইলে স্বভাবতই আশ মিটতো না, চোখ ধাঁধিয়ে যেত। তাই এই সময়কার উপন্যাস প্রচেষ্টায় তিনটি ধারা লক্ষ্য করা যায়।—

(ক) রবীন্দ্রকাব্যের রোমান্টিক প্রসাদের উপন্যাসে তরলীকরণের প্রচেষ্টা। প্রেম-বিরহ মিলনকে উপজীব্য করে এঁদের উপন্যাস প্রচেষ্টা। মুখ্যত ভারতীর লেখকবৃন্দ, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, মণীন্দ্রলাল বসু প্রমুখেরা এই লেখক গোষ্ঠীব মধ্যে পড়েন।

(খ) রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তি মনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার অক্ষম অনুসরণ ও তারও একটি তরলীভূত রূপসৃজন এ-যুগের আর এক বৈশিষ্ট্য। নরেশ সেনগুপ্ত ও উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কিছু সৃষ্টি এর মধ্যে পড়ে।

(গ) এই দুই ধারারই পাশাপাশি আর একটি ধারাও এই যুগে ক্রমশ সুস্পষ্ট হচ্ছিল। তা হল গল্পের ভিতর দিয়ে পাঠকশ্রেণীর পরিতোষণ বা entertainment। প্রভাত মুখোপাধ্যায়, নরেশ সেনগুপ্ত এবং উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যাযের বেশ কিছু রচনা এই পযায়ে পড়ে।

মোটামুটি এই ত্রিধাবার প্রতিনিধিস্থানীয় লেখক ছিলেন প্রভাত মুখোপাধ্যায় এব' পরে নবেশচন্দ্র সেনগুপ্ত ও উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। উপেনবাবুর রাজপথ উপন্যাসের নায়ক-নায়িকা নির্বাচনে গোরাকে অনুসরণ স্পষ্ট। শুধু গোরার বিশাল পট ও পটবিধৃত জীবনের তাৎপর্য নেই এ-উপন্যাসে। নিটোল করে সম্পূর্ণতার বোধ সঞ্চারে উপেন্দ্রনাথ সিদ্ধহস্ত ছিলেন। রাজপথে সে বোধ উপস্থিত। নরেশবাবু, চারুবাবু এবং প্রভাতবাবুও তর্কপ্রাণ বুদ্ধিকেন্দ্রিক উপন্যাস অপেক্ষা মোটামুটি পারিবাবিক গল্পেই মুক্তি অনুভব করতেন। নরেশবাবু যৌন সমস্যামূলক উপন্যাসের চেয়ে অভয়ের বিয়ের মতো স্নিগ্ধ চিত্তহারী গল্পে সফল হয়েছিলেন বেশি।

সমকালীন উপন্যাস সাহিত্যের প্রয়াসে মনোহরণের ঝোঁক অল্প স্থলেই অতিক্রান্ত হয়েছে। উপন্যাস-লেখক হিসাবে প্রভাতবাবুর রমাসুন্দরীর সাফল্য বিষয়ে সন্দেহ থাকলেও তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা রত্নদীপের সাফল্য এবং সম্ভাবনা দুয়ের কথাই

স্মরণীয়। রত্নদীপের প্রধান বলিষ্ঠতা এবং নীতি সচেতনতা বিশেষ অনুধাবনের বিষয়। রাখালের সাহায্যে লেখক যে কথাটি রূপায়িত করতে চাইলেন তা হল এই যে মানুষের পাপ করবার ক্ষমতার সীমা মানুষের মনই রচনা করে শাশ্বত নীতিবোধের সহজাত উত্তরাধিকারে। রাখাল যে শেষ পযন্ত চূড়ান্ত প্রবঞ্চনায় নেমে যেতে পারে না সেটার কারণ বৌরানীর চরিত্র সম্বন্ধে তার অনুভূতির আন্তরিকতা। বৌরানীর পতিপ্রেমের ব্যাপারটি রাখালকে স্পর্শ করে বলেই অনধিকাবীর অবমাননায় সে নিজেকে ধূল্যবলুণ্ঠিত করে না। রত্নদীপ বাংলা সাহিত্যের সেই ধরনের শেষ সার্থক উপন্যাস—যা বঙ্কিমী পাপ-পুণ্য বোধেব ওপর স্থাপিত, শেষ প্লটপ্রধান উপন্যাস—যেখানে পাঠকেব মূল আগ্রহ কী হয় শেষটা তা জানতে চাওয়ায়। তথাপি রাখালের দ্বৈত সত্তাকে ব্যবহার করায় কিছুটা সাফল্যের প্রসাদ পাওয়া গেল, বিপুলতর সম্ভাবনার প্রত্যাশা না মিটলেও এ কথা সত্য। ভারতী এবং উত্তর-ভারতী যুগের সাহিত্যকর্মের মধ্যে রত্নদীপের স্থান উচ্চে। ব্যক্তিকে একটা নির্দিষ্ট পটে স্থাপিত করে ব্যক্তিসত্তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে পরীক্ষা করা রবীন্দ্রনাথ-সম্মত পদ্ধতি। রাখালকে সে পরীক্ষায় স্থাপন করাও হয়েছিল। শুধু যে মনন এবং চিন্তাশীলতা থাকলে সে পরীক্ষার শিল্পরূপকে বিশিষ্ট করে তোলা যেত প্রভাতবাবুব ক্ষেত্রে তার অভাব ছিল। বত্নদীপে প্রভাতবাবু এই ত্রুটিকে বুঝতে দেননি বৌরানীব ওপব আমাদের দৃষ্টিকে আকৃষ্ট রেখে। বিষযবস্তুর মধ্যে শিল্পসম্ভাবনা আবিষ্কার করা যদি সাধু-সমালোচনা সঙ্গত ব্যাপার হয তাহলে বলা চলে যে এই ধরনের নৈতিক সমস্যার নিগূঢ় আকর্ষণ প্রভাতকুমারের সমকালবর্তী এবং পরবর্তী অন্য কোনো লেখকের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারে ছিল না। শরৎচন্দ্রের অসংখ্য উপন্যাসেব কথা ভেবেও এ মত পরিবর্তনের প্রয়োজন হয না।

•• দুই ••

রত্নদীপের একক সাফল্য ছাড়া চারুবাবুব অবাস্তবতা, নরেশবাবুব মনস্তত্ত্ব এবং তার আগের মণীন্দ্রলাল বসুর রোমান্টিকতা—এসব কিছুই বাঙালী পাঠকের আত্মীয়কল্প বিশ্বমায়া সৃজনে সফলকাম হতে পারেনি। না পারার হেতুও অত্যন্ত স্বাভাবিক। ভারতীর যুগের রোমান্টিকতা এবং মনস্তত্ত্বপ্রীতি জাতির মর্মমূলের সঙ্গে গ্রথিত ছিল না। এগুলো যেন স্পষ্টতই বঙ্গীয় আধারে বিদেশী সাহিত্যের প্রসাদ। এ যে-পরিমাণে ছিল অর্জিত অধ্যয়নের ফল সে-পরিমাণে

লেখকদের স্বীয় অভিজ্ঞতার দান নয়। কৃত্রিমতা এ-যুগের সাহিত্যকর্মের প্রধান কথা। স্বভাবত অ্যাভারেজ বাঙালী পাঠকের মনোরাজ্যে তখন অরাজকতা। তাঁরা না পারছেন রবীন্দ্রনাথকে গ্রহণ করতে, না পাচ্ছেন উপরোক্ত লেখকবৃন্দের কাছে প্রাণের প্রতিধ্বনি। উপরোক্ত লেখকবৃন্দও রবীন্দ্রনাথের শিল্পগত সাফল্যকে, আধুনিক সমালোচকদের কারো কারো মতো, মনে করেছিলেন হয় কবিত্ব নয় মনস্তত্বেব পরিণাম। পুরো রবীন্দ্রনাথ ব্যাপারটি অনুধাবন করতে না পারার জন্যই এখনও যেমন রবীন্দ্রনাথ থেকে সংগ্রহ করা হয় ভঙ্গি তখনও কেবল কাপড রাঙিয়ে যোগী হবার বাসনা ছিল অনেকের। ফল হয়েছিল আরো মারাত্মক। দেশকালের নিয়মকে লঙ্ঘন না করেই শিল্পবুদ্ধির বিকাশ ও পরিণতি ঘটে থাকে। ভারতী এবং উত্তর-ভারতী যুগেব অধিকাংশ লেখকের শিল্পবোধের প্রেরণাকেন্দ্রে সদাই ছিল বিদেশী হাওয়ার দোলা। সেই দোলায় কেমন করে ফুল ফোটাতে হয় তা জানতে গেলে মৃত্তিকামূলের সঙ্গে নিবিড পবিচয় প্রয়োজন। তা এঁদের কারো ছিল না। ওদিকে পাঠক সমাজেও মনস্তত্ত্ব বা রোমান্টিক কাহিনী অপেক্ষা ভিন্নতর চাহিদা অপেক্ষা করছে। আমাদের গ্রামীণ জীবনবোধ এবং জীবনাচবণের সূত্রগুলিব জট দুইই আমাদের কাছে ছিল দুশ্ছেদ্য, এও যেমন সত্য এক-শ বছবেব কলকাতাশ্রয়ী নবকালের সংঘর্ষে তারা হয়ে পডেছিল নানা সমালোচনাব বিষয় এও তেমন সত্য। তখনকার পাঠকমণ্ডলীর মনোভাবে দুই লক্ষণ পরিস্ফুট ছিল। এক, আমাদের জীবনাচরণ সম্বন্ধে, পুরনো মল্যবোধগুলি সম্বন্ধে ক্ষুব্ধ সমালোচনার বোধ. দুই, কোনো প্রকার ইতিবাচক মনোভাবেব অনুপস্থিতি বশত বহুকালেব বন্ধন-সূত্রগুলি সম্বন্ধে মমতাবোধ। এই হ্যাঁ এবং না-এর কাটাকুটি খেলাব শূন্য মনোভাবের আশ্চয প্রতিনিধি শরৎচন্দ্র। শরৎচন্দ্রকে যে বাঙালী পাঠক জযমাল্য দিয়েছে তার অন্তর্নিহিত কারণ এখানে।

এই হ্যাঁ এবং না-এর কাটাকুটি খেলা তাঁব বহুল পরিমাণে জনপ্রিয অথচ গৌণ সৃষ্টিগুলির মধ্যে অধিক মাত্রায পরিস্ফুট। যেখানে একজনের পাশে আর একজনকে দাঁড করিয়ে হ্যাঁ এবং না-এর বৈপরীত্য সৃজন করেন শরৎচন্দ্র। তাই দিগম্বরীর পাশে নারায়ণী কিংবা হেমাঙ্গিনীর পাশে কাদম্বিনী অথবা এলোকেশীর পাশে অন্নপূর্ণাকে রেখে শরৎচন্দ্র সহজেই পাঠকমনের পরিচর্যা করতে পেরেছেন। এই হ্যাঁ এবং না-এর উভয় কুল রক্ষা করতে গিয়ে তিনি যখন একান্নবর্তী পরিবারের সংকটকে ব্যবহার করতে গেছেন তখন সেই

সংকটের তটভূমিকে স্পর্শ মাত্র করে তিনি অপূর্ব মমতায় আবার তার সমস্ত শুশ্রূষা করেছেন। অশ্রুগলিত আনন্দে দেশবাসীর জয়ধ্বনি তিনি এই সমস্ত ক্ষেত্রে লাভ করেছেন। শেষ পর্যন্ত এই ব্যাপারটা যে তাঁর শিল্পের দৈন্য এবং সংকটকেই সূচিত করছে সে সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র সচেতন ছিলেন না। কেননা দেশ-কাল এবং পাত্র-পাত্রীকে গভীর অভিনিবেশ ও তাৎপর্যের সঙ্গে শরৎচন্দ্র কখনও ধরবার চেষ্টা করেননি। ব্যক্তিত্বের মূল থেকে উৎসারিত কোনো সমস্যা তাঁকে কখনও বিচলিতও করেনি। সেই কারণেই স্বাভাবিকতা কখনও শরৎচন্দ্রের স্বধর্ম নয়। আতিশয্যের সম্পর্কগুলিকে পরিমাপ করবার কোনো বিধিনির্দিষ্ট মাপকাঠি নেই বলে সেই সব অপার মুক্তির প্রাঙ্গণে শরৎচন্দ্রের শক্তির বিপুল বিকাশ ঘটেছে। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, বিন্দুর সঙ্গে বিন্দুর ছেলের সম্পর্ক অপেক্ষা অন্নপূর্ণার সঙ্গে বিন্দুর (দেবর জায়া) ছেলের সম্পর্ক তাঁকে আগ্রহান্বিত করে বেশি। নারায়ণীর সঙ্গে তার নিজের ছেলেব স্বাভাবিক সম্পর্ককে পাশ কাটিয়ে দেবর রামের সঙ্গে স্নেহাতিশয্যের সম্পর্কে শিল্পী হৃদয়ের সাড়া শরৎচন্দ্র বেশি অনুভব করেন। মা এবং ছেলে অথবা স্বামী-স্ত্রী অথবা এ-জাতীয় প্রত্যক্ষ সম্পর্কেব মধ্যস্থিত টানাপোড়েন—যেখানে শিল্পীর পরীক্ষা আরো গভীর এবং জটিল (যেমন কুমু-মধুসূদন বা মহেন্দ্র-রাজলক্ষ্মী)—শরৎচন্দ্র প্রায় সময়েই পরিহার করেছেন। সহজ হওয়াই যে ভয়ানক কঠিন কর্মভার এবং সহজের পরীক্ষাতেই যে শিল্পের প্রকৃত পরীক্ষা, শরৎচন্দ্রের সে জ্ঞানের অভাব তাঁর অপেক্ষাকৃত প্রধান শিল্প প্রচেষ্টাতেও কেমন প্রকট তার বড়ো প্রমাণ পল্লীসমাজ উপন্যাসের জ্যাঠাইমা চরিত্রে। পাত্র-পাত্রীদের ব্যক্তি জীবনের ন্যায় শৃঙ্খলার কতখানি অভাব একটা চবিত্রের রূপায়ণে অনুভব করা যেতে পারে জ্যাঠাইমা চরিত্র তার সবচেয়ে বড়ো নিদর্শন। জ্যাঠাইমা নিজের সন্তান বেণী ঘোষালের সম্পর্কে কতখানি আগ্রহান্বিত সে-নিদর্শন উপন্যাসে অনুপস্থিত (মাতা পুত্রের কোনো সাক্ষাৎকার নেই), কিন্তু রমা ও রমেশ প্রসঙ্গে যে-কোনো ব্যাপারে তাঁর আগ্রহ ও ভূমিকা অসীম। এমনও যদি হত যে বেণী ঘোষালের মতো পুত্র মাতার (বিশেষ এমন মাতার) সমস্ত অহংকারকে চূর্ণ করেছে বলেই সে মা পুত্র সম্বন্ধে সাধারণত নীরব তাহলেও একটা প্রশ্ন থাকে যে এই মায়ের ব্যর্থ মাতৃত্বের জন্য একটা প্রচণ্ড বেদনাবোধ থাকবে না? হয়তো জ্যাঠাইমার মধ্যে সে আক্ষেপের একটা সুর বিদ্যমান কিন্তু তা এতই অগভীর যে রমেশ প্রসঙ্গে এসেই মুছে যেতে পারে। শরৎচন্দ্র দেখলেন না যে রমার ক্ষেত্রে ব্যক্তিমানুষের সামনে

সমাজের যে বাধাকে তিনি আতিশয্যে বড়ো করে তুললেন সেই একই বাধা তো জ্যাঠাইমার ক্ষেত্রেও সক্রিয় ছিল। সমাজপতি বেণী ঘোষালের মা আর রমেশের জ্যাঠাইমায়ে যে দ্বন্দ্ব তাও তো অল্প শক্তির দ্বন্দ্ব নয়। বেণী ঘোষালের ছক থেকে জ্যাঠাইমার বেরিয়ে আসার মতো স্বাতন্ত্র্যের উৎস কোথায় তাও রয়ে গেল অস্পষ্ট। জ্যাঠাইমাও তো পল্লীসমাজেরই মা। কী করে তিনি এড়িয়ে এলেন সেই সামাজিক অর্থনৈতিক পিছুটান? আলোচনাকালে দেখা যাবে যে এতাদৃশ সহস্র কৃত্রিমতায় ও অসঙ্গতিতে শরৎসাহিত্য পরিপূর্ণ।

স্বভাবতই এখানে একটা প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে। বলা যেতে পারে যে কিছুক্ষণ আগে ভারতী এবং উত্তর-ভারতী যুগের লেখকদেব প্রসঙ্গেও কৃত্রিমতার অভিযোগ তোলা হয়েছে। আবাব শরৎচন্দ্রের ক্ষেত্রেও ধীরে ধীরে সেই অভিযোগই তৈরি হল। তাহলে একটা কৃত্রিমতাকে পাঠকেবা পরিহার করল অথচ আর একটাকে গ্রহণ করল সাগ্রহে—কেন? তাব কারণ শরৎচন্দ্রের কৃত্রিমতা আমাদের আহত জীবনকে, আমাদের ক্ষুব্ধ বোধকে শুশ্রূষা করেছে নিপুণভাবে। 'রমলা'র নায়ক-নায়িকাদেব থেকে জ্যাঠাইমাকে বিশ্বাস করতে আমরা বেশি প্রস্তুত। রোগ শয্যাশায়ী ব্যক্তি যেমন কবে চিকিৎসকের কৃত্রিম আশ্বাসকে বিশ্বাস করে, জাতীয় জীবনের এক অদ্ভুত শূন্য মানসিকতায়, আমরাও বিশ্বাস করেছি শরৎচন্দ্রকে। শরৎচন্দ্রেব এই কৃত্রিমতা অধিকতর স্পষ্ট হযেছে দুই ক্ষেত্রে। এক, যেখানে তিনি রবীন্দ্রনাথের আদর্শে চবিত্র এবং প্যাটানকে গড়ে তুলতে গেছেন সেখানে। জ্যাঠাইমাকে আনন্দময়ীর মতো গড়ে তুলতে গেলে জ্যাঠাইমার চরিত্রে যে ন্যায় এবং যুক্তির ব্যবহার প্রয়োজন শরৎচন্দ্র কখনও সে সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন না। গৃহদাহকে নষ্টনীড় বা ঘরে বাইরের আদর্শে দাঁড় করাতে গেলে ব্যক্তিত্বের যে প্রবল টানাপোড়েনের সৃষ্টি করতে হয় সে ব্যক্তিত্ব শরৎচন্দ্রের চরিত্রশালার বাইরের ব্যাপার। দুই নম্বর ক্ষেত্রে যে দুর্বলতা শরৎচন্দ্রের শিল্প প্রচেষ্টাকে গভীরভাবে ক্ষুণ্ন করেছে তা হল অকাবণ মনন প্রদীপ্তি সঞ্চারের প্রচেষ্টা। শেষ প্রশ্ন এ-প্রসঙ্গে একটি অবিস্মরণীয় উদাহরণ।

বস্তুতপক্ষে যখন বাংলা উপন্যাস পাঠক সমাজ পরিমাণে বিস্তৃত হয়েছে কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রবল জিজ্ঞাসা সে বিস্তৃত পাঠকমণ্ডলীর অ্যাভারেজ অংশকে স্পর্শ করতে পারছে না অথচ যখনও তিরিশের যুগে রবীন্দ্রনাথেরই উত্তরাধিকারকে নানাভাবে গ্রহণ করে বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের বিস্তার ও গভীরতার সূচনা হয়নি এই রকম ধরনের অবস্থায় দুই অঙ্কের মাঝখানে বিরতির সময়টুকুতে

শবৎচন্দ্র বাঙালী পাঠকমণ্ডলীকে অধিকার করেছিলেন। মানুষের সম্বন্ধে গভীর ভালবাসার বোধ শরৎচন্দ্রের নৈতিক সম্পদ বলে, কোনো জীবনদর্শন ব্যতিরেকেই, কোনো গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় না দিয়েও শবৎচন্দ্র পাঠকের ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হননি। এ-ভালবাসা কতকাংশে শিল্পমূল্যের প্রতিদান কতকাংশে শবৎচন্দ্রেব করুণাময় মনেব মূল্যশোধ।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বলেছেন, উপন্যাস করুণাময়দেব উপযুক্ত রঙ্গভূমি নয়। এ-কথা এই জন্য যথার্থ যে উপন্যাসের সহানুভূতি শুধু সহানুভূতি নয়, উপন্যাসেব কল্পনাও শুধু কল্পনা নয়। ঔপন্যাসিকেব সহানুভূতিব পশ্চাতে থাকে কল্পনাব সুদৃঢ় সহযোগিতা, আবাব কল্পনাব পশ্চাতে থাকে সহানুভূতিব গভীব সমর্থন। সহানুভূতি, কল্পনা এবং মনন এই তিনটিকে একই আধাবে মিশ্রিত কবতে না পাবলে উপন্যাসেব পানপাত্র অসম্পূর্ণ থেকে যায়। শবৎসাহিত্যেব বিস্তৃত আলোচনায় এই তিন প্রসঙ্গেবই বিচাব বাঞ্ছনীয়।

•• তিন ••

শবৎসাহিত্যেব সাফল্য প্রসঙ্গে সাধাবণত আমাদেব সমালোচকেবা নিম্নলিখিত কাবণগুলি নির্দেশ কবেন

(ক) নিষিদ্ধ সমাজ-অননুমোদিত প্রেমেব বিশ্লেষণ।

(খ) আমাদেব সামাজিক বীতি-নীতি ও সংস্কাব প্রভৃতিব কঠিন সমালোচনা।

এখন এই কাবণগুলিকে একে একে পবীক্ষা কবে শবৎচন্দ্রেব সাহিত্য-কীর্তিব তাৎপর্য অনুধাবন কবা যাক।

সমাজ-বিগর্হিত নিষিদ্ধ প্রেমকে শবৎচন্দ্রই প্রথম উপন্যাসেব উপজীব্য কবেননি। ববং বলা যেতে পাবে যে স্বদেশে ও বিদেশে উপন্যাস সাহিত্যেব গোড়া পত্তনেব কাল থেকেই নিষিদ্ধ প্রেমকে অবলম্বন কবে উপন্যাস লিখিত হয়েছে। বোহিণীকে গোবিন্দলাল ভালবেসেছিল এমন প্রমাণ কৃষ্ণকান্তেব উইলে বহু ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র দিয়েছেন। সে ভালবাসাব স্বরূপ কী এবং তাব প্রতি বঙ্কিমেব মনোভাব কী সে কথা স্বতন্ত্র। চোখেব বালিতে বিনোদিনীব বিহাবীব প্রতি ভালবাসা নিঃসন্দেহেই ভালবাসা এবং নিষিদ্ধ ভালবাসা। নিষিদ্ধ ভালবাসাব বিষয় ঔপন্যাসিকেব একটি এমন পবীক্ষাগাব যেখানে সাবা জীবনে তাঁদের একবাব না একবাব যেতেই হয়। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যেব অগুনতি উদাহবণ এবং বঙ্কিম ও

রবীন্দ্রনাথের বেশ কিছু সৃষ্টিকে এর প্রমাণ হিসাবে উল্লেখ করা চলে। আনা কারেনিনা বা মাদাম বোভারি, চন্দ্রশেখর বা নষ্টনীড়—নিষিদ্ধ প্রেমই যেন ঔপন্যাসিকের বীক্ষণাগার। সত্যই বীক্ষণাগার—কেননা নিষিদ্ধ প্রেম বিষয়টির সঙ্গে উপন্যাসের মর্মসূত্রের একটি নিবিড় যোগ বিদ্যমান। এ-যোগ ব্যক্তি সচেতনতার সঙ্গে গ্রন্থি-বদ্ধ। সচেতন ব্যক্তিমানসের বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাত বা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় ঔপন্যাসিকের প্রধান আগ্রহ। নিষিদ্ধ প্রেম ব্যক্তিকে প্রচলিত জীবন সংক্রান্ত ধ্যান-ধারণা ও গতানুগতিক বিন্যাসের বিপরীত মুখে স্থাপন করে। ব্যক্তি জীবনের বিচিত্র রূপকে পরীক্ষা করার বিপুল অবকাশ এই ক্ষেত্রে পাওয়া যায়।

মধ্যযুগীয় রোমান্সের নিষিদ্ধ প্রেম অপেক্ষা ঔপন্যাসিকদের ব্যবহৃত নিষিদ্ধ প্রেমের তাৎপর্য অনেক গভীর। এবং এই গভীরতাটুকুর জন্য উপন্যাসের অপ্রতিদ্বন্দ্বী আধারের কোনো বিকল্প নেই। মধ্য যুগের নিষিদ্ধ প্রেমের চরিত্রে প্রধান কথা হল প্রেম সম্বন্ধে কোনো দ্বন্দ্ববোধ ছিল না। নিষেধটা আরোপিত ছিল বাইরে থেকে। রোমিও-জুলিয়েটের পরস্পর প্রেমে কোনো সংশয় ছিল না। নিষেধ বা গোপনতা প্রয়োজনীয় হয়ে ছিল বাইরের বাধার জন্য। কিন্তু ভ্রনস্কি এবং আনার প্রেমের মধ্যে যে নিষিদ্ধতা সে নিষিদ্ধতা বাইরের দিক থেকে প্রকাণ্ড নয়। মনের দিক থেকেই সে বাধা অতিকায়। ব্যক্তি সচেতনতার একটি আশ্চর্য পরিণাম হল এই যে মানুষ বুঝল সমাজ নামক ব্যাপারটি লোকসমষ্টির যোগফলে বিরাজিত নয়। সমাজই বলা হোক, বা জীবন সংক্রান্ত ধ্যান-ধারণায় প্রচলিত মানই বলা হোক, এ-সমস্ত কিছুর বাঁধন শেষ পর্যন্ত ব্যক্তি-মানসের নিভৃতে। সেই বাঁধনে টান পড়ে ব্যক্তিমানসের বিশিষ্ট চেহারা কেমন করে ফুটে ওঠে ঔপন্যাসিকের আগ্রহ সদাই সেই প্রক্রিয়ার সন্ধানী। অথচ রোমিও এবং জুলিয়েট-এর প্রেমবৃত্তান্তটির মতো গল্পের মূল আকর্ষণ গোপন দুঃসাহসিকতায়। সেখানে বিপন্নতার বোধকে ব্যবহার করা হয় প্রতি পদে। কিন্তু কেউ কখনো মাদাম বোভারির প্রণয়-লিপ্সার শাস্তিস্বরূপে অসংখ্য সামাজিক মানুষকে বিচার সভায় জড়ো করবে না, কোনো বংশ মর্যাদায় আঘাতের আক্রোশে হত্যা করতে ছুটবে না কেউ প্রেমিককে। বড়ো জোর সে হয়তো কেলেংকারির গল্প করবে ড্রয়িং রুমে বা চণ্ডীমণ্ডপের আসরে। হয়তো মন্তব্য করবে। কিন্তু কোনো নিষিদ্ধ প্রেমের গল্প-উপন্যাসের ক্ষেত্রে—এগুলি প্রধান নিয়ামক ব্যাপার নয়। ব্যক্তিমানসের দ্বিধাদীর্ণতাই উপন্যাসে নিষিদ্ধ প্রেমকে

উপলব্ধি করবার প্রধান সূত্র। কেবলমাত্র প্রেমের নিবিড়তা বা গভীরতা বা ঐ জাতীয় কিছুকে প্রতিপন্ন করা উপন্যাসে নিষিদ্ধ প্রেমের লক্ষ্য নয়। বিভিন্ন সম্পর্কের যোগফল স্বরূপ ব্যক্তির মৌল সত্তাকে কেমন করে আলোড়িত করেছে এ-ঘটনা, তাই ঔপন্যাসিকের লক্ষ্য।

নিষিদ্ধ প্রেমের এই বিশিষ্ট তাৎপর্য একমাত্র উপন্যাসের কাঠামোয় ধরা যায়। আর কিছুতে নয়। কেননা বিভিন্ন সম্পর্কের, বিভিন্ন পর্যায়ের, ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা রুচিসমূহের ইতিহাসের, পরিবেশের নানা চাপের ফলে যে ব্যক্তিমানস গড়ে ওঠে এবং যাকে নিষিদ্ধ প্রেমের প্রতিমুখে স্থাপন করা হয় তাকে উপন্যাসের স্থিতিস্থাপক শিল্পরূপে সমগ্রভাবে ধরা যায়। কখনো কথকতায়, কখনো নাট্য রসাশ্রয়ে, কখনো বিশ্লেষণে, কখনো লেখকের স্বগতভাষণে, কখনো টীকায়, কখনো অপরকে কথা বলিয়ে, কখনো অপরকে ভাবিয়ে ও নিজে ভেবে ঔপন্যাসিক এই সমগ্রতার সাধক। সমগ্র মানুষটার প্রসঙ্গেই নিষিদ্ধ প্রেমের ব্যাপারটি অনুধাবনযোগ্য।

বাংলা সাহিত্যে বিধবা বিনোদিনীকে দিয়ে এ-পরীক্ষার ব্যাপারে গভীর সার্থকতা রচনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বিনোদিনী এবং শরৎচন্দ্রের অসংখ্য নায়িকা-কুলের মধ্যে একটা আপাত সাদৃশ্য বিদ্যমান সে-কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। শরৎচন্দ্র গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে বিনোদিনীর চরিত্রের প্যাটার্নের বাইরের সীমা-রেখাকে অনাহত রেখেছিলেন। বিনোদিনীর মতো বাকপটু, রসিকা, গৃহকর্ম-নিপুণা, সেবাপরায়ণা এবং পরকে আপ্যায়নে শুশ্রূষায় পারদর্শিনী শরৎচন্দ্রের সমুদয় নায়িকা। নায়কের শরীরের শুশ্রূষায় কাতর ও ব্যাকুল চিত্ততা রবীন্দ্র-নাথের বহু নায়িকার পরিচয়-সূত্রের অন্যতম। শীর্ণশরীর শচীশের জন্য দামিনীর উৎকণ্ঠা দেখে শ্রীবিলাসের ব্যঙ্গোক্তিতে দামিনীর উত্তর এ-প্রসঙ্গে লক্ষণীয়। দামিনী বলেছিল যে মেয়েরা শরীরের স্রষ্টা বলেই সম্ভবত শরীরের ওপর মায়া তাদের অধিক। শরৎচন্দ্রের অধিকাংশ নায়িকাই সে দিক থেকে বিনোদিনীর ছায়ায় গঠিত। রবীন্দ্রনাথও এই চরিত্র বিন্যাসের জন্য বঙ্কিমের কাছে ঋণী। রোহিণী ও বিনোদিনীতে বিস্তর পার্থক্য সত্ত্বেও দেখা যায় রোহিণী মাঝে মাঝে বিনোদিনীতে পরোক্ষ এবং সুদূর প্রভাবসম্পাতী। রোহিণীও গৃহকর্মনিপুণা, রন্ধনে দ্রৌপদীবিশেষ, ফুলের গহনা, খেলনা রচনায়, চুল বাঁধার বিভিন্ন কৌশলে সে অদ্বিতীয়া। সম্ভবত এ-চরিত্রগুলিকে এমনভাবে পরিকল্পনার মূলীভূত উদ্দেশ্য এদের ব্যক্তিসত্তার সম্যক পরিস্ফুটন। অন্যসব দিক থেকে যে সুস্থ এবং সমগ্র,

"নিষিদ্ধ প্রেম" তার পূর্ণবৃত্ত জীবনে কেমন করে বৃত্তভঙ্গ ঘটায় এটা বোঝানো এই জাতীয় পরিকল্পনার কারণ। এই চরিত্রগুলি অন্য দিক থেকে গুণগত উৎকর্ষের অধিকারী না হলে এদের প্রচলিত জীবনবিন্যাস পরিহার আমাদের আকর্ষণ করে না। রোহিণী-বিনোদিনী এবং শরৎচন্দ্রের নায়িকাকুল এদিক থেকে এক সূত্রে বাঁধা। কিন্তু শরৎচন্দ্র বিনোদিনীকে অনুধাবন করেছিলেন একান্তই তাঁর রেখাসীমার দিক থেকে। ফলে বিনোদিনীর বহিরঙ্গ সাদৃশ্য যতটা তিনি নিখুঁত ভাবে রূপায়িত করেছেন, বিনোদিনীর ব্যক্তিত্বের মূল স্থিত সমস্যাকে তিনি ততটা উপলব্ধি করেননি। আমরা চোখের বালির আলোচনায় দেখিয়েছি যে বিনোদিনীর সমস্যা প্রকৃতপক্ষে প্রেমাতুরা নারীর সমস্যা নয়। সারা জীবন যে অপরের দ্বারা ব্যবহৃত হয়েছে সে নিজের গোটা জীবনের সেই কঠিন ছকের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াতে চেয়েছে বিহারীর সঙ্গে তার সম্পর্কের অবকাশে। আমরা এও দেখিয়েছি যে বিহারীর বিবাহের প্রস্তাবে সম্মত না হওয়ার মধ্যেও বিনোদিনীর ব্যক্তিস্বরূপই কেমন সক্রিয় ছিল। শরৎচন্দ্র ব্যক্তির এই নিগূঢ় প্রশ্নকে বুঝতেন না।

বুঝতেন না বলে সমাজ-বিগর্হিত নিষিদ্ধ প্রেম শরৎচন্দ্র তাঁর উপন্যাসের পরিমণ্ডলে ব্যবহার করেছেন অনেক বার কিন্তু এটা প্রতিবারই তাঁর কাছে থেকে গেছে একটা সহানুভূতির ঘটনা মাত্র, তদপেক্ষা অধিক তাৎপর্য সৃজনে তা থেকে গেছে অপারগ। রমা সম্বন্ধে জ্যাঠাইমার শেষ বক্তব্য হয়তো শরৎচন্দ্রের উক্তি এবং শরৎচন্দ্র চাইতেন যে এই উক্তি সকলের হোক। এই সাধু ইচ্ছার মানবিকতাকে আমরা যতই মর্যাদা দিই না কেন উপন্যাসের লক্ষ্য এখান থেকে অনেক দূরে নিবদ্ধ থাকা উচিত। রমার কথাই একটু বিশেষভাবে আলোচনা করা যাক। রমা পল্লীসমাজের মেয়ে। সুতরাং পল্লীসমাজের যা কিছু জট তার মধ্যে থাকবে হয় এটা স্বাভাবিক, আর নয় পল্লীসমাজের জটগুলিকে সে চেনে, জানে সেই জটের মধ্যে সেও বন্দী, কিন্তু জটের গহন দুর্ভেদ্যতার সঙ্গে তার একটা দ্বন্দ্ব আছে এটা স্বাভাবিক। প্রথমোক্ত সম্ভাবনায় বিপদের ও ব্যর্থতার ঝুঁকি নেই। কিন্তু দ্বিতীয়োক্ত সম্ভাবনাকে শিল্পে রূপায়িত করা দুরূহ প্রক্রিয়া। লক্ষণ মিলিয়ে শুধু জীবনকে চিনলেই হবে না, জীবনকে জানার ব্যাপারে যে গভীর মনন এবং অন্তর্দৃষ্টি অপরিহার্য সেটাই এ-প্রসঙ্গে আসল কথা। রমা কি পল্লীসমাজকে জানে? সেই সমাজ তার মনের মধ্যে কি কোনো দ্বন্দ্ব সৃজন করেছিল, না, সে শুধু সে-সমাজকে জানে। সে শুধু অভ্যস্ত জীবনের দাসী মাত্র।

এ-অবস্থায় রমেশকে দেখামাত্রই যখন তার প্রেমের বোধে জোয়ার এল তখন থেকেই তার মনের মধ্যে শুরু হল ব্যক্তিসত্তা ও সমাজসত্তার দ্বন্দ্ব। কী তার ব্যক্তিসত্তা, কোন্ বিশিষ্ট প্রশ্ন অঙ্কুরিত হচ্ছিল তার মনে এ-সবের কোনো পরিচয় নেই। এবং এই ভাবেই সমাজের প্রভাবই বা কেন তার মনে বারে বারে সক্রিয় হচ্ছে—সে কি যে-কোনো ভাবে সমাজের একটা মানে খুঁজে বার করেছে, এ-সব প্রশ্নেরও কোনো সদুত্তর নেই। কাজেই রমা যখন রমেশের বীরত্বে, সৎকার্যে সপ্রশংস নীরবতা পালন করে, রমেশের পল্লী উন্নয়নের প্রচেষ্টার খোঁজ খবর নেয় তখন সেটা হয়ে ওঠে প্রেমাস্পদের প্রতি প্রেমিকার শ্রদ্ধাঞ্জলি মাত্র। তার মনোলোকে একটা আলোড়নের সৃষ্টি হয় বটে, কিন্তু আমরা বুঝতে পারি না তার স্বরূপ, বুঝতে পারি না তার উৎস। জ্যাঠাইমা রমাকে কী আলোক দিয়েছেন? আশ্চয সেই আলোক যে আলোক যিনি দিলেন এবং যাঁকে যাঁকে দিলেন কাউকেই আমরা চিনতে পারলাম না। কাজেই এ ভাবে যাঁকে দুরধিগম্য করে গড়ে তোলার জন্য শরৎচন্দ্রের প্রচেষ্টা তার দুরধিগম্যতার প্রাসাদও এক নিমেষে ভেঙে পড়ল তারকেশ্বরের এক দিবসের রোমান্টিক প্রয়াণে। সেবায়-মমতায় রমা এই অংশে শরৎচন্দ্রের পাঠকচিত্ত-তোষিণী শক্তির চমৎকার, বোধহয় সর্বোত্তম, প্রতিভূ হিসাবে দেখা দিয়েছে। তারকেশ্বরের রমা যেন পল্লীসমাজের রমার কেউ নয়। হয়তো লেখকের ধারণা ছিল পল্লী-সমাজের ছকের বাইরে চলে যেতে পারলে রমা-রমেশের সম্পর্কের সম্ভাবিত রূপের একটা চিত্রাঙ্কন এবং তার সাহায্যে পল্লীসমাজের ফ্রেমের মধ্যে এদের অনিবার্য পরিণতির বিয়োগান্ত রূপকে স্ফুটতর করা যাবে। সাধারণভাবে দেখতে গেলে এ-কৌশল খুবই জনপ্রিয় এবং সে হিসেবে লক্ষ্যভেদী হয়েছে। কিন্তু ছক জিনিসটা বস্তুতই লুডোর ছক নয়। একটা থেকে বেরিয়ে গেলেই তার কাজ শেষ হয়ে যায় না। তারকেশ্বরের বাসাবাড়িতে একটি রাত্রির সেবা-যত্নের স্মৃতি রমা এবং রমেশ উভয়কেই কোন অর্থে প্রভাবিত করল তার কোনো ইঙ্গিত উপন্যাসে উপস্থিত নেই। এ-যেন প্রেম প্রীতির ধর্মশালায় কিয়ৎক্ষণের জন্য আশ্রয় গ্রহণ। তাছাড়া তারকেশ্বরের বাসাবাড়িতে রমার ব্যবহারে মনে হয় যে তার কাছে পল্লীসমাজ নামক ব্যাপারটি যেন কুঁয়াপুর গ্রামেরই নিজস্ব ব্যাপার। সেই গ্রামের বাইরে গ্রামের পাত্র-পাত্রীরা নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলে তাদের ওপর আর সে পল্লীসমাজের প্রভাব থাকে না। অথচ রমার মনের মধ্যে যদি সমাজপ্রদত্ত সংস্কারগুলির জট দৃঢ়বদ্ধ না থাকে তাহলে বাইরের দিক থেকে বেণী ঘোষাল

এবং তারিণীর মূল্য কতটুকু। আর তার সমাজসত্তা এবং ব্যক্তিসত্তার দ্বন্দ্বেরই বা করুণ অর্থগৌরব কোথায়? যদি এমন হয় যে রমা জানে যে সমাজপ্রদত্ত সংস্কারগুলির বাস্তবিক কোনো অর্থ নেই, অথচ সেই সমাজের মুখ তাকিয়েই তাকে মনে মনে রমেশের পক্ষাবলম্বন করতে হচ্ছে, এবং সামাজিক ভাবে রমেশের বিরুদ্ধাচরণ করতে হচ্ছে তাহলে সেক্ষেত্রে রমার বেদনারই বা মূল্য কতটুকু, আর রমার ব্যক্তিস্বরূপের মূল্যই বা কী, সেই কারণেই শেষ অধ্যায়ে রমার কাশীবাস বড়ো জোর আমাদের করুণার্দ্র সহানুভূতিরই উদ্রেক করে, আর কিছু নয়। যাকে ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সর্বাপেক্ষা জটিল ও দুরধিগম্য বলেছেন সেই জটিলতা এবং দুরধিগম্যতা শিল্প-সার্থক জটিলতা নয়, অর্থাৎ শরৎচন্দ্রের শক্তির অভাবজনিত জটিলতাই এখানে প্রধান হয়ে উঠেছে। যে মুহূর্তে শরৎচন্দ্র বুঝেছেন যে এই উপন্যাসের আধারে বংশানুক্রমিক শত্রুতার ব্যাপারটিকে রমার ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে বিজড়িত করা গেল না সেই মুহূর্তেই পারিবারিক রেষারেষি হয়ে দাঁড়িয়েছে পল্লীসমাজের অন্তর্ভুক্ত সংকীর্ণতার সামগ্রী। অথচ রমাকে সেই সংকীর্ণতার শিকার হিসাবে ব্যবহার করলে রমা এবং রমেশের প্রেমের অংশকে উপন্যাসের পটে ব্যবহার করা চলে না। সুতরাং মুহূর্তেই পারিবারিক রেষারেষির ব্যাপার গৌণ হয়ে গিয়ে প্রধান হয়ে দাঁড়াল পল্লীসমাজ। অথচ বেণী ঘোষাল এবং তারিণীর মাধ্যমে প্রকাশিত পল্লীসমাজ একটা অনিবার্য অন্ধ শক্তিও নয়। মহাশক্তিশালী অন্ধ যন্ত্রের মহিমাও তার নেই। সেই যন্ত্রেরই ক্রীড়নক হয়ে রমা রমেশকে দেখা-না-পাওয়া মাত্রই আঘাত করছে এবং দেখা-পাওয়া-মাত্রই ভালবেসে বিগলিত হচ্ছে। এই দোলাচলবৃত্তি দ্বন্দ্ব নয়। একে বড়ো জোর মতিস্থিরতার অভাব বলা যেতে পারে। সুতরাং এই উপন্যাসের পটে রমার প্রেমেরও যেমন কোনো ব্যক্তি-সত্তাশ্রয়ী গভীর মূল নেই, রমার আঘাতেরও তেমনি কোনো প্রাচীন সংস্কার অনুগামী অনিবার্য ভূমিকা নেই। তাই তারকেশ্বরের বাসাবাড়ি এখানে প্রক্ষিপ্ত, আদালতে রমার সাক্ষ্যদান এখানে অযথা করুণ রসের উৎস।

অনুরূপ অসঙ্গতি এবং বৈসাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় সাবিত্রী এবং কিরণময়ীর ক্ষেত্রেও। সতীশ এবং সাবিত্রীর মেসবাড়ির জীবন উপন্যাসের দুর্বলতম বনিয়াদ। সাবিত্রীর আত্মসংযমকে অমানুষিক বলে অনেক সমালোচকের মনে হয়েছে। এই মনে হওয়ার হেতু এই যে আমরা সাবিত্রীর অতীত জীবনটাকে জানি না। রবীন্দ্রনাথের মতো শরৎচন্দ্র কখনই মানুষের গোটা জীবনের প্যাটার্নকে ধরতে

চাননি বা ধবেননি। সেইজন্য শরৎচন্দ্রেব উপন্যাসে বহু কেন-র উত্তব নেই। এব ফলে শবৎচন্দ্র তাদের সাহায্যে অনেক সুন্দর সুন্দব মুহূর্ত বচনা কবেছেন বটে কিন্তু নিখুঁতভাবে চবিত্র সৃষ্টি কবেছেন কম। সাবিত্রী কেন অত চমৎকার বাক্‌পটু অথবা কেন তাব এই অমানুষিক সংযম তা উপস্থাপিত কবা হয়নি এবং প্রতিষ্ঠিত কবা হয়নি। টাইপ এবং ইনডিভিজুয়ালেব দ্বন্দ্বেব ব্যাপার শরৎচন্দ্র কখনও অভিনিবেশেব সঙ্গে ধরবাব চেষ্টা কবেননি। ফলে তাঁব বাঈজীবা কখনও বাঈজী নয়, তাঁব ঝিয়েবা কখনও ঝি নয়, তাব দিদিবা কখনও দিদি নয, কিন্তু সকলেই একটা অন্য কিছু হয়ে সার্থক হতে চায। অর্থাৎ বৌদিবা হয় মায়েব মতো, জ্যাঠাইমা হলেন গুরুব মতো, মেসেব ঝি হল আদর্শ প্রেমিকাব মতো। এই মৌল অসঙ্গতি থেকেই শবৎচন্দ্রেব চবিত্রেব প্রতিষ্ঠা সাধনেব ত্রুটিও ঘটে থাকে। সাবিত্রীব ব্যক্তিত্বেব এমন কিছু প্রমাণ আমবা পেলাম না যাব ফলে কলকাতাব মেসবাড়িব সমস্ত আবহাওয়া মন্ত্র-শান্ত ভুজঙ্গেব মতো সতীশ এবং সাবিত্রীব প্রেমেব আকাশ বচনায় ব্যস্ত থাকবে। সাবিত্রীব চবিত্রকে প্রত্যক্ষভাবে আমাদেব কাছে প্রমাণ কবা হল না, শুধু অন্যদেব তাব সম্বন্ধে ধ্যান-ধাবণাটা কী সেটাকেই ব্যবহাব কবা হল। অপবেব মাধ্যমে চবিত্রকে প্রতিষ্ঠা কবাব চেষ্টা উঁচু দবেব সাহিত্য-কৌশল নয। ডাঃ শ্রীকুমাব বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন : "সাবিত্রী ও বাজলক্ষ্মী সতীত্ব ধর্মেব মূল্য সম্বন্ধে এত সচেতন যে তাহাবা প্রথম বযসেব পদস্খলনেব জন্য আজীবন প্রাযশ্চিত্ত কবিযাছে ও জীবনেব সর্বোত্তম সার্থকতা হইতে নিজদিগকে স্বেচ্ছায বঞ্চিত কবিযাছে।" মাত্র একটা অপবাধবোধেব ওপবে শবৎচন্দ্রেব প্রধান দুটি চবিত্রেব ভিত্তি স্থাপিত এ-কথা বললে শবৎচন্দ্রেব সীমিত কল্পনাকেই স্পষ্ট কবে দেখানো হয়। বিশেষ কবে এই অপরাধবোধেব যখন কোনো গতিশীল ভূমিকা নেই, এগুলোব কাজ যখন শুধু চবিত্রগুলিকে স্থিতি-ধর্মী কবে তোলা অর্থাৎ সর্বৈব ব্যক্তিত্বেব নির্বাপণ, তখন উপন্যাস শিল্পেব বিষয হিসাবে তাবা কোনো গভীব মূল্যেব অধিকাবী থাকে না।

সাবিত্রীব উপস্থাপনায় যে ত্রুটি উগ্রভাবে আত্মপ্রকাশ কবেছে কিবণময়ীব সমগ্র জীবনে তা উগ্রতব। কিবণময়ীব একটা অধ্যাযকেও যদি সত্য বলে ধবা যায় তাহলে তাব দ্বিতীয় অধ্যাযে উপনীত হওযাব পূর্বে দীর্ঘ প্রস্তুতি প্রযোজন। অনঙ্গ ডাক্তাবেব সঙ্গে স্থূল প্রেমলীলায যাকে মনে হয় ইতবশ্রেণীর বমণী, দিবাকরেব সঙ্গে তর্কে তাকে মনে হল মননশীল বৈদগ্ধ্যের আশ্চর্য অধিকারিণী। কিবণময়ীর সমস্ত আচবণগুলি যেন এয়াব-টাইট-কম্পার্টমেণ্টে বিভক্ত। তার

ফল হয়েছে এই যে কিরণময়ীর শেষ পরিণতির শোচনীয়তা আমাদের বিন্দুমাত্র স্পর্শ করে না। কেননা যে নারী ইতর তার জন্য আমাদের কোনো দুঃখ নেই। আবার যে নারী মননশীলা, তার এম্ববিধ আচরণের কোনো মূল্য খুঁজে পাই না। শুধু অভূতপূর্ব বলিষ্ঠ প্রেম ঘোষণার জন্য কিরণময়ীকে যদি তেজস্বিনী বলে ভেবে নিই তাহলে কিরণময়ীর ব্যর্থ পরিণামের একটা ট্র্যাজিক অর্থগৌরব খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু সে ঘোষণাও আত্যন্ত সমর্থনহীন। শুধুমাত্র "অনেক রহস্যই অমীমাংসিত থাকে" এই বলে কিরণময়ীকে ব্যাখ্যা করা যায় না।

"নিষিদ্ধ প্রেমের" বিষয়-সংবলিত উপন্যাস হিসাবে গৃহদাহ শরৎচন্দ্রের সর্বাপেক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ রচনা। অচলার সমস্যা নিঃসন্দেহে একটি মহৎ উপন্যাসের বিষয় হবার উপযুক্ত। সুরেশ এবং অচলার সম্পর্ক ও প্রতিক্রিয়ায় একটি যথার্থ প্রশ্নেরও সৃষ্টি করা হয়েছে। অচলার যন্ত্রণাকে শরৎচন্দ্র রূপদান করেছেন। এবং শেষ পর্যন্ত সেটাই হয়ে দাঁড়িয়েছে এ-উপন্যাসের প্রধান সম্বল। অচলাব অনুশোচনার আগুনে তার সমস্ত ক্ষণিক বিভ্রান্তি পুড়ে গেছে—পাঠক তার সতীত্বকে দৈহিক বলে মনে না করে, মানসিক বলে গ্রহণ করে। সুতরাং এই উপন্যাসটিকে আমরা নিষিদ্ধ প্রেমকে অবলম্বন করে লেখা পাশ্চাত্য সাহিত্যের উপন্যাসেব সঙ্গে রেখে তুলনা করে দেখতে পারি। তাতে গৃহদাহের প্রকৃত মর্যাদার হানি হবে না। পক্ষান্তরে এ-জাতীয় উপন্যাসেব একটা মান খুঁজে পাওয়া যাবে। একটা বিষয় পাঠক মাত্রেই লক্ষ্য করেছেন যে পাশ্চাত্য উপন্যাসে এ-জাতীয় সমস্যাকে যখন ব্যবহার করা হয়েছে তখন লেখকেরা সাধারণত সমস্যার একটা সমগ্র রূপ উপস্থিত করেছেন। নায়িকারা শুধুই পত্নী নন, জননীও বটে। অর্থাৎ একটা নারী-জীবনের সম্ভাব্য দুটো বাঁধনই সে-ক্ষেত্রে বিদ্যমান। সমাজ-নিষিদ্ধ প্রেমেব ব্যাপার এই জীবন-বিন্যাসের ওপরে যে প্রতিক্রিয়া সৃজন করে তা আরো গভীর এবং অর্থবান। আমাদেব সাহিত্যে নারীকে আমরা এমতাবস্থায় মাত্র পত্নী হিসাবে উপস্থিত করেছি। ফলে সতীত্বের বদ্ধ সংস্কাব ছাড়া আর কোনো দৃঢ়মূলে নিষিদ্ধ সমাজ-বিগর্হিত প্রেমের আঘাত এসে পড়ে না। এর একটা গভীর অসুবিধা আছে। সাধারণত এই ধরনের উপন্যাসে দেখা যায় যে স্বামীর জীবনযাত্রার কৃত্রিমতা বা ব্যক্তিত্বের যান্ত্রিকতার ফলে পত্নীর জীবনে একটা প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্র প্রস্তুত থাকে। পত্নীর মনে সেই ছকের কোনো প্রতিষ্ঠা না থাকায় যে প্রেমাখ্যানের শুরু তার যন্ত্রণা খুব বেশি নয়। অর্থাৎ স্বামীর সঙ্গে সম্পর্কের গভীরতার তরতম বিচার স্ত্রীর পক্ষে সম্ভব। সে-ক্ষেত্রে কারেনিনকে অথবা মঁশিয়েবোভারিকে আমরা বলতে পারি

ক্ষীণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী। আনা অথবা এমাব মনে স্বামীদের বিচার করার অবকাশ বর্তমান। কিন্তু এই বিচারে অক্ষম নারী সদাই যেখানে অচ্ছেদ্য সম্পর্কের সূত্রে বাঁধা, সেটা হল সন্তানেব ক্ষেত্র। এই ক্ষেত্রেই নাবীব সবকিছুকে যাচাই কবে দেখা সম্ভব। তা নইলে শুধু দৈহিক শুচিতা বোধেব মূল্য কতটুকু? আব এক-জনেব দাম্পত্য-নীতিবোধের অটলতাই বা কতটা গভীব প্রশ্ন সঞ্চাব কবতে পাবে? বিবণময়ীর পাশে সুববালা অথবা অচলাব পাশে মৃণাল এই প্রসঙ্গে মাত্র সামাজিক নীতিব ব্যক্তিগত প্রতীক।

এবং এই সমগ্রতাব অভাবেই অচলাব দোলাচলবৃত্তি নিবর্থক। কেননা প্রথম থেকেই লেখক যেন বড়ো সতর্ক এই কথাটি বোঝানোব জন্য যে সুবেশ একান্তই মুহূর্তমাযা সৃজন কবেছিল। তা যদি হয়, অচলাব মনেব মধ্যে যদি সুবেশ বদ্ধমূল না হয় তবে শুধু দৈহিক শুচিতাবোধ সংক্রান্ত প্রশ্ন নিযে যতটা অগ্রসব হওয়া সম্ভব ততটা অবশ্য শবৎচন্দ্র এগিযেছেন। কিন্তু "নিষিদ্ধ প্রেমেব" বিষয তো শুধু দৈহিক শুচিতা বোধেব প্রশ্ন নয। এব মূল ব্যক্তিস্বৰূপেব নিভৃত মৃত্তিকায। ব্যক্তিত্বেব গভীবে এব ক্ষেত্র। এবং সেখান থেকে উৎসাবিত না হলে এ-সমস্যা কখনো জ্বলন্ত হতে পারে না। সুবেশ এবং অচলাব সম্পর্ককে প্রতিষ্ঠিত কববার কোনো বকম প্রচেষ্টা ব্যতিবেকেই উপন্যাস আবম্ভ হবাব উনচল্লিশ পাতাব মধ্যেই সুবেশ এবং অচলাব ব্যবহাবে আতিশয্য সৃজন এই কাবণেই শিল্পসম্মত হয়নি। প্রথম থেকেই অচলা সুবেশ সম্পর্কে "ব্যাধভীত হবিণী এবং সুবেশ যেন তাহাকে ছোঁ মারিয়া ধবিতে চায"। সুবেশ তাব আগের দিন পর্যন্ত ব্রাহ্মদেব সম্বন্ধে বিমুখ। এবং সে অচলাব সঙ্গে কথাবার্তায় দূবত্ব বজায বেখে চলেছে। সে হঠাৎ এক লহমায় ব্রাহ্মবাড়িতে অচলা হাতে ক'বে দিলে খেতে বাজী হলে তা শিল্প-সঙ্গতি বক্ষাব কোনো নিয়মকেই পালন কবে না। শবৎচন্দ্র সুবেশকে দিয়ে ব্যাপারটাব ব্যাখ্যা করিয়েছেন এইভাবে যে "একদিনেব ভূমিকম্পে অর্ধেক দুনিয়াটা পাতালেব মধ্যে ডুবে যেতে পাবে"। কিন্তু সুবেশেব ব্যাখ্যা ছাড়াও উপন্যাসে একটা ব্যাখ্যাব প্রয়োজন হয়। শিল্পেব ন্যায় অনুসবণ কবেই সেই ব্যাখ্যা আমাদেব প্রত্যযকে গড়ে তোলে। শবৎচন্দ্র জীবনেব আকস্মিকতাকে শিল্পে আনতে গিয়ে শিল্পেব ন্যাযকে লঙ্ঘন কবেছেন। ফলে এক বাত্রির অনিদ্রাতেই ঘটনাটা যা দাঁড়াল তা এই :

> একে এই গবম, তাহাতে এত বেলা পর্যন্ত স্নানাহাব নাই—গত রাত্রে এতটুকু ঘুমাইতে পাবে নাই—তাহাব পায়েব নিচেব মাটিটা পর্যন্ত যেন

অকস্মাৎ জ্বলিয়া উঠিল। আরক্ত দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিল, ব্রাহ্মদের ঘৃণা করি কি না, সে জবাব ব্রাহ্মদের দেব, কিন্তু আপনি আমার কাছে তাদের অনেক, অনেক উপরে—তাহার উন্মাদ ভঙ্গিতে অচলা ভয়ে কাঠ হইয়া উঠিল। কোনোমতে প্রসঙ্গটা চাপা দিবার জন্য সভয়ে কহিতে গেল—বেহারাটা—

কিন্তু সে অস্ফুট মৃদুস্বর সুরেশের উত্তপ্ত উচ্চকণ্ঠে ঢাকা পড়িয়া গেল। সে অমনি তীব্র স্বরে কহিতে লাগিল, দুটো দিনের পরিচয়! তা বটে! কিন্তু জানো অচলা, দিন, ঘণ্টা, মিনিট দিয়ে মহিমকে মাপা যায়—কিন্তু সুরেশকে যায় না। সে স্থান কালের অতীত! তুমি ভূমিকম্প দেখেছ? যা পৃথিবী গ্রাস করে—

এবং এর পরেই সুরেশ কর্তৃক অচলাকে আলিঙ্গন। শরৎচন্দ্র নিজেও বুঝতে পেরেছিলেন যে এ অতিশয় দুর্বল অংশ। কাজেই সুরেশকে উন্মাদ বিশেষণে ভূষিত করে শেষ পর্যন্ত সে উন্মত্ততার কারণ ব্যাখ্যায় চিকিৎসকের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। সুরেশের আতিশয্যের হেতু হিসাবে তিনি শেষরক্ষার জন্য দেখিয়েছেন গ্রীষ্মাধিক্য, অধিক বেলা পর্যন্ত স্নান এবং আহারের অভাব ও পূর্ব-রাত্রের অনিদ্রা। অতএব সুরেশের আকস্মিক আতিশয্য কিছুটা সর্দিগর্মির ব্যাপারের মতো পূর্বাভাসরহিত। এই সুরেশকে অচলা ভালবেসেছিল। কিন্তু সে বিয়ে করেছিল মহিমকে। ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গৃহদাহ প্রসঙ্গে বলেছেন যে মহৎ চিত্তে অনিচ্ছাকৃত পাপের প্রতিক্রিয়া গৃহদাহের মূল বিষয়। শুধু অনিচ্ছাকৃত পাপের প্রতিক্রিয়া বললে আমরা অবশ্যই ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে একমত। কিন্তু মহৎ চিত্ত কথাটিতে আমাদের বড়ো আপত্তি। অচলা এবং সুরেশের সাহায্যে বরং আমরা এই সিদ্ধান্তে সহজে আসতে পারি যে দুর্বল চরিত্র ব্যক্তিদের পাপানুশোচনার চিত্র গৃহদাহ উপন্যাসে রূপায়িত হয়েছে।

শুধু যদি শরৎচন্দ্র এই কথাটি মনে রাখতেন, অযথা বর্ণারোপের ভাবালুতার প্রশ্রয় না দিতেন তবে গৃহদাহ শরৎচন্দ্রের তো বটেই বাংলা সাহিত্যেও একটা অসামান্য কীর্তিস্তম্ভ বলে পরিগণিত হত। অযথা বর্ণারোপের মূলে রয়েছে উপন্যাসের কাঠামোর অসঙ্গতি, এবং সেই অসঙ্গতির মূলে রয়েছে বক্তব্য বিষয় সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের অস্পষ্ট ধারণা। যে দোলাচলবৃত্তির কথা অচলা প্রসঙ্গে বলা হয়ে থাকে তাকে উপন্যাসে প্রমাণিত হবার কোনো সুযোগ শরৎচন্দ্র দেননি। সুরেশ সম্বন্ধে অচলার আগ্রহ কতটা এটা প্রতিপন্ন করতে গেলে সুরেশ-বিরহিত

পবিবেশ অচলার পক্ষে এ-উপন্যাসে বিশেষ প্রয়োজনীয় ছিল।| উপন্যাসের প্রথমাংশে অচলাকে কটূক্তি কবার পব স্নবেশের বিদায় ও ইত্যবসবে মহিমের ও অচলার বিবাহে সে সুযোগ পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু সুবেশকে মহৎ প্রতিপন্ন কবাব জন্য ফয়জাবাদেব প্লেগ ও অগ্নিকাণ্ডে সুবেশের ত্রাণকতাব ভূমিকা গ্রহণেব কাহিনী সৃজন ও সে-কথা সংবাদপত্রে পাঠ কবাব পব অচলাব শ্রদ্ধাপ্লুত দৃষ্টিব সম্মুখে অকস্মাৎ সুবেশেব আবির্ভাবে সে সুযোগ নষ্ট হল। এদিকে মহিমের জন্যও অচলাকে কোথাও অপেক্ষা কবতে হল না। অচলাব পাশে পাশে সুবেশেব সতত উপস্থিতিব ফলে সুবেশ অচলাকে অভিভূত কবতে সক্ষম সেটা বোঝা গেল। বোঝা গেল না সুবেশ কতখানি অচলাব সত্তাব গভীবে আলোড়ন সৃষ্টি কবেছে। অচলাব পক্ষে এটা যদি শুধু অন্ধ আবেগ হয় তা হলে আব সুরেশেব জন্য ফয়জাবাদেব মহত্ত্ব বচনাব দবকাব হয় না। যদি এটা অচলাব প্রেম হয় তাহলে বিস্তৃততর এবং গভীবতব পবীক্ষায তাকে স্থাপন কবা দবকাব।(অচলা জীবনধর্মেব কোন্ বৃহত্তব আবেগে সুবেশকে ভালবাসল তা এ-উপন্যাসে কোথাও স্পষ্ট নয়। সুতরাং মহিমেব সম্বন্ধে তাব শ্রদ্ধাব বোধেব স্বরূপ কী এবং সুবেশ সম্বন্ধে তাব আকর্ষণবোধেব অর্থ কী এ-সম্বন্ধে কোনো ধাবণা অচলাব নেই, অচলাব স্রষ্টাবও নেই। অস্থিবমতি ব্যক্তিব সর্ববিধ দৌর্বল্যে অচলা চিহ্নিত। কাজেই সুবেশেব ক্ষেত্রেও সুবেশেব কেউ নেই এই নিঃসহায় অবস্থাব সাহায্যে তাব প্রতি অচলাব এবং পাঠকেব দৃষ্টি ও সহানুভূতি আকর্ষণেব চেষ্টা শবৎচন্দ্রেব মৌল অসঙ্গতিবই ফল।

এই সমস্ত অসঙ্গতিব ফলে বোঝা গেল না কেন অচলা সুবেশকে দীর্ঘ বেলযাত্রায় তাদেব সঙ্গী হতে বলেছিল। কাজেই অচলা যখন সুবেশেব পা জড়িয়ে ধরে মহিমেব জন্য ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞাসা কবে "কোথায় তিনি ? তাকে কি তুমি ঘুমন্ত গাড়ি থেকে ফেলে দিয়েছ ? বোগা মানুষকে খুন কবে তোমাব—" তখন অচলার উচ্ছ্বাসময় উক্তিতে পীড়া অনুভব না কবে উপায থাকে না। বিশেষ কবে বোগা মানুষকে খুন কবা প্রসঙ্গটি হাস্যকরও বটে। যেন অচলাব মহিমেব প্রতি সহানুভূতি শুধু মহিম রুগ্ন বলেই। শবৎচন্দ্র অবশ্য এই উক্তিব সাহায্যে মহিমের প্রতি অচলাব আকর্ষণেব বোধে যে কোনো খাদ নেই সেটা প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন। কিন্তু যখন মহিম রোগা হলেই মহিমেব প্রতি সহানুভূতি বাড়ে এবং সুরেশ অসুস্থ হয়ে পড়লেই সুবেশেব কাছে থেকে যেতে হয় তখন বড়োজোর সে চবিত্রকে আমবা বলতে পাবি সেবা-ধর্মে উৎসর্জিত প্রাণ। উক্ত দুই ক্ষেত্রেই

অস্বস্থ মানুষের প্রতি সহানুভূতিকে, নারীর স্বাভাবিক জীবনাচরণ-বিধিকে শরৎচন্দ্র ব্যবহার করেছেন প্রেমানুভূতির প্রকাশ-মাধ্যম রূপে। এই অতিব্যবহৃত শরৎচন্দ্রীয় ছক অন্তত এই উপন্যাসের ক্ষেত্রে একেবারেই ব্যর্থ হয়েছে। বক্তব্য বিষয়ের অস্পষ্টতার জন্যই অভ্যস্ত কৃত্রিম কৌশলে অচলার দোলাচলবৃত্তিকে শরৎচন্দ্র রূপায়িত করতে গেছেন। জ্বরে অচেতন সুরেশকে মৃত বলে মনে করে অচলার যে ভাবনা তাও এই কারণে অচলার পক্ষে যথার্থ হয়নি। সুরেশের জন্য তখন অচলার যে চিন্তা তার মূল সূত্র এ-উপন্যাসে কোথাও লেখক স্পষ্ট করে তোলেননি। সেখানে অচলার ভাবনার মূল বক্তব্য এই যে "যে তাহারই জন্য এত বড়ো দুর্নামের বোঝা মাথায় লইয়া, হতাশ্বাসে এমন করিয়া, এই পৃথিবী হইতে চিরদিনের তরে বিদায় লইয়া গেল, অপরাধ তাহার যত গুরুতরই হোক, তাহাকে মার্জনা করিতে পারে না এত বড়ো কঠিন হৃদয় সংসারে অল্পই আছে।" এখানেও অচলার সহানুভূতিই প্রধান কথা। এই শুধু এখানে বোঝা গেল যে সেই অল্পসংখ্যক কঠিন হৃদয়ের মধ্যে অচলা পড়ে না। এ রোহিণী বা বিনোদিনীর জীবন-পিপাসা নয়, আনা কারেনিনা বা মাদাম বোভারির প্রচলিত ছকেব বিরুদ্ধে বিদ্রোহও নয়, এ বাস্তবিকপক্ষে একটি দুর্বল ব্যক্তির অপরাধচেতনার গল্প —যে ব্যক্তি লৌকিক সম্ভ্রমের অনুরোধে যার সম্বন্ধে তার বিতৃষ্ণার পাত্র পূর্ণ হয়েছে অনিচ্ছায় তারই শয্যা-সঙ্গিনী হয়। সুতরাং অচলার ভুল এবং ভুল সংশোধনের জন্য অনুতাপ এই দুয়েরই কোনো নৈতিক ভিত্তিভূমি নেই।

সুতরাং সমাজ-অনুমোদিত নয় এমন সব প্রেমের ব্যবহার শরৎচন্দ্রেব উপন্যাসে ঘন ঘন ঘটলেও, সেগুলির তাৎপর্য অধিক নয়। বিশ্লেষণের ক্ষেত্রকে তিনি এমন সব মোটা দাগে ভাগ করে নিয়েছিলেন যেখানে বিশ্লেষণ শেষ পর্যন্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে যান্ত্রিক। সেই যান্ত্রিকতাকে পরিহাব কবাব জন্য পাঠকদের উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীর প্রতি সহানুভূতিশীল করে তোলার আয়োজনেই শরৎচন্দ্রেব ষোলো আনা চেষ্টা নিযোজিত। মহৎ ঔপন্যাসিকেরাও পাঠকদেব কাছ থেকে তাঁদের সৃজিত চরিত্রাবলীর জন্য সহানুভূতি প্রত্যাশা করে থাকেন। তাঁদের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের এবং শরৎচন্দ্রের ছায়ানুসারী চল্লিশ-পঞ্চাশের বাঙালী ঔপন্যাসিকদের তফাত এইখানে যে মহৎ ঔপন্যাসিকেরা তাঁদের সৃজিত চরিত্রদের সাহায্যে যেটা করে থাকেন, শরৎচন্দ্র এবং তার অনুসারীরা সেটা করতে চান পাত্র-পাত্রীদের জীবনের কতকগুলো অবস্থার সাহায্যে। আমাদের সহানুভূতিটা জাগ্রত হয় চরিত্রদের জীবনের কতকগুলি পরিস্থিতি প্রসঙ্গে। দেবদাসের যক্ষ্মা, সুরেশের

নিউমোনিয়া—এবম্বিধ হাজার রকমের পরিস্থিতি (জ্ঞানদার মুখে সিঁদুর মেখে বসাও এই পর্যায়ে পড়ে) সৃজন করে পাঠকদের চোখের অশ্রুবাহী শিবার ওপর প্রবল প্রতিক্রিয়া সৃজন করতে শবৎচন্দ্র ছিলেন সিদ্ধহস্ত। শবৎচন্দ্রেব সঙ্গে গত দুই দশকের ঔপন্যাসিকদেব তফাত এইখানে যে এ-প্রসঙ্গে অন্তত শবৎচন্দ্রের প্রচেষ্টা ছিল খাঁটি এবং আন্তরিক। এ-যুগেব শবৎ ছায়ানুসাবীবা সে-ক্ষেত্রেও কেমন কৃত্রিম, বর্তমান গ্রন্থের শেষ পরিচ্ছেদে সে-কথা আলোচনা করা যাবে।
উপন্যাসেব অন্বিষ্ট যে সমগ্র জীবনবোধ সে সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের ধাবণাব ব্যত্যয় নানা ভাবে তাঁব উপন্যাসেব শিল্পকর্মকে ক্ষতিগ্রস্ত কবেছে। পূর্ব অনুচ্ছেদে কথিত পবিস্থিতি-প্রিয় মনোভাবেব উত্তম অভিব্যক্তি তাঁর সমাজ আবিষ্কাবেব চেষ্টাতেও প্রতিফলিত। মাত্র আন্তবিকতা বা শুভেচ্ছা যে ঔপন্যাসিকেব প্রধান সম্বল হতে পাবে না এটা তাবই প্রমাণ। এখন আমবা শবৎচন্দ্রেব পল্লীসমাজ চেতনার স্বরূপ সম্বন্ধে অবহিত হবাব প্রয়াস পাব।

•• চাব ••

আংশিকতাই একজন ঔপন্যাসিকেব প্রধান ত্রুটি। যে পটবিধৃত জীবন সার্থক উপন্যাস রচনাব অন্যতম শর্ত সেই পট অথবা বিধৃত জীবনে আংশিকতা সমস্ত শিল্পকর্মকে নষ্ট কবে। শবৎচন্দ্র কেমনভাবে এই পটবিধৃত জীবনকে শিল্পে ব্যবহাব করেছেন তার ভিতবেই প্রকাশিত তাঁব মানসোৎকর্ষ। উপন্যাসেব বিচাবে সেই মানসোৎকর্ষেব বিচাব হয়। শবৎচন্দ্রেব পল্লীসমাজবোধেব পূর্ণ চেহাবা নানাভাবে নানা উপন্যাসে উপস্থিত থাকলেও প্রধানত পল্লীসমাজ, পণ্ডিত মশাই ও অবক্ষণীয়ায ব্যবহৃত সমাজচিত্র শবৎচন্দ্রের খ্যাতিব কাবণ। আমাদেব আলোচনা পল্লীসমাজে-ব্যবহৃত সমাজচিত্রেব মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।
গ্রামসমাজকে ব্যবহাব বাংলা কথাসাহিত্যে নতুন নয়। নতুন হওযা সম্ভবও নয। স্বর্ণলতার গ্রামকেন্দ্রিক পাবিবাবিক উপন্যাসে, বমেশ দত্তেব সমাজ ও সংসাবেব চিত্রে গ্রামের ব্যবহাব আমবা দেখেছি। কিন্তু গোটা দেশীয় জীবনেব অংশ হিসাবে গ্রামজীবনের উপস্থাপনা এবং তাকে শিল্পসূত্রে গেঁথে নেওয়া ববীন্দ্রনাথের পূর্বে আব কোনো লেখকের হাতে ঘটেনি। গল্পগুচ্ছেব অসংখ্য গল্প এবং গোরা এ-প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণীয়। ববীন্দ্রনাথের কাছে গ্রামসমাজের সমুদয় অবস্থার উপলব্ধি যে ভাবে হয়েছিল তাব তাৎপর্য শরৎচন্দ্রেব থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। এ-কথা সকলেবই জানা আছে যে স্বদেশী যুগে স্বদেশী সমাজ-বিষয়ক নানা চিন্তায়

রবীন্দ্রনাথ ব্যাপৃত ছিলেন। আমাদের সমাজের পঙ্গু অবস্থা কেমন করে আবার নব স্বাস্থ্যের সঞ্চারে পরিপূর্ণ হবে তা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ বহুভাবে ভেবেছেন। আমাদের গ্রামসমাজ সম্বন্ধে চার্লস মেটকাফের মূল্যায়নের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের চিন্তারও কিছু সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। রাষ্ট্রনিরপেক্ষতা যে আমাদের প্রাচীন সমাজের মৃত্যুঞ্জয়ী শক্তির একটা দিক এবং নিজের ভিতর থেকেই আয়ু সঞ্চয় করে বেঁচে থাকবার একটা অদম্য ক্ষমতা প্রাচীন গ্রাম সমাজের ছিল এ-কথা রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন। "রাজলক্ষ্মী" নয় "সমাজলক্ষ্মী"ই ছিলেন আমাদের উপাসনার লক্ষ্য। সমাজের সেই হৃত স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পনার সঙ্গে মতানৈক্যের অবকাশ থাকতে পারে। কিন্তু কায-কারণ সূত্রকে মিলিয়ে রবীন্দ্রনাথ সমস্যার গোটা রূপটাকেই বুঝতে চেয়েছিলেন। তাঁর গল্প-উপন্যাস এ-কথার মহৎ সাক্ষ্য। রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন যে আমাদের সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক নেই এমন এক রাষ্ট্রশক্তির বৈশ্য-শকট-চক্রের তাড়নায় অনিবার্যভাবে আমাদের প্রাচীন গ্রামসমাজ হয়েছে পরাভবমুখী। রবীন্দ্রনাথকে প্রথমে যেটা আকৃষ্ট করে সেটা হল অনাত্মীয় রাষ্ট্রশক্তির সামনে প্রাচীন গ্রাম জীবনের প্রতি মুহূর্তের পরাভব, লাঞ্ছনা এবং যন্ত্রণা। মেঘ ও রৌদ্র গল্পে ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশে ম্যাজিস্ট্রেটের মেথর যখন ব্রাহ্মণ হরকুমারকে কান ধরে ঘোড়দৌড় করালো, সেই ঘটনার তাৎপয রবীন্দ্রনাথের কাছে জাতি-ভেদ-কণ্টকিত গ্রামে ক্ষীণজীবী ব্রাহ্মণের প্রতাপের অভিনয় অপেক্ষা অধিক গভীর বলে মনে হয়েছে। আমরা পূর্বে আলোচনা করে দেখিয়েছি যে অপমানিত নায়েবের সমস্তটাই নায়েব, সামান্যাংশে মাত্র সে ব্রাহ্মণ। কাজেই ব্রাহ্মণের প্রেস্টিজকে ওপরওয়ালা অফিসার যখন ধূল্যবলুণ্ঠিত করে তখন সামান্যাংশের ব্রাহ্মণের ক্ষোভ অচিরেই নায়েবাংশের কাছে পরাভূত হয়। রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন যে গ্রামীণ জীবনের করুণ বিড়ম্বনা ঐখানে। এ নয় শুধু নিমন্ত্রণ বাড়ির দলাদলি অথবা চণ্ডীমণ্ডপী ঘোঁট অথবা শুধুই অকারণ মূঢ়তা। একটা একদা শক্তিশালী অতিকায় সত্তাকে বিদেশী রাষ্ট্রশক্তি কেমন করে মেরে ফেলেনি কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের তৃণমুষ্টি ভক্ষণ করিয়ে তাকে বেঁধে রেখেছে জীবন্তে অর্ধমৃত—তারই যন্ত্রণা রবীন্দ্রনাথ অনুভব করেছিলেন। সেজন্য শুধু পাড়াগেঁয়ে নীচতা ও সংকীর্ণতাকে তিনি চিত্রণের বিষয় করেননি। পল্লীসমাজের পরিবেশ বলতে কেবল পল্লীর ভূমি-নির্ভর পর-শ্রমজীবীদের কথাই তিনি ভাবেননি। তিনি দেখতে চেয়েছিলেন বিশ্লিষ্ট গ্রাম-সমাজের শোচনীয় দীর্ণতাকে। শরৎচন্দ্রের পল্লীসমাজে আমরা সমস্যার অতি

সামিত রূপ প্রত্যক্ষ করি। সমস্যাটা যে শুধু লোকগুলিব ভালো-মন্দ হবার সমস্যা নয়, এবং কেউ ভালো হয়ে গেলেই যে সমস্যার মীমাংসা হয় না—সে কি ব্যক্তি-জীবনে, কি সমাজ-জীবনে—শবৎচন্দ্র তা নিয়ে কখনো মাথা ঘামাননি। কী সেই তৎকালীন গ্রামীণ অর্থনৈতিক কাঠামো যাব অনিবার্য পবিণতিতে প্রাচীন গ্রামসমাজেব অন্তর্নিহিত শক্তিগুলিব পবস্পব সম্পর্কেব ভাঙন শুরু হয়েছে, শবৎচন্দ্র সে সম্বন্ধে কোনো জিজ্ঞাসা তোলেননি। তিনি দেখেননি যে সমস্যাব একটা সামগ্রিক স্বরূপ না উপলব্ধি কবলে সমস্যাব লঘুকবণেব দিকে প্রবণতা সহজে আসে। ইংবাজ আগমনেব পব ভূমিজীবী গ্রামীণ মধ্যবিত্তেব সঙ্গে যখন গ্রামের কৃষক, কামাব, ছুতোব, মুচি, মেথবেব সঙ্গে প্রাচীন সম্পর্ক-সূত্র শিথিল হয়ে গেল তখন শুধু বর্ণাশ্রম পবিচালিত সমাজেব দুর্দশা শুরু হল না, সেটাই হয়ে দাঁড়াল প্রকৃত পক্ষে জাতীয় দুর্গতি। কলকাতামুখী মধ্যবিত্তের চেহারা বমেশ দত্ত সামাজিক উপন্যাসে অচেতনভাবে যথার্থ অঙ্কন কবেছেন—'গ্রামে থাকিলে উন্নতি নাই।' তাই মধ্যবিত্তের যে অংশ কলকাতায় লেখাপড়া শিখতে গেল তাদেবই আত্মীয়-স্বজনেরা সমাজ রক্ষার্থে অভিভাবক হলেন। কিন্তু কর্ণওয়ালিসেব ভূমি-ব্যবস্থার ফলে গ্রামীণ মধ্যবিত্তশ্রেণীব সঙ্গে গ্রামীণ সাধাবণেব মধ্যে যে ফাটল সৃজিত হল সেই দুবতিক্রম্য ফাটলেব একদিকে বইলেন গ্রামীণ মধ্যবিত্ত, ভূস্বামী, পুবোহিত, মোল্লা আব অপব দিকে বইল গ্রামেব প্রাচীন অর্থনৈতিক জীবনেব প্যাটার্নের ভগ্নাবশেষকে বুকে নিয়ে কৃষক, কামাব, ছুতোব, নাপিতেবা এবং প্রভৃতিরা। ববীন্দ্রনাথ সব সময় এই ফাটলবে দেখাতে চাইতেন, সমস্যাব মূল নির্ণয় করতে চাইতেন এখানে। গোবা উপন্যাসে চবঘোষপুবেব উৎসন্ন গ্রাম সমাজের স্বরূপ তিনি সে কাবণে বৃহৎ উপকবণ ব্যতীত প্রস্ফুট কবতে পেবেছেন। বড়ো কথা এটা নয় যে গোবা বা গোবাব সঙ্গী বমাপতি নাপিতেব ঘবে জল খেতে সম্মত হয়নি। শুধু এই সূত্রটুকু অবলম্বন কবে ববীন্দ্রনাথ জাতিভেদেব নিদারুণ কুফল সম্বন্ধে আমাদেব সচেতন কবতে চাননি। তিনি দেখিয়েছেন নাপিতও গোবাকে পানীয় জল দিতে ইচ্ছুক ছিল না। এই ব্যাপাবটা একটা বহু কালাগত জীবনাচবণ-বিধি। সমস্যাটা এখানে নয়। ববীন্দ্রনাথ সমস্যাটাকে দেখিয়েছেন তাব একটু পবেই। যেখানে নায়েব মাধব চাটুজ্যেব ঘবে বিশ্রম্ভালাপবত দাবোগাকে তিনি উপস্থিত কবেছেন। নীলেব হাঙ্গামায় পুলিস অবশ্যম্ভাবী-রূপেই জমিদাবেব বক্ষক হিসাবেই আবির্ভূত হবে। নায়েবেব ঘরে দারোগা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তেব দবোয়ানের মতো অপবিহার্য। কিন্তু ববীন্দ্রনাথ মাত্র

এইটুকু বলে সমস্যাহত জীবনের রূপনির্ণয়কে পরিহার করেননি। ভালো নায়েব আছে, ভালো জমিদারও আছে, ভালো দারোগাও আছে। প্রশ্নটা কারুর ভালো হয়ে যাওয়া বা মন্দ হয়ে যাওয়ার নয়। এই পরিচ্ছেদের পরে রবীন্দ্রনাথ গোরার সঙ্গে ম্যাজিস্ট্রেট ব্রাউনলো সাহেবের সাক্ষাৎকার ঘটিয়েছেন। ব্রাউনলো সাহেব গোরা অপেক্ষা স্বভাবতই শাসনযন্ত্রের দারোগা নামক সেই ছোট বল্টুটিকে বেশি বিশ্বাস করেন। দারোগার কাছ থেকে তিনি গ্রামের যে চিত্র সংগ্রহ করেছেন তারই ফলে সাতচল্লিশজনকে পুলিসের কর্তব্য-কর্মে বাধা দেওয়ার জন্য, দাঙ্গা মারপিটের জন্য হাজতে যেতে হল। কিন্তু এটুকুও যে-কোনো সাধারণ ঔপন্যাসিকের হাতে পড়লে হতে পারত শুধুই বিদেশী রাজার পুলিসী দাপটের কাহিনী। কিন্তু ব্রাউনলো সাহেব, দারোগা ও নায়েবের অক্টোপাশে বন্দী গ্রামের মানুষের যে ছবি লেখক ইতিমধ্যে অপূর্বভাবে শিল্প-সমৃদ্ধ করে গড়ে তুলেছেন তা অবিস্মরণীয়। গ্রামের সাধারণ মানুষের বীর্যবত্তার প্রতীক হিসেবে একদিকে যেমন ফরু সর্দার অপর দিকে তেমনি সেই নাপিত। সেই নাপিতের লৌকিক জীবনবোধের যে পরিচয় রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেছেন তা বিশেষ অনুধাবনযোগ্য। ফরু সর্দার নীলকুঠির সাহেবকে আঘাত করার পর জেলে চলে গেলে সারা গ্রামে যখন পুলিসের অত্যাচার নেমে এল সেই সময় নিরাশ্রয় মাতৃহীন ফরুর সন্তান তমিজকে নাপিত এবং তার বৃদ্ধ পত্নী আশ্রয় দেয়। গোরা এ-সম্বন্ধে প্রশ্ন করায় নাপিত জবাব দিয়েছিল যে "হিন্দুর হরি ও মুসলমানের আল্লায় কোনো তফাত নেই"। যে প্রাণময়ী শক্তি দীর্ঘকাল ধরে বাংলার লোক-জীবনকে লালন করে আসছে ক্ষিতিমোহনবাবুর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথও আমাদের লোকধর্ম ও লোকসাহিত্যে, এবং লোকজীবনের ধর্মসাধকদের সাধনায় সেই শক্তির উৎস সন্ধান করেছিলেন। যে অন্তরময় ঐক্যসূত্র একদা গ্রাম জীবনকে ভিতরের দিক থেকে আশ্লিষ্ট করে রেখেছিল সেই লোকজীবন-গত প্রাচীন ঐতিহ্যকেই আমরা বিস্মৃত হয়েছি এবং ম্যাজিস্ট্রেট, দারোগা এবং নায়েবের সমস্ত কুঠারাঘাত গিয়ে পড়েছে সেই জীর্ণ বনস্পতির শিথিল মূলে। তখন গোরার বিচ্ছিন্নতার যন্ত্রণা আমাদের কাছে আর নির্বস্তুক নয়, সে যন্ত্রণাকে আমরা যেন হাতে করে অনুভব করতে পারি। ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা এবং ঐতিহ্যের সচেতন নবমূল্যায়ন মহৎ সাহিত্যের লক্ষণ। চরঘোষপুরের উৎসন্ন গ্রাম সমাজকে রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি প্রসঙ্গসূত্রে নিবিড়ভাবে বিধৃত আঁচড়ে এমন এক মূল্যে মূল্যবান করে তুলেছেন যে সেই মূল্যে আমরা তখন স্বদেশের গ্রাম সমাজের

একটা নির্দিষ্ট প্যাটার্নকেই লাভ করি। এ-সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের চেতনা কতখানি ব্যাপক ও গভীর ছিল আত্মশক্তি গ্রন্থের স্বদেশী সমাজ প্রবন্ধে তার প্রমাণ পাই :

> এখনই আরম্ভ করিতে হইবে। যত শীঘ্র পারি, আমরা যদি সমস্ত দেশকে কর্মজালে বেষ্টিত করিয়া আয়ত্ত করিতে না পারি, তবে আমাদের চেয়ে যাহাদের উদ্যম বেশি, সামর্থ্য অধিক, তাহারা কোথাও আমাদের জন্য স্থান রাখিবে না। এমন-কি, অবিলম্বে আমাদের শেষ সম্বল কৃষিক্ষেত্রকেও অধিকার করিয়া লইবে, সেজন্য আমাদের চিন্তা করা দরকার। পৃথিবীতে কোনো জায়গা ফাঁকা পড়িয়া থাকে না, আমি যাহা ব্যবহার না করিব অন্যে তাহা ব্যবহারে লাগাইয়া দিবে, আমি যদি নিজের প্রভু না হইতে পারি অন্যে আমার প্রভু হইয়া বসিবে, আমি যদি শক্তি অর্জন না করি অন্যে আমার প্রাপ্যগুলি অধিকার করিবে, আমি যদি পরীক্ষায় কেবলই ফাঁকি দিই তবে সফলতা অন্যের ভাগ্যেই জুটিবে —ইহা বিশ্বের অনিবার্য নিয়ম।

প্রাচীন গ্রামজীবনের অর্থনৈতিক বনিয়াদ যে কৃষিকে আশ্রয় করেই টিঁকেছিল এবং সেই শেষ সম্বল কৃষির পুনঃসংস্থারের ভেতর দিয়েই যে বিদেশী গভর্নমেন্টের প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি হিসেবে গ্রামসমাজকে পুনরুজ্জীবিত করা যাবে রবীন্দ্রনাথ এটা বিশ্বাস করতেন। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ আরো জানতেন যে নবোদিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সঙ্গে দেশের বৃহৎ অংশের ব্যবধানজনিত মূঢ়তার অভিশাপ গ্রাম এবং শহর প্রভেদ করে চলে না। কলকাতায় গোরার বন্ধু অসাম স্বাস্থ্যবান পঞ্চু কেবল ছুতোরের ঘরের অসীম মূঢ়তার জন্য মরে। একই উৎস-নিঃসৃত অভিশাপের বলি দানে গোরা দেশটার পঙ্গু অবস্থাকে বুঝতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। পঞ্চুর মৃত্যু তারই নিদর্শন।

সে-ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্র কদাচ সমস্যার সমগ্র রূপকে ধরতে চেয়েছেন। এ-ক্ষেত্রে তার প্রথম ত্রুটি এই যে পল্লীসমাজের সমস্যাটা যেন কতকগুলো রীতি-নীতি, আচার-আচরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কতকগুলো কুপ্রথার সমষ্টিতেই যেন সমস্যার রূপ নির্ণয় হয়ে গেল। ফলে উদ্ভূত হয়েছে তার এ-সংক্রান্ত দ্বিতীয় ত্রুটি— কতকগুলি ব্যক্তির দিকে আঙুল দেখিয়ে তিনি বলে দিয়েছেন যে এরাই হল সংকীর্ণতার আধার, সমস্যার উৎস। আমরা আগেই বলেছি যে এ-অবস্থায় সমস্যার সরলীকরণ হয়, উপন্যাসের উপাদান সামগ্রিকতা থেকে বঞ্চিত হয় উপন্যাসের পট। বেণী অথবা তারিণী যদি সমস্যার পূর্ণ রূপ হয় তা হলে রমা এবং রমেশের নিজেদের দ্বন্দ্ব এবং যন্ত্রণার ঘনীভূত তীব্রতা হাস্যকর পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছয়। শরৎচন্দ্র তাই

করেছেন। অত্যন্ত ক্ষীণ এবং মোটেই প্রতিনিধিস্থানীয় নয়, এমন অংশকে সমগ্রের প্রতিভূ বলে মনে করেছেন। অন্য ক্ষেত্রে—যথা পণ্ডিতমশাই উপন্যাসে চরণের মৃত্যুর পূর্বে গ্রামের মহামারী উপলক্ষে অসামান্য গ্রাম্য মূঢ়তার সম্মুখবর্তী নায়কের অবস্থাকে, পূর্বোক্ত কারণেই, মনে হয় একটা সৎ লোকের দুর্গতি মাত্র। এবং এই ভাবেই, এই আংশিকতার জন্যই, এই সমস্যাগত অস্পষ্টতার কারণেই বোঝা গেল না বিশ্বেশ্বরীব বেদনার উৎস কোথায়, বোঝা গেল না চিরপ্রবাসী রমেশ কী করে গ্রামে এসেই সমস্যাজীর্ণ গ্রামবাসীকে ভালবেসে ফেলল। কিংবা সমস্যা বলতে সে কী বুঝল? তাই এও বোঝা গেল না যে হঠাৎ কারান্তরাল থেকে বেরিয়ে এসে কোন্ মন্ত্রবলে রমেশ দেখল পল্লীসমাজ এবার আদর্শ সমাজের দিকে অগ্রসর হতে চলেছে। সমস্যার সরলীকরণের জন্য সমাধানও অত্যন্ত সরল পথে এসেছে। তার ফলে চরিত্রগুলি কোনো দৃঢ় বনিয়াদের ওপর দাঁড়াতে পারেনি। তারাও থেকে গেছে লেখকের ভাবাবেগ সৃষ্টির উপায়ক্রম। রমা কেন রমেশের বিদ্যোৎসাহিতায় অথবা শিক্ষা বিস্তারের প্রয়াসে সুখী হয় তা বোঝা মুশ্‌কিল। এ যদি শুধু প্রেমিকের কীর্তিতে প্রচ্ছন্ন আনন্দোপভোগ হয় তা হলে তারও একটা সঠিক প্রস্তুতিভূমি প্রয়োজন। শরৎচন্দ্র সেই প্রস্তুতিভূমি রচনা ব্যতিরেকেই রমার দোদুল্যমানতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। আংশিকতার প্রধান দোষ আকস্মিকতা। তাই রমা এবং রমেশের প্রথম সাক্ষাৎকার থেকেই রমা রমেশ সম্বন্ধে দুর্বোধ্য মনোভাবের পরিচয় দিয়েছে। গ্রামের সমাজপতিদের সপক্ষে, পিতৃশত্রুর পুত্রের বিপক্ষে তার উচ্চকিত ঘোষণাও যেমন আকস্মিক, আবার রমেশকে দেখে বিচলিত হওয়াও তেমনি আকস্মিক। সুতরাং এই রমা এবং এই রমেশ, যাদের কাছে নিজেদের রূপ পরিষ্কার নয়, তারা পল্লীসমাজের স্বরূপ আবিষ্কারে কতখানি সক্ষম হতে পারে? তাই শরৎচন্দ্রের সামাজিক রীতি-নীতি সংক্রান্ত উপন্যাস কতকগুলি সংকীর্ণচেতা মানুষের সঙ্গে দুটি একটি আদর্শীভূত মানুষের সংঘর্ষের গল্প মাত্র। পল্লী অঞ্চলে অরক্ষণীয়া কন্যার সমস্যা তাঁর কাছে শুধুই একটা শুভবুদ্ধির, অথবা তার অভাবের সমস্যা। এ-সমস্যার সরলীকৃত রূপ সৃজনের জন্য কন্যার পিতৃমাতৃবিয়োগের মর্মান্তিকতা যেমন লক্ষ্যহীন, তেমনি অর্থহীন কারো একজনের শুভবুদ্ধির শুভলগ্নে শ্মশানকেও আনন্দাশ্রুতে ভাসানোর আয়োজন।

আংশিকতা থেকে আকস্মিকতা, এবং আকস্মিকতা থেকে আতিশয্য—এই হল শরৎচন্দ্রের প্রতি উপন্যাসের অপরিহার্য ছক। এই ভাবেই সামাজিক সমস্যার

কাটা-কাটা অংশগুলিকে তিনি শুধু ওপর থেকে দেখে জুড়ে দিতে চান। এই ভাবেই বোঝেন না (যেমন একজন তরুণ তীক্ষ্ণধী সমালোচক বলেছেন) যে রমা এবং বেণীর আর্থিক-বৈষয়িক সম্বন্ধ সূত্রটির বাস্তবতা কতখানি, বোঝেন না যে রমার দ্বন্দ্বকে যদি অন্তত বেণীর কূটবুদ্ধিতে ধৃত শিকারের অন্তর্জ্বালা করে গড়ে তুলতেন শরৎচন্দ্র তাহলেও একটা তাৎপর্য সৃজিত হত। অথচ বেণীর দীর্ঘ পরিচয়ে বেণীব বুদ্ধিকে রমা কোনো দিন প্রশ্ন কবেনি। সম্ভবত মেয়েমানুষ—বিশেষ সুন্দরী তরুণী—বৈষযিক বুদ্ধির ক্ষেত্রে অতখানি তীক্ষ্ণতা দেখালে তার সরল পবিত্রতা থেকে বিচ্যুত হয়, এই ছিল শরৎচন্দ্রের ধারণা। কিন্তু তাহলে আবার বেণী যে কেন এই সরলপ্রাণা তরুণীকে পথে বসানোর আয়োজন করেনি সেটা থেকে গেল দুর্বোধ্য। নাকি, বেণী ছিল রমা প্রসঙ্গে সৎ এবং খাঁটি, আর বমেশ প্রসঙ্গে পল্লীসমাজের চক্রান্তবাজ ব্যক্তি? তাহলে আবার বেণীরও তো একটা দ্বন্দ্ব থাকা দরকার ছিল, একটা অধিকার হাবানোব ব্যাপার সংক্রান্ত বোধ তার কাযগুলিব নিযামক হওয়া উচিত ছিল। একমাত্র তখনই রমার সূত্র ধরেই তাব স্বমতি জাগ্রত হতে পাবত। স্তব পবম্পরায় সেটাকে রূপায়িত করলে আকস্মিকতা কিছু পবিহৃত হতেও পাবত।

ববঞ্চ সমাজকে বোঝার ব্যাপাবে শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলি অপেক্ষা শরৎচন্দ্রের দুটি ছোট গল্প বিশেষ মূল্যবান। মহেশ এবং অভাগীর স্বর্গ গল্প দুটিতে গ্রাম-সমাজকে ছোট গল্পেব ছোট পরিসবে হলেও অধিকতর গভীরভাবে শরৎচন্দ্র ধববার চেষ্টা করেছেন। এবং সেই ছোট গল্প দুটিতেই দেখা যায় যে প্রেমের ঘটনাব ভাবালুতা (যেখানে শরৎচন্দ্র সব থেকে দুর্বল এবং যেখানে তিনি সব থেকে জনপ্রিয়)-বর্জিত পবিবেশে শরৎচন্দ্র তাঁর বক্তব্যকে অনেক লক্ষ্যভেদী করে গডে তুলতে পেরেছেন। এই ছোট পরিসরেই দেখা গেল যে গ্রামের কঠিন সমস্যাকে তিনি চিনতেন না এমন নয়। মহেশ এবং অভাগীর স্বর্গ গল্পে গোটা গ্রাম জীবনেব প্যাটানকে, তার বিপযস্ত অর্থনৈতিক রূপ এবং জীর্ণ সামাজিক বন্ধনকে শরৎচন্দ্র ব্যবহাব কবেছেন। আমাদের ভাবতীয় শ্রমিক শ্রেণীর ব্যক্তিগত জন্মবৃত্তান্তে যে নগব-জীবনের স্বাধীন স্বাচ্ছন্দ্যেব আকর্ষণ অপেক্ষা পল্লী-অর্থনীতির নিদারুণ বিপর্যয় ক্রিয়াশীল রয়েছে মহেশ গল্পটি তার আশ্চর্য প্রমাণ। অভাগীব স্বর্গের স্বত্বহীন প্রজাটিকেও আমবা চিনতে পারি এই কারণে। "দুরধিগম্যতা" "জটিলতা" "দোলাচলতা" প্রভৃতির লোভ পরিহার করে শরৎচন্দ্র ববং এই দুটি ছোট গল্পেই তাঁব আন্তরিকতা প্রমাণ করেছেন বেশি।

•• পাঁচ ••

শ্রীকান্ত শরৎচন্দ্রের প্রধান উপন্যাসগুলির অন্যতম। ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে এটি তার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। আমরা শ্রীকান্তের প্রথম খণ্ডটির বিস্তৃত আলোচনার পক্ষপাতী। শ্রীকান্ত প্রথম খণ্ড শ্রীকান্তের অন্যান্য খণ্ডগুলি অপেক্ষা শিল্পসৃষ্টির দিক থেকে উন্নততর এবং শক্তিশালী চরিত্র অঙ্কনে সমৃদ্ধ। শ্রীকান্তের প্রথম খণ্ডেই এক নতুন ধরনের বাংলা উপন্যাসের সূত্রপাত যার সাক্ষাৎ এই উপন্যাসের আদর্শে পরবর্তীকালে পাওয়া গেলেও, পূর্বে আমরা কখনো পাইনি। এ-ধরনের আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস রচনা রবীন্দ্রনাথের প্রবল আত্মসচেতনতায় সম্ভব ছিল না। শরৎচন্দ্রই প্রথম আত্মকাহিনীর ছলে উপন্যাস লিখলেন।

আত্মকাহিনীর ছলেই হোক বা কোনো নায়ককে স্থাপিত করেই হোক সাধারণত এ-জাতীয় উপন্যাসের ভিত্তিতে লেখকের জীবন ছায়াপাত করে বলে পাঠকদের কাছে এদের একটা পৃথক মূল্য থাকে। কিন্তু সেই মূল্যে লেখাটির বাজার মূল্যের বৃদ্ধি ঘটলেও এ জাতীয় রচনার তাৎপর্য অন্যত্র। বিশেষ কোনো প্লটের দায়ভার এখানে উপন্যাসকে বহন করতে হয় না, বহন করতে হয় না চরিত্রকে পরিবেশের সম্মুখীন করে নিরীক্ষা করার দায়। এখানে আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় যে শুধু অভিজ্ঞতাকে ধারাক্রমে লিপিবদ্ধ করে গেলেই ঔপন্যাসিকের কর্তব্য পালন হল। বৃহৎ ঘটনার জন্য এ জাতীয় উপন্যাসে কোনো প্রতীক্ষা নেই, নেই বৃহৎ ঘটনাকে এড়িয়ে যাবার সন্তর্পণচারিতা। মনে হওয়া অসম্ভব নয় যে এ-জাতীয় উপন্যাসে লেখক অনেক মুক্তধারা, অনেক স্বাধীন। কিন্তু একটু অভিনিবেশের সঙ্গে লক্ষ্য করলেই দেখা যায় যে লেখকের নির্বাচনী ক্ষমতা এ-ধরনের উপন্যাসেও গূঢ় নিয়মের বশীভূত হয়ে ক্রিয়াশীল। এ সত্যই নদী ধারার মতো কতকগুলি ঘাট ছুঁয়ে চলে যাওয়া নয়, অথবা পন্থানুগামী পথিকের মতো কতকগুলি বিচিত্র মানুষের সঙ্গে দেখা হওয়ার বিবরণী নয়। এ ধরনের উপন্যাসের সময়কাল সাধারণত নায়কের বা গ্রন্থের "আমি'র আশৈশবপ্রৌঢ়ত্ব। এই দীর্ঘ সময়খণ্ডকে লেখক ব্যবহার করেন নায়কের পূর্ণ ব্যক্তিমানসের গড়ে ওঠার প্রস্তুতিকাল হিসেবে। আমরা আমাদের বর্তমান গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছি যে উপন্যাস বহুবিধ। এই বহুবিধতার মধ্যে যোগসূত্র একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবোধ ও ব্যক্তিত্ব বিষয়ক আগ্রহ। এই জাতীয় আত্মজীবনীকল্প উপন্যাসে একদিকে যেমন মেলে নানা ব্যক্তির সাক্ষাৎ অপর দিকে সেই সমুদয় ব্যক্তির সমাহারে সমস্ত ঘটনার পুঞ্জ পুঞ্জ প্রতিক্রিয়ায় গড়ে ওঠে আত্মজীবনীর যিনি নায়ক তার ব্যক্তিস্বরূপ। গুছিয়ে

লিখলে প্রতিটি মানুষের জীবনই একটি সার্থক উপন্যাসের বিষয় এ-কথা এদিক দিয়ে সত্য। এই ব্যক্তিস্বরূপের প্রথম উন্মেষ থেকে, শৈশব-কৈশোরের অস্ফুট এবং অর্ধস্ফুট প্রদোষান্ধকার থেকে খরদীপ্ত যৌবনের বিচিত্র মধ্যাহ্ন ও প্রৌঢ়ের শান্ত উদার প্রশস্ততা এবং আসন্ন বার্ধক্যের সায়াহ্নের ক্ষমাশীল নিরাসক্তির বিশাল মোহানা পর্যন্ত নানা দিকে নানাভাবে ব্যক্তিটিকে গড়ে তোলা এ-উপন্যাসের কাজ। বাইরের লোকটার তত নয়—মানস গহন-সঞ্চারী মানুষটার জীবনী রচনা হয় এখানে। যেন সন্তর্পণে একটা ফুলের প্রতি মুহূর্তের ফুটে ওঠাকে, পাপড়ি মেলে দেওয়াকে, বাতাস, শিশির এবং মৌমাছির কাছ থেকে প্রতি মুহূর্তের স্নিগ্ধতা সঞ্চয়ের ইতিহাসকে, সৌরভ ও রেণু বিতরণের কথাকে ধরে রাখা হয় এই উপন্যাসে।)

শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত উপন্যাস এ-জাতীয় উপন্যাসের বিশেষ ধর্মের আলোকে বিচার্য। (শরৎচন্দ্র জীবনকে নানারূপে দেখেছিলেন। বহুরূপী জীবনপট বিধৃত বিচিত্র অভিজ্ঞতা তার ছিল। তিনি জীবনে বহু মানুষ এবং বহু ঘটনার সংস্পর্শে এসেছেন। এই সমস্ত কিছুর প্রসাদ তাঁর উপন্যাসে মেলে। শ্মশানে অন্ধকার রাত্রি, অথবা সমুদ্রবক্ষে সাইক্লোন—শরৎচন্দ্রের অভিজ্ঞতার আশ্চর্য ফসল। পর্যটক লেখকের অভিজ্ঞতা কী প্রচণ্ড শক্তির আধার, শরৎচন্দ্রের বর্ণনায় তার সাক্ষাৎ লাভ করা যায়। শরৎচন্দ্রের গল্প বলার মনোরম ভঙ্গি তাঁর অভিজ্ঞতাকে পাঠকের সামনে রূপময় করে তুলেছে।)

তথাপি এখানেও সেই একই কথা মনে হয় যে আংশিক ভাবে এক একটা চরিত্রের বা এক একটা অংশের সার্থকতা উপন্যাসের সমগ্র সার্থকতার সঙ্গে অন্বিত হতে পেরেছে কি না, এবং শরৎচন্দ্র সেদিকে লক্ষ্য রেখেছিলেন কি না, তা নইলে জীবনে যেমন হতে পারে শ্রীকান্ত উপন্যাসেও তিনি ঘটনাবিন্যাসকে সেইভাবে উপস্থাপিত করতে গেছেন কেন? (শ্রীকান্তের প্রথম খণ্ডে নতুনদা অধ্যায়ের অমিশ্র ক্যারিকেচার শুধু যে প্রক্ষিপ্ত বলে মনে হয় তা নয়, নতুনদা অধ্যায় উপন্যাসে এসেছে অন্নদাদিদি অধ্যায়ের পর। অন্নদাদিদির অধ্যায় যেমন গভীর তেমনি অর্থবহ। এই বিষণ্ন গম্ভীর কাহিনীর পরে নতুনদা অধ্যায়ের তাৎপর্য কী? স্বভাবতই পাঠক এ-কথা জিজ্ঞাসা করতে পারেন। (অন্নদাদিদি প্রসঙ্গে শ্রীকান্তের যে অভিজ্ঞতা তা শ্রীকান্তের কিশোর চিত্তকে গভীরভাবে রেখাঙ্কিত করেছে এবং সেটা নিশ্চয়ই তার জগৎসংসারকে উপলব্ধি করবার একটা সোপান। স্বভাবতই এই কাহিনীর পরে আমরা যখন নতুনদার কাহিনীর ভূমিকায় গিয়ে উপনীত হই

তখন আমাদের মন উঁচুতারে বাঁধা হয়ে গিয়েছে।) এই ভূমিকায় শরৎচন্দ্র লিখছেন :

> তারপরে অনেকদিন ইন্দ্রকে আর দেখি নাই। গঙ্গার তীরে বেড়াইতে গেলেই দেখি, তাহার ডিঙি কূলে বাঁধা। জলে ভিজিতেছে, রৌদ্রে ফাটিতেছে। শুধু আর একটি দিন মাত্র আমরা উভয়ে নৌকায় চড়িয়াছিলাম। সেই শেষ। তারপরে সেও আর চড়ে নাই, আমিও না। এই দিনটা আমার খুব মনে পড়ে। শুধু আমাদের নৌকা-যাত্রার সমাপ্তি বলিয়াই নয়। সে দিন অখণ্ড স্বার্থপরতার যে উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইয়াছিলাম, তাহা সহজে ভুলিতে পারি নাই। সেই কথাটাই বলিব।

স্বভাবতই ওপরের অনুচ্ছেদের সুর রীতিমতো গম্ভীর। মনে হয় যেন শরৎচন্দ্র এখনও অন্নদাদিদি সংক্রান্ত অনুভূতির বেশ টানছেন। এর মধ্যে সব থেকে ভ্রান্তিগর্ভ হয়েছে "অখণ্ড স্বার্থপরতা" কথাটুকু। কেননা আমাদের মন তখন সম্পূর্ণভাবে অন্নদাদিদিতে ভাবিত। স্বার্থপরতা প্রভৃতি প্রশ্নগুলি আমরা অন্নদা-দিদির পরিপ্রেক্ষিতে তখনও ভেবে চলেছি। অন্নদাদিদির নিঃস্বার্থপরতার সুর তখন আমাদের মনের মধ্যে এমনভাবে অনুরণিত হয়ে রয়েছে যে স্বভাবতই আমরা স্বার্থপরতার উদাহরণ হিসাবে অন্নদাদিদিরই বিপরীত কিছু দেখবো এইরকম প্রত্যাশা নিয়ে অগ্রসর হচ্ছি। কিন্তু যাকে শরৎচন্দ্র উপস্থাপিত করলেন সে বড়ো জোর একটি মূর্তিমান ক্যারিকেচার। এই অভিজ্ঞতা শ্রীকান্তের মনে অন্নদাদিদিকে দৃঢ়মূলে স্থাপিত করে না, বরঞ্চ অন্নদাদিদির গভীর সুরের মর্যাদাহানি ঘটায়। হাস্যরস হিসাবেও এ ব্যর্থ হয়েছে। কেননা এ জাতীয় উপন্যাস নাটক নয় যে নাটকীয় অবকাশ রচনার প্রয়োজন হবে, আর নাটকীয় অবকাশ রচনায়ও স্থান-কাল পাত্র প্রসঙ্গ আছে। উপন্যাসে—বিশেষ এ-জাতীয় উপন্যাসে—অবশ্যই শিথিল কাঠামোর কথা উঠতে পারে। কিন্তু উপন্যাসে শিথিল কাঠামোরও একটা নিজস্ব ন্যায় আছে। সেখানে যথেচ্ছ যোজনার কোনো অবকাশ নেই। (শ্রীনাথ বহুরূপীর ক্ষেত্রে ইন্দ্রনাথকে আমরা যা দেখলাম তার পর নিশীথ-অভিযান ও অন্নদাদিদি প্রসঙ্গ পেরিয়ে যেতে যেতে নানা ছোট বড়ো ঘটনার ভিতর দিয়ে তাকেও আমরা আমাদের মনের মধ্যে পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছি।) সুতরাং স্নেহপ্রবণতা, কর্তব্যপরায়ণতা—কোনো দিক থেকেই ইন্দ্রনাথকে নতুনদা অধ্যায়ে নতুন করে ধরা গেল না। এটা শিথিল কাঠামোর ব্যাপার শুধু নয়, কিয়ৎ পরিমাণে লক্ষ্য সম্বন্ধে অজ্ঞতাও বটে।

এই ব্যাপাব আবো ক্ষীণভাবে হলেও প্রকট হয়েছে ইন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে। এবং সে ক্ষেত্রে অন্নদাদিদিকে উপস্থাপিত কবতে গিয়েই এই ত্রুটি আত্মপ্রকাশ কবেছে। চবিত্রকে রূপময় কবতে গিয়ে শবৎচন্দ্র ববাবব একই কৌশলেব আশ্রয় গ্রহণ কবতেন। একজনকে না নামালে, না ছোট কবে আনলে আবেকজনকে সত্য প্রতিপন্ন কবতে পাবতেন না। এব কাবণ কিছুটা আমবা পূর্বে নির্দেশ কবেছি। শবৎচন্দ্র চরিত্র অপেক্ষা পবিস্থিতি নিয়ে মাথা ঘামাতেন বেশি। যেহেতু এই চিন্তায় আংশিকতাব দৈন্যই সূচিত হয় সেইহেতু এই আংশিকতাকে সামলাতে গিয়ে আনতে হয় আকস্মিকতা ও আতিশয্য। ইন্দ্রনাথ শবৎচন্দ্রেব অতি অল্প-সংখ্যক স্থায়ী সৃষ্টিগুলিব অন্যতম। এই ইন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কিশোব শ্রীকান্তেব অভিভূত মানসেব অংশীদাব আমবা সকলেই। সুতবাং নিশীথাভিযানেব কালে যখন এই ঘটনা ঘটল :

> ইন্দ্র অত্যন্ত সহজভাবে কহিল, ও কিছু না—সাপ জড়িয়ে আছে, তাড়া পেয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ছে।
>
> কিছু না—সাপ! শিহবিয়া নৌকাব মাঝখানে জড়সড় হইয়া বসিলাম। অস্ফুটে কহিলাম, কি সাপ ভাই?
>
> ইন্দ্র কহিল, সব বকম আছে। ঢোঁড়া, বোড়া, গোখবো, কবেত—জলে ভেসে এসে গাছে জড়িয়ে আছে -কোথাও ডাঙা নেই দেখছিসনে?
>
> সে তো দেখছি, কিন্তু ভয়ে যে পাযেব নখ হইতে মাথাব চুল পর্যন্ত আমাব কাঁটা দিয়া বহিল, সে লোকটি কিন্তু ভ্রূক্ষেপমাত্র কবিল না। নিজেব কাজ কবিতে কবিতে বলিল, কিন্তু কামড়ায় না। ওবা নিজেবাই ভয়ে মবচে।
>
> আব কামড়ালেই বা কি কবব। মবতে একদিন তো হবেই ভাই।

তখন স্বভাবতই আমাদেবও গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। এই অংশেব প্রতিটি কথায় ইন্দ্রনাথ-চবিত্র এমনভাবে ছড়িয়ে বয়েছে, এমন জীবন্তভাবে যে শ্রীকান্তেব মতো আমবাও ভাবি

> কিন্তু সে যাই হোক, ওই লোকটি কি? মানুষ? দেবতা? পিশাচ? কে ও? কাব সঙ্গে এই বনেব মধ্যে ঘুবিতেছি? যদি মানুষই হয়, তবে ভয় বলিয়া কোনো বস্তু যে বিশ্ব সংসাবে আছে সে-কথা কি ও জানেও না! বুকখানা কি পাথব দিয়া তৈরি? সেটা কি আমাদেব মতো সঙ্কুচিত বিস্ফাবিত হয় না? তবে যে সে দিন মাঠেব মধ্যে সকলে পলাইয়া গেল, সে নিতান্ত অপবিচিত আমাকে একাকী নির্বিঘ্নে বাহিব কবিবাব জন্য শত্রুব মধ্যে প্রবেশ

করিয়াছিল ?……আর আজ সমস্ত বিপদের বার্তা তন্ন তন্ন করিয়া, জানিয়া শুনিয়া, নিঃশব্দে অকুণ্ঠচিত্তে এই ভয়াবহ অতি ভীষণ মৃত্যুর মুখে নামিয়া দাঁড়াইল।

এই ইন্দ্রকে যখন আবার আমরা শাহজীর বাড়িতে অন্নদাদিদির সম্মুখে উপস্থাপিত দেখি তখন অন্নদাদিদিকে সহজ শক্তিতে অসীম শক্তিময়ী করে গড়ে তোলার জন্য ইন্দ্রকে দিয়ে যে সমস্ত আচরণ শরৎচন্দ্র করিয়েছেন তা সঙ্গতিহীন) ঘটনাটি এই :

ইন্দ্র জানাইল যে সে গোখ্‌রো সাপই খেলাইবে ; এবং পরক্ষণেই মাথা নাড়িয়া বাঁশি বাজাইয়া ডালাটা তুলিয়া ফেলিল। সঙ্গে সঙ্গেই প্রকাণ্ড গোখ্‌রো এক হাত উঁচু হইয়া ফণা বিস্তার করিয়া উঠিল। এবং মুহূর্ত বিলম্ব না করিয়া ইন্দ্রর হাতের ডালায় একট তীব্র ছোবল মারিয়া ঝাঁপি হইতে বাহির হইয়া পড়িল। বাপ্‌রে! বলিয়া ইন্দ্র উঠানে লাফাইয়া পড়িল। আমি বেড়ার গায়ে চড়িয়া বসিলাম। ক্রুদ্ধ সর্পরাজ বাঁশির লাউয়ের উপর আর একটা কামড় দিয়া ঘরের মধ্যে গিয়া ঢুকিল। ইন্দ্র মুখ কালি করিয়া কহিল, এটা একেবারে বুনো। আমি যাকে খেলাই, সে নয়। ভয়ে, বিরক্তিতে রাগে আমার প্রায় কান্না আসিতেছিল, বলিলাম, কেন এমন কাজ করলে ? ও বেরিয়ে যদি শাহজীকে কামড়ায় ? ইন্দ্রর লজ্জার পরিসীমা ছিল না। কহিল, ঘরের আগড়টা টেনে দিয়ে আসব ? কিন্তু যদি পাশেই লুকিয়ে থাকে ?

এখানে সর্পভীত ইন্দ্র শরৎচন্দ্রের কাছে গৌণ ব্যাপার। আসলে তাঁর লক্ষ্য তখন কেন্দ্রীভূত ছিল অন্নদাদিদিকে অসীম শক্তির আধাররূপে প্রতিপন্ন করা যাতে ইন্দ্র তার পদধূলি গ্রহণ করে এবং শ্রীকান্ত ভক্তিতে এবং বিস্ময়ে আপ্লুত হয়। কেননা পূর্বোক্ত সাপটি অন্নদাদিদি প্রায় অবলীলাক্রমে গল্প করতে করতে বন্দী করে ফেললেন। অথচ (ইন্দ্রকে আমরা জানি যে গায়ের ওপর দিয়ে গোখ্‌রো সাপ গেলেও বলতে পারে 'মরতে তো একদিন হবেই'। (রাম নামে তার এতই সরল এবং অভ্রান্ত বিশ্বাস যে সেই নামের জোরে প্রেতভূমিকেও সে ভয় করে না। অথচ এখানে আমরা একটু পরেই দেখতে পাচ্ছি যে ইন্দ্রের হাতে শাহজীর মন্ত্রপূত শিকড় ছিল, সেই শিকড় এবং শাহজীর বিষপাথর যে বিষজয়ী সেই দৃঢ় বিশ্বাসও ইন্দ্রের ছিল। কিন্তু ইন্দ্রের ভীত আচরণে তার কোনো প্রমাণ পাওয়া গেল না। শুধু অন্নদাদিদিকে দাঁড় করাতে গিয়ে ইন্দ্রের সাহস এবং ইন্দ্রের

বিশ্বাসবোধ এই উভয়কেই লেখক খণ্ডিত করেছেন। চরিত্রে অবশ্যই অসঙ্গতি থাকতে পারে কিন্তু সে অসঙ্গতিরও একটা সূত্র থাকা উচিত। তা নইলে অসঙ্গতিটা হয়ে দাঁড়ায় লেখকের খেয়ালখুশির ফরমায়েশী ফল। সে অসঙ্গতি তখন লেখকের অসঙ্গতি।

ইন্দ্রনাথের বৃহত্তর শিল্পসাফল্যের পরিপ্রেক্ষিতে এই ক্ষীণ অসঙ্গতিটুকু শরৎচন্দ্রের নিজের বলেই প্রক্ষিপ্ত হিসাবে বাদ দিয়ে যেতে পারি। চরিত্র এবং তার পটভূমিকাগত প্রকৃতির অমোঘ টানে ইন্দ্রনাথ নিঃসন্দেহে অবিস্মরণীয়—আমরা শরৎচন্দ্রের শিল্পস্বভাবের মুদ্রাদোষের বিষয়টির দিকে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি শুধু। এইবার এই ক্ষীণ অসঙ্গতি বৃহত্তর ক্ষেত্রে শ্রীকান্ত উপন্যাসের চরিত্রাঙ্কনে কীভাবে বড়ো অসঙ্গতি রূপে প্রকট হয়েছে তাই দেখাব। পরে দেখাব যে এ-উপন্যাসের ক্ষেত্রেও শরৎচন্দ্র কতখানি লক্ষ্যহীন ছিলেন। এই লক্ষ্যহীনতা অবশ্যই উদ্দেশ্যগত লক্ষ্যহীনতা এবং শিল্পলক্ষ্য সম্বন্ধে অচেতনতাই এর মূলকথা। আমরা সকলেই জানি যে ইন্দ্রনাথ শ্রীকান্তের একমাত্র প্রভাবসম্পাতী পুরুষ চরিত্র। এরপরে যে সমস্ত চরিত্রের সাহায্যে তিনি উপন্যাসের পটকে নানা ভাবে নানা সার্থকতায় পূর্ণ করে তুলেছেন বলে মনে করেছেন তারা সকলেই নারী। এবং এই বিচিত্ররূপিণী নারীকুলের মধ্যে রাজলক্ষ্মী প্রধান। শ্রীকান্ত উপন্যাসের প্রথম খণ্ডের মধ্যভাগে রাজলক্ষ্মীর উপস্থাপনা। উপস্থাপনাতে রাজলক্ষ্মী এত কৃত্রিম আবেগ এবং মেকি স্বরের স্রষ্টা যে তারপর বহু গঙ্গা মাটিতেও আর তার স্বাভাবিক স্বর ফিরে আসেনি। রাজলক্ষ্মীকে আমরা দেখি পিয়ারী বাঈজীরূপে। কুমার সাহেবের শিকার-পার্টির অপরিহার্য আনুষঙ্গিক সে। কিন্তু পিয়ারী বাঈজীর বাঈজী-জীবনটা যেন একটা কথার কথা মাত্র। সে যেন প্রথম থেকেই ব্যস্ত এ-কথা প্রমাণ করতে যে, সে শরৎচন্দ্রের নায়িকা। শ্রীকান্ত যখন পিয়ারী বাঈজীর গান শুনে মুগ্ধ চিত্তে এ-কথা বলল যে 'আমার বড়ো সৌভাগ্য যে তোমার গান দু-সপ্তাহ ধরে প্রত্যহ শুনতে পাব।' তখন বাঈজী তাকে পরিষ্কার বাংলায় বলল, 'টাকা নিয়েছি আমাকে তো গাইতেই হবে, কিন্তু আপনি এই পনেরো ষোলো দিন ধরে এর মোসাহেবী করবেন?' কথা শুনে শ্রীকান্ত "হতবুদ্ধি" এবং "কাঠ" হয়ে গেল। আমরা বুঝতে পারি না যে এ-কথা শুনে "কাঠ" হবার কী আছে—যদিচ হঠাৎ বাংলাভাষা শুনে হতবুদ্ধি না হয়ে অবাক হলেই বেশি মানায়। তবু আমরা পিয়ারী বাঈজীর হঠাৎ এমন ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের প্রকাশে না হয় মেনেই নিলুম

থে পিয়ারী বাঈজী সাধারণ স্তরের নন। কিন্তু পিয়ারী বাঈজী যে শ্রীকান্তকে স্পষ্টত চিনতে পেরেছে সে কথাও বাঈজীর উক্তিতে পরিস্ফুট। শ্রীকান্ত কিন্তু বাঈজীকে চেনার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করল না। তাহলেও পরের দিন যখন রতন শিকার ছেড়ে চলে আসা শ্রীকান্তকে জানাতে গেল যে "বাঈজী একবার সাক্ষাৎ করিতে চায়", তখন শ্রীকান্তের মনোভাব—"ঠিক এইটি আশাও করিতেছিলাম, আশঙ্কাও করিতেছিলাম।" কিন্তু কেন? শ্রীকান্ত পিয়ারী বাঈজীকে তো তখনও জানে না এবং জানার জন্যও ইচ্ছুকও নয়। এরপরে শ্রীকান্ত পিয়ারী বাঈজীর তাঁবুতে এল দেখা করতে। ততক্ষণে শরৎচন্দ্রের খেয়াল হয়েছে পিয়ারী বাঈজীকে বাঈজী বলে প্রতিভাত করতে হবে। আগের রাত্রের গানের আসরের দৃশ্যে শরৎচন্দ্র সে সুযোগ হারিয়েছেন। রাজলক্ষ্মীর জীবনের বর্তমান পর্যাযেব কদর্যতাকে যে পরিচিত করানো দরকার সে বোধ শরৎচন্দ্রের আছে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল :

> পর্দা তুলিয়া ভিতরে ঢুকিয়া দেখিলাম, বাঈজী একাকিনী প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া আছে। কাল রাত্রে পেশোয়াজ ও ওড়নায় ঠিক চিনিতে পারি নাই, আজ দেখিবাই টের পাইলাম, বাঈজী যেই হোক বাঙালীর মেয়ে বটে। একখণ্ড মূল্যবান কার্পেটের উপর গরদের শাড়ি পরিয়া বাঈজী বসিয়া আছে। ভিজা এলো চুল পিঠেব উপর ছড়ানো, হাতের কাছে পানের সাজ সরঞ্জাম, সুমুখে গুড়গুড়িতে তামাক সাজা। আমাকে দেখিয়া গাত্রোত্থান কবিয়া হাসিমুখে সুমুখের আসনটা দেখাইয়া দিয়া কহিল, বোসো। তোমার সুমুখে তামাকটা খাবো না আর —ওবে রতন গুড়গুড়িটা নিয়ে যা।

'রতন আসিয়া গুড়গুড়িটা লইয়া গেল।' এবং আশ্চর্যের বিষয় যে গুড়গুড়ির সঙ্গে সঙ্গে পিয়ারী বাঈজীব বাঈজী-জীবনও যেন বিদায় নিল। গুড়গুড়িটা রাজলক্ষ্মী আগেও সরিয়ে রাখতে পারত। কিন্তু শরৎচন্দ্রের ধারণা যে গুড়গুড়িতেই বাঈজী-জীবনের সমস্ত প্রতীক। সেই প্রতীকটি সরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মূল্যবান কার্পেটের ওপর গরদ পরিহিতা সিক্ত-কেশিনী নারী মুহূর্তেই শরৎচন্দ্রের নায়িকা হয়ে উঠল। যে শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীকে একবিন্দুও স্মরণ করতে পারছে না (এটিই শরৎচন্দ্রের একটি প্রিয় কৌশল, তারকেশ্বরে রমেশও রমাকে এই রকমই চিনতে পারেনি। সম্ভবত পুরুষ নারী-উদাসীন হলে নারীকে আকর্ষণ করতে পারে বেশি এরকম ধরনের একটা ধারণা

শরৎচন্দ্রের ছিল। এটি তিনি উত্তরাধিকারসূত্রে দিয়ে গেছেন বর্তমান বাঙলা সাহিত্যের প্রবোধ সান্যালকে) রাজলক্ষ্মী সেই শ্রীকান্তের সমস্ত শৈশব ইতিবৃত্ত এরপর একে একে বলে চলল, জিজ্ঞাসা করতে লাগল তার সমস্ত অতীত সংবাদাদি। এবং শুধু জিজ্ঞাসা করেই ক্ষান্ত হল না আঁখিপাতা ভারী ও চোখ ছল ছল করে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি সম্বন্ধে তার আগ্রহের গভীরতাও রাজলক্ষ্মী ব্যক্ত করল। অত দীর্ঘ প্রশ্নাবলীব পরেও শ্রীকান্তের কিন্তু রাজলক্ষ্মীকে মনে পড়ছে না। যে-শ্রীকান্তের সমস্ত শৈশবস্মৃতি নখদর্পণে, যে-শ্রীকান্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়েছে এমন কি নতুনদা প্রসঙ্গেরও, সেই শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীর বিন্দু বিসর্গও স্মরণ কবতে না পারলে যে শ্রীকান্তেব জীবনে রাজলক্ষ্মীর ভূমিকা সম্বন্ধে সংশয় উপস্থিত হয়, মনে হয রাজলক্ষ্মীর সমস্ত ব্যাপারটাই বাড়াবাড়ি, এ-বোধ শরৎচন্দ্রের ছিল না। কাজেই রাজলক্ষ্মীর লম্বা জেরার পবে শ্রীকান্তের এই চিন্তা অনেকখানি বিসদৃশ ও অসঙ্গত।

> কে এ ? আমার পাঁচ বছর বযসেব ঘটনা পযন্ত আমি স্পষ্ট মনে করিতে পারি , কিন্তু অতীতের মধ্যে যতদূর দৃষ্টি যায়, ততদূর তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলাম, কোথাও এই পিযারীকে খুঁজিযা পাইলাম না। অথচ এ আমাকে বেশ চিনে। পিসিমাব কথা পর্যন্ত জানে। আমি যে দরিদ্র, ইহাও তাহার অবিদিত নহে। সুতরাং আব কোনো অভিসন্ধি থাকিতেই পারে না। অথচ যেমন কাবিযা পাবে আমাকে সে এখান হইতে তাড়াইতে চায। কিসেব জন্য ? আমার থাকা-না-থাকায় ইহাব কি ? তখন কথায কথায় বলিয়াছিল, সংসাবে লাভ-ক্ষতিই কি সমস্ত ? ভালবাসা-টাসা কিছু নাই ? আমি যাহাকে কখনো চোখেও দেখি নাই, তাহাব মুখেব এই কথাটা মনে করিয়া আমার হাসি পাইল।

এবং মনে যে শ্রীকান্তের ছিল না, সে কথাও তো সত্য। কেননা তাহলে অন্নদা-দিদি পর্যায়ে অন্তত বালিকা লক্ষ্মীর কথা শ্রীকান্তের একবার না একবার মনে পড়ত। তারপর শ্মশান এবং শনিবাবের অমাবস্যাব ঘটনাকে অবলম্বন কবে পিয়ারী যখন শ্রীকান্তের বিপদ আশঙ্কায় "অকস্মাৎ ঝর ঝব কবিয়া কাঁদিয়া ফেলিল" তখন অকস্মাৎ শ্রীকান্তের বাজলক্ষ্মীর সমস্ত শৈশব মনে পড়ে গেল। এবং সেই অতীত স্মৃতির প্রত্যাবর্তনেও রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে শ্রীকান্তের গভীর সম্পর্কের কোনো সূত্র পাওয়া গেল না। রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তের প্রহারের ভয়ে বৈঁচির মালা এনে শ্রীকান্তকে দিত। এই উপদ্রবের স্মৃতি ছাড়া রাজলক্ষ্মী-

শ্রীকান্ত সম্পর্কে সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র আর কিছু তখন আমাদের জানালেন না। শ্রীকান্তের কাছে যে ব্যাপারটা কিছুই ছিল না এ তো বোঝাই গেল। কিন্তু রাজলক্ষ্মীর ব্যাপার দেখে মনে হয় যে রাজলক্ষ্মীর কাছে এটি ছিল একটি গভীর সুরের ব্যাপার। তাহলে ধরে নিতে হয় যে রাজলক্ষ্মী সেই ক্ষুদ্র স্মৃতিকে তার আট বছর বয়স থেকে লালন করছে শ্রীকান্তের কাছে এক মুহূর্তে কেঁদে সমস্ত কিছু নিবেদন করার জন্য। কিন্তু আমরা জানি রাজলক্ষ্মীও নিরুদ্দেশ শ্রীকান্ত সম্বন্ধে কোনো খবর রাখতো না, এমন কি সে খবর সম্বন্ধে তার-যে কোনো আগ্রহ ছিল সে কথাও তার উক্তিতে ব্যক্ত হয়নি। তাহলে রাজলক্ষ্মীর এই অকস্মাৎ মমতাতিশয্যের কারণ কী? এই অধ্যায় যদি শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীর পুরাতন প্রেমের মধ্যলীলা হয় তবে তা খণ্ডিত, কেননা আমরা আদি লীলা কী তা জানি না আর যদি এ নতুন প্রেমের উপক্রমণিকা হয় তবে তা যেমন ব্যর্থ তেমন হাস্যকর।

এবং এই হাস্যকর আতিশয্যের জন্যই শ্মশানের নিশীথ অভিজ্ঞতার অপূর্ব কাব্যময় রূপায়ণও বেশ কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আমরা সকলেই জানি যে শিল্পক্ষমতার আশ্চর্য ব্যবহারে প্রকৃতিকে এখানে প্রায় স্পর্শগ্রাহ্য করে তুলেছেন শরৎচন্দ্র। নিজস্ব অভিজ্ঞতার প্রসাদ ছড়িয়ে রয়েছে এর সর্বত্র। একটা পৃথক অংশ হিসাবে বাংলা সাহিত্যে এই বর্ণনা তুলনারহিত না হলেও এর স্থান কারো নিচে নয়। এর ভাষায় রবীন্দ্র প্রভাবের ছায়া একটু অসংযতভাবে আত্মপ্রকাশ করলেও তা অনুভূতিকে স্পর্শ করে নিজের প্রাণবত্তায়। প্রকৃতির ভৌতিকর মূর্তিকে রূপময় করার অনন্যসাধারণ ক্ষমতা ছিল শরৎচন্দ্রের। ইন্দ্রনাথের সঙ্গে নিশীথাভিযানের বর্ণনায়, শ্মশান-রাত্রির বর্ণনায় এবং সমুদ্রে ঝড়ের বর্ণনায় সে ক্ষমতার পূর্ণ নিদর্শন বিদ্যমান। কিন্তু আঁধারের রূপবর্ণনার ক্ষেত্রে আমাদের কতক গুলি বক্তব্য রয়েছে। আমরা জানি যে উপন্যাসে মানুষ অথবা প্রকৃতির বিশিষ্ট মূল্য কিছু নেই। গোটা উপন্যাসের পটেই সমস্ত কিছুর বিচার। এই আধারের রূপ মাত্র আধারের রূপ নয়। যে ব্যক্তি সম্পর্কে উপন্যাস প্রসঙ্গে আমাদের আগ্রহ আমরা উপন্যাস-ধৃত প্রকৃতিকেও দেখে থাকি সেই ব্যক্তি সম্পর্কেই জড়িত করে। যে উপন্যাসে প্রকৃতির ব্যবহার সেই বিশিষ্টতা-রহিত, অর্থাৎ প্রকৃতিকে ব্যবহার করা হয়েছে একান্তই ব্যক্তি-নিরপেক্ষভাবে—সে উপন্যাসে প্রকৃতি মাত্র একটি অভিজ্ঞতার ব্যাপার। শ্রীকান্তের প্রথম খণ্ডের এই অংশে সেই দোষ ঘটেছে। আমরা নিঃসন্দেহে

আঁধারের রূপালেখ্য দেখে মুগ্ধ হই। এবং শ্মশানের uncanny রহস্যঘন ভয়-জয় পরিবেশ চিত্রণে শরৎচন্দ্রের ক্ষমতাকে তারিফ করি। কিন্তু যে ব্যক্তিটি এই সমস্ত অনুভূতির ধারক, শ্মশানের ঐ অভিজ্ঞতা তার চেতনায় বা মনোলোকে কোনো স্থায়ী সুর বেঁধে দিল কিনা, ব্যক্তিমানসের যে তিল-তিল বিকাশ এ জাতীয় উপন্যাসের প্রধান বিষয় সেই বিকাশের পথে এই শ্মশানের অভিজ্ঞতা অপরিহার্য ছিল কিনা তা বোঝা গেল না। শুধু বোঝা গেল যে রাজলক্ষ্মী অসীম মমতায় শ্রীকান্তকে বাধা দিয়েছে শ্মশানে যেতে আর শ্রীকান্ত ইন্দ্রনাথের ছাত্রের উপযুক্ত দুঃসাহসিকতায় শ্মশানভূমিতে নিশীথাভিযান করেছিল। এই জাতীয় অতিপ্রাকৃতের অনুভূতি ইন্দ্রনাথের সঙ্গে নৈশ অভিযানের সময়েও একবার শ্রীকান্তের ভাগ্যে জুটেছিল। সেখানে ক্ষুদ্র পরিবেশে সেটা যেমন ছিল ভয় অনুভব ও ভয়মুক্তির কাহিনী, বিস্তৃত পরিসরে সমৃদ্ধতর রচনার রীতিতে এখানেও তা ভয় এবং ভয়মুক্তির গল্পই থেকে গেল। কেননা এত বড়ো একটা প্রচণ্ড অভিজ্ঞতার পরেও শ্রীকান্ত তেমনি তার আত্মসম্মানের প্রশ্ন নিয়ে ব্যতিব্যস্ত, এবং রাজলক্ষ্মীর চলে যাওয়ার বেদনাটাই তার বুকের মধ্যে কম্পমান। রাজলক্ষ্মী এরপর চলে গেল এবং শ্রীকান্তকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে চাইল। আত্মসম্মানের ভয়ে শ্রীকান্ত রাজী হল না। বোঝা গেল না এ আত্মসম্মানের স্বরূপ কী—কেন এই না যেতে চাওয়া। যাই হোক জীবানন্দের কলিকের ব্যথার মতো যথারীতি, সুরেশের নিউমোনিয়ার সুযোগের ন্যায় সন্ন্যাসী শ্রীকান্তের দারুণ অসুখের সুযোগে রাজলক্ষ্মী এবং শ্রীকান্তের ক্ষণবিচ্ছেদের পর পুনর্মিলন হল। এখানেও আমরা অকস্মাৎ জানতে পারলাম যে রাজলক্ষ্মীর বঙ্কু বলে একটি ছেলে আছে এবং তারপরেই জানলাম পুত্রটি রাজলক্ষ্মীর ছেলে নয়। ছেলেটি নিজের মা থাকা সত্ত্বেও রাজলক্ষ্মীকে মা বলে। এর রাজলক্ষ্মীর গানবাজনার ব্যাপার সংসারের সম্মতিলাভ যে করেছে এ-কথাও বঙ্কু গল্প প্রসঙ্গে শ্রীকান্তকে জানিয়ে দিল। এবং ও জানাতে ভুলল না যে রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তকে দেখলে খুশি হয় এ-কথা সে বোঝে, কিন্তু তাতেও তার অসম্মতি নেই। এদিকে রাজলক্ষ্মীও ততক্ষণে পিয়ারী নাম ঝেড়ে ফেলেছে, সে আর তখন মাইরি বলে না। কিন্তু শ্রীকান্তের মধ্যে সংশয়—"হঠাৎ বঙ্কুর মা অভ্রভেদী হিমাচলের ন্যায় পথ রুদ্ধ করিয়া রাজলক্ষ্মী ও আমার মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইল"। সুতরাং রাজলক্ষ্মীর কাছ থেকে শ্রীকান্ত পুনরায় বিদায় নিল। এবং তখনও শ্রীকান্তের জন্য পাঠকের সমবেদনাকে আরও ভারী করার আয়োজন হিসাবে আমাদের

জানানো হল যে শ্রীকান্তের ফের জর এসেছে। কিন্তু বন্ধুর মায়ের সম্মান রাখতেই হবে কাজেই শ্রীকান্ত আবার চলে গেল। তারপর শ্রীকান্ত উপন্যাসের বাকি তিন খণ্ড ধরে চলল আসা এবং যাওয়া।

কিন্তু প্রশ্ন এই যে অকস্মাৎ আগত অভ্রভেদী হিমাচলের একটু চূড়াও এর আগে দেখা যায়নি। এবং "আমাদের মাঝখান" বলে যে কোনো বস্তু আছে সে-কথাও স্পষ্ট করে বা আভাসে জানানো হয়নি। রাজলক্ষ্মীর দিক থেকে তার অর্থহীন আট বছর বয়সের প্রেমের স্মৃতি যে আতিশয্যই সৃষ্টি করুক না কেন, শ্রীকান্তের দিক থেকে সমস্তটাই নতুন ব্যাপার। সুতরাং আমাদের মাঝখান গড়ে উঠতে যে প্রস্তুতি প্রয়োজন তা এখানে নেই। শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্রের মতনই সব হঠাৎ মনে হয়। এই হঠাৎ-মনে-হওয়া শরৎচন্দ্রের সমস্ত আতিশয্যের জন্মদাতা। এবং সেই আতিশয্যকে অধিকতর বর্ধিত করার জন্যই বন্ধুর অবতারণা। অথচ বন্ধু সমস্যাকে কোনো দিক থেকেই স্পর্শ করেনি। এই আতিশয্যতুষ্ট নারী চরিত্রটি যখন কমললতার সঙ্গে দৃষ্টিরটু প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হল তখনই প্রকৃতপক্ষে চরিত্রটির ভরাডুবি হয়েছে। সে ভরাডুবির আয়োজন শরৎচন্দ্র চরিত্রটির অবতারণার মুহূর্তেই করে রেখেছিলেন।

অসংখ্য চরিত্র এসেছে এই উপন্যাসের পরবর্তী খণ্ডগুলিতে। তারা কেউ এর নায়ককে পূর্ণতার পথে নিয়ে গেল না। ইন্দ্রনাথ অন্নদাদিদির অধ্যায়ে আমরা যে বোধের দেখা পেলাম—যে সমস্ত চরিত্রগুলির কাছে মাধুকরী শেষ করে শ্রীকান্ত খুঁজে পাবে জীবনের একটা মানে—উপন্যাসের শেষে দেখা গেল সে মানে শ্রীকান্ত যেন খোঁজেইনি। কাজেই অন্নদাদিদির অগ্নিপরীক্ষা এবং ইন্দ্রনাথের নিস্পৃহ নির্বিকারত্বের পাঠশালায় যে নায়ক মানুষ হল সে এত মাঝারি অভিজ্ঞতাকে নিয়ে (একবার রাজলক্ষ্মীর সেবা-শুশ্রূষার জগতে ও তার পরেই জাগ্রত বিবেক নিয়ে আবার বাইরে) জীবন কাটাল এটা সংসারের দিক থেকে বেদনার, এবং শিল্পের দিক থেকে গূঢ়ার্থহীন।

•• ছয় ••

কিন্তু শরৎচন্দ্রের সঞ্জীবনী শক্তির উৎসটা তা হলে কোথায়? ঔপন্যাসিক অসঙ্গতির বিপুল বোঝা বহন করেও তিনি কেমন করে পৌঁছে গেছেন পাঠক চিত্তের অমরতার রাজত্বে? চেস্টারটন সাহেব ডিকেন্স প্রসঙ্গের উপসংহারে

ডিকেন্সের বিরুদ্ধবাদীদের দুটি প্রধান প্রশ্নের অভিযোগের জবাব দিয়েছেন। অভিযোগ দুটি এই . ডিকেন্স প্রচুর অনুন্নত সৃষ্টির জনক। এবং তাঁর চরিত্র সৃষ্টিতে রঙের আতিশয্য আছে। চেস্টারটন সাহেব ডিকেন্সের পক্ষ সমর্থনে শেকস্‌পীয়রের দোহাই দিয়ে বলেছেন যে অনুন্নত সৃষ্টির প্রাচুর্য তাঁরও অনুল্লেখ্য নয়। দ্বিতীয় অভিযোগের উত্তরে তিনি বলেছেন যে তাঁর চরিত্র সৃজনে আতিশয্য ঘটেছে বটে কিন্তু আতিশয্যগুলি চরিত্র-ন্যায়েরই অন্তঃনিঃসৃত ব্যাপার। অর্থাৎ আতিশয্যগুলি পাত্র-পাত্রীর জীবনযাত্রার ফল—লেখকের আরোপিত নয়। এ প্রসঙ্গে মিকবরের দৃষ্টান্ত ব্যবহার করা চলে। অশ্রুময়তায় ডিকেন্স এবং শরৎচন্দ্র এক জায়গায় বলেই শরৎচন্দ্র সম্পর্কেও অনুরূপ যুক্তি উত্থাপিত করা চলে নিশ্চয়। এবং গোটা উপন্যাসের বৃহৎ পটের কথা বাদ দিলে ডিকেন্স প্রসঙ্গে দ্বিতীয় অভিযোগে চেস্টারটন সাহেবের উত্তরের সুবিধা শরৎচন্দ্রেরও প্রাপ্য।

ছোট মাপে, মিত পরিসরে শরৎচন্দ্র এই কারণেই সিদ্ধহস্ত জীবন-রসিক। তাঁর মেজদিদি, নারায়ণী, ইন্দ্রনাথ, অন্নদাদিদি, এরা সকলে যে বাংলা দেশের ঘরে ঘরে রামায়ণ মহাভারতের চরিত্রগুলির পাশেই বিরাজ করে তার একমাত্র কারণ লেখকের জীবন-প্রেম। বৃহৎ উপন্যাসের বিস্তৃত পট শরৎচন্দ্রের অনুধাবনীয় ছিল না—এই দৌর্বল্য তাঁর সমগ্র উপন্যাস পরিকল্পনায় পরিস্ফুট। রমেশ, শ্রীকান্ত, জীবানন্দ—সকল উপন্যাসের নায়কই উপন্যাসের পটে বাইরে থেকে প্রক্ষিপ্ত নায়ক। ফলে এদের ব্যবহারের সঙ্গতি সূত্র রক্ষা করার প্রয়োজন লেখককে মানতে হয়নি। পক্ষান্তরে ছোট ছোট পটে এক-একটা ব্যক্তি চরিত্রের অসামান্যতা পরিস্ফুটনে শরৎচন্দ্রের কৃতিত্ব অসাধারণ। শ্রীকান্তও (প্রথম খণ্ড) এই কারণে তাঁর অপেক্ষাকৃত সার্থক সৃষ্টি। এখানে বিস্তৃত নির্দিষ্ট পটে কাউকে ধরে রাখতে হয়নি। এক-একজনের রঙ ফোটানো সারা হলেই তাকে ছেড়ে দিতে পেরেছেন। যাদের ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছে পৌনঃপুনিকতা তারাই শেষ পর্যন্ত হয়েছে রঙছুট। জীবন-প্রেম ও মানবিক অনুভূতি শরৎচন্দ্রের প্রধান শক্তি। ঔপন্যাসিক ব্যর্থতা সত্ত্বেও তিনি যে আমাদের সঙ্গে চিরদিন থাকবেন তা এই কারণে। তাঁর ছোট পটে ধৃত চরিত্র পাত্রগুলির প্রধান উপাদান মানুষের জন্য মানুষের ভালবাসা। এর কাছে সকল অপ্রিয় সমালোচনাই—তা সে যতই সত্য-দর্পিত হোক না কেন—কিছুটা আত্মানুশোচনায় দগ্ধ না হয়ে পারে না।

জগদীশ গুপ্ত ও শরৎচন্দ্রের প্রতিক্রিয়া

●● এক ●●

শরৎচন্দ্রেব প্রতিক্রিয়া শবৎচন্দ্রেব কালেই কতখানি নির্মমভাবে সক্রিয় ছিল জগদীশ গুপ্তেব বচনাবলী তাব অব্যর্থ নিদর্শন। সমাজ প্রগতি বা বাষ্ট্রনীতিক দ্বন্দ্বে প্রতিক্রিয়াব অর্থ ভিন্ন। শিল্প-সাহিত্যেব ইতিহাসে প্রতিক্রিয়া শব্দটি সেই পাবিভাষিক অর্থসীমায় আবদ্ধ নয। ববঞ্চ আক্ষবিক অর্থেই তাব সঠিক ব্যাখ্যাব ঠিকানা। শবৎচন্দ্রেব দবদী স্বষ্টিব বিপুল বিস্তৃতি যে পরিমাণে চিত্তবিনোদনী সেই পবিমাণে শিল্পার্থসাধক নয়—এই প্রতীতিব মূলে বয়েছে সংহত জীবনবোধ ও সঙ্গত শিল্পজ্ঞানেব প্রতিক্রিয়া। শিল্প-সাধনা শিল্পেব নিয়মে জীবন-সাধনা বলেই শিল্পেব অসঙ্গতিতে প্রকৃতপক্ষে জীবনবোধেব অসঙ্গতিই অভিব্যক্ত। শবৎচন্দ্রেব শেষেব পবিচযেব সমালোচনায় জগদীশ গুপ্ত শবৎচন্দ্রের অসংহত জীবনবোধ এবং সঙ্গতিহীন শিল্পক্রিযাব নির্মম বিশ্লেষণ করেছেন। শেষেব পবিচয শবৎচন্দ্রের প্রতিনিধিস্থানীয স্বষ্টি নয় এবং জগদীশ গুপ্তেব সমালোচনাও প্রতিকূলতাব আতিশয্যে দুষ্ট তথাপি এই উপন্যাসেব আলোচনাব ভিতবে জগদীশ গুপ্তেব মনের প্রবণতা এবং জীবন-জিজ্ঞাসাব গঠনটিব প্রকৃত পবিচয় লাভ কবা যায়। এক অর্থে শেষেব পবিচযেব আলোচনায শবৎসাহিত্যেব সাধাবণ অসঙ্গতিব সূত্রগুলিকে নির্দেশ কবা হয়েছে—বিশেষ-বচনাব প্রসঙ্গে সমগ্র বক্তব্যটি সীমিত বলে সমালোচনাকে মনে হয়েছে উগ্র প্রতিকূলতায পূর্ণ—এই সীমিত পবিসবেব শ্বাসবোধকাবী অসহিষ্ণুতায় কিছু কিছু কটূক্তিও স্বজিত হয়েছে—যেমন একক্ষেত্রে শবৎচন্দ্রকে জগদীশবাবু প্রায় ধাপ্পাবাজ বলেছেন।—

> **বাখালরাজ ভক্তিভরে সবিতার সর্বাঙ্গে যত মর্যাদাই নিরীক্ষণ করুক, আর মা মা আহ্বান যতই ধ্বনিত করুক, আর সারদা যত উৎসাহ লইয়াই বাখালের সঙ্গে কণ্ঠ মিলাক শরৎচন্দ্র সবিতাকে মর্যাদা দিয়া ফুটাইয়া তুলেন নাই— সজ্ঞানে কিংবা অজ্ঞাতে আমাদের ধাপ্পা দিয়াছেন।**

অবশ্যই অসহিষ্ণুতা এই সমালোচনাব বিশ্লেষণকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে কিন্তু তা সত্ত্বেও যে পদ্ধতিতে সমগ্র গ্রন্থখানি বিশ্লেষিত হয়েছে, চবিত্রগুলিব অসঙ্গতির স্বরূপ ব্যাখ্যাত হয়েছে, তা শবৎচন্দ্রেব কালে তাব প্রবল প্রভাবের পটভূমিতে বীতিমতো নির্মোহ মানসিকতাব পবিচাযক। চবিত্র-সংক্রান্ত আলোচনায় নিন্দাবাণী অথবা প্রশংসাবাণীকে আবদ্ধ বাখা যেখানে গড়পড়তা সমালোচনা, সেখানে একটা উপন্যাসেব নৈতিক সমস্যাকে কেন্দ্র কবে আলোচনাও আমাদেব কাছে নতুন এবং তাৎপর্যপূর্ণ না হয়ে পাবে না। শরৎচন্দ্রকে আমরা যে সমস্ত সদা-প্রস্তুত বিশেষণে বিশেষিত কবে থাকি—দবদী কথা-শিল্পী, নবনাবীর সম্পর্কেব ওপব নতুন আলোক-সম্পাতী, নাবীব দোলাচল-চিত্ততাব রূপকাব— এই সমস্ত বিশেষণকে এই সমালোচনায় আঘাত হানা হয়েছে। সমালোচনাটি যদি শবৎচন্দ্রের একটিমাত্র উপন্যাসেব ভিত্তিতে না হত তাহলে যে অসহিষ্ণুতা সমালোচনাটিকে মাঝে মাঝে আবহাওয়াচ্যুত কবেছে তাব অবকাশ ঘটত না। স্মর্তব্য যে শবৎচন্দ্র সম্বন্ধে ভাবালুতাকে জগদীশ গুপ্ত যতটা সমালোচকেব দৃষ্টিতে দেখতে পেবেছেন তাব থেকে বেশি ঘটেছে শিল্পী হিসাবে তাঁর নিজেব প্রতিক্রিয়াব প্রকাশ। এবং এই বকমই ঘটে থাকে। যখন কোনো লেখক অপব লেখকেব সাহিত্য-কীর্তিব বিচাব কবেন তখন সমালোচনাব ন্যায়-সূত্র অপেক্ষা তাঁব বাছে প্রধান বলে প্রতিভাত হয় নিজ শিল্প-অভিজ্ঞতা। অভিজ্ঞ শিল্পীই অভিজ্ঞ সমালোচক। বিড়ম্বিত শিল্পীব সমালোচনাতেও বিড়ম্বনা। সমালোচক হিসাবে বঙ্কিম এবং ববীন্দ্রনাথ যে এখনও পযন্ত ধ্রুবমর্যাদাব অধিকাবী তাব অন্যতম কাবণ শিল্পকে তাঁবা যথার্থ শিল্পীব দৃষ্টিতে দেখেছেন। শিল্প-বসিকেব সৌখিনতা সেখানে অহং বিনোদনে তৎপব হয়ে ওঠেনি। তাছাড়া শিল্পীব শিল্প-সমালোচনাব ব্যাপাবটি আবো একটি কাবণে আমাদেব কাছে গভীবতর অর্থদ্যোতক। এ জাতীয় আলোচনায় আমবা একজন শিল্পীব শিল্প-কর্ম আব এক শিল্পীমানসে কোন্ শিল্পসমস্যাব আকাবে অনুভূত, তাব ইঙ্গিত পাই। সাহিত্য জীবনেব ব্যাখ্যা। জীবনেব ব্যাখ্যাব ব্যাখ্যা সেখানেই অধিকতব গৌববময় হয় যেখানে ব্যাখ্যাতা নিজেই জীবন সমালোচক শিল্পী। এখানে একটা

কথা স্পষ্ট বলা দরকার যে, বিষবৃক্ষের সমালোচনায় যে রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ—মধ্যবর্তিনী গল্পেও সেই রবীন্দ্রনাথই প্রত্যক্ষ এমন ধরনের একটা মন্তব্য কিন্তু বেশিক্ষণ আমাদের সহায়তা করবে না। আমরা শিল্প-সমালোচককে জীবন-সমালোচনায় অবতীর্ণ দেখতে যতটা বাসনা করি জীবন-সমালোচককে শিল্প-সমালোচনায় দেখার বাসনা আমাদের কাছে তার চেয়ে অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ। সফল শিল্পী জীবনকে বোঝেন বলেই শিল্প ব্যাখ্যায় সেই জীবনোপলব্ধিকে প্রয়োগ করতে পারেন। পাঠলব্ধ শিল্পোপলব্ধিকে যদি জীবন-ব্যাখ্যায় প্রযুক্ত করেন কেউ, তবে তার মধ্যে কিছু সীমাবদ্ধতা অবশ্যম্ভাবী। মধ্যবর্তিনী গল্প গল্পের বেনামিতে কিছুটা বিষবৃক্ষের সংশোধনী সমালোচনা বলেই রবীন্দ্রনাথের রসসৃষ্টির শ্রেষ্ঠ স্বাক্ষর থেকে বঞ্চিত। এ-ক্ষেত্রে গল্পে ভাববস্তুর প্রেরণা, সংশোধনের বাসনাসঞ্জাত পরোক্ষ প্রেরণা। যতটা বুদ্ধিজাত ততটা অনুভূতি-শুদ্ধ নয়। জগদীশ গুপ্তের রচনার নেপথ্য-প্রেরণা-নির্মাণে শরৎচন্দ্রের ভ্রান্তির ও অসঙ্গতির প্রতিক্রিয়া কতটা এবং নিজস্ব মৌল অনুভূতি-সিদ্ধ জীবন-ব্যাখ্যা প্রয়াস কতটা সক্রিয় ছিল এই বিচারের ওপরই শেষ পর্যন্ত তাঁর প্রতিভার স্বাতন্ত্র্য নির্ণয় নির্ভরশীল।

●● দুই ●●

জগদীশ গুপ্ত কল্লোলের কালবর্তী এবং সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও সত্য যে কল্লোলের যা মূল বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত ছিল তা একমাত্র জগদীশ গুপ্তের রচনাতেই অভিব্যক্ত। স্বভাবতই এ-ক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠবে যে কল্লোলের মূল বৈশিষ্ট্য বলতে কী বোঝায়? অচিন্ত্যকুমারের সাক্ষ্যের প্রতি অমর্যাদা না করেও প্রতিক্রিয়াকেই কল্লোলের প্রাণধর্ম বলে আখ্যাত করা যায়। শুধু রবীন্দ্রনাথ যদি এই প্রতিক্রিয়ার লক্ষ্য হন তাহলে সমগ্র আন্দোলনই একটা সাহিত্যিক ফ্যাশন প্রচলনের অপরিণত উদ্দেশ্যে পর্যবসিত হয়। কল্লোল বলতে যা বোঝায় তার লক্ষ্যভ্রষ্টতার প্রধান হেতু এই অপরিণত উদ্দেশ্য। জগদীশ গুপ্তের দিকে না তাকালে মনে হয় কল্লোলের সমগ্র প্রতিক্রিয়া শেষ পর্যন্ত রোমান্টিক পন্থাবিলাসে পরিসমাপ্ত। বেদে, উপনায়ন, মিছিল প্রমুখ উপন্যাসের কাঠামো এবং বক্তব্য সমীক্ষণে এ-কথার সমর্থন মেলে। গোকুল নাগের পথিক ছাড়া কাব্যধর্মী উপন্যাসেরও একটা শিল্পসম্মত মান কল্লোল-পরায়ণদের হাতে সৃজিত হয়নি। বলাবাহুল্য এঁদেরও অধিকাংশের শিল্প

জীবনের মূলে যতখানি জীবন-সমালোচনার প্রেরণা কার্যকরী ছিল তার থেকে শিল্প-সমালোচনার প্রভাব কার্যকরী ছিল অধিকতর। বিদেশী সাহিত্যের হাতছানিতেই এঁরা রবীন্দ্র-প্রভাব-পরিহারের দুস্তর পথেব ধূলি-ঝঞ্ঝায় নেমে পড়েছিলেন। "অমুক অমুক বস্তু আমাদের সাহিত্যে নেই, থাকা উচিত" —কল্লোলের হাওয়ায় আন্তর্জাতিক আকাশেব দান এইটুকু। কাজেই স্বভূমি এবং পরিবেশ সম্বন্ধে কোনো গভীব জিজ্ঞাসার অবকাশ এখানে ছিল না। আমাদের বোহেমিয়ানী ভঙ্গি মানে এলোমেলা যথেচ্ছা কল্পনা। অ্যান্টি-রোমান্টিক নায়িকা মানে নায়িকার কেক ভক্ষণরত মুখশ্রী। ডিটেল সম্বন্ধে সূক্ষ্ম জ্ঞানের অর্থ নায়ক মুখে ক্যুটিকুরাকে ফেস পাউডাবেব বদলে মেখে ফেলবে কিনা এই সংশয় প্রকাশ। প্রেরণাব বিদেশী পুঁথিব উৎস যখন হারিয়েছে তখন দেশ নিরুদ্দেশ। অথচ কল্লোলের কালে প্রতিক্রিযাব মুহূর্তও পরিপক্ক। যে সমস্ত বস্তুগত কারণে এই প্রতিক্রিয়া মানসিক সাবালকত্ব অর্জনেব পথে চলছিল তার বিস্তৃত আলোচনা জগদীশ গুপ্ত প্রসঙ্গে স্থগিত বেখে শুধু এইটুকু ইঙ্গিতই বোধ হয় যথেষ্ট যে প্রথম মহাযুদ্ধেব পবেব বাঙালী মধ্যবিত্তেব চেতনাগত বিস্তৃতি যুদ্ধোত্তর সংকটেব শঙ্কিল পথ বেযে অগ্রসব হয়েছিল। প্রাকযুদ্ধ মধ্যবিত্ত জীবনের ছকে প্রথম আলোড়নেব আঘাত এসে পড়েছে তখন। রবীন্দ্রনাথ, প্রভাতকুমার, শরৎচন্দ্র এই পবিবর্তনমুখী চেতনাকে গল্পে-উপন্যাসে ধাবণ করতে পাবেননি। তখনও কথাসাহিত্যের মানুযেবা মাটিব মানুষ থেকে পৃথক। মাটির মানুষের যে প্রাকৃত যন্ত্রণা তা তখনও শিল্পেব অলৌকিক বঙে রঞ্জিত হবাব জন্য উন্মুখ। প্রেমেন্দ্র মিত্রেব উপনাযন প্রমুখ উপন্যাসে সেই যন্ত্রণাকে ব্যবহার কবার প্রচেষ্টা লক্ষণীয়।

কিন্তু প্রেমেন্দ্র, অচিন্ত্য, বুদ্ধদেব যে ববীন্দ্র-প্রতিক্রিযাকে কথাসাহিত্যে বহন কবতে চেয়েছিলেন সে প্রতিক্রিযার সীমাবদ্ধ চেহাবা অনুধাবনযোগ্য। বাংলা কথাসাহিত্যে তখন রবীন্দ্রনাথ-প্রভাতকুমাব-শরৎচন্দ্রেব আমল। এই ত্রয়ীর মধ্যে বিস্তৃত পার্থক্য সত্ত্বেও পাঠকমানসে শেষোক্ত দুজন নিঃসন্দেহে একটা আবহাওয়া সৃষ্টি কবেছিলেন। কল্লোলের লেখকবৃন্দেব সামনে কাজ ছিল জনশ্রুতিতে ধৃত, অথচ সাধারণ পাঠক সমাজে শ্রদ্ধেয়, কিন্তু অপ্রতিষ্ঠিত রবীন্দ্র-নাথের উপন্যাসের ঐতিহ্যকে স্পষ্ট করে তোলা। শরৎচন্দ্রের লঘুকরণের হাত থেকে উপন্যাসকে পুনরায় রবীন্দ্রনাথ-সম্মত জীবনচর্যাব দুরূহ পথের সন্ধানে ব্রতী কবে তোলাব দায় ছিল এঁদের। Up-to-date হবার ঐতিহাসিক তাগিদে

সে শিল্প-কর্তব্য এঁরা বিস্মৃত হয়েছিলেন, উপন্যাসের দিকে তাকালে এ-কথাই বলতেই হয়। প্রতিক্রিয়াব প্রয়োজন নিশ্চয় ছিল। কিন্তু সে প্রতিক্রিয়াব সবলীকৃত অর্থ ববীন্দ্র-অতিক্রমণ নয়। অবশ্যই আমবা জানি যে আমাদের সদ্য-ব্যবহৃত শিল্প-কর্তব্য কথাটিব কর্তব্যাংশে আপত্তি উঠতে পারে। কিন্তু সমগ্র আন্দোলনটি যখন কর্তব্যমূলক তখন কর্তব্যের শুদ্ধ রূপ এবং সমগ্র চেহাবাই বাঞ্ছনীয ছিল।

•• তিন ••

জগদীশ গুপ্তেব শবৎচন্দ্র সম্বন্ধে উগ্র প্রতিক্রিযা সেদিক থেকে একটি বিশিষ্ট মানসিকতা-সঞ্জাত। এই মানসিকতা তাঁব সাহিত্যিক ব্যক্তিত্বেব ফল। এই ব্যক্তিত্বকে উপলব্ধিব জন্য জগদীশ গুপ্তের সাহিত্য-কীর্তিব আলোচনা অবশ্য প্রয়োজনীয়। এ-প্রসঙ্গে প্রথমেই যা আমাদেব দৃষ্টি আকর্ষণ কবে তা হল/জগদীশ গুপ্তেব অন্তর্দৃষ্টিব একটি নিজস্ব অখণ্ড গঠন। ববীন্দ্র-অতিক্রমণ জাতীয় কোনো সৌখিন সাহিত্য অভিরুচি এই অন্তর্দৃষ্টিব বচয়িতা নয। ববীন্দ্রনাথ-প্রভাতকুমাব-শবৎচন্দ্রেব যৌথ প্রযাসে যে সাহিত্যরুচি গডে উঠেছিল, সেই আবহাওয়াব বিরুদ্ধে প্রথম সার্থক শিল্পী প্রতিবাদ জগদীশ গুপ্তেব। জগদীশ গুপ্তেব বিভিন্ন সৃষ্টি একটা গোটা সাহিত্যিক যুগেব প্রতিক্রিয়া-সঞ্জাত। সেই গভীব তাৎপর্যেই এই লেখক বাংলা কথাসাহিত্যেব ইতিহাসে স্মবণীয়। অন্যদেব ক্ষেত্রে যেখানে প্রতিক্রিযাব ব্যাপাবটা ছিল বুদ্ধিসম্ভব উপলব্ধি, জগদীশবাবুব ক্ষেত্রে সেখানে উপলব্ধিটা জীবনবোধেব ফল। জীবনেব গূঢ় সমস্যা হিসাবেই তিনি বিষযগুলিকে শিল্পী হিসাবে ধাবণ কবেছিলেন। যে সমস্ত পূর্বতন শিল্প-সৃষ্টি তাঁব স্রষ্টা-মানসে বিভিন্ন প্রশ্নেব জন্ম দিয়েছিল, সেগুলো তাঁব কাছে শিল্পবীতিব বিচ্ছিন্ন প্রশ্ন নয। জীবনকে তাঁব নিজেব দৃষ্টিতে বুঝতে চাওয়াব প্রেবণা পেযেছিলেন সেখান থেকে। এই সূত্রেব সাহায্যেই জগদীশ গুপ্তেব শক্তি এবং দৌর্বল্য উভয়কে ব্যাখ্যা কবা যাবে।

ধবা যাক্ অসাধু সিদ্ধার্থ নামক উপন্যাসটিব কথা। নটবব নামে এক ব্যক্তি সিদ্ধার্থ নামে মৃত এক উজ্জ্বল-চবিত্র ব্যক্তিব ছদ্মবেশ ধাবণ কবেছিল অজয়া নামে একটি সুন্দবী তরুণীব হৃদয হবণেব জন্য। সিদ্ধার্থেব সমস্ত পবিচয নটবর সংগ্রহ কবে বেখেছিল। এই ছদ্মবেশ ফেঁসে গেল অজযা এবং ছদ্মবেশী সিদ্ধার্থেব প্রেম যখন বিবাহেব মুখোমুখি গিয়ে দাঁডিয়েছে তখন। এখন এই যে কাঠামো

এ আমাদের কাছে অল্পবিস্তর পরিচিত কাঠামো। রত্নদ্বীপ উপন্যাসেও এই কাঠামোর সাদৃশ্য মোটেই দুর্লক্ষ্য নয়। সেখানেও মৃত স্বামীর আবয়বিক সাদৃশ্যের সুযোগে বৌরানীর অন্তঃপুরে এবং অন্তরে প্রবেশের অধিকার পেয়েছিল নায়ক রাখাল। গল্প-প্রিয় প্রভাতকুমার যে যত্নে প্লটকে গড়ে তুলেছিলেন সে যত্নে বিষয়বস্তুর অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাকে ব্যবহার করতে পারেননি। এখানে কল্পনার সর্বোচ্চ ব্যবহারে রাখালের দ্বন্দ্বকে ব্যবহার করার কথা। প্রভাতবাবু তাঁর এই সর্বোত্তম সৃষ্টিতে যেন বড়ো তাড়াতাড়ি রাখালের পাপ-ক্ষমতার সীমায় গিয়ে পৌঁচেছেন। রাখালকে স্তিমিত রেখে বঙ্কিমের moral teaching-এর অনুবর্তী প্রভাতকুমার বৌরানীকে ফুটিয়েছেন সর্ব-শক্তি নিয়োগ করে। সে-ক্ষেত্রে তিনি সার্থককাম। জগদীশ গুপ্তের কাছে এই গল্পের অর্থ অন্যতর। "নিজে যা নয় ছদ্ম আচরণে নিজেকে তাই প্রতিপন্ন করবার প্রাণান্ত প্রয়াস তো প্রত্যেকেরই জীবনের এক অংশ" —এই জীবনগত চিরন্তন অদৃষ্ট লিখনের টানে আমাদের অনেক ব্যর্থতার জন্ম। সিদ্ধার্থের ছদ্মবেশের ব্যর্থতা প্রকৃতপক্ষে তার জীবনের ব্যর্থতা।

রত্নদীপের রাখালের পাপ-চেতনা বৌঠাকুরানীকে দেখে এবং তাঁর সংস্পর্শে এসে জাগ্রত হয়েছে। তার পূর্ব পর্যন্ত সে স্বাভাবিক মানুষ, স্বাভাবিক বিপদ-বিমুখ এবং অকস্মাৎ দুঃসাহসী ব্যক্তি। বৌরানীর সংস্পর্শে না এলে সে কখনও আত্মানুশোচনায় দগ্ধ হত না। বৌরানীই তার পাপ-চেতনার উদ্বোধক। পক্ষান্তরে নটবরের সিদ্ধার্থ হবার বাসনা জেগেছে অজয়াকে দেখার পর— অজয়ার নিকটবর্তী হবার বাসনায়। নটবরের জীবন রাখালের মতো এই ঘটনা ব্যতিরেকে স্বাভাবিক জীবনও নয়। বরঞ্চ বলা যায় চরম অস্বাভাবিক। নটবর ছিল বৈষ্ণবীর গর্ভে ব্রাহ্মণের জারজপুত্র। মুদির দোকানের ছোকরা চাকর, সখের থিয়েটারে অভিনেতা ও পরিশেষে অর্থলোভে এক বৃদ্ধা বেশ্যার শয্যাসহচর — এই হল নটবরের নাতিদীর্ঘ জীবনের প্রধান বিগত পরিচ্ছেদ। এই ব্যক্তি নানা অপবিত্র কার্যাদির মাঝে বা পরিশেষে একটি পবিত্র স্বপ্নের কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছিল— সেটি হল অজয়াকে ভালবাসা। ভালবাসা তাকে যে ছদ্মবেশ পরিয়ে দিল ভালবাসার বিশুদ্ধ আবেগে সেই ছদ্মবেশ তার জীবনে খাঁটি হয়ে উঠতে চাইল। অতীত জীবনের প্রেতভূমির বাসিন্দারা অত অনায়াসে এই নবাগত অধ্যায়কে সংযোজিত হতে দেবে না। জগদীশবাবু যথার্থই নটবর-সিদ্ধার্থের সংঘাতকে উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে ব্যবহার করেছেন।

অজয়ার প্রভাবে ধীরে ধীরে মহানুভবতার অভিনয়ে অভ্যস্ত নটবরের আত্ম-সমালোচনা ও আত্মচিন্তার মধ্যে নিষ্ঠুর স্বার্থপরতার যে কারুণ্য তা লক্ষণীয়।—

শুনতে পাই, জীবন-যুদ্ধে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা কীট-পতঙ্গে আছে উদ্ভিদে আছে—সেটা বিধিদত্ত প্রেরণা। তবে আমি মানুষ হয়ে কেন টিকে থাকতে চাইব না ?···মনে মনে তাল ঠুকিয়া বলিল—আলবৎ চাইব।···কীট পতঙ্গ উদ্ভিদ রং বদলায়, আমি একটু নাম বদলেছি, কিন্তু মানুষ তো আমি সেই আছি।···ধরণীর সব সুখ কৃপণের মতো লুকিয়ে রেখেছিল—এতদিন পরে তার এক অঞ্জলি তপস্যার ফলের মতো আমার সম্মুখে ছড়িয়ে দিয়েছে ; কেন আমি তা দু-মুঠো ভরে কুড়িয়ে নেব না ?

এই কাঙাল মনোভাবকে নটবর বহু শঠতায় ও কাপট্যে সিদ্ধার্থের রূপে সাজিয়েছে। অজয়ার স্বপ্নময় আকর্ষণ আত্মহত্যামুখী নটবরকে যে মুহূর্তে নবজীবন-রসে সঞ্জীবিত করেছে, প্রকৃতপক্ষে সেই মুহূর্তই নটবরের ধ্বংসাবশেষে সিদ্ধার্থের জন্মমুহূর্ত। অজয়ার ভালবাসায় নটবরের জগৎ সংসার পরিবর্তনের দিকে ঝুঁকে পড়ে—কিন্তু মিথ্যা খতের সাক্ষী হিসাবে আসে রাসবিহারী, তার পুরনো বন্ধু। রাসবিহারীকে দেখলেই নটবরের মনে হয় জগৎ অপরিবর্তনীয়। নটবরের অবচেতনে ধীরে ধীরে সমুদয় অভিনয়, সমুদয় ছলনার প্রতিক্রিয়া রূপ-পরিগ্রহ করে স্বপ্নে :

শ্মশানে চিতা জলিতেছে, চিতাব আগুনে ধোঁয়া নাই, কিন্তু তার অবিশ্রান্ত সোঁ সোঁ শব্দ নিবিড় আর নিস্তব্ধ অন্ধকারেব ভিতর দিয়া যেন একটা তরল স্রোতের মতো বহিয়া চলিয়াছে—

চিতায় শায়িত শবদেহটা দেখা যাইতেছে—

পুড়িতে পুড়িতে দেহটা কাষ্ঠ শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া ধীরে ধীরে মাটির উপর পা রাখিয়া নামিয়া দাঁড়াইল, আগুনের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল—চক্ষু তার নির্নিমেষ—

আসিয়া সে সিদ্ধার্থেরই সম্মুখে দাড়াইল , বলিল—চিনতে পারছ ?

—না, কে তুমি ?

—আমি সিদ্ধার্থ। আমার প্রত্যাবর্তন আশা করনি বুঝি ?

—তুমি তো মৃত।

—না, আমি জীবিত। আমার পরিচয় চুরি করে যাকে তুমি মুগ্ধ করেছ সে তো আমার। তুমি তার কে ?

স্বপ্ন ভেঙে যাওয়ার পরেও সিদ্ধার্থের মৃত চোখ দুটি যেন নির্নিমেষ নয়নে নটবরের দিকে তাকিয়েছিল। সমগ্র কাহিনীটির তাৎপর্যও এইখানে। "আমার পরিচয় চুরি করে যাকে তুমি মুগ্ধ করেছ সে তো আমার। তুমি তার কে ?" এই উক্তির মধ্যে অসাধু সিদ্ধার্থ উপাখ্যানের নাট্যরসের সংহত রূপ। সমগ্র উপন্যাসটির মূল বিষয়বস্তু মুমূর্ষু মানুষের জিজীবিষা। নটবরের শেষ উক্তি ও-প্রসঙ্গে আলোক-সম্পাতী। তাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হল, বলে যাও সিদ্ধার্থ কোথায়, তার জবাবে সে বলল—স্বর্গে কি নরকে তা সে জানে না, তবে এটুকু জানে সে বেঁচে নেই। সিদ্ধার্থ বেঁচে নেই—এই শেষ উক্তির সার্থকতা এইখানে যে সিদ্ধার্থ হতে চাওয়া সর্বক্ষেত্রেই মৃত হতে বাধ্য। মূল সিদ্ধার্থের ক্ষেত্রেও এটা সত্য, ভুল সিদ্ধার্থের ক্ষেত্রেও এটা সত্য।

দেখা যায় রূপকের আবহাওয়া বা পরিমণ্ডল সত্ত্বেও জগদীশবাবু নটবরের জীবনের মৌল সমস্যাকে বিশ্ব জীবনের মূল ধারার সঙ্গে অন্বিত করে শিল্পরূপ দিয়েছেন। প্রভাতবাবুব ক্ষেত্রে বাখালের পাপ-সাধ্যের সীমা হল রাখালের (মূলত অব্যবহৃত) দ্বন্দ্বের হেতু। এখানে দেখানো হল পাপ-সাধ্যের কোনো সীমা নেই। নটববের পাপ-ক্ষমতাব ভিতব দিযেই প্রকাশমান পৃথিবীর শাশ্বত নিবাময়-সঞ্চারিণী শক্তি। সে জীবনান্তবেব বাসনায ছলনার পথেব পথিক—সেই বাসনার এমনই অন্তর্নিহিত অমৃতধাবা যে তারই এক অঞ্জলি পানে পাপও, ছলনাও অমর হতে চায়। বিষয়বস্তু এবং বক্তব্য নির্মাণের দিক থেকে জগদীশবাবুব প্রযাস নিঃসন্দেহে প্রভাতকুমারেব থেকে একপদ অগ্রবর্তী।

•• চার ••

ঠিক এমনিভাবেই গতিহারা জাহ্নবী-র প্রসঙ্গ উত্থাপিত হতে পাবে। অকিঞ্চন ও কিশোবীর দাম্পত্য জীবনের নিদারুণ অসঙ্গতিঘটিত নৈতিক প্রশ্ন এই উপন্যাসের ভাব-বীজ। অকিঞ্চন স্থূল-প্রবৃত্তিপরায়ণ গ্রাম্য যুবক। ভূস্বত্বভোগী, নিষ্কর্মা। তার নববিবাহিতা স্ত্রী কিশোরী নারীর স্বাভাবিক সততার অধিকারী। এই দুয়ের সংঘাতে যে আপসহীন অনিবাযতা তাকে লেখক ক্ষমাহীন ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। স্থূল স্বামী এবং আদর্শ-রুচি পত্নীর ব্যক্তিত্ব-সঞ্জাত দ্বন্দ্বের আশ্চর্য শিল্পরূপ আমরা যোগাযোগ উপন্যাসেও প্রত্যক্ষ কবি। যোগাযোগের ব্যক্তিসত্তাগুলি নিজ নিজ ইতিহাসেব যোগফলে জগদীশবাবুর ব্যক্তিবৃন্দ অপেক্ষা বিরাটতর। উপন্যাসের উদ্দিষ্ট রসবস্তুকে শিল্পেব ও জীবনের ন্যায়ে বন্দী

করার প্রয়াসেও রবীন্দ্রনাথ অধিকতর অভিনিবেশের পরিচয় দিয়েছেন। কুমুর ব্যক্তিত্বের উৎস, মধুস্দনের অধিকার-চেতনার মূল শিল্পের ন্যায়েই আমাদের কাছে পরিস্ফুট। জগদীশবাবুর ক্ষেত্রে সেই ঔপন্যাসিক মননশীলতার অভাব আছে। কিশোরী কেমন করে জগদীশবাবুর নায়িকা হল সে-কথা আমাদের কাছে অস্পষ্ট। শুধু আমরা ধরে নিতে পারি যে লেখক একটি গ্রাম্য তরুণীর স্বাভাবিক শুচিতাবোধকে একটা স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার বলে ধরে নিয়েছেন। তাই বাগ্‌দীদের মেয়ে ভুবন এবং গেরস্তের মেয়ে কিশোরীতে কোনো পার্থক্য না দেখলেও জগদীশবাবু আশ্চর্য হন না। কেননা দুইয়ের ক্ষেত্রেই শুচিতাবোধ স্বতঃসিদ্ধ।

তথাপি এই উপন্যাসে নাট্যরস সৃজনে লেখক এমন সব মুহূর্ত রচনা করেছেন যা জীবনের গভীর অন্তঃস্থলটিকেও আলোকিত করে। বাড়ির উঠানে ভুবন এসে যখন অকিঞ্চনের তার প্রতি কামার্ত আচরণের অভিযোগ উচ্চারণ করল সে-মুহূর্তের সূচীভেদ্য জমাট গাঢ়তা অতুলনীয়।—

> ভুবনের একান্ত সন্নিকটে আর একেবারে সম্মুখে বসিয়া আর নির্নিমেষ চক্ষে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কিশোরী সব শুনিল—
>
> কাত্যায়নী অদূরে দাঁড়াইয়া বোধকরি কতক শুনিলেন, কতক শুনিলেন না। কিশোরী তার পরেও বসিয়াই রহিল। কাত্যায়নী নিঃশব্দে রান্নাঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন কড়াই পুড়িয়া ধোঁ ধোঁ করিতেছে। ভুবন বলিল—এখন আমি আসি, তুমি ক্যানে শুনলে—বলিয়া কিশোরীর রক্তহীন বিবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া সে কিছুক্ষণ আবিষ্টের মতো অবশ হইয়া বসিয়া রহিল।
>
> কিশোরী বলিল—শুনলাম ভালোই হল, আচ্ছা এসো এখন। ভুবন চলিয়া গেল। এবং কাত্যায়নী রান্নাঘরের ভিতর হইতে গম্ভীর কণ্ঠে আদেশ করিলেন —বৌমা চান কর, বাগ্‌দী মাগীকে ছুঁয়েছ।
>
> কিশোরী বলিল—করি।
>
> তারপর মনে হইল তার বলে—জননী কতবার কত জলে স্নান করিলে তোমার পুত্র শুচি হইতে পারে? বলিল না ঘৃণা করিয়া, বাক্যব্যয়ের অরুচিতে।

এই মুহূর্তে কিশোরীর আচরণের স্পষ্টতা আমাদের বিস্মিত করে। এবং এই আচরণগত স্পষ্টতার জন্য যে পরিস্থিতি পর্যায়ের পরম্পরা-সৃজন উপন্যাসে প্রয়োজন সে-ক্ষেত্রেও জগদীশ গুপ্তের কাহিনী-সংস্থান প্রয়াস মূল্যবান কিন্তু

"তারপর মনে হইল তার বলে" এই অংশে যে রুচির প্রশ্ন জড়িত তার ইতিহাস কোথায় সে-কথা স্পষ্ট হয়নি। "বলির পর জীবটির মুণ্ড আর দেহ যেমন বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়"—কিশোরী সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন হল। পিত্রালয়ে চলে গেল সে স্বামীগৃহ পরিহার করে।

স্বাভাবিক সততার আশ্চর্য আধার নয় কিশোরী। বরঞ্চ মানুষী আধারের দুর্বলতাও সেখানে ঈপ্সিত পূর্ণতারই জননী। স্বামী-বিরহে পিত্রালয়বাসিনী কিশোরীর দেহ অথবা মন স্বামীর জন্য কেমন কেমন করেনি। এ যদি হত তবে বলতে হত নিম্নশ্রেণীর শিল্পকৌশলের আশ্রয়ী হয়েছেন জগদীশবাবু। স্বামীকে সে উপযাচক হয়ে পত্র প্রেরণ করেছিল বটে, সে ভিন্ন কারণে। ব্যক্তিমানসের সামাজিক অংশটুকু সমাজের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতার যন্ত্রণাকে ভয় পায়। সমাজ নানা সম্পর্কের জাল মেলে দিয়ে নানাদিক থেকে বেঁধে ফেলতে চায় ব্যক্তির মন। কিশোরীর ক্ষণদৌর্বল্যের ইতিহাসও তাই। বৈশাখ মাস আসে, চারদিকে শ্বশুরবাড়ি থেকে মেয়ে আসবার, শ্বশুরবাড়িতে জামাই আসবার সোরগোল, কিশোরী বুঝল যে এ-উৎসবে তার স্থান নেই। তার বান্ধবীরা তাকে এড়িয়ে চলে। তার পত্র প্রেরণের মূলে এই সামাজিক মন। সেখানে তার শর্তে অকিঞ্চনের অসম্মতিতে অথবা উপেক্ষায় চিঠির ভূমিকা শেষ হল। তার এই পিত্রালয় জীবনের মাঝখানে একদিন সে আবিষ্কার করল অকিঞ্চনের সন্তান তার গর্ভে।

এমনিভাবে কুমুও একদিন সচকিত হয়ে উপলব্ধি করেছিল তার শারীরিক অবস্থা। অশ্লীল এবং স্থূল মধুসূদন সম্বন্ধে এমনি ঘৃণাই তখন ছিল কুমুর। কিন্তু ভিন্ন ব্যক্তিত্বের আধারে কল্পিত এই দুই চরিত্রের একই ঘটনার প্রতিক্রিয়ার দুই রূপ লক্ষণীয় :

কিশোরী	কুমু
কিন্তু সহজ সরল অর্থ ঘুচিয়া গিয়া কিশোরী যে অর্থ পাইল তাহা ভয়ানক। এমন নিরর্থক অযাচিত ব্যাপার, এক-দিকে হাস্যকর অন্যদিকে হৃদয়বিদারক হইয়া আর কাহারো জন্য কখনো ঘটে নাই বোধহয়। এই সন্তান কি স্বামীর	মধুসূদনের মধ্যে এমন কিছু আছে যা কুমুকে কেবল যে আঘাত করেছে তা নয়, ওকে গভীর লজ্জা দিয়েছে। …ওর সেই স্বাভাবিক ইতরতায়, ভাষার কর্কশতায়, দাম্ভিক অসৌজন্যে, সবসুদ্ধ মধুসূদনের দেহমনের, ওর সংসারের

আত্মজ? স্বামী যাহা অকাতরে দান করিয়া করিয়া ইহকাল ও পরকাল-ব্যাপী কলুষ মর্মে আত্মায় পুঞ্জীভূত করিয়াছিল—এই সন্তান সেই অশেষ কলুষজাত—ইহা শুভ নহে, ঈপ্সিত নহে। ইহা অবাঞ্ছিত এবং বর্জনীয় কলুষ। সর্পের যেমন বিষদাত থাকে ঐ পুরুষটির অন্তরে তেমন একটি জ্বালাময় প্রবৃত্তি আছে। এই সন্তান তাহার সেই প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তির চিহ্ন মাত্র। বিবাহিতা পত্নীর গর্ভের সন্তানের যে মূল্য লোকে দিয়া থাকে ইহার সে মূল্য নাই তার মুখ দেখিয়া কি সে সকল যন্ত্রণা ভুলিতে পারিবে? যেমন সকল মা পারে? সে তা পারিবে না।

আন্তরিক অশোভনতায় প্রত্যহই কুমুর সমস্ত শরীর মনকে সঙ্কুচিত করে তুলেছে। যতই এগুলোকে দৃষ্টি থেকে, চিন্তা থেকে সরিয়ে ফেলতে চেষ্টা করেছে, ততই এরা বিপুল আবর্জনার মতো চারিদিকে জমে উঠেছে। আপন মনের ঘৃণার ভাবের সঙ্গে কুমু আপনিই প্রাণপণে লড়াই করে এসেছে। স্বামী-পূজার কর্তব্যতার সম্বন্ধে সংস্কারটাকে বিশুদ্ধ রাখবার জন্য ওর চেষ্টার অন্ত ছিল না, কিন্তু কত বড়ো হার হয়েছে তা এর আগে এমন করে বোঝেনি। মধুসূদনের সঙ্গে ওর রক্তমাংসের বন্ধন অবিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। তার বীভৎসতা ওকে বিষম পীড়া দিলে।

এ-প্রসঙ্গে কুমুর শেষ উক্তি হল "এমন কিছু আছে যা ছেলের জন্যও খোওয়ানো যায় না।"

ব্যক্তি হিসাবে উভয়ের ক্ষোভ এবং নারী হিসাবে উভয়ের অসহায়তা উদ্ধৃত অনুচ্ছেদ দুটির সাদৃশ্য-সূত্র। কিশোরীর চিন্তায় যে স্পষ্টতা এবং কুমুর অবস্থার কাছে আত্মসমর্পণের যে ভঙ্গি তা গভীর আলোচনার বিষয়। এত বড়ো একটা ব্যাপারে যেন কুমুর প্রতিক্রিয়া তাদৃশ সাড়া দিতে পারেনি এমন মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়। অশ্লীলতা এবং বীভৎসতার কথা কুমুর মনে এসেছে বটে কিন্তু শ্যামাপ্রসঙ্গ এই প্রয়োজনীয় মুহূর্তে দেখা দেয়নি। অবশ্যই কিশোরীও শেষ পর্যন্ত মায়ের কাছে গিয়ে কেঁদে পড়েছিল, বলেছিল—যা খুশি করো তোমরা আমায় নিয়ে। এখানে কিশোরীর জীবন-বিতৃষ্ণাকে প্রতিকূলতার কাছে অসহায় করে তুলেছেন জগদীশবাবু। কিন্তু কুমুর ক্ষেত্রে তা না হওয়ার কারণ রবীন্দ্রনাথের জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে অপার নৈতিক সচেতনতা। কুমু না হতে পারলে আর সবকিছু হওয়াই ব্যর্থ। বধূ হওয়া এবং জননী হওয়াও। জননী

হতে চলেছে বলে তার প্রতিক্রিয়ার তীব্রতাব কিছু বৃদ্ধি ঘটবে না। ঘটলে, নিঃশেষে আত্মসমর্পণের আত্যন্তিক পবাজয়ই প্রধান হয়ে ওঠে। সংসার অন্ধের মতো বসে বসে যে অদৃষ্টেব জাল বুনে চলেছে তা কখন এবং কবে থেকে আমাদেব চাবপাশে ঘন হয়ে নিকটবর্তী হয় আমরা তা জানি না। জালবদ্ধ হবিণেব মতো জালবদ্ধ মানুষ জাল সম্বন্ধে অকস্মাৎ সচেতন হয়ে প্রবল প্রতিক্রিয়াব আক্ষেপে কেঁপে ওঠে। বিশোবীব স্পষ্ট চিন্তাব মধ্যে তাবই ইঙ্গিত। যে-স্ত্রীলোক মাযেব কাছে বলল—যা খুশি কবো আমাকে নিয়ে, সে আসলে মৃত। কুমুব অধ্যাত্ম-প্রেবণায এই মৃত্যু থেকে সঞ্জীবিত হবাব সম্পদ ছিল। কিশোবীব এবং নটববেব শেষ উক্তিব মধ্যে যে আত্মিক বিনষ্টিবোধ, যে চূড়ান্ত শূন্যতা তাব মধ্যে সঞ্জীবনীবোধ নেই।

এই অভাবেব মূল অবশ্যই জীবন সম্বন্ধে জগদীশবাবুব attitu le-এব মধ্যে। কুমুব ক্ষেত্রে কুমুব লাঞ্ছনা তাব ব্যক্তিত্বেব লাঞ্ছনা। কিশোবীব লাঞ্ছনা অদৃষ্টেব লাঞ্ছনা। কুমুব যে ভাবনাংশ আমবা উদ্ধৃত কবেছি সেখানে দেখা যায় মধুসূদন নামক ব্যক্তিব অন্তব বাহিবেব গোটা জীবনাচবণেব যোগফলকেই কুমু স্বীকাব কবে নিতে পাবেনি। অকিঞ্চনেব দুশ্চবিত্রতাই সে-ক্ষেত্রে বিশোবীর বিরূপতাব কাবণ। কিন্তু এই কাবণেব মধ্যে এমন এক দৈন্য বিদ্যমান যেটা জগদীশবাবুব জীবন সম্পর্কে মনোভাবেব বা তাব মনোভঙ্গিব কিছুটা ক্ষতি কবেছে। জীবন নিযতিব নিষ্ঠুবতাব শিকাব। জীবনকে নিষ্ঠুব কবতে গিযে তিনি অকিঞ্চনকে নিষ্ঠুব কবে ফেলেছেন। সেই কাবণে কিশোবীব উদ্ধৃত উক্তি কুমুব চেযে স্পষ্ট শোনালেও কুমুব সমগ্রতা বিশোবীতে নেই, যদিও এ প্রমাণেব কোনো অভাব নেই যে কিশোবীব বেদনাব তীব্রতাকে তিনি অনুভব কবেছিলেন। এবং সে অনুভূতিকে গোঁজামিল দিযে হেয কবেননি।

জীবনেব অন্তর্নিহিত শুদ্ধিভবনেব শক্তিকে দুঃখবাদী জগদীশবাবু সবত্রই পবাভূত দেখেছেন। একটা শিল্পী-জীবনেব আদি অন্ত জীবনবোধেব অপবিবর্তনীযতা শিল্প এবং জীবন দুয়েব ন্যাযেই অসত্য। জগদীশ গুপ্তেব দৃষ্টিব এই অপবিবর্ত-নীযতা অবশ্যই আমাদেব পাড়া দেয। কিন্তু তিনি কখনও জীবনেব প্রচেষ্টাকে ছোট কবে দেখেননি। শুদ্ধিভবনেব দিকে জীবনেব অমেয প্রয়াসকে তিনি যদি ছোট কবে দেখতেন তাহলে তাঁব পক্ষে শিল্পসৃষ্টিই সম্ভব হত না। সুখেব বিষয জীবনেব অমেয প্রযাস জগদীশ গুপ্তেব সার্থকতম শিল্পসৃষ্টিব মধ্যে সর্বদাই প্রতিফলিত। যদিও প্রাক্তনেব সূত্রে অথবা কর্মফলেব বন্ধনে মানুষেব স্বাধীন

ভূমিকা অবলুপ্ত এমন একটা ধারণা জগদীশবাবুর ছিল, তথাপি স্বাধীন ভূমিকা বিস্মৃত মানুষের কথা তিনি কখনও ভাবেননি। বরঞ্চ প্রাক্তন কর্মফলের বন্ধনে বন্দী মানুষ স্বীয় ভূমিকার স্বাধীন বিকাশের জন্য অশেষ যন্ত্রণাকে শিরোধার্য করেছে, হয়েছে সংগ্রামপরায়ণ— এই ছবিই মানুষের সত্য ছবি বলে তাঁর কাছে প্রতিভাত হয়েছে। এই কারণেই বোধহয় বাংলা সাহিত্যে তাঁর আত্মীয়-সন্ধানে ব্যর্থ হবার আশঙ্কাই বেশি। একমাত্র কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ছাড়া জগদীশবাবুর শিল্পস্বভাবের আত্মীয় আব কেউ নেই। উদাসীন অদৃষ্ট শক্তি, যাকে রচনা করেছে কর্মফল, এবং যন্ত্রণাহত শান্ত মানুষ—যতীন্দ্রনাথ ও জগদীশ গুপ্তকে আকৃষ্ট করেছিল। তাঁর প্রধান উপন্যাস লঘুগুরু এ-প্রসঙ্গে প্রোজ্জ্বল নিদর্শন। যন্ত্রণাহত শান্ত মানুষ এই কথাটি লঘুগুরু উপন্যাসের টুকির সংমা বলে পরিচিত বিশ্বম্ভরের রক্ষিতা উত্তমকে যত মানায় তত আর কাউকে নয়। প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর বিশ্বম্ভব উত্তমকে পছন্দ করে নিয়ে এসেছিল সঙ্গে রাখবে বলে। যদিও উত্তম-বিশ্বম্ভর সম্বন্ধে লেখক 'নবযুগল' বলে উল্লেখ করেছেন তথাপি আমরা জানি বিবাহাদিব কোনো ব্যাপাব এখানে নেই। "উত্তম বিশ্বম্ভরের বাড়িতে যাইবে ঠিক হইয়া গিয়াছে"—এই চুক্তিটুকুর কথা লেখক এক কথায় সমাপ্ত করেছেন। এব পরে আমবা উত্তমকে বিশ্বম্ভরের কন্যা টুকি-সমেত সংসারের কর্ণধার হিসাবে দেখি। সমগ্র লঘুগুরু উপন্যাসকে উত্তমের আত্ম-প্রতিষ্ঠার অনলস যন্ত্রণাভোগ বলে বর্ণনা করা চলে। উত্তম সর্বৈবভাবে টুকির মা হতে চেয়েছিল। টুকির প্রতিষ্ঠায় এবং শুদ্ধ জীবনের বাসনায় প্রকৃতপক্ষে তার নিজেরই শুদ্ধতার বাসনা। স্মবণ বাখা কর্তব্য যে বাংলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্র পতিতা নারীদের সাধ্বী হিসাবে অঙ্কনে তখন পূর্বসূরী। রাজলক্ষ্মী চন্দ্রমুখী প্রমুখ চরিত্রে শরৎচন্দ্র স্নিগ্ধ মানবিকতার সাহায্যে পাঠক সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন সমাজ-ভ্রষ্টাদের দিকে। শরৎচন্দ্রেব কাছে পতিতার সমস্যা বলে কিছু ছিল না। পতিতারা সাধু রমণী মাত্র এই কথাটুকুই ছিল শরৎচন্দ্রের বক্তব্য। তাদের শ্রেণী বা ব্যক্তি কোনো রূপকেই শরৎচন্দ্র ধারণ করতে চাননি, করেননি। এইসব রমণীদের মধ্যে প্রেম আছে এবং প্রেমেই সব শুদ্ধ, সতীত্ব অপেক্ষা নারীত্ব অনেক বড়ো কথা, এই ছিল মোটামুটি শরৎচন্দ্রেব বক্তব্য। উত্তমের সাহায্যে জগদীশবাবু দেহজীবিনী এক নাবীর গোটা জীবনের বাসনার সমস্যাকে রূপদান করেছেন। শবৎচন্দ্রের মতো সহানুভূতিব প্রশ্ন জগদীশ গুপ্তের মুখ্য প্রশ্ন ছিল না।

নাট্যকারের নির্লিপ্তি জগদীশবাবুর আদর্শ বলে তিনি উপন্যাসে যৎপরোনাস্তি স্বল্পভাষী। এ-স্বল্পভাষিতা কখনো কখনো তাঁকে ত্রুটির সীমায় উপনীত করেছে। করেনি যে সমস্ত ক্ষেত্রে উত্তম তার অন্যতম। উত্তম চেয়েছিল টুকির জন্য তার সমস্ত অতীতকে মুছে ফেলতে। পাড়াপ্রতিবেশীর কুৎসা, বিশ্বম্ভরের দেওয়া অমর্যাদা এবং শতমুখী সামাজিক দংশনকে সে সহ্য করেছে শান্ত চিত্তে এবং পক্ষীমাতার মতো টুকির নবজাগ্রত নানা প্রশ্নের হাত থেকে, পরিবেশের কবল থেকে, টুকিকে ডানার আড়াল দিয়ে বাঁচাতে চেয়েছে। নিজের সর্বস্ব দিয়ে সে টুকির বিয়ে দিয়েছে। টুকির ভালো বরের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। উত্তম যা কিছু এ-সংসারে ভালো বলে জানে তা সবই টুকিকে শিখিয়েছে। ঘর গেরস্তালির মাঙ্গলিক কর্মাদি, ক্রোচেট বোনা প্রভৃতি টুকিকে শিখিয়ে উত্তম যেন টুকির ভিতর দিয়ে নিজের জীবনেরই সংশোধিত রূপ সৃজন করে চলছিল। টুকির বিবাহিত জীবনের ব্যর্থতায় প্রতি পদে পদে আমাদের চোখের সামনে উত্তমের সেই প্রয়াস ভেঙে খান খান হয়ে গেল। টুকির অন্ধকারে অন্তর্ধানের ভিতরে যেন প্রতিফলিত হল উত্তমের সাধনার অন্ধকার-বিলুপ্তি—যে সাধনা একমাত্র টুকি ছাড়া লালমোহন, বিশ্বম্ভর, পাড়া প্রতিবাসী, বিশ্বম্ভরের বন্ধুবান্ধব সকলের কাছ থেকে শুধু আঘাত পেয়েছে। কাম্য বিষয়ের স্পষ্টতায় এবং স্পষ্ট কামনার সঙ্গে প্রাক্তনের কর্মফলের সংঘাতে ব্যক্তির চূর্ণীকৃত রূপরচনায় লঘুগুরু অনুপম। লঘুগুরু তাঁর প্রথম দিকের উপন্যাস হলেও সার্থকতায় বোধ করি জগদীশ গুপ্তের সর্বোত্তম রচনা।

•• সাত ••

এতক্ষণে একটা কথা আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়েছে যে জগদীশবাবু তার সমস্ত উপন্যাসে একই বক্তব্যকে উপস্থাপিত করেছেন। অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ-প্রভাত-কুমার-শরৎচন্দ্রের প্রতিক্রিয়া তাঁর রচনায় পরিস্ফুট কিন্তু তাঁর এই প্রতিক্রিয়ার জন্ম জীবন-বিষয়ক বক্তব্য থেকে। সে বক্তব্য হল এই মানুষ তার কর্মফলকে মুছে ফেলে স্বাধীন শুদ্ধতাভিসারী হতে চায়। উত্তম, নটবর, কিশোরী—এরা সকলেই তাঁর এই বক্তব্যের প্রমাণ। অনন্ত প্রয়াসশীল মানুষের যন্ত্রণাকে, পরাভবকে যিনি এঁকেছেন তিনি মানুষকে ছোট করে আঁকেননি। জগদীশ গুপ্ত সম্বন্ধে এইটাই প্রধান কথা।
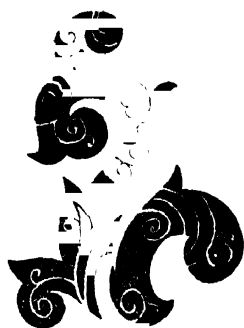
তিরিশের যুগ : বাংলা উপন্যাসের দ্বিধামুক্তি

আমাদের বাংলা উপন্যাস পরিক্রমার এই পরিমিত প্রয়াসে এতক্ষণে একটা কথা পরোক্ষে স্পষ্ট হয়েছে—Pure Novel বা বিশুদ্ধ উপন্যাস বলতে যা বোঝায় বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে তা প্রধানত অনুপস্থিত। সুবিন্যস্ত পরিকল্পনায় শুদ্ধ মানবিক সম্পর্কগুলির অভিব্যক্তি সাধনকে শিল্প লক্ষ্য হিসাবে অবিচল রেখে কোনো জেন অস্টেন বাংলা সাহিত্যে আবির্ভূত হননি। তিরিশের যুগের বিস্তৃত আলোচনার পূর্বে বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের এই লক্ষণটির বিশেষ ব্যাখ্যা প্রয়োজন। জেন অস্টেনের ন্যায় উপন্যাস-শিল্পীর কল্পনার স্থৈর্যে এবং সংশয়হীনতায় উত্তর-বিপ্লবী মনোভাবের প্রতিফলন ঘটেছিল। ইংলণ্ডীয় উপন্যাস সাহিত্যের অষ্টাদশ শতকের শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের মধ্যেই এই উত্তর-বিপ্লবী নিশ্চিত অবিচলতার পরিমণ্ডল ছিল সহজে ক্রিয়াশীল। জেন অস্টেন ঊনবিংশ শতকের ব্যক্তি হলেও তাঁর উপন্যাসের মাটিতে প্রকৃতপক্ষে অষ্টাদশ শতকের বীজের ফসল। কল্পনার স্থৈয এবং নিশ্চিন্ত অবিচলতার প্রসঙ্গে তিনি পূর্ব শতাব্দীর উত্তরাধিকারকে বহন করেছেন। এই দুটি গুণের অধিকারিণী তিনি ছিলেন বলেই তাঁর রচনা বিশুদ্ধ উপন্যাসের উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

বিশুদ্ধ উপন্যাসের পক্ষে প্রয়োজনীয় নিশ্চিন্ত নিরাসক্তি অবশ্যই বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে দুর্লভ। এই দুর্লভতার হেতু আমাদের স্বদেশীয় জীবন-বিন্যাসের মধ্যে নিহিত। প্রথমত, আমাদের সমাজ-জীবনে আমরা ইংলণ্ডীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উত্থানের ন্যায় ব্যাপক পরিবর্তনগর্ভ কোনো সামাজিক আলোড়ন প্রত্যক্ষ করিনি। আমাদের যা কিছু চেতনাগত আলোড়ন তা প্রধানত চাকুরিমুখী ও কলকাতাকেন্দ্রিক। ফলে জীবনের সার্বিক প্রসারের কোনো

ভূমিকা এখানে প্রস্তুত হয়নি। সুতরাং জেন অস্টেনের ন্যায় ঔপন্যাসিক যে উত্তব-বিপ্লবী নিশ্চিন্ত অবিচলতাব উত্তরাধিকাবিণী হতে পেবেছিলেন এখানে তা কাবো পক্ষে হওযা দুঃসম্ভব ছিল। সে-কারণেই কীর্তিপ্রধান জাতির প্রথম ঔপন্যাসিক প্রযাসে যে বাস্তব ব্যাখ্যাব প্রযাস পবিলক্ষিত হয়, মানবিক সম্পর্ক-গুলির নিখাদ রূপাযণ মুখ্য হয়ে ওঠে—সে-জাতীয় কীর্তিগর্ভ বনিয়াদ এখানে ছিল অনুপস্থিত। বঙ্কিমেব উপন্যাসেব সমস্ত শক্তি সত্ত্বেও পাবিবাবিক-সামাজিক সম্পর্কগুলিব বিষয়ে তাঁব পবাঙ্মুখতা লক্ষণীয। দ্বিতীয়ত, ঔপনিবেশিক জীবনেব শতবন্ধন জাল জটিলতায সমস্যা আমাদেব নিত্য সহচব। যেখানে কিছুবই সমাধান হযনি—অথচ সমাধানেব আবেগও নয় তীব্র—সেখানে সমস্যা সদা-সবদাই তদপেক্ষা দীর্ঘতব ছাযা সৃজন কবে। কপালকুণ্ডলা আব চতুবঙ্গ ছাডা সমুদয বাংলা উপন্যাস—শিল্পসাফল্য নিবপেক্ষভাবেই বলা হচ্ছে—সমস্যাসঙ্কুলতা প্রধান।

সুতবাং তিবিশেব যুগেব উপান্তে আমবা যখন পৌছলাম তখন এই দ্বিবিধ হেতুবই শক্তিবৃদ্ধি ঘটেছে। বিশুদ্ধ উপন্যাসেব অবকাশ হযেছে সম্পূর্ণ তিবোহিত। প্রথম মহাযুদ্ধেব পবে বাস্তব অবস্থায তাব একটা ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধেব প্রতিক্রিযাব চবিত্রটিকে সঠিকভাবে হৃদযঙ্গম করা কঠিন। ইতিহাস ব্যাখ্যায শুধু তাব সূত্রটুকুই হাতে আসে। কেননা এমন বিমিশ্র অনুভূতিকে সমাজে এবং সাহিত্যে যুগপৎ উপস্থিত হতে অল্পই দেখা গেছে। একদিকে যুদ্ধ দিগন্তকে বিস্তৃত কবেছে, আব একদিকে যুদ্ধ-পববর্তী অধ্যাযেই চাকুবিপ্রাণ মধ্যবিত্তিক সত্যযুগেব অবসান ঘটল। একদিকে বিপ্লব ও রূপান্তবেব বিশ্ববোধ, অপব দিকে ঘন ঘন জাতীয আন্দোলনেব উত্তাল তবঙ্গেব নিস্ফল আলোড়ন, একদিকে ফ্রযেডেব অবচেতন-লোকেব আবিষ্কাব, অপব দিকে এঙ্গেলস-মার্কসেব দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদেব নবীন জ্ঞান—তিবিশেব উপান্তে এই জট-পাকানো বাস্তব জীবনে গ্রন্থিমোচনেব জন্য দুষ্পাঠ্য বাস্তবকে ব্যাখ্যা কবাব দায ছিল ঔপন্যাসিকদেব।

দুই ••

কল্লোল এই সাহিত্যিক দায়িত্ব পালনেব জন্য ব্যস্ত ছিল যে পরিমাণে, সে পবিমাণে প্রস্তুত ছিল না। এই ব্যস্ততায় সে যে 'আগ্রহে পাঠ কবেছে আন্তর্জাতিক সাহিত্য, সেই অনুসাবে পাঠ কবেনি দেশেব জীবনকে। বেদে উপন্যাস প্রসঙ্গে

রবীন্দ্রনাথের পত্রের সারমর্মে এই তাৎপর্যপূর্ণ ইঙ্গিত এ-দেশের সকল সাহিত্য-আন্দোলনের ক্ষেত্রেই আলোক-সম্পাতী। যে বোহেমিয়ান বিলাসীকে স্ক্যাণ্ডিনেভীয় পানপাত্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের আসব পান কবে বিচবণ করতে দেখেছি আমবা বিদেশী সাহিত্যে, এখানে তাব উপযুক্ত ভূমি ছিল না। উপন্যাসেব পক্ষে যা পবম প্রয়োজনীয় : দেশ-কালেব সঙ্গে উপন্যাসেব ভাবমণ্ডলের যুক্তিকবণ—কল্লোলগোষ্ঠীর ভিতরে তাব পবম অভাব তাঁদেব সার্থক উপন্যাস লিখতে দেয়নি। গোকুল নাগেব পথিকেব আংশিক সাফল্যেব কথা বাদ দিলে, প্রেমেন্দ্র মিত্রের পাঁক, উপনায়ন, মিছিল কল্লোলগোষ্ঠীর লেখকদের মধ্যে উল্লেখ্য উপন্যাস। তিনটি উপন্যাসেই কল্লোলেব যা সম্ভাবনা ছিল, এবং যে-সম্ভাবনা শেষ পর্যন্ত অচিন্ত্যকুমাবেব বেদে ও যুবনাশ্বেব পটলডাঙাব পাঁচালিতেই নিঃশেষিত হত—তার সুচারু বিকাশ ঘটেছে। তাব কাবণ একমাত্র প্রেমেন্দ্র মিত্রই হলেন কল্লোলেব ক্রোড়ে লালিত সেই লেখক যাঁর অসঙ্গতি অল্প। যদিও ছোট গল্পেব প্রেমেন্দ্র মিত্রে আব কবি প্রেমেন্দ্র মিত্রে দুস্তব পার্থক্য এবং ঔপন্যাসিকও আবাব এই দুইকেই ছাড়িয়ে অন্যপথগামী তথাপি মানুষেব দুঃখ-বেদনাকে মূল্য প্রদানের চেষ্টায় প্রেমেন্দ্র মিত্রেব সমগ্র শিল্পপ্রয়াসে একটা সূত্র বিধৃতি ঘটেছে। নইলে সাড়া থেকে তিথিডোবেব যদি বা ব্যাখ্যা চলে, বেদে থেকে পবমপুরুষেব বহস্য বোঝা যায় একমাত্র এইভাবে যে সাহসিকতায় বিস্ময় সৃজনেব দুর্মব অভীপ্সায় সমগ্র কল্লোলী লেখকদেব প্রয়াস নিয়োজিত।

তথাপি এই যুগেব না হলেও প্রথম যুদ্ধোত্তব কলকাতাব একটা প্রতিফলন মিছিল এবং উপনায়নে পড়েছে। উন্মূলিত এবং উদ্দেশ্যহীন নিম্ন মধ্যবিত্ত কিশোর বিন্নুর জীবনে অথবা মেস-বাড়িব অসহযোগ-আন্দোলনোত্তব নিস্তবঙ্গ বেকাব জীবনে চাকুবিব সত্যযুগেব যে অবসান ঘটেছে তাব ইঙ্গিত স্পষ্ট। এবং বিষয়বস্তুর মধ্যে এই সত্যনিষ্ঠা ছিল বলেই প্রেমেন্দ্র মিত্র এমন একটা মানসিক দৃষ্টিব অধিকারী হতে পেবেছিলেন যা তাঁকে কল্লোলেব যুগেব অশ্লীলতাব ফ্যাশন থেকে মুক্ত বেখেছিল। অবশ্য কল্লোলেব স্থূল বাস্তব বর্ণনায় একটা সামাজিক সত্যেব ছায়া পড়েছিল। কল্লোলেব যুগেব ঐ দেহাশ্রয়ী বাস্তবতা প্রকৃতপক্ষে প্রথম মহাযুদ্ধেব পবেব সর্বাঙ্গীণ অস্থিবতাব দ্বাবা চিহ্নিত। এবং সে-অস্থিবতাও আবাব উপনিবেশেব জীবনেব চূড়ান্ত বিফলতাবোধ-সঞ্জাত। প্রেমেন্দ্র মিত্রেব প্রধান উপন্যাসগুলিতে এই বিফলতাবোধেব ব্যবহার ঘটেছে জীবনেব শাশ্বত নীতিতে বিশ্বাস-ব্যতিবিক্ত ভাবে নয়। এই স্থিবতায় তিনি পবিহার কবেছেন

অশ্লীলতা। কিন্তু তাতেই ঔপন্যাসিকের লক্ষ্যভেদ সম্ভব হয়নি। উপনায়ন উপন্যাসে বিনুর দৃষ্টিকে উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে ব্যবহার করতে করতে অকস্মাৎ কেন্দ্রচ্যুতি ঔপন্যাসিক অসঙ্গতিরই প্রমাণ। বাংলা সাহিত্যে ছোট গল্পের যিনি রাজা শুদ্ধ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও উপন্যাসে তিনি অকিঞ্চিৎকর।

•• তিন ••

তিরিশের ঔপন্যাসিকবৃন্দ সে দিক থেকে যেমন কল্লোলের তেমন শরৎচন্দ্রেরও সীমাবদ্ধতাকে উপলব্ধি করেছিলেন গভীরভাবে। যদিও শরৎচন্দ্রের চৈতন্য-সঞ্চারী প্রয়াসের পাঠে তাঁরা ছিলেন দীক্ষিত, এবং কল্লোলের সাহসিকতাকে তাঁরা স্বীকার করেছিলেন ন্যায়তই। তিরিশের প্রধান ঔপন্যাসিকদের বুদ্ধিপ্রধান (ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অন্নদাশঙ্কর রায়, গোপাল হালদার) এবং হৃদয়প্রধান (তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ, মানিক) এই দুই পর্যায়ে বিভক্ত করলেও এই বিভক্তি-করণের জন্য কঠিন সীমারেখা ব্যবহার করা চলে না। বরঞ্চ বলা চলে, সৎ ঔপন্যাসিক প্রচেষ্টায় অনিবার্যভাবে মননের যে আলোকসম্পাত ব্যবহৃত হয়ে থাকে তিরিশের যুগের সমগ্র ঔপন্যাসিক প্রয়াস সেই মননশীলতার প্রয়োগে বিশিষ্ট। তারাশঙ্করের দেশ-জিজ্ঞাসা, বিভূতিভূষণের বিশ্বরহস্য জিজ্ঞাসা, বা ধূর্জটিপ্রসাদের নায়কের সমগ্র মানসের টানাপোড়েন হৃদয়েরও ব্যাপার, বুদ্ধিরও ব্যাপার। বস্তুত হৃদয় নামক বস্তুটি তো সত্যই হৃৎপিণ্ডের ধারে কাছে নেই—সে বরঞ্চ রয়েছে আমাদের মস্তিষ্কের শক্তির মধ্যেই। তিরিশের বাংলা উপন্যাস এই বুদ্ধির স্বাভাবিক কিরণসম্পাতে উজ্জ্বল। He who thinks reasonably must think morally—বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের ঔপন্যাসিক উত্তরাধিকার এই পথেরই নির্দেশক। প্রচুর পঠনশীলতায় অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করে তোলায় এই নির্দেশেরই স্বীকৃতি।

তিরিশের কালে বাঙালী মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী-মানসে চিন্তাকে বিজ্ঞাননিষ্ঠ করে তোলার জন্য যে প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়েছে তার মূলে একদিকে যেমন বিশ্ববীক্ষা, স্বদেশকে বিশ্বের অংশ হিসাবে উপলব্ধি, অপর দিকে তেমনি মানুষের পরিবেশ ও মনোজগৎ সংক্রান্ত নানা জিজ্ঞাসার ভূমিকা ক্রিয়াশীল। সে কারণে তিরিশের বুদ্ধি-জগতে জীবনের সার্বিক সংকটের স্বীকৃতি যেমন স্পষ্ট, সেই সংকটকে শিল্প-সৃষ্টিতে পরিহার না করার দৃঢ়তাও তেমনি লক্ষণীয়। এই দৃঢ়তার মূলে ছিল জীবন সম্বন্ধে প্রবল আশা। ভারতবর্ষে এই আশার চেহারা গড়ে উঠেছিল

উপনিবেশের বন্ধনমুক্তির স্বপ্নে। যত অস্পষ্টই হোক এই আশার আলোকে চেতনাচঞ্চল মধ্যবিত্ত যুবকের প্রেরণা এবং বেদনার (শিবনাথ ও শশী) কথা ধ্বনিত হয়েছে আমাদের উপন্যাসে। সম্ভবত এই কারণেই শরৎচন্দ্রের স্ত্রী-চরিত্র-প্রাধান্য এবং কল্লোল-পন্থীদের নেতিভিত্তিক উন্মূল যুবকদের প্রসঙ্গ পরিহার করে তিরিশের উপন্যাস আবার বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের ধারা বহন করে পুরুষ-চরিত্র-প্রধান হয়ে উঠেছে। অপু-শিবনাথ-শশী-বাদল-খগেনবাবু-অমিত এই যুগের উপযুক্ত প্রতিনিধিস্থানীয় চরিত্র। ভাবপ্রবণ নায়ক অপেক্ষা চিন্তাশীল নায়কের প্রতি পক্ষপাত তিরিশের চেতনা-বিস্তারের অনলস প্রয়াসের পটেই প্রাসঙ্গিক। এই চেতনার বিস্তৃতিভবনের জন্য তিরিশের ঔপনাসিকবৃন্দ তাঁদের উপন্যাসের বিষয়-নির্বাচনে ও শিল্পপ্রয়াসে অনেক বেশি সমগ্রসন্ধানী দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। তারাশঙ্করের গ্রামীণ সমাজবীক্ষা এবং বিভূতিভূষণের প্রকৃতি-অভিমুখিনতা উপন্যাসের কাম্য সমগ্রতা-সন্ধানের নিদর্শন। সমগ্রতা সন্ধানের এই বিভিন্নমুখী প্রয়াসের জন্যই তিরিশের যুগেই ঘটল বাংলা উপন্যাসের যথার্থ প্রসার। বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের কালে এ ছিল শুধু একক পুরুষের প্রবল কীর্তি। তিরিশের যুগেই প্রথম পাওয়া গেল বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে একাধিক শক্তিমানের একত্র সমাবেশ। সাহিত্যে সর্বতোমুখী কর্মিষ্ঠতার কাল বলে তিরিশের কালকে আখ্যাত করা যায়। সে কর্মিষ্ঠতার মূলে ছিল এক পরম মানবিক বিশ্বাস—বিশ্বাস মানুষের ক্ষমতা সম্বন্ধে। মানুষের জীবনের প্রতি মমতা সম্বন্ধে। একেই আমরা ব্যাপক জীবনবোধ বলে আখ্যাত করেছি। তিরিশের লেখকদের প্রসঙ্গে গণজীবনের সঙ্গে পরিচিতি, মাটির মানুষের সঙ্গে আত্মীয়তা প্রভৃতি যে-সব বিশেষণোক্তি ব্যবহৃত হত তার মূলে জীবন সম্বন্ধে প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর চেতনা। বিস্তৃতি ও গভীরতায় এ-চেতনা বিশিষ্ট জীবনাগ্রহের ফল।

এই বিশিষ্ট জীবনাগ্রহের মৌল প্রেরণায় আলোচ্য সময়ে উপন্যাসের আঙ্গিক-সাধনারও একটা ধারা ক্ষীণভাবে গড়ে উঠতে থাকে। বনফুলের আঙ্গিকসাধনা নানা পথচারী না হলে, এবং তিনি বক্তব্য নির্মাণে অতিমাত্রায় আলস্যবশত শেষ পর্যন্ত নেতিধর্মী লক্ষ্যহীনতায় ব্যর্থ না হলে, তাঁর সে ও আমি উপন্যাসের আঙ্গিক-নিরীক্ষা মূল্যবান পরিণতির পথে অগ্রসর হতে পারত। ডায়েরিধর্মী উপন্যাসে বা স্বগত আলাপনের মেজাজে বনফুল শতধাবিভক্ত মধ্যবিত্ত যুবমানসের অসঙ্গতিময় চরিত্র-চিত্রণে সিদ্ধহস্ত। কিন্তু লেখকের নির্মম ব্যঙ্গদৃষ্টি যে পরিমাণে

উত্তম ছোট গল্পের স্রষ্টা, শুধু সেই বক্তব্যটুকুই কখনও মহৎ উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দু হতে পারে না। জঙ্গমের বিশাল আয়োজন এ-কারণেই ব্যর্থ। আঙ্গিক সাধনায় বনফুলের ব্যর্থতার মূলে তাঁর বক্তব্যের হীনতা বা ন্যূনতা। আবার এই বক্তব্য সম্বন্ধে অতিসচেতনতাই আর একজন লেখককে তাঁর সাধনায় অগ্রসর হতে দিল না—তিনি গোপাল হালদার। 'একদা' বাংলা সাহিত্যের গতানু-গতিক গল্পধারায় অকস্মাৎ আশ্চর্য শক্তিশালী ব্যতিক্রম। আজ বাংলা সাহিত্যে যখন সাহিত্য আলোচনার ক্ষেত্রে চেতনা-প্রবাহ প্রভৃতি বিষয়ের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ হচ্ছে তখন একদার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হওয়া উচিত বলে মনে করি। প্রকৃতপক্ষে অন্তঃশীলা এবং একদা থেকেই এই নতুন লেখকেরা প্রেরণা সংগ্রহ করেছেন —এঁরা অভিনব কিছু নন। একদার একটি দিনের মুকুরে কলকাতা, সমকালীন স্বদেশ-কাজেই বিশ্বজগৎ এবং ব্যক্তিমানসের সকল ভগ্নাংশে প্রতিফলিত সভ্যতার ছবি—সবই প্রতিফলিত। একদার ভাষা সম্বন্ধে লেখক সাহসিকতার পরিচয় দিতে পারেননি। যে কারণে পারেননি সেটা হল লেখকের বক্তব্য সচেতনতা। যে-দৃষ্টির সাহায্যে লেখকের বিশ্ববীক্ষা তা জয়েস প্রুস্তীয় ভাষারীতিকে আত্মসাৎ করে নিতে পারেনি। এই সমস্যার কারণেই লেখকের এই পথে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পদচারণা সার্থক নয়। বলা প্রয়োজন আজকের নতুন প্রয়াসশীলদের মধ্যেও এই সমস্যা অগ্নিবৎ জ্বলন্ত।

তিরিশের যুগেই বাংলা উপন্যাস সাবালকের দ্বিধামুক্তি অর্জন করেছে। এখন আমরা এ যুগের লেখকদের প্রধান ঔপন্যাসিক বৈশিষ্ট্যের পরিচয় গ্রহণ করব।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

●● এক ●●

নগর-জীবনের ব্যর্থতা, ঔপনিবেশিক মধ্যবিত্তের চাকুরিগত নিরাপত্তার অভাব, না ত্রিশের আর্থিক সংকটে প্রথম উগ্রভাবে আত্মপ্রকাশ করল —এবং রাজনৈতিক আন্দোলনের ব্যর্থতা ও পর্বতের মূষিকপ্রসব ইত্যাদি সত্ত্বেও বাঙালী মধ্যবিত্তজীবন তখন আশাহীন হয়নি। বরঞ্চ এবম্বিধ অবস্থায় চিন্তার বিভিন্ন স্তরের সক্রিয়তায় বাঙালী বুদ্ধিজীবী সমাজ তখন বিশ্বাস এবং আশার মূল জাতীয় জীবনের গভীরে মেলে দিতে চেয়েছে। শশী, অপু অথবা শিবনাথ কিংবা শঙ্কর, প্রত্যেকেই পরস্পরের থেকে দূরে হলেও, এদের সমস্যার একটা সাধারণ উৎস বিদ্যমান ছিল। জীবন সম্পর্কিত আশা বা আদর্শকে রূপায়িত করতে পারা-না পারার

ব্যাপারটাই এদের জীবনের মুখ্য ব্যাপার। অপুর শিশুচিত্তে সুদূরের আহ্বান, অথবা শশীর নগর-স্বপ্নের সঙ্গে গাওদিয়ার সংঘর্ষ কিংবা শিবনাথের ধরিত্রীকে চেনার বাসনা জীবন সম্পর্কিত আশা-আকাঙ্ক্ষারই প্রমাণ। এটা অবশ্য সে-যুগেই সম্ভব, যে-যুগে জাতীয় মানস সুদৃঢ় আশাবাদিতার ন্যায়ে ও শৃঙ্খলে বাঁধা। (স্বপ্ন থাকলে তবেই স্বপ্নভঙ্গের বেদনার কথাও ওঠে এই কারণে শশী এ-যুগেই প্রাসঙ্গিক।) এই আশাবাদিতার মূল জাগ্রত জাতীয় চেতনায়— যে জাতীয় চেতনা ১৯০৫ সালের দেশমাতৃকার বন্দনা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। উপনিবেশের জোয়াল কাঁধে চেপে আছে বলেই স্বদেশকে, দেশজ মানুষকে, দেশের প্রকৃতিকে চেনা যাচ্ছে না, গ্রামকে যে রূপান্তর দিতে চাই তা দিতে পারছি না। কখনো স্পষ্টভাবে, অধিকাংশ সময়ে অস্পষ্টভাবে এটাই এ-যুগের সকল সাহিত্যকর্মের প্রধান কথা। সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতিকূল ছকের সঙ্গে ব্যক্তি-মানসের আশা-প্রত্যাশার সংঘাতের রূপায়ণে এ-যুগের উপন্যাসের শিল্পকর্ম নিয়োজিত হয়েছে। এখানে আমাদের আলোচ্য তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি এ-যুগের প্রথম সারির ঔপন্যাসিকদের অন্যতম। দীর্ঘ সাহিত্যজীবন এবং তাৎপর্যপূর্ণ সাহিত্যকীর্তিতে তিনি বিশিষ্ট। জীবন সম্বন্ধে বহুমুখী আগ্রহবিশিষ্ট তারাশঙ্করের ঔপন্যাসিক সাহিত্যকর্মের আলোচনা দ্বিতীয় যুদ্ধপূর্ব ও তৎপরবর্তী বাংলা উপন্যাসের শক্তিসামর্থ্যেরই একটা প্রধান পর্যায়ের আলোচনা।

•• দুই ••

যে ভৌগলিক অঞ্চলকে তারাশঙ্কর তাঁর উপন্যাসের ঘটনাবলীর জন্য নির্বাচন করেছেন সেটি তাঁর সম্পূর্ণ স্বক্ষেত্র। কিন্তু এটাই সেই ভৌগোলিক অঞ্চলের একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়। নানা দিক থেকে জীবন সম্বন্ধে বহুমুখী কৌতূহল এবং আগ্রহ সঞ্চার করার ক্ষমতা এ-অঞ্চলে বর্তমান। বীরভূম-বর্ধমান-বাঁকুড়ার ভূপ্রকৃতি সম্বন্ধে যাঁরই জ্ঞান আছে তিনিই জানেন যে একদিকে বর্ধমানের শস্যপূর্ণ আদিগন্ত প্রান্তর, অপরদিকে বীরভূম ও বাঁকুড়ার তরঙ্গময় কাঁকুরে রুক্ষতা, জীবনের দ্বৈত রূপকে এখানে যুগপৎ ধরে রেখেছে। কাজেই পিপাসার্ত বীরভূমের দুর্ভিক্ষ (ধাত্রীদেবতা) এবং দু-কূলপ্লাবী ময়ূরাক্ষী (গণদেবতা) দুইই এই অঞ্চলের বিশেষত্ব। বীরভূমের গ্রামীণ অর্থনীতি বাংলার আর পাঁচটা জেলার মতো কৃষিনির্ভর হওয়া সত্ত্বেও বীরভূমের সাধারণ ভাগচাষীকে একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হতে হয় সাঁওতালদের সঙ্গে—যেটা এ-অঞ্চলেরই নিজস্ব

ব্যাপার। অল্প মজুরিতে কঠিন শ্রমের সাহায্যে এরা বীরভূমের কাঁকুরে বিমুখতাকেও ব্যর্থ করে দেয়। একদিকে ধ্বংসমুখী সামন্ততন্ত্র এবং অপরদিকে সাঁওতাল কৃষকদের ঘর গড়ে তুলতে গিয়ে যাযাবরত্ব ত্যাগের আহত বাসনায় ইতিহাসের একটা পর্যায় এখানে স্পষ্ট (কালিন্দী)। দুর্বল কৃষির ওপর নির্ভরশীল গ্রামীণ বেকারের অজস্র টাইপ স্বভাবতই বাঁকুড়া-বীরভূমের বৈশিষ্ট্য এবং পূর্ববঙ্গের তুলনায় অধিকতর গ্রামমুখিতা এবং অধিকতর আলস্য এই বৈশিষ্ট্যকে আরো উজ্জ্বল করেছে (অগ্রদানী এবং কবির বিপ্রপদ)। কৃষি দুর্বল বলেই জীবিকাহীন অনন্যোপায় বাউরী প্রভৃতি শ্রেণীর তথাকথিত "স্বভাব অপরাধিত্ব" এখানে অধিকমাত্রায় প্রকট। আবার অপরদিকে একই কারণে বাউল, বৈরাগী, বোষ্টম এবং কবির দল, ঝুমুরের দল প্রভৃতির আধিক্য তথাকথিত "স্বভাব অপরাধী" শ্রেণীর সঙ্গে একটা বৈপরীত্য সৃজন করে রয়েছে (রাইকমল ও কবি)।

দ্বন্দ্বই রাঢ় অঞ্চলের জীবনের প্রধান পরিচয়সূত্র এটা আরো বেশি বোঝা যায় যখন সমগ্রভাবে এ-অঞ্চলের অর্থনৈতিক রূপটা চোখে পড়ে। একদিকে রানীগঞ্জ এবং বরাকরের কয়লাখনির শিল্পাঞ্চল এবং অপরদিকে তারই সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত ক্ষয়িষ্ণু সামন্তবংশগুলি যে-কোনো চিন্তাশীল লেখকের কাছেই যথেষ্ট আগ্রহের বিষয়। বর্ধমান-বীরভূমের এই বিচিত্র রূপটি বাংলা দেশের অন্যত্র দুর্লভ। চটকলের চেহারা অন্য। সেখানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিদেশী ম্যানেজিং এজেন্টের একচেটিয়া ব্যবসায়ে বাঙালী শিল্পপতির ভূমিকা লুপ্ত। শ্রমের প্রতিযোগিতায় স্বল্পশ্রমী বাঙালী মজুরদের ভূমিকাও গৌণ। একমাত্র রানীগঞ্জ-বরাকর অঞ্চলেই সেই শ্রেণীর বাঙালী শিল্পপতির দেখা পাওয়া যাবে যাঁরা জমিদারি সম্পত্তি বেচে কয়লার ব্যবসায়ে নেমেছেন। এই নতুন বাঙালী ব্যবসায়ী শ্রেণীর সঙ্গে সামন্ততন্ত্রের সংঘাত এখানকার মাটি থেকেই উদ্ভূত ব্যাপার। ফিউডাল অর্থনৈতিক কাঠামোর চারদিকের রূপান্তরমুখী ইতিহাস কী ভাঙন, আলোড়ন সৃষ্টি করল তা বলার উপযুক্ত ক্ষেত্র বর্ধমান-বীরভূম (হাঁসুলিবাঁকের উপকথার চাকরানভোগী কাহারপাড়া বনাম রেলপথের বিস্তৃতির দ্বন্দ্ব স্মরণীয়)। ভারতীয় কয়লার পৃথিবীর বাজার নেই। আর বিদেশী পুঁজি ভারতবর্ষে সে-ক্ষেত্রে একচেটিয়া হয়নি, যে-ক্ষেত্রে পাট বা চায়ের মতো একচেটিয়া বাজারের সম্ভাবনা কম। সুতরাং উপনিবেশের প্রভুদের ছত্রছায়ায় থেকেও এক ধরনের অর্ধগঠিত বাঙালী শিল্পপতি ও বাঙালী ব্যবসায়ী চরিত্রের

বিকাশ এ-অঞ্চলে ঘটেছে—যা বাংলার অন্যত্র বিরল। তারাশঙ্করের উপন্যাসে এ-ধরনের ব্যবসায়ীর চরিত্রের ভূমিকা সর্বত্রই বিদ্যমান। কালিন্দীর বিমল মুখুজ্যে বা শিবনাথের শ্বশুর (ধাত্রীদেবতা) বা আরতির বাবা (উত্তরায়ণ) শুধু নয়, আরো প্রমাণ এ-প্রসঙ্গে দেওয়া চলে। অবশ্য এদের ভূমিকা সম্বন্ধে তারাশঙ্কর ওয়াকিবহাল হলেও তার পূর্ণ ব্যবহার তাঁর উপন্যাসে হয়নি। তথাপি এটা তো খুবই স্পষ্ট যে এই উঠতি ব্যবসায়ী শ্রেণীর সংঘর্ষে ধ্বংসমুখী সামন্ত জমিদার বা ভূম্যধিকারীদের চরিত্র তারাশঙ্কর উপন্যাসে অনেকবার ব্যবহার করেছেন। বিষয়বস্তুর ব্যবহারের দিক দিয়ে এটা কতটা তাৎপর্যসূচক তা শিল্পবিচার প্রসঙ্গে আলোচনা করা হচ্ছে।

●● তিন ●●

এই বিষয়বস্তু ব্যবহারের সময় উপন্যাসের কাঠামোগত পরিকল্পনায় তারাশঙ্কর যে বিশিষ্টতার পরিচয় দিয়েছেন তাও এই প্রসঙ্গেই আলোচ্য। তারাশঙ্করের উপন্যাসরাজিকে দু-ভাগে ভাগ করা যায় একভাগে পড়ে ধাত্রীদেবতা, কালিন্দী, গণদেবতা প্রভৃতি, আর একভাগে পড়ে হাঁসুলিবাঁকের উপকথা, নাগিনী কন্যার কাহিনী, কবি, রাধা প্রভৃতি। এর মধ্যে শেষোক্ত উপন্যাসগুলির প্যাটার্নে রূপকথার প্রভাব সহজেই ধরা যায়। করালী, নাগুঠাকুর যেন রূপকথার সেই নায়ক যে আধারপুরীতে প্রতিকূল দৈত্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করে জেতে, আঁধারপুরী ভেঙে দেয়। কথকতার ভঙ্গিতে প্রথমাবধি ছন্দায়িত ভাষায় বিধৃত এই কাহিনীগুলি শুধু যে লোকজীবনের সঙ্গেই তারাশঙ্করের পরিচয়ের প্রমাণ তাই নয়, লৌকিক সাহিত্যধারার সঙ্গে তাঁর নিবিড় পরিচয়ের প্রমাণও বটে। কিন্তু নাগিনী কন্যার কাহিনী, হাঁসুলিবাঁকের উপকথা প্রভৃতি উপন্যাসেই নয়, মনে হয় রূপকথার ছাদন তারাশঙ্করের অন্য বৃহৎ উপন্যাসগুলিতেও সমানভাবে বিদ্যমান। তারাশঙ্করের বড়ো উপন্যাসের গল্প সর্বদাই এই। একটি পুরাতন জীবনের ছকে এক নবীন নায়ক কী পরিবর্তনের পথায় নিয়ে এল তারই সংঘাত-সংঘর্ষকে ভিত্তি করে তারাশঙ্করের উপন্যাসের নাট্যরস জমে ওঠে। তার নায়কেরা প্রাচীন বাংলা কাহিনী-কাব্যের নায়কের মতো সর্বথাই ধীরোদাত্ত, রূপবান, গুণবান, অক্রোধী, দৃঢ়চেতা এবং মেধাবী (শিবনাথ, অহীন, দেবু ঘোষ থেকে শুরু করে উত্তরায়ণের প্রবীর পর্যন্ত স্মরণীয়)। তার মধ্যবিত্ত নায়কেরা সবসময়েই অভিজাত বংশোদ্ভূত। নায়ক-চরিত্রের এই পরিকল্পনা বঙ্কিম-

রবীন্দ্রনাথের নায়ক পরিকল্পনার কথা মনে করিয়ে দেয়—অধিকন্তু তারাশঙ্করের উপন্যাসের গ্রামীণ পরিবেশ-পটভূমিতে তা সহজেই রূপকথার গল্পের প্যাটার্ন গ্রহণ করতে পারে (অবশ্য এর একটা সংকটও আছে)।

বলা প্রয়োজন যে পূর্ব পরিচ্ছেদে কথিত বিষয়বস্তুর সঙ্গে—তথা তারাশঙ্করের আঞ্চলিকতার সঙ্গে—এই রূপকথার প্যাটার্নের সম্পর্ক নিবিড়। আঞ্চলিক উপন্যাসের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে একটা হল এই যে আঞ্চলিক জীবনবিন্যাসের ওপর কোনো বহিরাগত শক্তির আঘাত যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তার রূপায়ণ। যথাদৃষ্ট স্থির ছবির ন্যায় মাত্র আঞ্চলিক জীবনই প্রচুর পারিভাষিক শব্দের সাহায্যে কখনো সার্থক উপন্যাস গড়ে তুলতে পারে না। হার্ডির উপন্যাসে Ballad tale-এর প্যাটার্ন এবং তারাশঙ্করের উপন্যাসে রূপকথার প্যাটার্ন-রচনার হেতু এই সূত্রের মধ্যেই সন্ধান করতে হবে। এই উভয় লেখকেরই উপন্যাসে ব্যবহৃত জমাট কাব্যরস এবং নাট্যরস এই বিশেষ জীবন-বিন্যাসের জন্যই এমন সার্থক হয়ে উঠতে পেরেছে। ওয়েসেক্স অঞ্চলের Agricultural Decline-এর সঙ্গে অবশ্যই বর্ধমান বীরভূমের আংশিকভাবে আগত ভূম্যধিকারীদের কোনো তুলনা হয় না। কেননা ব্যাপক শিল্প রূপান্তর এবং ১৮৪৬ সালে শস্যে স্বাধীন বাণিজ্যের ফলে Agricultural Decline, আর সম্রাজ্ঞীর ছত্রছায়ায় গজিয়ে-ওঠা কলোনির কয়লার ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সংঘর্ষে বা অন্য কোনো আঘাতে কম্পমান সামন্তদের কারো কারো ব্যক্তিগত দুঃখভোগ নিঃসন্দেহে এক ব্যাপার নয়। ফলে উপন্যাসের বিষয়ের দিক দিয়ে ইতিহাসের বলিষ্ঠ সাহায্য হার্ডি যতটা পেয়েছেন তারাশঙ্কর ততটা পাননি। তথাপি উপন্যাসে জীবনকে শিল্পরূপে বিন্যস্ত করতে গিয়ে হার্ডির Ballad tale-এর প্যাটার্নের মতো রূপকথার প্যাটার্নের আশ্রয় গ্রহণ তারাশঙ্করের পক্ষে কখনো কখনো খুবই সমীচীন হয়েছে। এইভাবে লোকসাহিত্যের বলিষ্ঠ ধারার সঙ্গে আত্মীয়তা এবং বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিচেতনার পরম্পরাসরণের ভিতর দিয়ে তারাশঙ্কর তার ব্যক্তি-প্রতিভার সঙ্গে জাতীয় ঐতিহ্যের এক মিলন খুঁজে পেলেন। এইটাই বাংলা সাহিত্যে তারাশঙ্করের নিজস্ব মহৎ দান।

চার

'মানুষের ওপর বিশ্বাস হারানো পাপ'—এটাই তারাশঙ্করেরও প্রধান বক্তব্য। উপন্যাসে যে দ্বন্দ্ব অবলম্বনে তারাশঙ্কর এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে চান তার রূপটাও

প্রণিধানযোগ্য। সাধারণত সামাজিক দ্বন্দ্বগুলির পশ্চাতে পাপ-পুণ্যের দ্বন্দ্বের একটা ছায়া কাজ করে। শ্রীহরি ঘোষ এবং দেবু, বা ইন্দ্র রায় এবং বিমলবাবু বা শিবনাথ এবং তার শ্বশুরবাড়ি বা করালী এবং কাহারপাড়া এদের সংঘাতের মধ্যে সামাজিক অর্থ নৈতিক সূত্রগুলির সন্ধান যেমন মেলে তেমনি সাধারণভাবে অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ, ভালো-মন্দের যুদ্ধ, ন্যায়-অন্যায়ের যুদ্ধ প্রভৃতি মোটা দাগের নৈতিক প্রশ্নও জড়িত থাকে। রূপকথার প্যাটার্ন এই নৈতিক চেতনাকে এভাবে গড়ে উঠতে সাহায্য করেছে। কথক যেমন তার সমস্ত কথকতার শেষে স্বস্তিবাণী উচ্চারণ করেন—তারাশঙ্করেরও সমস্ত উপন্যাসের ফলশ্রুতি সেই স্বস্তিবাণী। সম্ভবত সমস্ত অকল্যাণ বা পাপের মধ্যেও পুণ্যের জন্য একটা সংগ্রাম বিদ্যমান এমন ধরনের একটা বক্তব্যে তিনি বিশ্বাসী। রামায়ণ-মহাভারতাশ্রয়ী ভারতীয় চাষী যেমন 'সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী'—এ-কথাকে বিশ্বাস করে, তারাশঙ্করের বিশ্বাসেও সেই unsophisticated সারল্য আশ্রয়ের চেষ্টা উপস্থিত। প্রত্যেক মহৎ ঔপন্যাসিকের সৃজিত চরিত্রাবলীই জীবনের ঘাটে ঘাটে নিজের অভ্রান্ত সত্তাকে খুঁজে ফেরে। নেখল্যুডফই হোক বা গোরাই হোক—নিহিলিস্ট বাজারভ ব্যতীত—মহৎ উপন্যাসে বোধকরি সকলেই সেই অস্তিত্বের পূর্ণাদর্শের সন্ধানী। বাজারভের নেতিবাচনে এবং বিমুখ ঔদাসীন্যের পক্ষে এটা অপ্রয়োজনীয়। এই কারণে অপ্রয়োজনীয় যে, বুদ্ধিজীবী রুশ মধ্যবিত্তের তৎকালীন খণ্ডায়নই সেখানে দেখবার বিষয় ছিল। বাজারভ তার চতুষ্পার্শ্বের বাস্তবতার মাঝখানে বিশ্বাস খুঁজে পেলে এই দেখানোর কোনো যৌক্তিকতা থাকে না। তারাশঙ্করের প্রশ্ন অন্যতর। মানুষ বিশ্বাস খুঁজে পায় তার অন্তরে—বাস্তব ব্যবস্থার সঙ্গে সংঘর্ষে তার বিশ্বাসেরই শুদ্ধিভবন ঘটে। তাই টলস্টয়ের এই পথে তারাশঙ্কর পদার্পণ করতে চেয়েছেন। কোনো মহৎ উপলব্ধির স্তরে জীবন যদি উপনীত না হয় তবে জীবনের ঘাটে ঘাটে ফেরা নিরর্থক। জীবনের অন্তর্নিহিত কোনো শক্তি সেই মহৎ বিশ্বাসে মানুষকে নিয়ে যায়। নিতাই (কবি), কৃষ্ণেন্দু (সপ্তপদী), শিবনাথ (ধাত্রীদেবতা), প্রবীর (উত্তরায়ণ), এরা সকলেই নিজ নিজ ঘটনাময় জীবনের শেষে এই বৃহত্তর উপলব্ধির স্তরে উন্নীত হয়েছে। এই উপলব্ধিটা কতখানি জীবন থেকে উদ্ভূত আর কতখানি লেখকের আরোপিত, সেটা আমরা পরে আলোচনা করব।

এতক্ষণ আমরা দেখলাম যেটুকু তা সংক্ষেপে এই : তারাশঙ্করের আঞ্চলিকতা যেমন তাঁর উপন্যাসের প্যাটার্নকে গঠন করতে সাহায্য করেছে তেমনি

তারাশঙ্করের নৈতিক সিদ্ধান্ত এবং প্রশ্নাবলীও সেই প্যাটার্নের কাছ থেকে বিশেষ সহায়তা পেয়েছে। জীবন, জীবনের বিন্যস্ত রূপ এবং নৈতিক সমস্যা একাধারে বিধৃত হবে—এটা মহৎ ঔপন্যাসিকেরই লক্ষণ।

•• পাঁচ ••

হার্ডির কারুদক্ষতা তারাশঙ্করে অবিদ্যমান এই ভেবে যাঁরা শোক করেন তাঁরা উক্ত দুই লেখকের আঞ্চলিকতার সাদৃশ্যটুকু দেখেই বিচারে অগ্রসর হন বলে এই বিপত্তি ঘটে। তাঁরা অবশ্যই হার্ডির কারুদক্ষতার প্রচুর প্রশংসা ন্যায়ত করতে পারেন। চরিত্রের বিধুরতার ব্যঞ্জনায় বা প্রকৃতির আশ্চর্য চিত্র অঙ্কনে হার্ডির সিদ্ধতা স্মরণীয়।—

> The stillness was disturbed only by some small bird that was being killed by an owl in a neighbouring wood, whose cry passed into the silence without mingling into it.

এ-জাতীয় বর্ণনার সিদ্ধতা বা 'রিটার্ন অফ দি নেটিভ'-এর এক অংশে একটা উপযুক্ত চিত্রকল্পের জন্য তীব্র অনুসন্ধানের পর্যায়ে

প্রথমে : A dwindled voice strove hard at a husky tune.

পরে : The note bore a great resemblance to the ruins of human song which remains to the throat of fourscore and ten.

এবং পরিশেষে অব্যর্থভাবে : It was worn whispers, dry and papery and it brushed so distinctly across the ear......

এই পরিণত চিত্রকল্পের জন্য কবিসুলভ জাগ্রত প্রয়াস তারাশঙ্করে প্রায় অনুপস্থিত। কিন্তু এ-কথা বলার সময় একটি প্রধান কথা ভুলে যাওয়া হয় যে, হার্ডির উপন্যাসে কাব্যরস প্রধান, সে-ক্ষেত্রে তারাশঙ্করের উপন্যাসের প্রধান গুণ নাট্যরস। হার্ডির উপন্যাসের প্রধান সহচরই হল কবিত্ব। হার্ডির সমালোচকেরা বহু স্থলেই বলেছেন যে কথাসাহিত্যের পরিভাষার নয়, ব্যালাড কবিতার আঙ্গিকে এবং কাব্যবিচারের মাপকাঠিতেই হার্ডি স্পষ্টতরভাবে বোধগম্য।

এ-পার্থক্যের মূল দুজনের বিষয়বস্তুতে। আমরা আগেই বলেছি যে ওয়েসেক্স

অঞ্চলের Agricultural Decline এবং বর্ধমান-বীরভূম অঞ্চলের সামন্ততন্ত্রের ভাঙন এক কথা নয়, যেহেতু এক কথা নয় একটা স্বাধীন বাণিজ্যজীবী জাতির শিল্পবিপ্লব এবং কলোনির সাম্রাজ্যের প্রভুদের প্রসাদপুষ্ট কয়লা অঞ্চলের ব্যবসায়ীদের খর্বিত আত্মপ্রসার। তাই শিল্পবিপ্লবের ফলে ওয়েসেক্সের কৃষি অঞ্চলে যে-প্রতিক্রিয়া সহজেই চোখে পড়ে বীরভূম-বর্ধমানের কৃষি-জীবনে সে রূপান্তরের সন্ধান নেই। সেখানে অতি অসম্পূর্ণ দেশী বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে সামন্ততন্ত্র প্রবল প্রতিরোধী শক্তি। সে শুধু কালের নিয়মে অন্তর্দ্বন্দ্বে ভাঙনদশাগ্রস্ত। ফলে বাথসেবা বা টেসের মতো সামাজিক বিপর্যয়ের বলি হিসাবে সাধারণ মানুষের কথা তারাশঙ্করে নেই কিন্তু ইন্দ্র রায় বা বিশ্বম্ভর রায় তারাশঙ্করে আছে। অদৃষ্ট নয়—ইতিহাস অর্থে যে কাল বোঝায় সেই কাল বিমুখ বলেই বিশ্বম্ভরের মতো শক্তিমানকে ভেঙে যেতে হচ্ছে—এই নাটকীয় দ্বন্দ্ব এই বিষয় থেকেই জন্মেছে। এখানে তারাশঙ্কর অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও অদ্বিতীয়। এইভাবে "কালবিমুখ"-তার বোধকে যদি তারাশঙ্কর ব্যবহার না করতেন তাহলে বিমল মুখুজ্যের মতো দেশী শিল্পপতির পঙ্গু নিদর্শনের হাতে রামেশ্বর ও ইন্দ্র রায়ের পতনের কোনো মানে হয় না।

প্রশ্ন উঠতে পারে টেস কিংবা বাথসেবা নেই, কিন্তু বনোয়ারী আছে। বনোয়ারী যদিও প্রাকৃত মানুষ—কিন্তু সে জনতার একজন নয়। সে কাহারপাড়ার মোড়ল। করালী এবং ইতিহাসের ধাক্কায় কাহারপাড়ার রূপান্তরের সে একটা প্রতিরোধী শক্তি। এবং এ-প্রসঙ্গে তারাশঙ্করের শিল্পকর্ম বিচারে হাঁসুলি-বাঁকের উপকথা ও বনোয়ারীর বিষয় নানা কারণে তাৎপর্যপূর্ণ। বিশ্বম্ভর রায়, রামেশ্বর, ইন্দ্র রায়ের চেয়ে বনোয়ারী অনেক পূর্ণতর চরিত্র। বিশ্বম্ভর, রামেশ্বর, ইন্দ্র রায়ের পতন অনেকটাই সামন্ত জীবনের অন্তর্দ্বন্দ্ব-প্রসূত। দশ আনা ছয় আনার বিবাদ যেন সামন্ত দাম্ভিকতার ফল। বিমল মুখুজ্যেদের ভূমিকা এখানে গৌণ নয়। কিন্তু সে পরিমাণ স্পষ্টতার সঙ্গে গোটা সামাজিক কাঠামোয় বিমল মুখুজ্যেদের ভূমিকা তারাশঙ্কর আঁকতে পারেননি। কাজেই উল্লিখিত ব্যক্তিদের পতনে প্রতিকূল 'কাল' বা 'কালের রূপান্তর ঘটেছে' এই বোধের ব্যবহারে তারাশঙ্কর যথেষ্ট শিল্পচেষ্টা নিয়োগ করলেও রূপান্তরমুখী সারা সমাজপটের অতি ক্ষীণ সমর্থনই উক্ত শিল্পপ্রয়াস পেয়েছে। অনেক সময়ই মনে হয়েছে যে বিষয়টা যেন শেষ পর্যন্ত শুধুই ব্যক্তিগত। কিন্তু বনোয়ারীর ক্ষেত্রে এই ত্রুটি নেই। সে কাহারপাড়ার মোড়ল। কাহারপাড়ার ভবিষ্যৎ করালী তার হাত থেকে

ছিনিয়ে নিতে চায়, বলেই তার সঙ্গে করালীর দ্বন্দ্ব। গোটা কাহারপাড়ার রূপান্তরটা তার চোখের সামনেই ঘটেছে তিল তিল করে। এবং প্রতি মুহূর্তেই সে তার সঙ্গে দ্বন্দ্বে লিপ্ত। তাই বনোয়ারী অনেক পূর্ণ এবং স্পষ্ট। সমাজ-বাস্তবতার সার্থক ব্যবহারে তারাশঙ্কর বনোয়ারীর নাটকীয়তাকে উপন্যাসে সুপ্রযুক্ত করেছেন। কাহারপাড়ার বটগাছে যখন কুড়ুলের ঘা পড়ে তখন বনোয়ারী ইতিহাসের অনিবার্যতার কাছেই বিধ্বস্ত হয়।

অথচ ইতিহাসের এই অনিবার্যতা হার্ডির অদৃষ্টবাদ নয়, যদিও অদৃষ্টও যেমন অপ্রতিরোধ্য হাঁসুলিবাঁকের উপকথার কাহার-পল্লীতে ইতিহাসের প্রবেশও তেমনি অপ্রতিরোধ্য, অন্তত বনোয়ারীর কাছে। তথাপি এটা ইতিহাস বলেই—শুধু অদৃষ্টের বিধিকল্প-অন্ধতা নয় বলেই—এ যেমন কাহারপাড়ার পুরনো জীবনের প্যাটার্নকে ভাঙে তেমনি করালীদের নতুন জীবনকে রচনাও করে। তারাশঙ্করের সম্বন্ধে এ-আপত্তি না উঠে পারে না যে জীবনের দ্বন্দ্বসম্ভূত যে পুরাতনের ক্ষয় তার জন্য বিধুরতাকে তিনি যতটা আশ্রয় করেন ততটা তার স্বরূপকে চিনতে চান না। বস্তুর অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বের ফলে যে সামাজিক অগ্রগতির জন্ম হয়, এটাকে তারাশঙ্কর শুধু কথার কথা মনে করেন। না করলে হাঁসুলি-বাঁকের উপকথা বনোয়ারীর গল্প না হয়ে করালীর গল্পই হত। এবং এখানেই হার্ডিরও যে ত্রুটি তারাশঙ্করেরও সেই ত্রুটি। হার্ডি চরিত্রকে গল্পের কাঠামোর কাছে সমর্পণ করেন, তারাশঙ্করের নায়ক-চরিত্রেরা বলি হয়ে যায় তাঁর নাটকীয়তার কাছে। বনোয়ারীর প্রতি পক্ষপাতে যে নাটকীয়তার জন্ম তার মধ্যে নাট্যকারের নিরাসক্তি খণ্ডিত - এ সন্দেহ শেষ পর্যন্ত নির্মূল হয় না।

এবং এইখানেই তারাশঙ্করের শিল্পের প্রধান অসঙ্গতি। যে যুক্তি পরম্পরায় ইতিহাসের নতুন রূপকে চেনা যায় এবং উপন্যাসে তাকে ব্যবহার করা চলে সে ন্যায়শৃঙ্খলা তারাশঙ্করের চেতনায় খণ্ডিত। এটা তার যে-কোনো নায়ক চরিত্রের মূল ভিত্তির অসঙ্গতির দিকে তাকালেই স্পষ্ট হয়। জীবনের পুরাতন বিন্যাসের ছকে রূপান্তরের আঘাত হানবার জন্যই তারাশঙ্করের নায়ক-চরিত্র ব্যবহৃত হয়। রূপান্তরের ফলে পুরাতন ছকে আঘাতের প্রতিক্রিয়া বলার জন্য তারাশঙ্কর ন্যায়তই ব্যস্ত। কিন্তু সে রূপান্তর সৃজনের মাধ্যম যে মানুষগুলো যেমন করালী, অহীন—তারা যেন অনেকটাই ইতিহাসের যন্ত্র। করালী, অহীন বা শিবনাথের প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে দ্বন্দ্ব বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এদের মানসলোকেও যে একটা দ্বন্দ্ব বা টানাপোড়েন চলতে পারে এবং তারও একটা

নাটকীয় সার্থকতা থাকা সম্ভব—তারাশঙ্কর সে সম্বন্ধে প্রায় উদাসীন। এই জন্যই হাঁসুলিবাঁকের উপকথা ও কালিন্দী করালী এবং অহীনের চেতনার নবজন্মের কাহিনী না হয়ে বনোয়ারী এবং ইন্দ্র রায়ের গল্প হয়ে ওঠে। লেখকের নাট্যাসক্তি শিল্পীর নিরাসক্তিকে ব্যাহত করে, শিল্পবিন্যাসে অসঙ্গতি নিয়ে আসে। অহীন কী করে নিজ জন্মের পরিবেশ ছাড়িয়ে মার্কসবাদী হয়, করালী ছুটো বিয়ে করতে চাইলে তার পাপবোধে আঘাত লাগে না কেন, আরতি গান্ধীবাদ গ্রহণ করে কিসের ভিত্তিতে, এ-সমস্ত কথার কোনো উত্তর নেই। একমাত্র কবি উপন্যাসের নায়ক ছাড়া তারাশঙ্করের প্রধান নায়কদের কারো অন্তর্দ্বন্দ্বই যথার্থ প্রত্যয়গ্রাহ্য হয়ে ওঠেনি। (ইদানীংকালে কতকটা সপ্তপদীর কৃষ্ণেন্দু এ-মর্যাদার দাবি করতে পারে।) (ডোমজীবনের অন্ধকার পটে নিতাইয়ের ব্যক্তিত্ব বিকাশের কাহিনীই কবি উপন্যাসের প্রধান কথা। নিজ সমাজের কাছে তার ব্যক্তিজীবনের সামাজিক দান একটি পরম স্বকীয়তায় মূল্যবান হয়ে উঠুক, এই সুপরিচ্ছন্ন নৈতিক জিজ্ঞাসায় কবির নায়ক নিতাই বিশিষ্ট। নিতাই তারাশঙ্করের সবচেয়ে স্বাস্থ্যবান পর্যায়ের সৃষ্টি) যে সমস্ত অবিনশ্বর চরিত্র সৃষ্টির জন্য তারাশঙ্কর উত্তরকালের কাছে নমস্য হয়ে থাকবেন বনোয়ারী এবং নিতাই তাদের অন্যতম। অন্যথা তারাশঙ্করের মধ্যবিত্ত যুবক নায়কেরা রূপকথার নায়কের মতো প্রায়ই অন্তর্দ্বন্দ্বহীন। অথবা অমূলক অন্তর্দ্বন্দ্বে পীড়িত। এই দ্বন্দ্বহীনতার জন্যই তারাশঙ্করের উপন্যাসের তরুণ নায়কেরা প্রায়ই সরলীকৃত হয়ে পড়ে। অথচ এবম্বিধ সরলীকরণ উপন্যাসের নৈতিক সিদ্ধান্তের পক্ষেই হানিকর হয়ে দেখা দেয়। উপন্যাসের নৈতিক তাৎপর্য তার শিল্পরূপের সঙ্গেই সংযুক্ত—সেটা নীতিবাগীশতা বা ঋষিবচন বিতরণ নয়। যদি তা হয় তবে তা art এর বিচারে দাঁড়ায় না। বঙ্কিমচন্দ্র থেকেই তারাশঙ্কর এ-সতর্কতা সংগ্রহ করতে পারতেন। এই সরলীকরণের হাত থেকে শিল্পকে বাঁচাতে গিয়ে তারাশঙ্কর মাঝে মাঝে নকল বুঁদির গড় সৃষ্টি করেন। যেখানে শিবনাথের জমিদারির অন্তঃসারশূন্যতায় তার পত্নীও বিদ্রূপমুখর হয়ে তাকে চাকরি গ্রহণ করতে বলে সেখানে আর শিবনাথের ঘোড়া বেচে দিয়ে দেশের জন্য কৃচ্ছ্রসাধন করছি ভাবার কোনো মানে হয় না—ও তো এমনিই বিক্রি হয়ে যেত। দেবু ঘোষের বাধাটা শুধু এই যে ছিরে ঘোষ অসৎ, তা নইলে তার কোনো সমস্যা নেই। তেমনি আরোগ্য নিকেতনের প্রাচীন আয়ুর্বেদ এবং আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের দ্বন্দ্বের বাস্তবভিত্তি কোথাও নেই। উত্তরায়ণের

প্রবীরের সিদ্ধান্তের মর্ম স্বীকার্য এবং আরতির গান্ধীবাদ গ্রহণে কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু তাঁর বক্তব্যটা হচ্ছে এই যে শ্রেণীসংগ্রামও তো এই প্রকারই হিংসালীলা, অতএব পরিহার্য। এ-সিদ্ধান্ত লেখক নিজ দায়িত্বে আরোপ করেছেন বলেই এটা শিল্প হয়নি। যদিও তারাশঙ্কর নিশ্চয় জানেন যে রেজারেকসনের নায়কের বাইবেলীয় সদাচরণের উপলব্ধিতে পৌঁছনো এ-ক্ষেত্রে একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। যে সিদ্ধান্তে নেখল্যুডফ পৌঁছল সেটা আমাদের কাছে প্রত্যয় সৃষ্টি করতে পেরেছে। কারণ, যে দীর্ঘ সোপান পথের শেষে সে উক্ত উপলব্ধিতে উপনীত হল সেই সোপানগুলির ক্রম এবং চরিত্রের ন্যায় আমাদের কাছে যুক্ত হয়ে দেখা দেয়। অহীনের মার্কসবাদ গ্রহণ এবং আরতির গান্ধীবাদ গ্রহণে সেই ন্যায় রক্ষিত হয়নি। তাছাড়া নেখল্যুডফের সাহায্যে টলস্টয় যে সমাজ-বাস্তবতার স্বরূপ চিত্রিত করলেন ও তার ব্যাখ্যা দিলেন সেটাও অনুধাবন-যোগ্য। নেখল্যুডফের গল্প শুধু শিবনাথের গল্পের মতো একটা সৎলোকের গল্প নয়। নেখল্যুডফ ব্যক্তিগতভাবে সৎ কাজ করতে চায়, কিন্তু টলস্টয় দেখাচ্ছেন যে, সে যে ভালো কাজের জন্য চেষ্টাও কবতে পাবে তার কাবণ সে নিজে সুবিধাভোগী শ্রেণীর সন্তান। সাধারণের প্রবেশাধিকার এবং ক্ষমতা যেখানে সীমিত নেখল্যুডফ সেখানে নিজ বংশ-মর্যাদাব সুযোগ গ্রহণ করতে পারে। এর দ্বারা নেখল্যুডফের চরিত্রের সাধুতা যতটা স্পষ্ট হচ্ছে তার থেকে ঢের বেশি স্পষ্ট হচ্ছে তৎকালীন রুশ জনতার দুর্দশা। এবং সে দুর্দশার পাহাডপ্রমাণ বাধা নেখল্যুডফেব শত ভালমানুষিতেও দূব হচ্ছে না, এটাই নেখল্যুডফের দুঃখ, টলস্টয়ের বক্তব্য। শিবনাথ বা দেবু ঘোষের বেলায় বাধাটা মাত্র শিবনাথের স্ত্রীর বা ছিরে ঘোষের হয়ে ওঠায় সমস্ত ব্যাপারটা ব্যক্তিগত সুখদুঃখের স্তবে থেকে গেছে। কাজেই নেখল্যুডফের বাইবেলীয় সদাচরণের পথে সাধারণ মানুষের জীবন স্বীকীরণ—তথা জীবনের বিশুদ্ধির জন্য অনলস প্রয়াস—তারাশঙ্করের নায়কদের অধ্যাত্মসিদ্ধি বা গান্ধীবাদ গ্রহণের থেকে অনেক তাৎপর্যময়।

বরঞ্চ সে-ক্ষেত্রে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়েব মধ্যবিত্ত নাযকেরা যথার্থই কালোচিত অন্তর্দ্বন্দ্বের ভারে পীডিত নায়ক। শশী এবং গাওদিয়ার দ্বন্দ্বে আমাদের ঔপনিবেশিক মধ্যবিত্ত জীবনের সেই চূডান্ত দ্বন্দ্বই প্রকাশিত। শশীর গাওদিয়ার জীবন কলকাতাই নাগরিক জীবনের সব স্মৃতিস্বপ্নকে গলা টিপে ধরতে চায়। উপনিবেশের অসঙ্গতি আর কোন্ নায়ক-চরিত্রে এর বেশি ব্যবহৃত হয়েছে

জানি না। তিরিশের বাংলা দেশের গ্রাম-শহরের সমাজ বাস্তবতার স্বরূপ নির্ণয়ের কাজে শশী সর্বদা স্মরণীয় চরিত্র।

তা বলে আমাদের বলার উদ্দেশ্য কিন্তু এ নয় যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে দাঁড়িয়ে তারাশঙ্কর হেরে গেছেন (যেমন এর উল্টো কথাটাও আমাদের বক্তব্য নয়)। বরঞ্চ আমাদের সাধারণ সিদ্ধান্ত এই যে, সমৃদ্ধ বিষয়বস্তু ও তার ব্যবহারে তারাশঙ্কর বিশেষ তাৎপর্যের অধিকারী। বহুকালাগত প্রাচীন ভারতীয় বিশ্বাসকে এ-কালের পটে নবমূল্য প্রদানে (সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী), জীবনের সুস্থ স্বভাবকে খোঁজার অক্লান্ত প্রয়াসে বিচিত্র বিশাল জনজীবনকে একটা নৈতিক ব্যাখ্যাদানের চেষ্টায়, তারাশঙ্কর স্মরণীয়। মহৎ শিল্পের উপাদান জীবন ও জীবনভিত্তিক দর্শন। এ-কথা তারাশঙ্কর যেখানে যে-পরিমাণে মনে রেখেছেন সেখানে সে-পরিমাণে স্বীয় প্রতিভায় তিনি কালোত্তীর্ণ, যেমন কবি, হাঁসুলিবাঁকের উপকথা (আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত অংশ)। এখানে তিনি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালের বর্ণ-বিহ্বল, অভিজ্ঞতার কারবারীদের শিক্ষাস্থল। কখনো কখনো তিনি নিজ অহংবুদ্ধির কাছে শিল্পবুদ্ধিকে বিসর্জন দিয়েছেন। তিনি নিজে যেটাকে অসংলগ্নভাবে বোঝেন, বা বোঝেন বলে মনে করেন সেটাকে প্রচারের ভিতর দিয়ে শিল্প করে তুলতে চান যেমন আরোগ্য নিকেতন, উত্তরায়ণ প্রভৃতি। এখানেই আমাদের শিল্পগত আপত্তি। আমরা তারাশঙ্করের সেই শিল্প-সংকটের কথা এবার আলোচনা করব।

●● ছয় ●●

তারাশঙ্করের সাহিত্যকর্মের সঙ্গে সুপরিচিত পাঠক সমাজ জানেন যে তাঁর গোটা শিল্পজীবনকে এখনো পর্যন্ত দু-ভাগে বিভক্ত করা যায়। একটা ভাগ হাঁসুলি-বাঁকের উপকথা পর্যন্ত। আর একটা ভাগ মন্বন্তর থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য মন্বন্তর হাঁসুলিবাঁকের উপকথার আগে লিখিত হলেও মন্বন্তরে তাঁর সাহিত্যজীবনের রূপান্তরের সূচনা। সুতরাং, তারাশঙ্করের প্রথম যুগের রচনাধারার সঙ্গে দ্বিতীয় যুগের রচনাধারার প্রতিতুলনা এ-ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক। সরল নায়ক, সহজ পরিবেশ এবং বলিষ্ঠ জীবনবোধ তারাশঙ্করের প্রথমদিকের রচনার বৈশিষ্ট্য। তারাশঙ্করের বাগ্‌ভঙ্গিতে যে কথকতার সুর তা এই ফ্রেমের উপযুক্ত আঙ্গিকরীতি। তারাশঙ্কর গল্পকে স্থাপন করতেন গ্রামের পটভূমিতে। সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ, ক্ষীয়মান সামন্ত যুগের অস্তরাগ তাঁর

গল্প-উপন্যাসের জগতে এক আলোকরশ্মির বিচ্ছুরণ সম্ভব করেছে যার কথা অবিস্মরণীয়। কিন্তু আত্মসন্তুষ্ট শিল্পী তখনও তারাশঙ্কর ছিলেন না বলেই এ-কথা উপলব্ধি না করে পারেননি যে তার প্রথম পর্যায়ের সাহিত্য সম্ভারের মধ্যে মধ্যবিত্ত জীবনাশ্রয়ী উপন্যাসগুলিতে তিনি একটিও পূর্ণাঙ্গ নায়ক চরিত্র সৃজন করতে পারেননি। প্রচলিত অর্থে নায়ক চরিত্র সৃজন করতে পারেননি। প্রচলিত অর্থে নায়কের যুগলে নায়িকা সৃজনে তারাশঙ্কর এই পর্যায়ে একেবারেই ব্যর্থ। বরঞ্চ বলা যায় মধ্যবিত্ত পরিসরের বাইরে যেখানে দাঁড়াতে চেয়েছেন সেখানে তাঁর সাফল্য অনেক বেশি মাত্রায় করতলগত হয়েছে। কবি এবং হাঁসুলিবাঁকের উপকথা এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয়। অবশ্য তারাশঙ্করের মধ্যবিত্ত নায়ক চরিত্রে সরলীকৃত যন্ত্রণার সরলীকৃত নাটক বরাবর সহজলভ্য। এসব ক্ষেত্রে ব্যক্তির যন্ত্রণাকে তার মনোময় সত্তার গভীরে তিনি নিয়ে যেতে পারেননি। শিবনাথের সমস্যা না সামন্ত সংকটের, না দাম্পত্য জীবনের, না ব্যক্তির উপলব্ধির। অথচ সব কিছুরই সম্ভাবনা এ-ক্ষেত্রে ছিল। অহীনের কাছে কালিন্দীর চর সমাজতত্ত্বের পাঠ। নাটকটা বরঞ্চ ইন্দ্র রায় এবং রামেশ্বরকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। দেবু ঘোষকে তারাশঙ্কর বলেছেন যে সে বুদ্ধি সম্বন্ধে সচেতন, খানিকটা স্বার্থপর। "বিদ্যা অবশ্য বেশি নহে, কিন্তু দেবু সেইটুকুকেই যথেষ্ট মনে করে। এ-গ্রামে তাহার সমকক্ষ বিদ্বান ব্যক্তি কাহাকেও তো সে দেখিতে পায় না।" "তাহার ধারণা গ্রামের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি সে। ব্যক্তিত্বের সম্মান তাহার প্রাপ্য। অরণ্যানীর শিশুশাল যেমন বন্য লতার দুর্ভেদ্য জাল ভেদ করিয়া সকলের উপর মাথা তুলিতে চায়, তেমনি উদ্ধত বিক্রমে সে এতদিন গ্রামের সকলের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আসিয়াছে। তবে সে একা আলোক ভোগের জন্যই ঊর্ধ্বলোকে উঠিতে চায় না, নিচের লতাগুলি তাহাকেই অবলম্বন করিয়া তাহার সঙ্গে আলোক রাজ্যের অভিযানে চলুক—এই তাহার আকাঙ্ক্ষা।" কিন্তু সে নিজের গ্রামখানিকে ভালবাসে। স্বভাবতই লেখকের চিন্তায় এই যে মানুষের কাঠামোটি ধৃত হয়েছিল তা একটা পুরোদস্তুর উচ্চাভিলাষী গ্রামীণ মানুষের কাঠামো। কিন্তু লেখকের কল্পনায় যে এই মানুষটি একেবারেই ধরা দেয়নি পূর্ণাঙ্গ দেবু ঘোষ চরিত্রটি তার নিদর্শন। প্রতিযোগিতাপরায়ণ ব্যক্তির সে পট নয় গণদেবতা বা পঞ্চগ্রাম, সে জটিল মনের আধারও নয় দেবু ঘোষের সুখে বিগতস্পৃহ এবং দুঃখে অনুদ্বিগ্ন সরল বিনীত চরিত্রটি। বরঞ্চ প্রথম অধ্যায়ে ছিরু ঘোষ লেখকের নায়কের প্রতিশ্রুতি থেকে কিছুটা ঋণ গ্রহণ করে নিজ ন্যায়ে বিশিষ্ট হয়েছে।

অথচ এই উদ্ধৃত অংশটুকু পরিহার করে দেবু ঘোষকে উপস্থাপিত করলে দেবুর গ্রাম্য পণ্ডিতের সহজ মর্যাদা-সচেতন চরিত্রের কোনো ক্ষতিই হত না। সম্ভবত লেখক মনে করেছেন যে দেবুর জীবনে ব্যক্তিস্বরূপের অন্তর্নিহিত একটা সংঘাত এবং দ্বন্দ্বের সাহায্য নিলে দেবুকে রূপায়িত করা যাবে নতুন কালের তাৎপর্যে। কিন্তু এই হিসাবী চিন্তা উপন্যাসস্থ হতে পারেনি।

অথচ তারাশঙ্করের নাট্যরস প্রবণতায় এই বিষয়টা অন্তত স্বচ্ছ যে, সত্তার গভীরে আলোড়ন সৃষ্টিকারী কোনো যন্ত্রণা ব্যতিবেকে নায়কের ব্যক্তিস্বরূপকে স্পষ্টরেখ করে তোলা যাবে না। এ-ধরনের একটা বোধ তাঁর মধ্যে স্বতঃই উপস্থিত। উপন্যাসের নিজ নিয়মে দেবু পণ্ডিত বেঁচে গেলেও আরোগ্য নিকেতনের জীবন মশাইকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। জীবন মশাইয়ের অস্তিত্বের আলোড়িত রূপ সৃজনে লেখকের ব্যর্থতা উপন্যাসে দু-ভাবে ব্যক্ত হয়েছে। এক, দ্বন্দ্বটা কাল-কালান্তরের রূপক নির্মাণ করতে পারেনি, যা পেবেছে তা হল অ্যালোপাথি বনাম আয়ুর্বেদের ঝগড়া। ফলে মৃত্যুকে নিয়ে মিথ্ সৃজন জীবন মশাইয়ের ব্যক্তিজীবনের অনিবার্য সূত্রে গ্রথিত হয়নি। দুই, এই অসঙ্গতি তারাশঙ্করের দৃষ্টি এড়ায়নি বলেই তিনি জীবন মশাইয়ের ব্যক্তি জীবনের প্রথম-প্রেমেব ব্যাপাবটির শেষ অধ্যায়ে প্রত্যাবর্তন ঘটিয়ে জীবন-বৃত্তের বিষয় সম্বন্ধে, মায়ামুক্তি বা মোহচ্ছেদ সম্পর্কে আমাদের সচেতন কবতে চেয়েছেন। আরোগ্য নিকেতনে অবৈজ্ঞানিক বিশ্বাস প্রাধান্য পেয়েছে এটা উপন্যাসটিব আংশিক ত্রুটি। এব মূলীভূত কারণটি অনুসন্ধেয়। চরিত্রের বিশ্বাস বৈজ্ঞানিক বা অবৈজ্ঞানিক দুইই হতে পাবে। প্রশ্ন সেখানে নয়। প্রশ্ন এইখানে যে, যে-জীবন মশাই জীবনবহস্য ও মৃত্যুরহস্য দুইকে জানেন, এবং দুর্জ্ঞেয় শক্তিকে জানেন—তিনি শুধু লেখকেব উপলব্ধির দায় বহন করেই ক্ষান্ত হলেন, না, উপন্যাসের আকাশ বাতাস মৃত্তিকা এবং আবহাওয়া থেকে কিছু রক্তমাংস সংগ্রহ করে জীবিতকল্প হলেন? শেষোক্ত প্রশ্নে আমাদেব উত্তর—'না'। জীবন মশাইয়ের জীবন সম্বন্ধে অসামান্য স্নিগ্ধবোধ, নিরুদ্বিগ্নতা এবং শান্ত-ভাবের সঞ্জীবনেব জন্য উপন্যাসেব বিষয়ভূমি থেকে কোনো সহায়তা না থাকায় জীবন মশাই কতকগুলি নিবাময়ের হেতু হয়ে রইলেন শেষ পর্যন্ত। জীবনের ভ্রমে এবং স্খলনে, উত্থানে ও পতনে যে নিরাময়ের সম্ভাবনা নিহিত সেই awareness of the possibilities of life উপন্যাসে শিল্পোজ্জ্বল হয়ে উঠল না। অথচ কবি উপন্যাসে নিতাইয়ের শেষ উত্তরণকে জীবন ও পৃথিবীর কূলে এমন ভাবে স্থাপিত করা হয়েছিল যে সেখানে সৃজিত ব্যক্তিস্বরূপের নিজস্ব

ন্যায়েই তাকে মনে হয়েছে জীবন এবং শিল্পের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ। নিতাই-য়ের যন্ত্রণা, প্রেম, অভীপ্সা সমস্তই উপন্যাসের শিল্পময় আধারকে গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে। পক্ষান্তরে সে নিজেও প্রাণবায়ু সংগ্রহ করেছে উপন্যাসের পটধৃত পরিমণ্ডল থেকে। কিন্তু তারাশঙ্করের অপর মূল্যবান সৃষ্টি হাঁসুলিবাঁকের উপকথায় নায়ক চরিত্রের পরিকল্পনায় পুনরায় অসঙ্গতির দেখা মেলে। করালী যদি মাত্র নবকালের প্রতীক হয় তা হলে করালীর একটা ব্যাখ্যা হয়তো দাঁড করানো চলে। কিন্তু উপন্যাস তো প্রতীকী বাচনরীতির বা আঙ্গিকরীতির উপযুক্ত লীলাভূমি নয়। তাই এখানে চরিত্রের পরিভাষায় লেখক তাঁর জীবন-বিষয়ক বক্তব্যকে ব্যক্ত করলেও সাংকেতিক নাট্যরীতি নিশ্চয় এখানে চলে না। করালীর প্রথম উপস্থাপনায় নিঃসন্দেহে সে নায়ক। সর্প-নিধনের তাৎপর্যে এ-কথার বড়ো সাক্ষ্য মিলবে। কিন্তু ধীরে ধীরে দেখা গেল যে করালী একটা অন্ধ আবেগ ছাড়া কিছু নয়। সে নবকালকে ধারণ করে নেই। নবকালই তাকে ধারণ করে আছে। তার প্রয়াসের কোনো শুদ্ধতা নেই। যে রূপকথার নায়কের মতো কাহারপাড়ার অাঁধাব দৈত্যকে হনন করেছিল সে ধীরে ধীরে শুধু কাহারপাডাকে আঘাত করার একটা যন্ত্রে পরিণত হল। অতঃপর বনোয়ারীর প্রাধান্য আর আতিশয্য ছাড়া উপন্যাসকে বাঁচানোর আব কোনো উপায় ছিল না। উপন্যাসটি হয়ে উঠল বনোয়ারীর গল্প। বনোয়ারীর বেদনা তারাশঙ্করের শ্রেষ্ঠ কীর্তিগুলির অন্যতম হলেও বনোয়ারীকে তিনি নায়ক কবতে পারেননি তাঁর সামাজিক বুদ্ধির তাগিদেই। অথচ তারাশঙ্করের দীর্ঘ সাহিত্যকীর্তিতে নিতাই ছাড়া তখনও পর্যন্ত কোনো নায়ক নেই।

এই অবস্থায় তিনি মুখ ফেবালেন কলিকাতা-কেন্দ্রিক মধ্যবিত্ত জীবনের দিকে। যে জটিলতা, যে দ্বন্দ্ব, যে ব্যর্থতাবোধ তাঁর গ্রামীণ মধ্যবিত্ত নায়কদের ক্ষেত্রে তিনি কল্পনায় আনতে পারেন না, নাগবিক মধ্যবিত্ত জীবনের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ-কালীন দীর্ণতার পর, তাবাশঙ্কর ভাবলেন, সেটা কলকাতায় হবে সহজলভ্য। মন্বন্তরে তাঁর সেই চেষ্টার প্রথম প্রকাশ। অথচ মন্বন্তব উপন্যাসেব নায়ক কানাইয়ের যন্ত্রণায় মধ্যবিত্ত মানুষের সর্বাঙ্গীণ জটিলতাব কোনো সাক্ষ্য নেই। যেটা কানাইয়ের যন্ত্রণাব প্রধান সূত্র সেটা হল বংশগত বক্তধারা, যা তার মধ্যে প্রবহমান তার শুদ্ধি-অশুদ্ধির ব্যাপার। নগর-জীবনকে গভীর মনোনিবেশে তারাশঙ্কর ধরেননি কোথাও। নগর পটভূমি হিসাবেও অপরিহার্য হয়ে ওঠেনি। তাঁর প্রয়োজন ছিল দ্বন্দ্বময় নায়ক। সুতরাং তারই সন্ধানে তিনি ব্যস্ত। এই

দ্বন্দ্বের উৎসরূপে তিনি জীবনের গভীরে যাবার চেষ্টা করেননি। চেষ্টা কবেছেন জীবনেব সংবাদে যাবাব। জাবজ কিনা, বংশেব বক্তধাবায় শুদ্ধতা কোথায়, এই সমস্ত ব্যাপাব তাবাশঙ্কবেব কাছে নায়কেব সমস্যা হিসাবে দেখা দিয়েছে। বলা বাহুল্য এব জন্য নগবপটেব কোনো অপবিহার্যতা নেই। কৃষ্ণেন্দুকে কলকাতাতেই ববং বেমানান মনে হয়েছে। বাঁকুডাব রুক্ষ পবিবেশে এই স্নিগ্ধ মানুষটি চমৎকাব বৈপবীত্য সৃজন কবেছে। কিন্তু ওদিকে অকাবণে বিণা-ব্রাউনেব জন্মবহস্য কতকগুলি বড়ো বড়ো গ্রন্থি সৃজন কবে বড়ো গল্পকে উপন্যাসে রূপান্তবিত কবেছে। 'বলো আমাব পিতা কে' অথবা নায়ক জাবজ কিনা এ-প্রশ্নেব নিজস্ব জোব এত বেশি যে একটি ব্যক্তিস্বরূপেব বহুলাংশই এই জিজ্ঞাসাচিহ্নেব ধাক্কায় হাবিয়ে যায। এব পবে যা জেগে থাকে তা হল লণ্ঠনেব পলতেকে শেষ বিন্দুতে পৌঁছে দিলে যে ধূমেল শিখা জ্বলে ওঠে, যাব মধ্যে অন্ধকাব বেশি, তাবই মতো অবসিক কৌতূহল। এ কিছুতেই বসসৃজন নয়। ১৩৬৭ সালেব শাবদীয় উল্টোবথে প্রকাশিত তাবাশঙ্কবেব উপন্যাস বিপাশা-র কথা উল্লেখ কবা যায়। বিপাশাব নাযকেব সমস্যাও এই ব্যক্তিগতরূপে নির্বিশেষেব তাৎপয বহিত। গোটা ভাবতবর্ষকে পটভূমি কবে তুলতে গিয়ে পাঞ্জাব থেকে দিল্লী হযে কলকাতা এবং সেখান থেকে আবাব এলাহাবাদে এই উপন্যাসেব ঘটনাক্রম বিস্তৃত। শিখ, খ্রীষ্টান, আদিবাসী সবই এবং সবাই এখানে উপস্থিত শুধু একটি উদ্দেশ্যহীন পবিসমাপ্তিকে গড়ে তোলাব জন্য। কৃত্রিম নাটক, মেকি আবেগ এবং প্রচুব আবেগময় বাক্যবাশিব সমাবেশে তাবাশঙ্কব মধ্যবিত্ত নাযকেব দ্বন্দ্বময রূপ সৃজনেব নাম কবে যা কবেছেন তাব মধ্যে আশ্চযভাবে এ-যুগেব সাহিত্যেব অধিকাংশেব ক্ষেত্রে অনুভূত অবক্ষযেব লক্ষণ উপস্থিত। সেগুলি এই

(ক) যা তাব ছিল—সেই বৃহৎ অর্থে জীবন এব সভ্যতা সম্বন্ধে আগ্রহ তাব নেই।

(খ) তিনিও এতদিন বাদে ঘটনা-সাবালো, ঘটনা-ধাবালো ও ঘটনা-ভাবালো উপন্যাস লিখতে চাইছেন।

(গ) জীবনেব সমস্যা বলতে তাঁব কোনো প্রয়াস নেই। তাব চেয়ে ব্যস্ত তিনি জীবনেব বহস্য বলতে। আব বহস্য বলতে তিনি বুঝেছেন 'নকব সংকীর্তনেব' মতো গল্প।

নগব জীবনে নাযক খুঁজতে এসে তাবাশঙ্কব যেন শিল্প বিসর্জন দিতে বসেছেন।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

•• এক ••

তিরিশের কালে প্রকৃতি চেতনার জন্য চিহ্নিত দুজন শিল্পীর খ্যাতি এখন প্রায় সর্বজনস্বীকৃত। এঁদের একজন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অপরজন জীবনানন্দ দাশ। বিভূতিভূষণ এবং জীবনানন্দের মধ্যে প্রকৃতি সাধারণ উপকরণ এ-কথা কিন্তু একান্ত প্রাথমিক সত্য। উভয়ের ব্যক্তিস্বরূপের বিশেষ বিন্যাসে, প্রকরণের স্বতন্ত্র মহিমায় দুই তাৎপর্যের সূচক দুজনে এ-কথাই শেষ সত্য। জীবনানন্দের মন সচেতনভাবে আধুনিক বলেই মর্মশায়ী পীড়া সম্বন্ধে তীক্ষ্ণ অনুভূতি তাঁর প্রেরণায় ক্রিয়াশীল। জীবনানন্দের বিখ্যাত প্রতীক রূপকে, হেমন্তের অনুষঙ্গের পৌনঃপুনিকতায় জীবনের সেই পীড়াক্রান্ত অনুভূতির প্রকাশ স্পষ্ট। যদিও শেষ দিকে মানুষের প্রেমে এই পীড়ামুক্তির সান্ত্বনা কবি প্রত্যয়কে আকর্ষণ করেছে, তথাপি 'পৃথিবীর গভীরতর অসুখ'—এই বোধই কবি জীবনানন্দের ভাবভূমির মূল আবহাওয়া। নিঃসন্দেহেই বিভূতিবাবু জীবনানন্দের নিজস্ব সংজ্ঞানুসারে সভ্যতা-সচেতন নন। সংকটাপন্ন সভ্যতার আর্তি তাঁর মানসের সৃজনীবৃত্তির চেতন অংশটুকুকে অধিকৃত করেনি। সেই জন্যেই বিভূতিভূষণ এমন এক স্বাস্থ্য-মনস্কতা রচনা করেছিলেন যার ফলে তিনি না হলেন পল্লীপ্রীত কুমুদরঞ্জন, না হলেন সংকট-বিধুর জীবনানন্দ। সান্ত্বনা আর উজ্জীবনের মধ্যে প্রেরণাগত উৎস একই—ব্যাধিই উভয়ের উৎস, কিন্তু উভয়ের পরিণতিতে দুই মানস-দৃষ্টির কথা ওঠে বলেই উভয়ে পৃথক পথগামী।

নইলে, এ-জিজ্ঞাসার উত্তর মিলবে কোথায় যে রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছের গ্রাম প্রকৃতির পর বিভূতিবাবুর প্রকৃতি-দৃষ্টির বিশিষ্টতা কোন্ খানে? তিরিশের যন্ত্রণাও যত তিরিশের প্রেরণাও তত। এই দ্বৈতে সেই বিশিষ্টতা অনুসন্ধেয়। তিরিশের যন্ত্রণা অর্থনৈতিক সংকটে, আমাদের বেকার সমস্যায়, জাতীয় আন্দোলনের মন্থরতায় এবং মধ্যবিত্ত জীবন মূললগ্ন মৃত্তিকার বিশুষ্ক বিদীর্ণতায়। তিরিশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশার প্রেরণা এ-দেশে অনুভূত হয়েছে জিজ্ঞাসার তীব্রতায়। মার্কস এবং ফ্রয়েড জট পাকিয়ে গেলেও সে প্রেরণা অনুভূত হয়েছে জীবনের দ্বন্দ্বময় অথচ ব্যাপ্ত গভীর রূপ-কে উপলব্ধির প্রয়াসে। জীবন সম্বন্ধে নির্মোহ আগ্রহ উপন্যাস শিল্পের মূলে। ইতোপূর্বে ব্যক্তি সম্বন্ধে আগ্রহী বাংলা উপন্যাসে ব্যাপক জীবন সম্বন্ধে গভীর আগ্রহ এত সমগ্রতা নিয়ে একটা

যুগ সৃষ্টি করেনি। হয়তো স্বদেশ-জিজ্ঞাসা এবং জীবন-জিজ্ঞাসা তিরিশের দশকের শুভলগ্নে মিলিত হতে পেরেছিল বলেই জীবনের সংলগ্নতা এ-যুগের প্রধান উপন্যাস-লক্ষণ হয়ে উঠেছিল। বিভূতিভূষণের উপন্যাস বিচারকালে এ-কথাটি বিশেষভাবে স্মরণীয়।

•• দুই ••

রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি-চেতনায় নিঃসন্দেহে কবির মর্ত্য-প্রীতির প্রকাশ। অন্তত কবিজীবনের শেষ পর্যাযে কবিব প্রকৃতি-চেতনা মর্ত্য-প্রীতিরই নামান্তর। প্রকৃতি তখন আর সোনার তরী-চিত্রা-পর্যায়ের কবির সৌন্দর্য সাধনার সহায়ক মাত্র নয়, বা পরবর্তী পর্যাযের অরূপ সাধনাব অঙ্গ নয়। সহজ জীবন-প্রীতিতেই প্রকৃতি তখন আকর্ষিত হয়েছে—জীবনের অমেয় সম্ভাবনার বাহক হিসাবে। সেই ভাবে দেখতে গেলে বলা যায যে বিভূতিবাবুর কোনো সঠিক সংজ্ঞানিবদ্ধ প্রকৃতি-দৃষ্টি নেই। প্রকৃতি তাঁর কাছে জীবনের অংশ রূপে প্রতিভাত। সুতরাং জীবন সম্পর্কে তাঁব মনোভাব কী এই ব্যাখ্যাতেই তাঁব প্রকৃতি-চেতনাও ব্যাখ্যাত হয়ে যায়। /রবীন্দ্রনাথ যে ক্ষেত্রে কবির আবেগে প্রকৃতিকে অনুরঞ্জিত করেছেন, ব্যাখ্যা কবেছেন, যে ক্ষেত্রে তাঁর দৃষ্টি কবিব দৃষ্টি, সে-ক্ষেত্রে বিভূতিভূষণেব দৃষ্টি কৌতূহলীর দৃষ্টি। যে দীপ্ত আগ্রহে জীন্‌স্ সাহেবেব বিশ্বরহস্যেব সম্মুখে বিস্ময়াভিভূতি, বিভূতিভূষণেব কৌতূহলের সঙ্গে তার সাদৃশ্য ববশ্চ লক্ষণীয়। অর্থাৎ বিজ্ঞানীব জানবার পিপাসার সঙ্গে কবিব আবেগ সেখানে যুক্ত। পথের পাঁচালিতে যে ছেলেটি বারে বাবে তার পিতাকে এটা কী ওটা কী বলে ব্যস্ত কবেছিল, অথবা আবণ্যকে যে ভদ্রলোক এত কিছু আছে জানতাম না বলে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন এরা দুজনেই জীবনেব সম্বন্ধে প্রবল কৌতূহলের লক্ষণে চিহ্নিত। এই বিশ্ববোধেব ব্যাপাব উপন্যাসে বিভূতিভূষণের দান। প্রথম দৃষ্টিতে বিভূতিভূষণকে কবি বলে ব্যাখ্যা সমাপ্ত করলে তাঁকে সমগ্রভাবে পাওয়া যায না। অসীম গ্রহ নক্ষত্রের জগৎ, গাছ লতা পাতা, নদী নালা বিধৃত যে জীবন আমরা যাপন করি অথচ বিস্মৃত থাকি, বিভূতিভূষণ সেই বিস্মৃতিকে পূরণ করে পূর্ণ বৃত্ত রচনা করতে চেয়েছিলেন। প্রকৃতি এই সূত্রেই বিভূতিবাবুর কল্পনার সঙ্গে প্রসঙ্গবদ্ধ। বিভূতিভূষণের এই জীবনদৃষ্টি কতখানি শিল্প-প্রযুক্ত, কতখানি নয়, তাঁর আরণ্যক গ্রন্থখানির সাহায্যে সে-কথা আমরা বর্তমান প্রবন্ধে বোঝার চেষ্টা করব।

আরণ্যক গ্রন্থখানির এ-প্রসঙ্গে নির্বাচনের কারণ বিদ্যমান। লেখকের শ্রেষ্ঠ রচনাই যে সর্বদা তাঁর সমালোচনা প্রসঙ্গে যোগ্য গ্রন্থ এমন নাও হতে পারে। যে রচনায় লেখককে তাঁর শক্তি এবং দুর্বলতা-সমেত ধরা যায় লেখকের সমগ্রতা বিচারে সেটাই তাৎপর্যপূর্ণ গ্রন্থ। পথের পাঁচালি সর্বোত্তম হলেও আরণ্যক এ-হিসাবে তাৎপর্যপূর্ণ রচনা। বিভূতিবাবুর শক্তির প্রকাশ এবং ব্যত্যয় দুইই এখানে বিদ্যমান।

আমরা জানি যে বিভূতিবাবুর প্রধান ক্ষমতা এই যে তিনি তাঁর জগৎ রচনা করেন এমনভাবে যেখানে বিশ্বাস্যতা বা অবিশ্বাস্যতার কোনো প্রশ্ন ওঠে না। এমন কি বিশ্বাস্য হবার জন্যও তাঁর বিন্দুমাত্র ব্যস্ততা নেই। তিনি প্রমাণ-প্রয়োগ করেন না, কেবল যা দেখেছেন তাই আমাদের বলতে চান। এর বিপরীতাচরণ তাঁর স্বধর্ম নয়। সেই কারণে দৃষ্টি প্রদীপের সাংসারিক রূঢ়তা বিভূতিবাবুর হাতে রূঢ়তার তালিকা প্রণয়ন হয়ে গেছে—মাঝে মাঝে অপ্রাকৃত দৃষ্টিশক্তির আলোকে যে রূঢতা-জনিত রসাভাসকে উত্তীর্ণ হওয়া যায়নি। বরঞ্চ সে ক্ষেত্রে ইন্দির ঠাকরুণের প্রতি সর্বজয়ার নিষ্ঠুরতা প্রায় জীবনসংলগ্ন হওয়া সত্ত্বেও, নিশ্চিন্দপুরের স্বপ্নধাত্রী পরিবেশে তাকে বেমানান ঠেকেনি। শুকনো পাতা গাছ থেকে ঝরে যায় যে স্বাভাবিকতায় ইন্দির ঠাকরুণের মৃত্যুও তাদৃশ। সর্বজয়ার সংকীর্ণতা এ-ক্ষেত্রে যে বিরাট প্রাণিন প্রকৃতি-বেগ উপন্যাসের প্রধান স্রোত তারই অংশ। দৃষ্টি প্রদীপে এমনটা ঘটেনি। যে সরল বলিষ্ঠতায় লেখক পথের পাঁচালির বিশাল প্রকৃতি পটকে এঁকেছেন, ইন্দির ঠাকরুণ ও সর্বজয়ার ক্ষেত্রে সে-কল্পনাকে অকস্মাৎ রূঢ় পৃথিবীর সংস্পর্শে এসে সংযত হতে হয়নি। এই পদ্ধতিতেই লেখকের জীবন-প্রত্যয় শিল্পমাধ্যমে সহৃদয়ের হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়।

আরণ্যকেও দেখা যায় বিভূতিবাবুর মূল বক্তব্যের বীজ-রূপে পথের পাঁচালি দৃষ্টি প্রদীপের সাদৃশ্য বর্তমান। এই তিন ক্ষেত্রেই মূল বিষয় হল—স্বপ্নের জগৎটা হারিয়ে গেল শেষ পর্যন্ত। জগৎটাকে বিভূতিবাবু এত বেশি বিশ্বাস করতেন যে তার কথা বলতেই তিনি তদ্‌গত থাকতেন। জগৎটা ভেঙে যাওয়া, তাঁর কাছে প্রিয় বিয়োগের মতো এত নিবিড়ানুভূতির ঘটনা যে বিচ্ছেদের বেদনাটাই শেষ পর্যন্ত প্রধান হয়ে ওঠে। বিয়োগের অহেতুক বিশ্লেষণ তিনি করেন না। নায়ক-নায়িকার চেতনার ক্ষেত্রে দ্বন্দ্বহীনতার যে অভিযোগ বিভূতিভূষণ প্রসঙ্গে উত্থাপিত হয় তার মূল এইখানেই নির্দেশ করা যায়। সেদিক থেকে প্রথম দৃষ্টিতে

আরণ্যকের ত্রুটি অনেক। ধাওতাল সাহুর মহাজনী, রাসবিহারী সিং-এর জমিদারি, গাঙোতা এবং রাজপুতদের দাঙ্গা অরণ্যের আদিম পটভূমিকা বিনাশের সঙ্গে নিবিড় ভাবে গ্রন্থিনিবদ্ধ হলে আরণ্যক অন্য ধরনের সৃষ্টি হত। অবশ্যই যে তাৎপর্যে আরণ্যক এখন অনন্য, সে অনন্যতা তখন তার থাকত না।

দেখা যাক বিভূতিবাবু কী কী পরিহার করেছেন। প্রথম, জমিবিলির ফলে আরণ্যক জীবনের পটে যে অর্থনৈতিক সূত্র সম্বন্ধ সমাজ জীবনের প্রাথমিক আবির্ভাব ঘটল তার কোনো পরিচয় লেখক দেননি। দ্বিতীয়, তিনি জীবনের ও জীবিকার মৃত্তিকাবদ্ধ কোনো স্বরূপ সন্ধানের প্রযাসী হননি। তৃতীয়, অরণ্য মণ্ডলের রূপ নির্মাণে বর্ষা বা ঝড়কে আদপেই ব্যবহার করেননি। ওপরে কথিত এই তিনটি সূত্র থেকে একটা কথা স্পষ্ট যে বিভূতিবাবু জীবনের সংঘাত-দ্বন্দ্বের ব্যাপারটিকে প্রশ্রয় দিতে চান না। যেখানেই জীবনের নিষ্ঠুর নখরদন্তকে তিনি প্রত্যক্ষ কবেছেন, সেখানেই ডেকে এনেছেন অনন্ত জীবনরহস্যকে, বিস্মৃতি সৃজনের জন্য ততটা নয়, যতটা জীবনের ছোট বড়ো ভালো-মন্দ প্রভৃতির অতীত একটা রূপক সৃজনের জন্য। আরণ্যক উপন্যাসে ঘন ঘন ব্যবহৃত জোৎস্না রাত্রির ব্যবহার এই তাৎপর্যেই বুঝতে হবে। যা আছে, বা যা বিভূতিবাবু ব্যবহার করেছেন তাও এ-প্রসঙ্গে গণনীয়। এই পরিহার ও ব্যবহারের মধ্যেই তাঁর জীবনদৃষ্টির কথঞ্চিৎ পবিচয় মিলবে। বিষয়বস্তুর ব্যবহারেব প্রসঙ্গে আবণ্যকের এই তিনটি বিশিষ্টতা স্মরণীয। প্রথম যার অভিভূত কবাব ক্ষমতা বেশি প্রকৃতিব ভিতর থেকে তাকেই নির্বাচিত করা হয়েছে ঘন ঘন। ছায়াহীন জোৎস্না বাত্রি এবং ছায়াহীন নির্জন দুপুরের পৌনঃ-পুনিক ব্যবহার এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয। দাবানলে যতটা আকস্মিকতা, বর্ণনাক্ষেত্রে ততটা দ্রুততা দাবানলেব ঈপ্সিত ফলশ্রুতি আনযন করেনি। দ্বিতীয়, অতি-প্রাকৃতের ব্যবহার। অতি-প্রাকৃতেব দিকে ঝোক পথের পাঁচালিতে অস্পষ্ট, দৃষ্টি প্রদীপে সুস্পষ্ট। আবণ্যকের আবণ্য-আদিম পরিবেশে এর সুসার্থক প্রয়োগ লক্ষণীয়। বোমাই বুরুর জঙ্গল কাহিনী এবং মহিষের দেবতা টাঁরবারোর গল্প উপন্যাসের সমগ্রতার সঙ্গে অভেদ সম্পর্কে গ্রথিত। তৃতীয়, এই উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীদের অধিকাংশই জীবিকা-সংলগ্ন মানুষ নয়। কুন্তা এবং নাকছেদীর পরিবার ব্যতীত প্রায় সকলের সম্বন্ধেই এ-কথা প্রযোজ্য। রাজু পাঁড়ে ভক্ত কবি এবং দার্শনিক, যুগলপ্রসাদ জঙ্গলে গাছ লাগায়, বেঙ্কটেশ্বর কবি, ধাতুরিয়া নাচে, মটুক নাথ টোলের পণ্ডিত। রাজু পাঁড়ে এবং যুগলপ্রসাদ লেখককে

যে আকৃষ্ট কবেছে অধিক পরিমাণে তাবও প্রমাণাভাব নেই। একান্ত সহজ কীর্তিহীন মানুষগুলিই লেখকেব উপাদান।

•• তিন ••

স্বভাবতই লেখকেব এই মনোভঙ্গিব মধ্যে দেখা যাচ্ছে এমন অনেক কিছু বয়েছে যাদেব উপন্যাসস্থ হবাব তথাকথিত যোগ্যতা অল্প। জীবনেব দ্বন্দ্বকে এড়িয়ে, ব্যক্তিব পট-ধৃত জীবনেব যন্ত্রণাকে পবিহাব কবে বিভূতিভূষণ কীভাবে আবণ্যককে শিল্পভাতি দান কবলেন সেটাই শেষ পযন্ত প্রশ্ন। সেই শক্তিবহস্য অনুসন্ধান কবতে হবে শিল্পীব মানসিক স্বাস্থ্যে, যা বচনাতে সঞ্চাবিত হয়েছে, সমস্ত দুর্বলতাকে গ্রাস কবেছে এবং উপন্যাসে এনেছে অটুট পূর্ণতা। বিভূতিভূষণেব স্বদেশ ভূমি সম্বন্ধে আগ্রহ নিঃসন্দেহে তিবিশেব জীবন-সন্ধানী ব্যাপকতাব দান। কিন্তু যেহেতু বিভূতিবাবুব মন কিছুতে আবিষ্ট নয় এবং তাঁব বিশ্বপবিচয়-পিপাসা একান্ত ভাবেই জীবনেব ক্ষুধা, সেইহেতু সমস্ত ব্যাপাবটাকে একটা প্যাটার্নের মধ্যে নিয়ে আসা লেখকেব পক্ষে অসম্ভব হযনি। দু-ভাবে আবণ্যকেব উপন্যাস-প্রকৃতিব বিকৃতি ঘটতে পাবত। এক হতে পাবত লেখকেব প্রাচীন ভাবতেব তপোবনেব ঐতিহ্যবোধ অতিমাত্রায় প্রকট হযে ব্রহ্ম জিজ্ঞাসাব মুহুর্মুহু তাগিদে উপন্যাসটিব ছন্দোভঙ্গ। আব হতে পাবত ইওবোপীয ভ্রমণবীবদেব পদাঙ্ক অনুসবণ কবে জীবনেব দুবন্তরূপ সন্ধানী বচনা। আবণ্যক এ-দুযেব কোনোটাই নয়। বিস্তৃত উপন্যাসে কোথাও ঋষিকীর্তিব কথা স্মবণ কবিযে অবণ্যভূমিকে পূত কবাব চেষ্টা লক্ষিত হয়নি। আধুনিক বাংলা হিমালয় ভ্রমণেব বর্ণনায যেমন পদে পদে মৃত্যু কল্পনাব আতিশয্য—এ-ক্ষেত্রে তাব সাহায্যে পাঠককে শিহবিত কবাব চেষ্টাও কোথাও নেই।

এইভাবে সর্ববিধ সংস্কাব-বিমুক্তিব ফলেই আবণ্যকেব মানুষগুলিও উপন্যাসেব মৃত্তিকাব সঙ্গে অবণ্যানীব মতোই দৃঢ়-লগ্ন। ধাওতাল সাহুব কথা প্রথমে ধবা যায়। ধাওতাল সাহু কুসীদজীবী—অর্থনীতিব পবিভাষায Indigenous Banker-এব পর্যাযে সে পড়ে। ধাওতাল সাহু লক্ষপতি, কিন্তু অনাড়ম্বব এবং বিশ্বাসবান ব্যক্তি। এ-ধবনেব গ্রামীণ মহাজন আমবা দেখিনি—বাংলা উপন্যাসে তো নয়ই। কিন্তু বিভূতিবাবু তাকে প্রত্যযসিদ্ধ কবলেন কী প্রকারে? তাব উত্তব এই যে উপন্যাসের ন্যায় শৃঙ্খলে তাকে লেখক আশ্চযভাবে বেঁধেছেন বলে। এই উপন্যাসেব আবহাওয়াব নিয়মেই সে হয়েছে সত্য। এখানে যদি কুটিল এবং

কুচক্রী এক মহাজনেব আধুনিক লোভার্ত মূর্তি লেখক গড়ে তুলতে চাইতেন তাহলে আরণ্যকেব সহজ বলিষ্ঠ পটভূমি স্থাপনা মিথ্যা হয়ে যেত। যেমন অক্লেশে ধাওতাল সাহু তামাদি হ্যাণ্ডনোটগুলি ছিঁড়ে ফেলে, তেমনি অক্লেশে কলেবায় মানুষগুলো মবে, তেমনি অবলীলায় গাছে গাছে বসন্তে ফুল ধরে, গরমে শুকিয়ে যায়। টাকা বসিয়ে বাখা যায় না তাই তাকে খাটাতে হয়। এ-ছাডা তাব কোনো অভিলাষ নেই। নিবভিলাষ অবণ্যেব মতো, নিরভিমান ধাওতাল সাহু সত্য। ঠিক এই নিয়মেই বাসবিহাবী সিংও সত্য। সে বন্য প্রাচুর্য এবং বন্য উদ্দামতা নিয়ে অবণ্যেব হিংস্রতাব স্মাবক হয়ে বইল। তাব বাড়িতে লেখককে প্রদত্ত আহার্যথালীতে 'হাতিব কানেব মতো বড়ো বড়ো পুবী'ব কথা আমবা পড়েছি। বাসবিহাবী সিং-এব স্মৃতিতে মদমত্ত হাতিব প্রসঙ্গ সর্বদা উপযুক্ত। এবং এইভাবে বলতে বলতে বিভূতিবাবু আবণ্যকেব মানব-জীবনেব একটা রূপ শেষ পযন্ত বিন্যাসেব মধ্যে আনতে পেবেছেন। একাধিক-বাব লেখক বলেছেন এ-দেশেব মানুষ বড়ো নিষ্ঠুব, তাদেব দযামায়া নেই। কিন্তু ধাওতাল সাহু এই দযামাযাহীন জীবনেব মধ্যেই বিদ্যমান। কিন্তু এব মধ্যে বাস্তবিক কোনো বিবোধ নেই। কলেবায মানুষ মবে—এ-ঘটনায় এখানকাব মানুষেব মনে দযাধর্ম উদ্রেক কবাব কোনো অবকাশ নেই। অবণ্য এখানে জটিল নাগপাশেব মতো মানুষেব জীবনকে শত-জট-বন্ধনে বেঁধে রেখেছে। দীর্ঘ অভ্যাসে তাবা সেই বন্ধনে অভ্যস্ত, সমর্পিত-চিত্ত। তাবা জানে অবণ্যেব অমোঘ নিয়মেব মতো সবই অলঙ্ঘ্য। কাজেই দয়াব প্রশ্ন নিবর্থক। ধাওতাল সাহুও যে তামাদি হ্যাণ্ডনোট ছিঁড়ে ফেলে, তাব পশ্চাতে দযাব কোনো প্রশ্ন নেই। টাকা খাটাতে গেলে এই বকমই ঘটে থাকে। আবণ্যক উপন্যাসে মাত্র একটি ঘটনা দয়াব স্নিগ্ধতায আর্দ্র। লেখক যেখানে কুন্তাকে জমি দিচ্ছেন সেখানে কুন্তাব জমি চাষ কবে দেবে কে এ-প্রশ্নেব জবাবে সেই গাঙ্গোতা যুবক যখন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বলল যে সকল গাঙ্গোতাই একখানি কবে লাঙ্গল দেবে—সেখানেই প্রথম দযাব সাক্ষাৎ। অবণ্যেব আদিম পট ছিঁড়ে অর্থনৈতিক সূত্রবদ্ধ জীবনেব উদ্ভবেব সঙ্গে সঙ্গে তাব সহজাত সামাজিক কর্তব্যবোধেব উদয হল। এই ভাবেই বলা যায় যে বিভূতিভূষণ সমগ্র শিল্পকর্মেব দিকে প্রখব দৃষ্টি বেখেছিলেন বলেই নন্দলাল ওঝাব মতো কুটিল ব্যক্তিকে যথাসম্ভব উপন্যাসেব পটের বাইবে বাখাব চেষ্টা কবেছেন। জমিদাবি সেবেস্তার দলিল দস্তাবেজ এবং আমলাবৃন্দও একই কারণে যথাসম্ভব দূবে পবিহৃত হয়েছে।

•• চার ••

সঙ্গে সঙ্গে লেখকেব বাচন-ভঙ্গিমাও দ্রষ্টব্য। ভাবোন্নীত সুগম্ভীর ভাষাকে কোথাও কারো মুখেব কথাকে বাস্তব কবে তোলার অনুরোধেও লেখক লক্ষ্য-চ্যুত করেননি। প্রাকৃত এবং অতি-প্রাকৃত জীবনের ভেদবেখা যে অবণ্য-ভূমিতে মিলে-মিশে রয়েছে সেখানকার বর্ণনাভঙ্গিতে গদ্যেব ঋজুতাব সঙ্গে কাব্যের নমনীয়তা প্রয়োজন। বিভূতিভূষণেব সমুদয় প্রধান উপন্যাসেব ভাষাতেই এই গুণ বর্তমান। আরণ্যকে তা আবো যথার্থ আধাব পেয়েছে।—

(ক) দিক চক্রবালে দীর্ঘ নীলবেখাব মতো পবিদৃশ্যমান এই পাহাড় ও বন দুপুবে, বিকালে, সন্ধ্যায কত স্বপ্ন আনে মনে। এব জ্যোৎস্না, এব বন বনানী, এব নির্জনতা, এব নীবব বহস্য, এব সৌন্দর্য, এব মানুষজন, পাখিব ডাক, বন্য ফুলশোভা—সবই মনে হয অদ্ভুত, মনে এমন এক গভীর শান্তি ও আনন্দ আনিয়া দেয়, জীবনে যাহা কখনো কোথাও পাই নাই। তাব উপবে বেশি কবিয়া অদ্ভুত লাগে ওই মহালিখারূপেব শৈলমালা ও মোহনপুবা বিজার্ভ ফবেস্টেব সীমাবেখা। কী রূপলোক যে ইহাবা ফুটাইযা তোলে দুপুবে, বৈকালে জ্যোৎস্না বাত্রে কি উদাস চিন্তাব সৃষ্টি কবে মনে।

(খ) তাহাব কাছে সবস্বতী কুণ্ডীব কথা তুলিতেই সে বলিল—হুজুব ও মায়ার কুণ্ডী, ওখানে বাত্রে হুবী পবীবা নামে, জ্যোৎস্না বাত্রে তাবা কাপড় খুলে বাখে ডাঙায ঐসব পাথবেব উপব, বেখে জলে নামে। সে সময় যে তাদেব দেখতে পায, তাকে ভুলিযে জলে নামিযে ডুবিযে মাবে। জ্যোৎস্নাব মধ্যে দেখা যায় মাঝে মাঝে পবীদেব মুখ জলেব উপবে পদ্মফুলেব মতো জেগে আছে। আমি দেখিনি কখনও, হেড সার্ভেয়াব ফতে সিং একদিন দেখেছিলেন।

উদ্ধৃত অংশ দুটিতে ভাষাব বিন্যাসে কোনো ভেদসীমা নেই বললেই চলে। অথচ প্রথমটি লেখকেব উক্তি, দ্বিতীয়টি আমিন বঘুবব প্রসাদেব। আমিন বঘুবব প্রসাদেব উক্তিকে বিশ্বাস্য বা বাস্তব কবে তোলাব জন্য লেখকেব কোনো গবজ নেই। কেননা আমিন বঘুবব প্রসাদকে রূপায়িত কবা লেখকেব লক্ষ্য নয়। সে যে গল্প বলছে তার অবিশ্বাস্যতাকে বিশ্বাস কবাব জন্য আমবা প্রস্তুত বলে ছোট খাট বিশ্বাস্যতাব বেলায় আমবা আর তীক্ষ্নদৃষ্টি নই। কাজেই যে কবিত্ব লেখকের নিজেব ভাষায়, সে কবিত্ব বঘুবব প্রসাদেব ভাষাতে এলেও বিস্ময়েব কিছু নেই এবং লক্ষণীয় যে লেখক সর্বত্র অতি-প্রাকৃত গল্পগুলিকে সফল কবেছেন একটা

বিশেষ কৌশলে। প্রকৃতির অঢেল এবং উদ্দাম সৌন্দর্যলীলার কথা বলতে বলতেই তিনি অতি-প্রাকৃত কাহিনীগুলির অবতারণা করেছেন। কোলরিজের কৌশল এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয়। পাঠকের কাছে দুইই সমান বিস্ময়ের বিষয়। নাগরিকতা-ক্লান্ত মানসে বিশাল সীমাহীন প্রকৃতির কথা বিশ্বাস করতে যতটা শক্তির প্রয়োজন তারই পটভূমিকায় স্থাপিত অতি-প্রাকৃতকে বিশ্বাস করতে তদপেক্ষা অধিক শক্তির প্রয়োজন হয় না। মনে হয় প্রথমটা যদি সত্য হয় তা হলে দ্বিতীয়টাই বা নয় কেন? ঈষৎ অপ্রাসঙ্গিক হলেও এ-প্রসঙ্গে একটা ব্যাপার পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারে না। বর্ণিত অঞ্চলগুলির নামের মধ্যে মহাপ্রাণবর্ণের আধিক্য রহস্যময়তার সূচক হিসাবে কাজ করেছে। মহালিখা, মোহনপুরা, ফুলবইহার, ঝনঝরি প্রভৃতি নামের মধ্যেই যেন বন ঝাউয়ের দীর্ঘশ্বাসের ইঙ্গিত মেলে।

•• পাঁচ ••

এই সমস্ত উপাদানের পশ্চাতে সতত ক্রিয়াশীল হয়ে রয়েছে লেখকের একটি বেদনা। এই বেদনার দুই মুখ। একমুখে অপরিচয়ের জন্য ক্ষোভ। এ অপরিচয়-জনিত ক্ষোভের মূল সুদৃঢ় ভিত্তিতে। দেশকে জানার পিপাসা তিরিশের কালের একটা প্রধান লক্ষণ এ-কথা পূর্বে বলেছি। স্বদেশ-জিজ্ঞাসায় জীবন-জিজ্ঞাসারই অভিব্যক্তি ঘটেছে। বিভূতিভূষণের রচনায় স্বদেশ-জিজ্ঞাসার বহিরঙ্গ আবরণটা কখনই বড়ো হয়ে ওঠেনি। কিন্তু আরণ্যকে বারে বারে দেখা যায় যে স্বদেশ পরিচয়ের অসম্পূর্ণতার জন্য লেখকের ক্ষোভ কথা বলেছে। ভারতবর্ষ নামক ব্যাপারটা যে এত বিশাল এত বিচিত্র এ-কথা তিনি এ-উপন্যাসে বারে বারে বলেছেন। এই বেদনার দ্বিতীয় মুখ জাতীয় সম্পদের অপচয়ে। উপনিবেশের ভূস্বত্বভোগীদের হাতে শাসক-শক্তির ঔদাসীন্যে, যে বিরাট অঞ্চল ন্যাশনাল পার্ক হতে পারত, তা শেষ পর্যন্ত ধ্বংস হতে বসল দু-মুঠো গমের জন্য। এই জাতীয় সম্পদ চেতনা এবং জাতীয় সম্পদ বিনষ্টির ক্ষোভ থেকে জন্ম লাভ করেছে যুগলপ্রসাদ। যুগলপ্রসাদ আশ্চর্য প্রেমিক মানুষ। এ-প্রেম জীবন-প্রেম। যে জীবন ঐ বিস্তৃত অরণ্য পটভূমিতে ব্যাপ্ত, তাকে সাজিয়ে বেড়ায় রাষ্ট্রশক্তির সহায়তাহীন একক যুগল-প্রসাদ। সরস্বতীর ধারে ধারে নিঃসঙ্গ ঘুরে বেড়ালে তার মহিমা অক্ষুণ্ণ থাকত। লেখক উপন্যাসের প্রবক্তা হিসাবে তার কথা বলে গেলেই সে মহিমার সম্যক শিল্পরূপায়ণও সম্ভব হত। কিন্তু লেখক নিজে যুগলপ্রসাদের সঙ্গে অরণ্যভূমিকে

অলংকৃত করার কাজে যুক্ত হওয়ার যুগলপ্রসাদের বিশ্বাস্যতা কমে গিয়েছে। প্রাচীন অরণ্যভূমির কাছে যে কারণে লেখক বারে বারে ক্ষমা চেয়েছেন, সেই অপরাধ-বোধকে স্খলিত করার জন্যই মনে হয় যেন যুগলপ্রসাদের সঙ্গে এই যুক্তপ্রয়াস—এমন ধরনের যান্ত্রিকতার অভিযোগ এখানে না উঠে যায় না। অথচ যুগলপ্রসাদ এই উপন্যাসের পক্ষে একটা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার। জমি বিলির ফলে লবটুলিয়ার নবোদ্ভূত মানব বসতি যদি কাউকে আঘাত করে থাকে তো সে হল যুগলপ্রসাদ। যুগলপ্রসাদকে দিয়ে সে ক্ষেত্রে লেখক অনেক কথা বলাতে পারতেন, যা বলা হয়নি।

জাতীয় সম্পদ বিনষ্টি-জনিত যে-ক্ষোভেব ফলে যুগলপ্রসাদকে লেখক কল্পনা করেছেন, সেই ক্ষোভের প্রেরণায় রচিত হয়েছে সাঁওতাল রাজা দোবরু পান্না। দোবরু পান্না অরণ্যভূমিব আত্মা, আরণ্যক উপন্যাসেরও আত্মা। ভানুমতী অরণ্য-ভূমির সৌন্দর্যের প্রতীক। দোবরু পান্না মযাদার প্রতীক। লেখক সৌন্দর্যের মর্যাদা এবং মর্যাদার সৌন্দর্য উভয়কেই নিঃসংকোচে রূপায়িত করেছেন। পরাভূত দোবরু পান্না বিপর্যস্ত হলেও, সে রাজা এবং অতীত সংগ্রামের নায়ক, এ-কথাটা লেখক কদাচ বিস্মৃত হননি। যৌবন বয়সে কোম্পানির সঙ্গে লড়েছেন দোবরু পান্না, তাঁর পূবপুরুষেরা লড়েছেন মুগল সাম্রাজ্যবাহিনীর সঙ্গে। সূর্য বংশের সন্তান তিনি, একদা তার বংশের অধীনে ছিল ঐ পাহাড় জঙ্গল সারা পৃথিবী। দোবরু পান্নাকে রাজসম্মান দিয়েছেন লেখক। রাজার পূর্বপুরুষদের প্রাচীন সমাধিভূমিতে দাঁড়িয়ে লেখকের অনুভূতি স্মরণীয়।—

> ইতিহাসের এই বিরাট ট্রাজেডি যেন আমার চোখের সম্মুখে সেই সন্ধ্যায় অভিনীত হইল, সে নাটকের কুশীলবগণ একদিকে বিজিত উপেক্ষিত দরিদ্র অনার্য নৃপতি দোবরু পান্না, তরুণী অনার্য রাজকন্যা ভানুমতী, তরুণ রাজপুত্র জগরু পান্না—একদিকে আমি, আমার পাটোয়ারী বনোয়ারীলাল ও আমার পথপ্রদর্শক বুদ্ধু সিং।

দোবরু পান্নাকে রাজসম্মান, রাজাদেশ পালন, রাজার সমাধিতে পুষ্পাঞ্জলি প্রদানের ভিতরে লেখকের বেদনার্ত ক্ষুব্ধ আত্মাই ক্রিয়াশীল হয়েছে। ভারতভূমির অপরাজেয় প্রতিরোধের একটা প্রতীক খুঁজেছেন লেখক এই বিরাট অরণ্য-সম্পদের বিনষ্টির অসহায়তায়। ভারত সকল কিছুকে সমন্বিত করার ব্রহ্ম মন্ত্র জানে এ-কথায় তখন আর লেখকের ক্ষোভের নিরসন হয় না। দোবরু পান্নার প্রতিরোধী আত্মার স্মৃতিতে পুষ্পাঞ্জলিদানের অংশে যে গম্ভীর ভাবাবেগ

সঞ্চারিত হয় তার মূল এখানে।

সঙ্গে সঙ্গে ভানুমতী অরণ্যের সমস্ত সৌন্দর্যকে এবং সারল্যকে নিজের মধ্যে অবলীলাক্রমে সংহত করেছে। এই ক্ষেত্রে লেখকের সংযম যেন ভানুমতীরই সৌন্দর্যের মর্যাদার দান। তথাপি আমার মনে হয় যে দোবরু পান্নার মৃত্যুর পরে সমাধিভূমিতে পুষ্পাঞ্জলি প্রদানের সঙ্গেই এই অধ্যায়ে যবনিকা ফেলে দিলে ভানুমতীর শেষ অধ্যায়ে যে রসাভাস ঘটেছে তার হাত থেকে সে বেঁচে যেত। ভানুমতীর সঙ্গে বিদায় দৃশ্যে ভানুমতী উপন্যাসের নায়িকার মতো আচরণ করেছে। এমন কি তার কালো জোড়া-ভুরু দুটির কথায় আমাদের হঠাৎ যেন ভুলে যেতে ইচ্ছে করে যে সে সাঁওতাল মেয়ে। ভানুমতীই হঠাৎ আমার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল—'আজ যেতে দেব না বাবুজী',—এই অংশেও তার ব্যবহারে প্রচলিত নায়িকা ভঙ্গিমার ছাপ অসঙ্গত হয়েছে। অরণ্যভূমি থেকে বিশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে এ ঘটনা যেন একান্তই লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় রূপান্তরিত হল।

•• ছয় ••

আরণ্যকের মূল শক্তি তার ভাষা ভঙ্গিমায় এবং বর্ণনা-রীতিতে প্রকাশ পেয়েছে —কিন্তু এ-শক্তির উৎস নিঃসন্দেহে লেখকের সমগ্র চেতনার বিন্যাসে। নাঢা ও লবটুলিয়ার আরণ্য-ভূমিতে যে বিস্ময় তা একদিকে যেমন আ-নীহারিকা-তৃণকণা বিস্তৃত জীবনের বিস্ময়, তেমনি লেখকের স্বদেশ জীবনের অন্তর্গত মানুষের জীবন-ধারণের বিস্ময়ও বটে। এই দুটি ব্যাপারকে, তথা জীবনের দ্বৈত রূপকে লেখক শিল্পস্থ করেছেন। ফলে অনেক টুকরো টুকরো কাহিনী (যেমন কুন্তার কাহিনী, মঞ্চীর কাহিনী) এক অনিবার্য ছন্দোবেগে রূপময় হতে পেরেছে। সে ছন্দ স্বভাবতই জীবনের ছন্দ। এই জীবনের ছন্দকে যে ঔপন্যাসিক বোঝেন তিনিই পট ও পাত্রের পরস্পর সম্পর্ককে কখনো ভুল করেন না। আরণ্যকের কতক স্থলে সেই ছন্দের ব্যত্যয় লক্ষ্য করেও বলা যায় জীবনের সমগ্রতার ধ্যানে আরণ্যক সফলকাম শিল্পকর্ম—তিরিশের যুগের কালোত্তীর্ণ সৃষ্টিগুলির মধ্যেই তার স্থান।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

•• এক ••

মানিক বন্দ্যোপাধ্যাযেব শিল্পকর্ম আলোচনা কালে প্রথমে লেখকেব attitude towards life বা জীবন সম্বন্ধে লেখকেব মনোভঙ্গিব কথা অবশ্যই অপবিহার্য। কোনো লেখকের মনোভঙ্গিব কথা আমবা যখন বলি তখন আমবা নিঃসন্দেহে কোনো অস্পষ্ট আপ্তবাক্য উচ্চাবণ কবি না। লেখকেব মনোভঙ্গি লেখকেব নিজস্ব বৃত্তি যাব সাহায্যে লেখক নিজ শিল্পকর্মে স্বাধীন এবং স্বচ্ছন্দগতি হতে পাবেন। এই স্বাধীন স্বাচ্ছন্দ্য উপন্যাসেব বা গল্পেব কাঠামো নির্মাণে, চরিত্র সৃজনে, ভাষাবয়নে এবং জীবন-ব্যাখ্যাব সর্বত্রই অনুভূত হয়। বস্তুত লেখকের জীবন সম্বন্ধে সামগ্রিক ধ্যান-ধাবণা বা লেখকেব মনোভঙ্গিব ওপবেই সার্থক উপন্যাসেব রস পরিণাম নির্ভবশীল। বলা বাহুল্য যে, লেখকেব জীবন সম্বন্ধে ধ্যান-ধাবণা বা মনোভঙ্গি এবং লেখকেব ব্যবহৃত দৃষ্টিকোণ সর্বাংশে এক বস্তু নয়। জীবন সম্বন্ধে লেখকেব মনোভঙ্গি লেখকেব পক্ষে এক গভীরতর প্রশ্ন। লেখকেব দৃষ্টিকোণেব প্রশ্নটা অপেক্ষাকৃত বাইবেব প্রশ্ন। সে কাবণে দুজন মার্কসবাদী লেখকেব দৃষ্টিকোণেব সাদৃশ্য থাকা সত্বেও দুজনেব মনোভঙ্গিব মধ্যে বিপুল পার্থক্য বিদ্যমান। হাওযার্ড ফাস্ট * এবং এবেনবুর্গ উভযেই একই বাজনৈতিক দৃষ্টিব অধিকাবী হওযা সত্বেও এবং উভয়েবই উপন্যাস ঐতিহাসিক ঘটনামিশ্রিত হলেও উভয়েব বচনাব প্রসাদ যে ভিন্ন তাব মূলে দুই লেখকেব মনোভঙ্গিব পার্থক্য। একজন যে ব্যক্তিকে ইতিহাসের পটে স্থাপন কবে তাকে পবীক্ষা কবাব পক্ষপাতী এবং একজন যে-ইতিহাসকে ব্যক্তিব জীবন-বিন্দুতে প্রতিবিম্বিত কবায সচেষ্ট এখানেও দুই লেখকেব নিজস্ব মনোভঙ্গিই সক্রিয়। লেখক যে জীবনকে দেখেছেন সেটা অবশ্যই তাব শিল্পকর্মে প্রতিভাত হযে থাকে এবং সেই জীবনবস-সমৃদ্ধ শিল্পকর্ম লেখকেব বিশিষ্ট মনোভঙ্গিব কথাই ঘোষণা কবে। সে কাবণেই হেনবি জেম্‌সেব সুবিখ্যাত বক্তব্যটি আমবা স্মবণে বাখি যে No good novel will ever proceed from a superficial mind। তাই উপন্যাসেব শিল্পকর্মেব বিচাবে লেখকেব মানস-বিচাবই হয়ে থাকে।

* সাম্প্রতিককালে অবশ্য হাওয়ার্ড ফাস্টের রাজনৈতিক দৃষ্টিব পরিবর্তন ঘটেছে।

সুতরাং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রসঙ্গ আলোচনাকালে আমাদের মানিকবাবুর বিশিষ্ট মনোভঙ্গি বা attitude-এর কথা সর্বাগ্রে আলোচ্য। তিনি ফ্রয়েড এবং অতঃপর মার্কসকে অবলম্বন করেছিলেন এর কোনোটার জন্যই তাঁকে নিন্দিত বা নন্দিত না করে আমাদের দেখা দরকার যে মানিকবাবু জীবন থেকে কী "নির্বাচন" করেছেন, কোন্ বক্তব্যে পৌঁছতে চেয়েছেন—স্থূল কথায় তাঁর জীবনকে দেখার মনোভঙ্গি কী। একজন লেখকের শিল্পগত এই মনোভঙ্গি বিচারের কালে আমাদের করণীয় কী এ-সম্বন্ধে রসজ্ঞ পণ্ডিতদের সূত্রও এই প্রসঙ্গেই স্মরণীয়। কোনো শিল্পকর্ম বিচারে বিশেষ উপন্যাস বিচারে আমাদের বিবেচ্য এবং আলোচ্য তিনটি বিষয়—প্রথম, লেখক কী পদ্ধতিতে জীবনকে দেখেছেন, দ্বিতীয়, কী তিনি জীবন থেকে গ্রহণ করেছেন, কী তিনি বর্জন করেছেন, তৃতীয়, তাঁর সমস্ত বক্তব্য কোন্ নৈতিক বোধে বিশিষ্ট। যে-কোনোও লেখকের সাহিত্যকীর্তি আলোচনা করতে গেলে উক্ত সূত্র তিনটির আলোকে হওয়াই বাঞ্ছনীয়। নানা রকম ভাবে জীবনকে দেখা যায় বলেই সার্তর কমিউনিস্ট হলেও গোর্কি হবেন না। তারাশঙ্কর মন্বন্তর লিখলেও তারাশঙ্করই থাকেন। সে কারণেই মানিকবাবুর সঙ্গে তারাশঙ্করের তুলনা অনর্থক। সে কারণেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও উপন্যাসের প্রসঙ্গ আলোচিত হলে যদি দেখা যায় যে, মানুষের মনের বিচিত্র গহনতাকে উপন্যাসের বিষয় করে তিনি বাংলা উপন্যাসে নতুন দিগন্তের সন্ধান করেছেন—এ-কথার উল্লেখও হল না তখন সে আলোচনাও অপূর্ণ।

•• তিন ••

মানিকবাবুর উপন্যাসগুলিকে আমরা তিনটে মোটা দাগে ভাগ করতে পারি। একভাগে পড়ে পুতুলনাচের ইতিকথা এবং পদ্মা নদীর মাঝি আর একভাগে পড়ে চতুষ্কোণ, সরীসৃপ, অহিংসা প্রভৃতি এবং তৃতীয় ভাগে পড়ে শহরতলী, চিহ্ন, আরোগ্য প্রভৃতি। যদিও এই তিন ভাগে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তিন ভিন্ন দৃষ্টিকোণের ব্যবহার করেছেন তথাপি তাঁর মনোভঙ্গি—জীবনকে গ্রহণের পদ্ধতি—প্রথমাবধি প্রায় অপরিবর্তিত থেকেছে। মানিকবাবুর শক্তি এবং তাঁর দৌর্বল্যের উৎস এই অপরিবর্তনীয় মনোভঙ্গির মধ্যেই নিহিত। অবশ্যই কোনো লেখক তাঁর attitude towards life-কে পরিহার করতে পারেন না। স্বেচ্ছায় নিজ দৃষ্টিকোণের পরিবর্তন ঘটিয়ে নিজের জীবন সম্বন্ধে ধ্যান-ধারণাকে

তার ব্যবহারও অক্রূর নয়। তাই 'কত ঘুমাইবা' ওপরে উদ্ধৃত গানের এই ধুয়ার অর্থ বাউল-মুর্শিদ-ঈপ্সিত আধ্যাত্মিক চেতনার উন্মেষের ইঙ্গিত নয়। নিষ্ক্রিয় আত্মসমর্পণের যে বিরুদ্ধতা হোসেন মিয়ার সমগ্র জীবনের সারার্থ গানটির রূপকে তাই বলা হয়েছে। এবং এই গানের পর বিস্মিত কুবের যখন জিজ্ঞাসা করেছে যে—আপনি গান বাইন্ধবার পারেন? তখন হোসেন মিয়ার জবাবটিও লক্ষ্য করার মতো—খুশ হলে না পারি কি? অবশ্য কুবেরের কাছে হোসেন মিয়া প্রায় ঐশী শক্তির সমতুল্য। দ্বীপে বসতি রচনা এবং গান রচনা খুশি হলে সে সব পারে—দুইই তার লীলা। সে-কারণেই ময়না-দ্বীপ যাত্রার বর্ণনায় কম্পাসের সামনে স্থিরনেত্র হোসেন মিয়ার পুরুষকার-প্রদীপ্ত মূর্তিটি মানিক-বাবুর রচনার দরকার হয়—কুবেরের কাছে হোসেন মিয়াকে মানুষ করে তোলার জন্যই আফিমের প্যাকেটের ঘটনার প্রয়োজন হয়। এর কোনো কথাই, আশা করি, নতুন কথা নয়। তবু একটা কথা বোধ করি কাউকে অসম্মান না করেই বলা চলে যে হোসেন মিয়ার মতো কল্পনা-সিদ্ধ চরিত্র বাংলা উপন্যাসের চরিত্র-মালায় আর একটিও নেই। পুতুলনাচের ইতিকথার যাদব আর হোসেন মিয়া একই মনোলৌল্যে গঠিত এ-কথা তাই রসবোধসম্মত কথা নয়।

এ-সমস্ত কাবণেই চতুষ্কোণ অবলম্বন কবে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে তুষ্ট থাকা হয় যে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যাযের রচনায় যৌনতা আছে বেশি জীবন আছে কম। চতুষ্কোণেব ক্ষণিক পর্যায় মানিকবাবুর আদি এবং অন্তে কোথাও স্থায়ী চিন্তা হিসাবে ছিল এ-প্রমাণ নেই। চতুষ্কোণের পরবর্তীকালে শহরতলী, চিহ্ন এবং আবোগ্যে মানিকবাবু নতুন করেই মানুষকে দেখতে চেযেছেন। মানুষের গোটা চেহারায় তারই সমাজ প্রতিবেশ ক্রিয়াশীল—চতুষ্কোণে এ-বক্তব্যের ব্যর্থ শিল্প-রূপায়ণের পর স্বাভাবিকভাবেই মানিকবাবু অগ্রসব হয়েছেন নতুন জিজ্ঞাসায়। এবং এরই ফলে মানিকবাবু মার্কসবাদকে স্বীকাব করেছেন।

নিঃসন্দেহে এই স্বীকরণ নির্ভুল সিদ্ধান্তেরই পরিণাম। কিন্তু এই সিদ্ধান্তকে নিজ শিল্পীজীবনে জারিত করে নিতে গেলে নিজেরই শিল্পী ইতিহাসকে যে ভাবে অনুধাবন করা দরকার সে-ক্ষেত্রে মানিকবাবুর ব্যত্যয় ছিল। তাঁর শেষ দিকের উপন্যাসগুলি নিয়ে কোনো যোগ্য বিনীত সমালোচনা হলে এ-কথা নিশ্চয় উত্থাপিত হবে। শুধু যখন অন্বিষ্ট হয় নিজের মন অথবা মনের মানে, তখন,—অথবা অন্ধ অদৃষ্টতুল্য প্রকৃতির গ্রাসে উপায়ান্তরহীন জীবন যখন উপজীব্য

তখন যে-মনোভঙ্গি কার্যকরী, মানুষ নিজ ইতিহাসকে নিজেই রচনা করে এ-কথা বলবার সময় আর সে-মনোভঙ্গি কার্যকরী হয় না। মানুষ পরিবেশের অধীন—শহরতলী পর্যন্ত এ-কথা যত শিল্পসম্মত ভাবে মানিকবাবু বলেছেন—মানুষ আপন অদৃষ্ট রচনায় অংশ গ্রহণ করে এ-কথা তত শিল্পসম্মত ভাবে তিনি বলতে পারেননি। অথচ মানিকবাবু হোসেন মিয়ার মতো চরিত্র সৃজন করেছেন। যশোদার নিঃসঙ্গতার ছবি এঁকেছেন। সেই কারণেই পাকার আত্মানুসন্ধানের ছকে (জীয়ন্ত উপন্যাসে) অথবা চিহ্ন উপন্যাসে অক্ষয়ের মদের গ্লাসে তাজা ছেলের রক্ত দেখায় মানিকবাবু মানুষের নিঃসঙ্গতাকেই রকমফের করে এঁকে বসেছেন তাঁর মার্কসবাদী অধ্যায়ে। অবশ্যই মানিকবাবুর অগ্রসর হবার প্রয়াস সদাই অভিনন্দনযোগ্য। এই প্রয়াসেই তিনি জগদীশ গুপ্তের নৈঃসঙ্গ্যের বক্তব্য থেকে এগিয়ে যেতে পেরেছিলেন। কিন্তু এই বক্তব্যের সার্থক রূপান্তরেব পথে বাধা ছিল তাঁর নিজস্ব শিল্পী-ব্যক্তিত্ব—যা তাঁর শিল্প-ধর্ম, শিল্প-দৃষ্টি, শিল্প-বক্তব্য—সবই। শশী-হোসেন-কুবের-যশোদার পর্যায়ে তিনি যে মানুষকে খুঁজেছেন সে শুধু আত্মা নয়, শুধু দেহ নয়, নয় শুধু বুদ্ধি, অথবা স্নায়ু কিংবা কোষের জটিলতা, কিংবা সমাহার। তিনি খুঁজেছেন সেই অখণ্ড ব্যক্তিস্বরূপকে যে তার সমুদয় উক্ত খণ্ডগুলির থেকে বড়ো। সেই মানুষের যন্ত্রণা ছিল মানিকবাবুর বিষয়। মার্কসবাদী পযায়ে তিনি বুদ্ধিসর্বস্ব মানুষকে আঁকতে গিয়ে হারিয়ে ফেললেন তাঁর শিল্পেব অভিজ্ঞান।

এইভাবেই মানিকবাবুর গদ্যরীতিকেও উপলব্ধি করা সম্ভব। তিরিশের লেখকবৃন্দেব মধ্যে যাঁর গদ্যরীতি চতুর্থ ও পঞ্চম দশকের শক্তিমান লেখকদের সমধিক প্রভাবিত করেছে—তিনি হলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। এবং আপাত দৃষ্টিতে অপ্রাসঙ্গিক হলেও একটা কথা স্মরণ করার মতো। কথাটি এই যে প্রভাবিত লেখকেবা প্রায় ক্ষেত্রেই মার্কসবাদী নন। এই অপ্রাসঙ্গিক মন্তব্যটি আমাদের এতক্ষণের আলোচিত সিদ্ধান্তের দিকেই ইঙ্গিত করছে—মানিকবাবুর শিল্পজীবনের প্রকৃষ্ট অধ্যায়ে মার্কসবাদের সাঙ্গীকরণ হয়নি। তাঁর বিশিষ্টতার উত্তরাধিকারীদের দিকে তাকালে এই কথাই স্পষ্ট হয় যে মানিকবাবুর শিল্পসাধনার সার্থকতর স্তরে, ভবিষ্যৎ প্রভাবী স্তরে, মার্কসবাদের বীজ ছিল না। যে অর্থে মানিকবাবুর সঙ্গে জগদীশবাবুর আত্মীয়তা এবং মানিকবাবুর সঙ্গে ইদানীঙের লেখকদের—সে অর্থের সঙ্গে মার্কসবাদের কোনো সম্পর্ক নেই। বিচ্ছিন্ন মানুষ, প্রতিকূল পরিবেশের কাছে নিঃশব্দে সমর্পিত-প্রাণ মানুষ—এবং

ভিতর থেকে ও বাইরে থেকে পরাধীন মানুষকে গড়ে তোলার উপযুক্ত ভাষা জগদীশ গুপ্তের ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এবং এই ভাষাকেই ব্যবহার করেছেন বর্তমান কালের অনেকে।

এই ভাষা-রীতিকে প্রসঙ্গসমেত পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে এর প্রধান লক্ষণ হচ্ছে এই যে এ-ভাষা বেগবতী নয়। সম্প্রতিকালে বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশ নিয়ে আলোচনা করেছেন এমন কারো কারো মন্তব্যেও মানিকবাবুব ভাষা যে বেগবতী নয়, সেখানে যে তীব্রতা প্রায় নেই এ-অভিযোগ ধ্বনিত হয়েছে। কিন্তু অভিযোগেব কোনো কারণ থাকে না, যদি আমবা এ-কথা অনুভব করি যে বেগবতী না হওয়াটাই মানিকবাবুব ভাষার প্রধান গুণ। মানিকবাবু যদি প্রতিকূল পবিবেশেব সঙ্গে যুদ্ধরত মানুষের কথা বলতে চাইতেন, তাহলে তাঁর উপন্যাসের উপকবণ-প্রকবণ সমেত ভাষাও পবিবর্তিত হত। কিন্তু তিনি যে ব্যক্তির কথা বলেছেন তাবা কেউই তাবাশঙ্কর বা বিভূতিভূষণের নায়কের মতো জীবনের পাঠ প্রথম গ্রহণ করছে না। চারদিকেব জীবনের সঙ্গে দ্বন্দ্বময়, অথবা সখ্যময়, এই দুই ছবিব কোনোটাব প্রতিই তাঁর কোনো লোভ নেই। সুতবাং তাঁর গদ্যে বেগ বা আবেগ দুযেব কোনোটাই স্পন্দিত হয়ে ওঠেনি। তিনি বেছেছেন সেইসব মানুষকে যারা জীবনের একটা প্যাটার্নের নিদর্শন (যশোদা), সেই প্যাটার্নকে যাবা অদৃষ্টেব মতো মেনে নিয়েছে, সুখ-দুঃখকে সেই জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছে (কুবেব), যাদের জীবনের সেই বিধাতা-কল্প অপবিবর্তনীয়তাব বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতাব বাসনা নেই, ক্ষীণ প্রয়াস প্রায় দুর্লক্ষ্য (শশী)। আবাব তিনি কখনো কখনো অন্ধ অদৃষ্টেব বিপরীত মেরুতে যে প্রতিযোগী শক্তি কল্পনা কবেছেন সেও পদ্মাব মতোই নিরাসক্ত এবং প্রায় অমানবিক (হোসেন মিয়া)। পাকাব মতো দামাল কিশোরের কল্পনায় মানিকবাবুব এই ধরনের ব্যক্তি কল্পনা একবার ব্যতিক্রমের পথ ধরেছিল বটে, কিন্তু অচিরেই মনের দিক থেকে পাকা বয়সকে ছাড়িয়ে যাওয়ায় গদ্য-রীতির নিজস্ব ছন্দের বদল আবশ্যিক হল না। স্বভাবতই যে সমস্ত মানুষের কথা তিনি বলেন তাদের প্রসঙ্গে ভাষার মন্থব নিবাবেগ ভঙ্গিই কার্যকবী।

মানিকবাবুর গদ্যরীতির দ্বিতীয় লক্ষণ হল এই যে এ-ভাষা একেবারেই ঘটনা-ভারবাহী বা সংবাদ-বাহন নয়। কেননা মানিকবাবু বাস্তব বলতে বাস্তবতার বিকারকে বোঝেন না। তিনি সব সময়েই বাস্তবেব অন্তঃসারগত মূর্তিটিকেই আবিষ্কার করতে চান। ফলে খুঁটিনাটি বর্ণনায় তাঁব সহজাত দক্ষতা তর্কাতীত

হলেও (পদ্মানদীর মাঝির জেলেদের জীবন বর্ণনা) এ-বর্ণনার কোনো তাৎপর্য তাঁর কাছে নেই। তিনি জানেন পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনার কোনো শেষ নেই—বাস্তবের শুদ্ধ সার, যা সৎ অসৎ, ভালো-মন্দ কিছুই নয়, তা এই বর্ণনার জঙ্গলে হারিয়ে যেতে পারে। মানিকবাবুর এই শক্তিই তাঁর গদ্যভঙ্গিতে একটা সংক্ষিপ্ত হবার ক্ষমতা এনে দিয়েছিল যা শেষের দিকে তাঁর শত্রুতা করেছে। এবং এখানেও তিনি তারাশঙ্কর ও বিভূতিভূষণের বিপরীত পথচারী। কেননা তারাশঙ্করের মতো তথ্যসন্ধ হবার প্রয়োজন তিনি অনুভব করেন না, বিভূতি-ভূষণের বিমুগ্ধতারও তিনি কেউ নন।

প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে জগদীশ গুপ্তের সঙ্গে কোনো ক্ষেত্রে তার আত্মীয়তা থাকলেও জগদীশ গুপ্ত নিজস্ব মেজাজকে গদ্যে প্রায়ই নষ্ট করতে চাইতেন, অনাত্মীয় কাব্যস্রোতের সাহায্যে। যে শুষ্কতা তাঁর সম্পদ তা এর ফলে মাঝে মাঝে হারিয়ে গেছে। শুষ্কতার পবিবর্তে সরসতা এ-ক্ষেত্রে কর্দম সৃষ্টি করেছে। দিবারাত্রির কাব্যে মানিকবাবুর ভাষার শুদ্ধতায় যে কবিত্বের প্রসাদ তা পল্লবগ্রাহী কবিত্ব নয়। সেও বিষয়ের অন্তর্নিহিত স্বরূপকে উন্মোচিত করার মাধ্যম। যে সরল ঋজুতার জন্য তিনি খ্যাতিমান তা তাঁব মধ্যবর্তী জীবনের সৃষ্টি। এখানে তিনি জগদীশ গুপ্তকে অবশ্যই অতিক্রম কবেছেন। বক্তব্যে কৃত্রিমতা থাকলে এ-ভাষাও কৃত্রিম হতে বাধ্য। তখন এর শক্তিচ্যুতি ঘটে। মানিকবাবুর হাতে তা কখনো ঘটেনি। মানিকবাবুর গদ্যের উত্তর-সাধকদের এ-কথা মনে রাখা দরকার।

অন্নদাশঙ্কর রায়

●● এক ●●

সত্যাসত্যের ভূমিকায় অন্নদাশঙ্কর জানিয়েছেন যে ইচ্ছা ছিল সত্যাসত্য এপিক হবে, তথা রূপক। সুধী এবং বাদল হবে সত্য এবং অসত্যের প্রতীক—এই ছিল লেখকের বাসনা। বাসনা ছিল—উজ্জয়িনী হবে সংকটারূঢ় মানবাত্মা। লেখক বলেছেন—‘আইডিয়াটাকে মগজ থেকে কাগজে নামিয়ে দেখা গেল বাদল সুধী উজ্জয়িনী আমার হুকুম মানে না। অবাধ্য সন্তানের মতো যা খুশি বলে, যা খুশি করে, যেখানে ইচ্ছা সেখানে চলে যায়। দেখতে দেখতে তাদের চরিত্র বদলে গেল, সম্বন্ধ বদলে গেল। মানসসরোবর থেকে নির্গত হয়ে সিন্ধু ও ব্রহ্মপুত্র দুই বিপরীত দিকে প্রবাহিত হল, গঙ্গা ধাবিত হল তৃতীয় দিকে—এই

তিন নদ-নদীর সঙ্গ নিল ও ছাড়ল বহু উপনদ উপনদী, শাখানদ শাখানদী। তাদের সবাইকে রূপকের অঙ্গীভূত করা যায় না, তারা এক একটা শক্তি নয়, ব্যক্তি। রূপক গেল, কিন্তু এপিক রইল।' যে সচেতন উদ্দেশ্য সত্যাসত্যের অব্যবহিত পূর্বপ্রেরণা, অচিরেই দেখা গেল সে সার্থক শিল্পের শাশ্বত ন্যায় অনুসরণ করে সেই সচেতন উদ্দেশ্যের সংকীর্ণ চতুঃসীমাকে লেখক অতিক্রম করে গেছেন। 'আমার হুকুম মানে না'—এ-কথাটা কতকটা সৌখিন উক্তি। কেননা ঔপন্যাসিকই হোন অথবা নাট্যকারই হোন, সৃজনী ক্ষমতা জীবন এবং শিল্পের দ্বৈত লীলায় সেতুবন্ধন প্রয়াসী, তাই সেতুরচনা নামত রচনা হলেও যেহেতু তা বন্ধন, বন্ধনের কঠিন নিয়ম শিল্পীকে পালন করতেই হয়। তথাপি রূপকের ছায়া সত্যাসত্যে শেষ পর্যন্ত উপস্থিত এবং তাতে তার মর্যাদার হানি হয়নি, শুধু রূপকের বেশ বদল করার জন্য সিদ্ধির তারতম্য এসেছে। সে কথাটাই এখানে আলোচ্য।

অন্নদাশঙ্কর রবীন্দ্রনাথ এবং প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের মুক্তদৃষ্টির প্রসাদলব্ধ হয়েও শুধু প্রসাদের মূল্যেই প্রসন্ন ছিলেন না। উপন্যাসে এক-ধরনের বিশ্ববীক্ষা বা সভ্যতা-সচেতনতাকে তিনি ব্যবহার করলেন, যার বিমুক্ত সংস্কৃতি-মনস্কতার ভিত্তিতে হয়তো প্রমথ চৌধুরী এবং তাঁর প্রকৃতিচেতনা ও সহজ মানবিকতার মূলে হয়তো রবীন্দ্রনাথ, কিন্তু জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে অপার আধুনিক আগ্রহের জন্য যা হয়ে উঠল বিশিষ্ট। "উজ্জয়িনী হবে সংকটারূঢ় মানবাত্মা"—শেষ পর্যন্ত উজ্জয়িনী নিজে তা হয়নি কিন্তু যুদ্ধোত্তর ইওরোপের মানবতার সংকটকে অন্নদাশঙ্কর উপন্যাসস্থ করেছিলেন। এই সভ্যতার সংকট সম্বন্ধে চেতনা এবং আগ্রহের গূঢ় অর্থে অন্নদাশঙ্করের আধুনিকতা এবং স্বাতন্ত্র্য উভয়ই গৌরবময়। স্মর্তব্য যে, বাংলা সাহিত্যে তখন শরৎচন্দ্রের জনতা-বিজয়ের কাল, তখনই কল্লোলের কলরবে সমুদ্রের গভীরতা না বাজলেও নানা জলতরঙ্গের বিদেশী সুর,—শ্রীকান্ত-অমিত এবং অচিন্ত্য-প্রেমেন্দ্রের পথিক-চিত্তসম্পন্ন নায়কেরা তখনকার অস্থিত-মূল মধ্যবিত্ত-মানসের প্রতিভূ—এই সাহিত্যিক পরিবেশে তখন অন্নদাশঙ্করের নায়ক-নায়িকাবৃন্দ একে একে আবির্ভূত হল। শরৎচন্দ্র তাঁর ধারেকাছে নেই, কল্লোলের পথিক-স্বভাব বেদনা-বিলাসের তিনি কেউ নন। তিনি বললেন—'এপিকের বিষয়বস্তু সত্যাসত্যের হিসাব-নিকাশ। পটভূমিকা কেবলমাত্র মানব সংসার নয়, নক্ষত্রনীহারিকার সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় পারম্পর্য, অণুপরমাণুর চিরন্তন অস্তিত্ব। নায়ক-নায়িকার তিনজনের তিন পন্থা। সুধী গ্রহণ করেছে ইন্‌টুইশনের

মার্গ, বাদল ইন্‌টেলেক্‌টের, উজ্জয়িনী আত্মনিবেদনের। তিনজনের আকাঙ্ক্ষা বিশুদ্ধ ও বিপুল, অধ্যবসায় একাগ্র ও একান্ত, নিষ্ঠা নিবিড় ও নিগূঢ়।' স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে এ-উপন্যাসে মানুষের আত্মচেতনার বহু সাক্ষ্য বিদ্যমান থাকার কথা। এবং সেই দ্বন্দ্বসংঘাতযুক্ত চেতনা-লোকের ভাষাও লেখককে গড়ে নিতে হবে। সত্যাসত্যের এপিক ধর্ম সম্বন্ধেও লেখক নিজেই একটি নিরিখ আমাদের দিয়েছেন—যথাকালে এই উপন্যাসের ভাষার বিচারও হবে সেই নিরিখের ব্যবহারে। নিরিখটি হল—'এপিকের লক্ষণ নায়ক-নায়িকার লক্ষ্যের উচ্চতা ও প্রয়াসের মহত্ত্ব।'

•• দুই ••

লক্ষ্যের উচ্চতা সম্বন্ধে পূর্বে সুনিশ্চিত হয়ে প্রয়াসেব মহত্ত্বের কথা বিবেচনা করা যাবে। বাদল এই উপন্যাসের নায়ক, অন্যতম নায়ক সুধী। বাদলের বক্তব্য হল : Free will এবং determinism-এর দ্বন্দ্বে Free will-এর জয় কল্পনাতীত নয়। বাদল ভারতীয়। কাজেই বাদলের পক্ষে Free will-এর প্রবক্তা হওয়া বলিষ্ঠ সত্যসন্ধিৎসাবই পরিচায়ক। সুধী বাঁদলকে বলেছিল—জীবনেব সঙ্গে ফ্লার্ট কোরো না। সম্ভবত এইটাই সুধীর জীবনের তাৎপর্য। উজ্জয়িনী জীবনের রস-পিপাসায় পরিপূর্ণ। 'কার জন্য বাঁচব?' 'কার কাছে আমার আদর?' আত্ম-নিবেদনের জন্য সে আকুল। এখন এই তিনটি চরিত্রের লক্ষ্যের তাৎপর্য কি? সম্ভবত অস্তিত্বের মূলীভূত রহস্যে অবহিত হওয়াই কুশীলবদের লক্ষ্য। জীবন শুধু বিরহ-মিলন কাহিনী নয়, নয় শুধু মনের অগমরহস্যেব সিংহদ্বার উন্মোচন। প্রকৃতপক্ষে আমাদের এ-কালের বেঁচে থাকায় উপলব্ধির শর্তটি প্রধান। সমাজ, সভ্যতা এবং ইতিহাসের জটিল রূপ সম্বন্ধে সচেতনতায় জীবনের তাৎপর্য অন্বে-ষণের প্রেরণা। ত্রিশের ইওরোপে সেই সচেতনতা জন্মলাভ করেছে যুদ্ধোত্তর ইওরোপের রক্তহারা ক্লান্তির পথে। এ দেশে জীবনের গার্হস্থ্য চেহারায় এই ক্লান্তির অস্ফুট প্রতিফলন। ভারতবর্ষে জীবনের চেহারায় ত্রিশের যুগেও মাত্র চাকুরিগত সংকটের ছায়া। কল্লোলের শ্রেষ্ঠ রচনা গোকুল নাগের পথিক। পথিকে আভি-জাত্যের প্রতি বিদ্রূপ, অথবা অসহযোগ আন্দোলনের কথা থাকলেও পথিক শেষ পর্যন্ত বিরহ-মিলন কথা। প্রেমেন্দ্র মিত্রের উপনায়নে দুঃখের বাঞ্ছিত রূপ সৃজনে সহানুভূতি নির্মাণের প্রয়াস—যদিও তা নিঃসন্দেহে শরৎচন্দ্রের (মেজদিদি গল্পে) কেষ্ট যেমনভাবে সহানুভূতি আকর্ষণ করেছে এবং শিল্প হিসাবে নিকৃষ্ট হয়েছে, সে পথে

পদার্পণ করেনি। জীবন সম্বন্ধে নতুন আশা-বোধ ত্রিশের যুগের কাল-লক্ষণ। কিন্তু সে-আশার স্পষ্ট কোনো অবয়ব আমাদের মনে গড়ে ওঠেনি। কাজেই আশাভঙ্গের বেদনাও আর্তির পর্যায় ছাড়িয়ে পৌরুষের যন্ত্রণায় গিয়ে উপনীত হল না। সীমিত জীবনবোধকে নিয়ে বড়ো উপন্যাস সম্ভব নয়। গোরা এবং চতুরঙ্গের পর, তাই আমাদের কল্লোল-কালীন উপন্যাস-সাহিত্য প্রধানত ক্লান্ত মধ্যবিত্ত জীবনের সর্ববিধ জড়, অলস, কর্মবিমুখতাকে রঙিন এবং ভাবময় করে তুলতে চেয়েছে। রবীন্দ্রনাথেব অমিত এবং শবৎচন্দ্রেব শ্রীকান্ত তার প্রমাণ। এই কারণে অন্নদাশঙ্কর তাঁর নায়কদেব ইওরোপের পটভূমিকায় স্থাপিত কবেছেন। ভেবেছেন, বাদল-স্থধী-ব লক্ষ্যের উচ্চতাকে এই স্বাদেশিক অষ্টাবক্র জীবনের আধাবে ধারণ করা অকল্পনীয়। স্বভাবতই ইওরোপে সভ্যতার অন্তর্দ্বন্দ্ব-জাত টানাপোড়েনে এই লক্ষ্যগত উচ্চতাব বাস্তব পরীক্ষা। উত্তুঙ্গ শৃঙ্গ ব্যতীত সমতলে যেমন শৈলবীরদেব পবীক্ষা অভাবনীয়, সেইভাবে বলা যায় ইওরোপেব জটিল গ্রন্থিল জীবন-সূত্রেব মাঝখানে না দাঁড়ালে গ্রন্থিমোচনের কাজ সমাপ্ত হবে না। স্থধী-বাদল সকলেরই উদ্দেশ্য জীবনকে বাইরেব শক্তি দ্বারা নির্দিষ্ট ছকের হাত থেকে মুক্ত করা—এক কথায় গ্রন্থিমোচন। বাদলের Free will এবং স্থধী-র নিবাসক্ত জীবন-প্রীতি দুইযেরই লক্ষ্যমুখ এই দিকে। উজ্জযিনীর ব্যক্তি-জীবনের গ্রন্থিমোচন-কল্পনাও এই প্রসঙ্গেই বিবেচ্য। আধুনিক অর্থে যে তীব্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে সত্যাসত্য উপন্যাসের প্রধান পাত্র-তিনজনের উদ্ভাসন, ভারতবর্ষের পক্ষে সে আলোকবশ্মির কথা স্পষ্টতই জনশ্রুতি। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এখানে সমাজ-সভ্যতাব বিবর্তনেব অমোঘ টানে উদ্ভূত নয়। কেতাবে পাওয়া ব্যাপাব মাত্র। নানা মতবাদের মতো এও হয়তো আমাদেব কাছে একটা 'বাদ'। উজ্জয়িনীর পিতাব মতোই অসম্পূর্ণ এবং অসহায় এখানকাব ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীর চেহারা। এখানে জীবন নিয়ে ওবকম পরীক্ষা-নিরীক্ষাব অবাধ স্বাধীনতা কল্পনা করা দুরূহ। বাদলের মতো আত্মগোপনের ব্যাপাবও এখানে সন্ন্যাসের ছকে বাঁধা। জীবনের মধ্যবর্তী হয়ে আশ্রমধর্মের অবহেলা কলকাতাতেও ত্রিশ সালে সম্ভব ছিল না। কাজেই ইওরোপ ছাড়া সত্যাসত্যের ঔপন্যাসিক কল্পনাব স্বভূমি লেখকের পক্ষে ছিল দুরধিগম্য। লক্ষ্যের উচ্চতার সঙ্গে এই পটভূমি জড়িত হয়েছে এইভাবে।

প্রয়াসের মহত্ত্ব এপিকের নায়কের অন্যতম চরিত্র-লক্ষণ। লক্ষ্যের উচ্চতা সত্যের সন্ধানে—প্রয়াসের মহত্ত্ব সন্ধানের তীব্রতায়। কিন্তু মুশ্‌কিল হল এই যে

রামচন্দ্র এবং সীতার জীবনে সত্যের প্রতিষ্ঠা ছিল অবিচল এবং দৃঢ়বদ্ধ। প্রশ্নটা আমাদের মহাকাব্যের নায়কের কাছে এই ছিল না যে সত্যটা কী? সত্য ছিল তখন জীবনাচরণের সঙ্গেই যুক্ত। তাঁদের সংগ্রাম ছিল প্রতিষ্ঠিত সত্যের মহিমাকে রক্ষার সংগ্রাম। সেই সংগ্রামের তীব্রতায় তাঁদের মহত্ত্ব। বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকে সত্য কী সে সম্বন্ধে আমরা সন্দিগ্ধ। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের দানে র‍্যাশনালিজম ধর্মকেও একদা প্রভাবিত করতে চেয়েছে বটে কিন্তু উনিশ শতকেব ইংলণ্ডের হ্যাঁ এবং না-এর দ্রুত কাটাকুটির ভিতরে Impertect Synthesis-এর মধ্যে সত্যের পূর্ণ চেহারা মেলেনি। যুদ্ধোত্তর ইওরোপেও সংকটের দীর্ঘকায় ছায়ারণ্যে সত্যের সন্ধানেই মানুষ ফিরেছে। সুতরাং প্রতিষ্ঠিত সত্যের মহিমা রক্ষার জন্য সংগ্রামে যে ইতিবাচকতা তার ফলস্বরূপে প্রাচীন মহাকাব্যে সরল বলিষ্ঠতা ছিল স্বাভাবিক। 'সত্য কী'—এই অন্বিষ্ট নিয়ে যে আধুনিক সন্ধানী যাত্রা সেখানে নায়কের জীবনরেখা জটিল বঙ্কিম হতে বাধ্য। টমাস মানের ম্যাজিক মাউণ্টেন তার প্রমাণ।

ম্যাজিক মাউণ্টেনেব জন্য নির্ধারিত ঘটনাস্থল ইওরোপের সংস্কৃতির সংকটের রূপক রচনার উপযুক্ত ক্ষেত্র ছিল। নায়ক হান্স কাস্টর্প-এর বিশুদ্ধ জীবন-জিজ্ঞাসাকে এই রুগ্নাবাসের পটভূমিকায় স্থাপিত করেছেন লেখক। Research অথবা The Snow, প্রাকৃতিকতা অথবা জীবের প্রাণরহস্য, Settembrini-র বিতর্ক, Walpurgis Night-এর বিচিত্র ছদ্মবেশের অন্তরালবর্তী প্রাণোল্লাস—সমস্ত কিছুই হান্স কাস্টর্প-এর কাছে জীবনের পটকে বিস্তৃততর করে তুলেছে। এগুলি যেন নায়কের কাছে বিশাল জীবনের নানা অনুন্মোচিত অধ্যায়কে আলোকিত করেছে। যখন নায়কের জীবনান্বেষার সঙ্গে—যক্ষ্মাবাসের সার্বজনীন প্রচ্ছন্ন মৃত্যুচিন্তার এবং অধ্যায়ে অধ্যায়ে বিকশিত ইওরোপের দীর্ঘদিনের সংস্কৃতি, তার বিজ্ঞান, তার মানবতাকে সম্পৃক্ত হতে দেখি, তখনই 'সত্য কী' এই বোধের অপেক্ষা জীবনসন্ধানী অপরাজেয়তা অধিকতর সত্য বলে প্রতিভাত হয়। সত্যাসত্য উপন্যাসের নায়ক বাদল জীবন অথবা জীবনসত্যকে খুঁজেছে এই জাতীয় পদ্ধতিতে এ-কথা উভয় উপন্যাসের যে-কোনো তুলনাই অবান্তর জেনেও, বলা চলে। ম্যাজিক মাউণ্টেনের লেখক বুঝেছিলেন যে যুদ্ধপূর্ব ইওরোপও রোগজীর্ণ। যুদ্ধ এল আর ঘনিয়ে এল সংকট তা নয়। নানা খাত ধরে সংকটের স্রোত এসেছে বলেই যুদ্ধ। জোয়াকিম যেমন নিজের সমস্ত রুগ্ন শারীরিকতাকে অতিক্রম করতে চেয়েছে সাহসী সৈনিকের মতো, হান্স

কাস্টর্প-এর শেষতম পরিণতিতেও হয়তো তারই ছায়া দুর্লক্ষ্য নয়। আমাদের নায়ক বাদল দেখেছিল যুদ্ধদীর্ণ ইওরোপকে। বাদলের জগৎ যুদ্ধোত্তর বিশ্বজনীন শূন্যতার রূপক, ইংলণ্ডের দ্বীপভূমি তার উপযুক্ত অনুকূল ক্ষেত্র। সেও এখানে সন্ধান করেছে জীবনসত্যের।

বাদলের অভিজ্ঞতার মাধুকরীতে আশ্চর্য শক্তি দেখিয়েছেন অন্নদাশঙ্কর। এই গ্রন্থখানি যে পথে-প্রবাসের বিদেশবিবরণের সঙ্গে কাহিনী ও চরিত্র-সংযোগ মাত্র হয়ে ওঠেনি তা অন্নদাশঙ্করের প্রখর বক্তব্য-সচেতনতার জন্য। এবং তা প্রকাশ পেয়েছে বিভিন্ন চরিত্রে। মিঃ ওয়েলি দাবারু—মাঝে মাঝে বাদলকে তিনি আহ্বান করেন খেলার জন্য। হাসি তাঁর মুখে বাদল দেখেনি, মুখের মাংসপেশীতে তাঁর নেই কোনো ভাবতরঙ্গ। এই বিশুদ্ধ র‍্যাশনালিস্টকে দেখে পাঠক নিঃসন্দেহে আকৃষ্ট হবেন। কিন্তু আস্তে আস্তে তাঁর ঔদাসীন্যের ব্যাখ্যায় আমরা ইওরোপের গত দুশো বছরের ছায়ার বদলে যেন দেখতে পাব শূন্য ভবিষ্যতের ছায়া। 'ওয়েলি কোনো জিনিসকে ভালো বলেন না মন্দ বলেন না। কারো ভালো বা মন্দ চান না। তাঁব জিজীবিষা নেই। তিনি বেঁচে আছেন, কারণ বাঁচা ছাড়া অন্য কিছু করতে পারেন না, করবার ইচ্ছে যে নেই। আত্মহত্যা করলে যে অস্তিত্ব থাকবে না অথবা আবাব বাঁচতে হবে না, এর প্রমাণ কই?' আশ্চর্য এই যে ইতিহাসেব শঙ্কিল গিরিপথে এই সমস্ত উক্তি যে প্রতিধ্বনি সৃষ্টি কবে তা শুধু দার্শনিকতার জনক নয়, রিক্ত বর্তমান ও হতাশ্বাস ভবিষ্যতের যে বোধ তৎকালীন ইওরোপীয় বুদ্ধিজীবী মহলে ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল তার ইঙ্গিতবহও বটে। বাদলেব কাছে ওয়েলির বক্তৃতাটি তাৎপর্যপূর্ণ: 'ইচ্ছা কাকে বলব সেন? কার ইচ্ছা? ঐ সমস্ত cell-এর ইচ্ছা? Cell-সমষ্টির ইচ্ছা? ইচ্ছার লক্ষ্যটা কী? আরো কিছু কাল জীবনধারণ? দু-দিন কমবেশিতে কি আসে যায়? জীবন যদি যায়ও তবে এমন কি আসে যায়? Cell-গুলো বাঁচতে পারে না, শুকিয়ে গুঁড়িয়ে যাবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত atom-গুলো তো থাকবে? Personal immortality-র কথা ওঠে না, যেহেতু person বলে কিছু নেই। আর atomic immortality তো স্বতঃসিদ্ধ।'

মানবজাতি থাক বা না থাক তাতে ওয়েলির ভ্রূক্ষেপ নেই। Nothing matters in the last analysis। অন্নদাশঙ্কর গভীর অন্তর্দৃষ্টিতে উপন্যাসের সমকালীন বুদ্ধির সংকটকে অনুভব করেছেন এবং ওয়েলি-চরিত্রের সাহায্যে তার রূপ নির্মাণও করেছেন। কিন্তু বাদলের কাছে ওয়েলি শুধুই ইংলণ্ডীয় বৈচিত্র্য-

মালার নানা ফুলের একটি ফুল, নাকি বাদলের কাছে এর কোনো মূল্য ছিল? পরবর্তী অধ্যায়ের বাদলকে দেখে মনে হয় ওয়েলি তার মধ্যে পলায়নের প্রবৃত্তি ছাড়া কোনো বৃহৎ প্রশ্ন সঞ্চার করতে পারেনি। হান্স কার্স্টর্প-এর What is Life আর বাদলের মুক্ত জীবনাকাঙ্ক্ষায় যে মূলগত তফাত তারই ফলস্বরূপে এই প্রশ্নের অবিদ্যমানতা। বাদলের মুক্ত জীবনাকাঙ্ক্ষা প্রকৃতপক্ষে একটা কিছু প্রমাণ করতে চাওয়া। প্রমাণের প্রয়োজনে তার যা কিছু। উজ্জয়িনীকে পরিহার এবং পান্থজীবনের গতিবেগ সবই প্রমাণের প্রয়োজনে। জীবনের কোনো সংকট থেকে, জীবনবোধের অমোঘ আকর্ষণে এগুলো ঘটেনি। তাই কারো আসা-যাওয়াই তাকে কোথাও পৌঁছে দেওয়ার জন্য ব্যয়িত হচ্ছে না। ম্যাজিক মাউণ্টেনে Research অধ্যায়ে প্রাণতত্ত্বের গবেষণার শেষে হান্স যেমন জীবনকে ভালবাসার রূপকে ভেবেছিল, বাদলের জন্য সে জাতীয় তাৎপর্যপূর্ণ কোনো পরিস্থিতি সৃজিত হল না। বাদল যেন ইংলণ্ড আবিষ্কারে বেরিয়েছে। অথচ বাদলকে দিয়ে লেখকের করণীয় ছিল অনেক। প্রতি মুহূর্তের বেঁচে থাকা মানেই প্রতি নিমেষের 'হওয়া'। সেই হওয়ার যে পদ্ধতি তা কি শুধু দু-একজনের সঙ্গে দু-একবারের ইষ্টগোষ্ঠীতেই রূপায়িত করা সম্ভব? ধরা যাক মিঃ মারউডের কথা। দু-বগলে ক্রাচ, খবরের কাগজ নির্ভর এই ব্যক্তিটি আরেকবার লেখকের অন্তর্দৃষ্টির দূরস্পর্শী শক্তির সাক্ষ্য দেয়। সমুদ্রতীর থেকে দূরে একটি ছোটো মার্কেট টাউনে এর সাক্ষাৎ পেয়েছিল বাদল। এর আগে বাদল পেরিয়ে এসেছে মেরিয়ন এবং অশ্বারোহণ-পর্ব। তখন অদম্য উৎসাহে ঘোড়ায় চড়তে যাওয়ার মধ্যে বাদলের স্বাধীন ইচ্ছার প্রয়াসকে আমরা দেখেছি। মারউড ওয়েলির মতোই ইতিহাসের সৃষ্টি। প্রথম মহাযুদ্ধের স্মৃতি। মারউডের বিখ্যাত উক্তি, 'আমার ভবিষ্যৎ নেই, আছে অতীত' অথবা 'বহু সংস্কারকের ঘা খেয়ে খেয়ে পৃথিবী বুড়ি ঘাগী হয়ে গেছে—একে ভেঙে গড়বার কল্পনা বৃথা'—তখন আমাদের তৎকালীন ইওরোপকে চিনতে দেরি হয় না। হৃত-বিশ্বাস মারউড এবং প্রায় শূন্য-বিশ্বাস ওয়েলি নিশ্চয় লেখকের পশ্চিম ইওরোপের বিপর্যস্ত সামাজিক অবস্থা উপলব্ধির প্রমাণ। এদের দুজনের কথায় এবং আচরণে যেন তৎকালীন অবক্ষয়ের মাঝে ধ্বনিত এলিয়ট এবং অডেনের স্বর শুনতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই অকৃত্রিম স্বরের পরেই যখন বাদল বলে (মারউডের প্রশ্ন ছিল, ভারতবর্ষের লিবারেলদের সঙ্গে এদেশের লিবারেল পত্রিকার কী সম্পর্ক)—'আঃ মিস্টার মারউড সারা ইংলণ্ডকে আমি বারবার এ-কথা

বলে ক্লান্ত হয়ে গেলাম যে আমি জন্মত ভারতীয় হলেও স্বেচ্ছায় ইংরাজ। জন্মের উপর হাত নেই, Free will খাটে না। তা বলে কি জন্মের পরও determinism মেনে নিতে হবে?' তখন আমাদের বাদলকে চিনতে কষ্ট হয়। জন্মের পর determinism-কে যে চ্যালেঞ্জ করবে ভারতবর্ষই তার উপযুক্ত ক্ষেত্র হওয়া উচিত। ইওরোপ নানাভাবে নানা দ্বন্দ্বময় জীবন-ধারণার মধ্যে দিয়ে তার ইতিহাসকে গড়ে তুলেছে। যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে সে সময়েও ইওরোপের জীবন-ভাবনায় ত্রিমুখী চাপ। যুদ্ধের ফলে তৃতীয় চাপটা প্রবল। সেটা সোস্যালিজম বা তাকে এড়াতে চেয়ে ফ্যাশিজম। একদিকে ছিল প্রেম ও বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের খ্রীষ্টীয় ধর্মবাহী ঐতিহ্য, অন্যদিকে পাশাপাশি ছিল ব্যক্তিস্বাধীনতার ওপর প্রাধান্য-আরোপী Enligh-tenment ও Liberalism-এব দর্শন, এর সঙ্গে শক্তিমান হয়ে উঠল যুদ্ধোত্তর সমাজতন্ত্রের বৈজ্ঞানিক ভূমিকা। এখানে যখন chief desiderata of the age ছিল good life, সামাজিক সাম্য-সুবিচার প্রভৃতি, অথচ এ-সম্বন্ধে, মানুষের জীবনাচরণের যথার্থ বিন্যস্ত রূপ সম্বন্ধে কোনো মীমাংসিত সিদ্ধান্তে উপনীত হবার সম্ভাবনা ছিল দূরপরাহত, যখন মূল্যায়নের সংকট শুরু হয়েছে এবং সংকটের মূল্যায়নও, তখন বাদলের ভারতীয় determinism-এর বিরুদ্ধে সংগ্রামের যদিবা কোনো তাৎপয মেলে, ইংলণ্ডীয় হবার জন্য Free will-এর সাধনা হয় হাস্যকর। তার শেষ অধ্যায়ও এ-থেকে বিচ্যুত হতে পারেনি। বাদলের 'আমাদের' কথাটির মধ্যে যে বিশ্বগ্রাহী সারল্য, একমাত্র তাকে আমরা যুবক-বলিষ্ঠতার পরিচয়-চিহ্ন বলেই গ্রহণ করে সন্তুষ্ট।

মিস্টার পিউ ভারত-ফেরত ইংরাজ। বাদলের সঙ্গে মারউডের সাক্ষাৎকার যখন ঘনিষ্ঠতার পর্যায়ে তখনই মিস্টার পিউর সঙ্গে বাদলের সংঘাত। ইনি ভারত-বিদ্বেষী। বাদলকে, কুলির দেশের মানুষ বলেই বোধ হয়, তিনি কুকুর লেলিয়ে দিয়েছিলেন। মিস্ এফিংহ্যামের বাড়ির পার্টিতেও মিস্টার পিউ এবং বাদলের সংঘাত হল। অপমানিত বাদলের পক্ষে মিস এফিংহাম আতিথেয়তার ব্রিটিশ-পরাকাষ্ঠায় অবশ্যই রইলেন। কিন্তু বাদল আইনের আশ্রয় নিতে গিয়ে দেখল যে তার সমর্থকেরা অন্তর্হিত। এ-ব্যাপারে বাদলের ক্ষোভ ভারতীয় হিসাবে নয়, মানুষ হিসাবেই। কিন্তু ত্রিশের ভারতীয় যুবক একেবারে বর্ণাধিকার চেতনাবিহীন এই কথা কল্পনা করা দুষ্কর বলেই এর প্রস্তুতি আমাদের সম্মুখে ঘটা সমীচীন ছিল। সে-কারণেই আমাদের কাছে বাদলের পুরো চেহারাটা

কখনই স্পষ্ট হল না। জীবনবোধ ব্যাপারটা জীবন বৃক্ষের ফল। 'স্বপ্ন বাস্তব স্মৃতি' অধ্যায়ে সুধী-র অতীত স্মৃতি বিবরণে আমরা বাদলের অতীত পরিচয় পেয়েছি। মাঝে মাঝে আরো নানা প্রসঙ্গে বাদলকে অতীত বিন্যস্ত দেখেছি, কিন্তু তার চাওয়ার মূলীভূত শক্তির উৎসটা কোথায় বোঝা গেল না। অথচ যখনই সাধারণ ইংলণ্ডীয় চরিত্রের সঙ্গে বাদলের সাক্ষাৎ হয়েছে সে অভিভূত হয়েছে তাদের প্রাণবত্তায়। কলিন্স এমনই এক সাধারণ চরিত্র। মেরিয়নের আগে কলিন্সের সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছিল। কলিন্স বইয়ের দোকানদার। এবং একজন খাঁটি কর্মিষ্ঠ ইংরাজ তনয়ের মতো সে বইয়ের দোকানী হয়েই খুশি নয়, হতে চায় প্রকাশক, নিউ ইয়র্কে থাকবে তার শাখা আপিস। কলিন্স মেরিয়নকে দিয়ে বাদল জীবনের সহজ রূপসাধনাকেও বুঝল না, দেখল শুধু।

তাই বাদল যেখানে গিয়ে পৌঁছল সর্ববিধ অহমিকামুক্ত সেই উপসংহার, সেখানে সত্যের সাক্ষাৎ মিলল না। দেশলাই-বিক্রেতার জীবনে একটা করুণ ব্যঞ্জনা-গৌরব আছে হয়তো, কিন্তু সত্য গৌরব কোথায়? শ্রেণী পরিচয়ে মানুষের পরিচয় না থাকতে পারে কিন্তু বিমুক্ত মানুষের Free-will-এর যে পরিচয় বাদল খুঁজছিল দেশলাই-বিক্রেতার জীবনে কি তার ইঙ্গিত লভ্য? আসলে বাদলের চরিত্র পরিকল্পনায় এবং তাকে উপন্যাসে উপস্থাপনায় অন্নদা-শঙ্করের একটি মূলগত ত্রুটি ঘটেছে। বাদলের বীর্যবান সারল্য প্রশ্ন-চিহ্নের পক্ষে উপযুক্ত নয়, এটা প্রথম ত্রুটি। দ্বিতীয় ত্রুটি যতগুলি তাৎপর্যপূর্ণ চরিত্রের সঙ্গে বাদলের সম্পর্ক ঘটেছে তারা সকলেই উপসংহারে উপনীত চরিত্র। ওয়েলি মারউড তার উজ্জ্বল উদাহরণ। অন্যদিক থেকে পিউ ব্যতিক্রম নয়। ফলে এদের উপসংহার থেকে বাদল কোনো উপক্রমণিকার সন্ধান পেল না। ওয়েলির কাছ থেকে সমুদ্রতীরে গমন এবং উদ্দাম জীবনের প্রয়াস যতটা ওয়েলির কাছ থেকে পলায়ন ততটা ওয়েলির প্রতিক্রিয়া নয়। শুধু একটা বিপরীত ছক সৃজন। আবার ওখান থেকে মারউডের অভিজ্ঞতায় যাওয়াও কোনো জিজ্ঞাসার বিস্তৃতি-সাধন নয়। ফলে কমিউনিস্ট বাদল, মিস্টিক বাদল, নানা বাদলের দেখা পেলাম বটে কিন্তু তার অন্তিম পরিণতিকে কোনো সত্য জিজ্ঞাসার অপরিহার্য ফল বলে মেনে নেওয়া গেল না। বড়ো বড়ো রাশি বসানো হল। যোগফলে এত বড়ো শূন্য সেই রাশিগুলিকে মিথ্যা করে দিলে বলে বাদলের যাত্রা দুর্বল হয়ে গেল।

•• তিন ••

সেদিক থেকে উজ্জয়িনী এবং সুধী এ-উপন্যাসের বলিষ্ঠ নির্ভর। উজ্জয়িনী আমাদের কাছে আদি অন্ত সমেত পুর্ণ এক নারী হিসাবেই প্রতিভাত। উজ্জয়িনীর পিতা, উজ্জয়িনীর শ্বশুর, যোগানন্দ এবং মহিমচন্দ্র, উজ্জয়িনীর সখিবৃন্দ, স্বদেশে-বিদেশে তার অভিজ্ঞতা সব মিলিয়ে সে শুধু সংকটারূঢ় মানবাত্মা নয়, সম্ভবত আধুনিক ভারতবর্ষও। উজ্জয়িনীর পিতা এবং উজ্জয়িনীর শ্বশুর আধুনিক ভারতবর্ষের দুই রূপ। এখান থেকে উজ্জয়িনীর শুরু। কাজেই এই উভয়ের সামান্য পরিচয় গ্রহণ করা প্রয়োজন। উজ্জয়িনীর পিতা নব্য ভারতবর্ষের একদিক। সেদিকে তার সংস্কারমুক্ত মানসিকতায় পাশ্চাত্ত্য ভাবাকাশের উজ্জ্বল আলোকরশ্মির প্রতিফলন। উজ্জয়িনীর শ্বশুর ভারতবর্ষের বিকৃতির চিহ্নধর। শ্বশুরবাড়িতে উজ্জয়িনীর কোনো পরীক্ষার আয়োজন লেখক করেননি। ব্রিটিশ উপনিবেশের চাকুরিঅন্ত আভিজাত্যের রায়বাহাদুরীর প্রতীক উজ্জয়িনীর শ্বশুর। মিসেস স্যামুয়েলসের অবতারণা করিয়ে লেখক এই ভদ্রলোকের হ্যাংলামিকে চুড়ান্ত কশাঘাত করেছেন। বিদ্রূপ যে অন্নদাশঙ্করের স্বক্ষেত্র নয় উজ্জয়িনীব শ্বশুরের কাঙালপনাকে কুকুরের হ্যাংলামির সঙ্গে তুলনা করে তা তিনি প্রমাণ করেছেন। এ-আঘাতে আমাদের লৌকিক ক্ষোভের নিবসন ঘটে বটে, কিন্তু বিদ্রূপেব আতিশয্য বোধহয় এই গভীর যন্ত্রণা-মথিত উপন্যাসে সুসঙ্গতি লাভেব উপযুক্ত বিযয নয়। সে যাই হোক এখানে উজ্জয়িনী-কে আকর্ষণ করত—সম্ভত এই বাড়িরই পিঙ্গল প্রাণহীনতার প্রতিক্রিয়ায়—পাশের বাড়ির ছোট সাধারণ শ্রমক্লান্ত পবিবাবের দাম্পত্য জীবন। যে আত্ম-নিবেদনের থালা পুর্ণ করার সাধনা উজ্জয়িনীর—এই ছোট পরিবারের রূপকে হয়তো তারই কিছু আভাস সে পেয়েছিল। ওদিকে ছিল তার পিতার প্রভাব। যে পিতা সম্বন্ধে ইংলণ্ডে একদা সূচীমুখ জিজ্ঞাসার যন্ত্রণায় জ্বলতে জ্বলতে সে ভেবেছিল: 'অন্তর উদ্বেল হল। তাব সেই স্নেহের বাবাটি নেই। বেচারা বাবা। কেউ তার মর্যাদা বোঝেনি, না ঘরের লোক, না বাইরের লোক কেউ তাকে চিনত না, তিনি ছিলেন মনের গহনে একাকী। সেই উপেক্ষিত বাবা, পরাজিত বাবা, নিরহংকার ও নিঃসঙ্গ বাবা আজ নেই।' নিঃসঙ্গ একাকিত্বের সাধক উজ্জয়িনীর পিতাকে আমরা মাত্র উজ্জয়িনীর চোখ দিয়েই দেখেছি। চরিত্র হিসাবে সেই বিড়ম্বিত স্বতন্ত্রতার সাধক মানুষটি আমাদের কাছে তত স্পষ্ট নয়। বাবা এবং শ্বশুর দুজনেই শুধু উজ্জয়িনীর ভূমিকা। যে নব ভারতবর্ষ উজ্জয়িনীকে

রূপ দিতে চেয়েছে তার দুই দিক এঁদের দুজনের মধ্যে।

উজ্জয়িনীর প্রশ্ন কাকে দেব আমার জীবনের নৈবেদ্য? 'আমি যদি পাখি হতুম, উজ্জয়িনী ভাবে, আমার কোনো প্রশ্ন থাকত না। আমি অসংশয়ে বাঁচতুম ও তেমনি সহজে মরতুম। আমার আসা-যাওয়ার চিহ্ন রইত না। আমি যদি গাছ হতুম তবে তো আমি ভাবতুমই না কোনো কথা। আমি অকারণে বাঁচতুম ও কখন এক সময় চুপ করে মরে যেতুম। কেউ মনে রাখত না যে এখানে একটা গাছ ছিল। আমি যদি পতঙ্গ হতুম তবে হয়তো জানতুমই না যে বেঁচে আছি কি মরে গেছি। আফসোসের বিষয় আমি মানুষ। তাই প্রশ্ন ওঠে বেঁচে কি হবে? কার জন্যে বাঁচব? কার কাছে আমার আদর?'

উজ্জয়িনীকে অনেক কিছুর সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া যায়। মিলিয়ে নেওয়া যায় ভারতীয় রসসাধনার ধারার সঙ্গে। মিলিয়ে নেওয়া যায় প্রেমধর্মের নায়িকা রূপে, সত্যাসত্যের পরে অন্নদাশঙ্করের প্রেমের উপন্যাসের নায়িকাদের মুখপাত হিসাবে। দেখা যায় তাকে সংকটারূঢ় মানবাত্মার রূপকে, চেনা যায় তাকে চিরকালের রাধাভাবের আখরে চিহ্নিত বলে। এগুলিই উজ্জয়িনীর শক্তির নিদর্শন। আসলে উজ্জয়িনী জীবনের ভাস্বর নিদর্শন, অন্নদাশঙ্করের জীবনার্থ। উজ্জয়িনী কেন দে-সরকারকে গ্রহণ করেছিল মাত্র এই অভিযোগে উজ্জয়িনী চরিত্রের ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। কিংবা রূপক সাহিত্যের সনাতন রীতি অনুমোদন করলে এমন উপসংহার কল্পিত হত না—ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের এই মন্তব্যেও উজ্জয়িনীর স্বরূপ নির্ণয় হবে না। শূন্যেরে করিব পূর্ণ এই ব্রত বহিব সদাই—এমন ধরনের একটা লাবণ্য-স্থলভ জীবনার্থ-বোধ উজ্জয়িনীর ছিল এমনও নয়। উজ্জয়িনীর সমস্ত জীবন এবং মনন বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে সে যা খুঁজেছিল তা হল কিসে তার সার্থকতা। উজ্জয়িনী গোটা জীবনের রূপক বলেই রূপকের ক্লাসিক বন্ধনগুলি তার প্রসঙ্গে শিথিল। সে বারবার বলেছে আমার মূল্য কোথায়। উজ্জয়িনী বীণাকে দেখে যা বুঝেছে সেইটাই প্রকৃতপক্ষে তার প্রধান উপলব্ধি। সেইটাই বস্তুত তার স্থায়ীভাব। তার পরের যা কিছু সমস্তই অকৃতার্থতার অস্থিরতা থেকে। বাদলের জন্য রয়েছে তার আকুলতা অথচ বাদলের জন্য যদি তার 'মানব জমিন রইল পতিত' হয় তাহলে সেই চরম অচরিতার্থতায় সান্ত্বনা কী? তার রাধাকৃষ্ণ, তার মক্ষিরানীবৃত্তি, তার সকল কিছুর মধ্যেই এই অস্থিরতা। এই লক্ষণ নিঃসন্দেহে এক যুগের 'সংকটারূঢ়

মানবাত্মারই' লক্ষণ। যে যুগে মানুষ সার্থকতার পথ সন্ধান করে ফিরেছে—পথ কোথায় হয়তো কেউ কেউ তাদের মতো করে সে-কথা জেনেও ছিল কিন্তু অন্ত সকলের জটিল পথের অরণ্যে তাদের পথের মুখ গিয়েছিল হারিয়ে। চুড়ান্ত হতাশার মাঝখানে উজ্জয়িনী যখন বলছে 'কেন বাঁচব' তখন তার সঙ্গে দেখা হয়েছে ললিতার। স্বামীপুত্রের সম্পদে একদা-ধন্যা কিন্তু বর্তমানে সর্বরিক্ত এই নারীর প্রথম প্রবেশ শোকের শান্ত পদক্ষেপে, অচিরেই কথা বলতে বলতে ললিতা জীবন্ত হয়ে উঠে উপস্থাপিত করলে তার মোক্ষম প্রশ্ন 'কেন বাঁচব না?' 'তুমি জীবনের স্বাদ পেয়েছ, যদিও সাধ মেটেনি তোমার। তোমার পক্ষে বলা সাজে, জীবন নিয়ে কী করব? কিন্তু জীবনের সিংহদ্বারে প্রবেশ করবার সময় যার চোখের ওপর দ্বার বন্ধ হয়ে গেল, প্রাণের পেয়ালাখানি তুলে ধরে পান করবার সময় যার মুখ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হল, তার পক্ষে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করছি আমি, কেন বাঁচবে না?' এই প্রসঙ্গে উজ্জয়িনীর আবেগদীপ্ত সিদ্ধান্ত-বাচন—ঠিক। কেন বাঁচব না। কেন বুঝে নেব না আমার অধিকার, বুঝে নেব না কেন? অবশ্যই কথার আবেগে কথা। কিন্তু তার পরবর্তী জীবন কিছুটা এই বিশ্বাসেব বোধে চালিত। সুধা-র কাছে প্রত্যাহত হয়ে দে-সরকারে আত্ম-সমর্পণও এই বোধের ফল। দে-সরকারের পরিবর্তনের মধ্যে উজ্জয়িনীর সার্থকতার সন্ধান মেলে। সেই দে-সরকার, যে সব সময়েই একটা না একটা অ্যাফেয়ারের নায়ক সে ধীরে ধীরে সৌখিন প্রেমিকের বেশ পরিহার করে প্রেমের শুদ্ধ উপকূলে পৌছে গেল। এই উপনায়নের মূলে উজ্জয়িনীর প্রতি তার প্রেমের অনুভূতি। দে-সরকার সকল দিক থেকে জীবন্ত চরিত্র। সুধা-র সঙ্গে উজ্জয়িনী সংক্রান্ত কথোপকথনের কালে সুধীকে তার প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বী ভেবে, পরাজয়কে নিশ্চিন্ত জ্ঞান করে সে যখন কথা বলছিল তখনই দে-সরকারের সমস্ত প্রবঞ্চিত জাবনের রূপ আমাদের কাছে ধরা দিয়েছে। দে-সরকার-রূপী ধূলিমুঠিকে উজ্জয়িনা যখন নিজেব অজ্ঞানে সোনামুঠিতে রূপান্তরিত করে ফেলল তখন উজ্জয়িনীর সর্বরিক্ততাও কাঙাল হয়ে অপেক্ষমান। এই অবস্থায় দে-সরকারকে উজ্জয়িনী গ্রহণ করেছে। এই গ্রহণের ভিতরে অভিজ্ঞতা-দীর্ঘ জাবনের যন্ত্রণার ছায়া পড়েছে, জাবনের অনেক সম্ভাবনার ইঙ্গিত দুলে উঠেছে। এই দুই আলোকে উজ্জয়িনী পেয়েছে জীবনের স্পন্দন। এই উপন্যাসের একটা ব্যাপার লক্ষ্য না করে পারা যায় না। অনেক বিষয়ে দেখা যায় যে একের পরিণতি বা পরিস্থিতি দিয়ে অপরকে লেখক স্ফুটতর করছেন। উজ্জয়িনীর

উপসংহার এবং বাদলের উপসংহার যখন এইভাবে আমরা একত্র যুক্ত করে দেখি তখনই জীবনের অপচয় এবং সম্ভাবনার ব্যাপারটা আমাদের কাছে করুণোজ্জ্বল সমগ্রতা লাভ করে।

জীবনকে উজ্জয়িনী কোনো পূর্ব-নির্ধারিত দৃষ্টিকোণের সাহায্যে দেখেনি। সুধীও দেখেনি। তথাপি এই দুজনের মধ্যে সাদৃশ্য দুর্লভ। সুধী-র মার্সেলকে ভালবাসা আর উজ্জয়িনীর সোনিয়াকে আদর করার মধ্যে তফাত অনেক। একটা জীবন সম্বন্ধে স্নিগ্ধ প্রসন্ন মনোভাব থেকে উৎসারিত। আরেকটা অতৃপ্তি সঞ্জাত। সুধী মানুষের দিকে তাকায়, প্রকৃতির দিকে তাকায়, আত্মার পূর্ণতার আনন্দের মনোভাব নিয়ে। সে স্থিতধী এবং স্থিত-প্রজ্ঞ। সে প্রকাশ্যভাবে ভারতবর্ষের কথা না বলেও ভারত আত্মার যথার্থ প্রতিভূ। সেদিক থেকে সকলের প্রিয় কিন্তু আপন অন্তরে একাকী, অথচ অপূর্ণতার কোনো গ্লানি যাকে স্পর্শ করেনি সেই সুধী যেন সত্যের প্রতীক। অন্নদাশঙ্করের রূপকাভিপ্রায় সুধীতে শিল্পসম্মত হয়েছে। এ-কথা বলার হেতু এই যে বাদলকে অসত্যের প্রতীক বলা দুষ্কর। তার সত্য-জিজ্ঞাসা কোনো ক্ষেত্রেই অসত্য নয়। উজ্জয়িনীর বাদলের জন্য যে আকুলতা তাকেও সংকটের প্রতীক বলা যাবে না। লেখক সে কারণেই বলেছেন যে শিল্প নিজ নিয়মে সেই রূপকাভিপ্রায় খণ্ডিত করেছে। জীবন এবং শিল্পের নিয়ম মেনেও যেখানে এই রূপকাভিপ্রায়কে খণ্ডিত করা প্রয়োজন হয়নি সে হল সুধী। লেখকের জীবনবোধ-সঞ্জাত যে বক্তব্য সেটা চরিত্র-পাত্রের বাইরে কোথাও নেই। বক্তব্য ও চরিত্রের পরস্পর ক্রিয়ার রূপার্থ সমন্বিত আধার-আধেয়ের রূপকে এ-ক্ষেত্রে লেখকের শিল্পোদ্দেশ্য সাধিত হয়। লেখকের গদ্য শৈলী নির্মাণে, ঘটনা সংস্থানে, চরিত্র উপস্থাপনার সর্বত্রই সেই পরস্পর সম্পর্কের অমোঘ প্রভাব। অন্নদাশঙ্করের সত্যাসত্যের শিল্পকর্মেও সেই প্রভাবের প্রসাদ মেলে।

তথাপি যদি ধরা যায় যে উজ্জয়িনী এবং সুধী-র মধ্যে তুলনায় সুধী রূপককে অধিকতর আভাসিত করেছে, তাহলেই শিল্পগত যাথার্থ্যের দিক থেকে সুধী-র একক জয়লাভ সূচিত হয় না।

আগেই বলা হয়েছে যে অন্নদাশঙ্করের মহাকাব্যকল্প উপন্যাস-চিন্তায় প্রধান ত্রুটি ঘটেছে নায়ক চরিত্রের ক্ষেত্রে। নায়কের জীবনের দ্বন্দ্বের ব্যাপারটা বুদ্ধির স্তরে সীমিত থাকায় আমাদের আপত্তি নেই। যদি সেটা চিন্তার সংকটের আকারে নায়কের জীবনকে নানাদিক থেকে ছায়াচ্ছন্ন করত তাহলে

নায়কের মাধ্যমে বা নায়কের চরিত্রের পরিভাষায় বলা লেখকের জীবনবোধ রূপান্বিত হতে পারত। তখন যে-কোনো দিকেই সে হতে পারত বিচারের ঘাতসহ। নায়ক কল্পনায় এই ত্রুটি লেখকের বক্তব্য-বিষয়ক অসঙ্গতির ফল বলে উপন্যাসের ভাষায় তার কিছু প্রকাশ ঘটেছে। মহাকাব্য-কল্প উপন্যাসে উপন্যাসের উপযুক্ত সংহতি নির্মাণে প্রয়োজনীয় নিরাসক্তি এ-ভাষা সর্বত্র রক্ষা করতে পারেনি। মহিমচন্দ্রকে উপলক্ষ্য করে শানিত ব্যঙ্গময়তা ভারসাম্যকে লঙ্ঘন করেছে। যে-কোনো স্বগত চিন্তায় কবির আত্মপ্রকাশ ঘটেছে বড়ো দ্রুত। অন্নদাশঙ্করের গল্প নায়কের মতো কিঞ্চিৎ অস্থিতমতি বলে মননের ভাষায় মাঝে মাঝে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। উজ্জয়িনীর নিজের কথার পক্ষে তা মেয়েলি আটপৌরে প্রসাদগুণে শক্তিময়ী। সেখানে আর একবার বোঝা যায় সত্যাসত্যের প্রধান শক্তি কোথায়। সংকটারূঢ় মানবাত্মার মুক্তি সভ্যতার নিজস্ব নিয়মের চেয়ে ব্যক্তির নিজের যন্ত্রণার পথে লভ্য এবং সাধারণ মানুষ হওয়াই মুক্তির পথ, এই টলস্টয়ী বিশ্বাসের পক্ষে অন্নদাশঙ্করের সায় উপন্যাসটির নানা জটিলতার মধ্যে কখনও অস্পষ্ট নয়। সেদিক থেকে তিরিশের উপন্যাস-কীর্তিতে সত্যাসত্য বিশিষ্ট। আমরা যখন বিভূতিভূষণের আরণ্যক ও অন্নদাশঙ্করের সত্যাসত্যকে এই যুগের প্রসঙ্গে চিন্তা করি তখন বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যের ইতিহাসে তিরিশের যুগের সর্বতোমুখী জীবন-জিজ্ঞাসার ব্যাপকতাকে কিছুটা বুঝতে পারি।

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বুদ্ধির রৌদ্ররাগ-দীপ্ত পথের পথিক—কিন্তু কখনই সে বুদ্ধির উপাসক নন—'কৈলাসেরে লক্ষ্য করে যে-দাম্ভিক ছোঁড়ে শুধু ঢিল।' যে বুদ্ধি আস্তো বস্তুকে ভেঙে ভেঙে টুকরো করে আবার সেই টুকরোগুলিকে খুঁজে এনে সমগ্রতা গড়তে চায় সে কখনও সমগ্রতার প্রসাদ পায় না। তিরিশের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যাঁরা অপ্রসন্ন সমগ্রতাকে সমগ্রতা বলেননি, তাঁদের মধ্যে প্রৌঢ় ধূর্জটিপ্রসাদ অন্যতম। এঁরা বুঝেছিলেন বুদ্ধি-চর্চা জীবনের বিকল্প নয়। অন্তঃশীলা, আবর্ত, মোহানা—এই উপন্যাস তিনটিতে সমগ্রতা-সন্ধানী (কেননা সমগ্রতাতেই সার্থকতা) আধুনিক মানুষের চিন্তা ও বুদ্ধিজনিত যন্ত্রণারই প্রতি-ফলন ঘটেছে। এই উপন্যাসত্রয়ের প্রথম দুই ভাগের আলোচনায় উপন্যাস সম্বন্ধে বিষ্ণু দে মহাশয়ের বক্তব্য স্মরণীয়। তিনি বলেন—"পাত্রপাত্রী চরিত্র

উপন্যাসে আসলে একটা স্বসমুখ বা ইমার্জেন্ট ব্যাপার। লেখকের পুরুষার্থ ও তাৎপর্যার্থের আবশ্যিকতায় যে ছন্দ সমগ্র রচনার অস্থি মজ্জায় ছড়িয়ে পড়ে, সেই ছন্দের নির্দেশে, ভাষা ব্যবহারে, প্লটগতিতে, গল্পের বিকাশেই পাত্র-পাত্রীর আবির্ভাব। শুধু চরিত্রই যদি উপন্যাসের উৎস হত, তাহলে টলস্টয়ের সমর ও শান্তি, হোমারের ওডিসি বা রবীন্দ্রনাথের গোরা, এমন কি প্রুস্তের অতীতের অন্বেষণের মতো ব্যক্তিমনসর্বস্ব উপন্যাসের কার্যকারণ নির্ণয় করা যেত না। সুখের বিষয় ধূর্জটিবাবুও পুরুষার্থ যে তাৎপর্যার্থেই অস্তিত্ব পায় এ-কথা বোঝেন।” বিষ্ণুবাবু যে তাৎপর্যার্থের কথা বলেছেন শরৎচন্দ্রের ব্যর্থ অনুকারীদের পরিস্থিতি সর্বস্বতায় বাংলা উপন্যাসে তার সংখ্যা বিরল। ধূর্জটিপ্রসাদের প্রধান কৃতিত্ব এইখানে যে তাৎপর্যার্থেব সচেতনতা এবং উপন্যাসের রসশ্রীর মধ্যে তাঁর সেতুবন্ধন প্রায় সমাপ্ত। এই প্রায় শব্দটি অক্লেশে পরিহার করতে পারা যেত যদি রমলাকে যে-পরিমাণে হৃদয়বতী বলে মনে হল সেই পরিমাণে সংসার-লগ্ন বলে না মনে হত। হয়তো লেখক চেয়েছিলেন খগেনবাবুব নিজেকে আবিষ্কারের ছকটি সম্পূর্ণ করতে। তাই ঈষৎ অমনোযোগ এসেছে ক্বচিৎ কখনো অন্যদের বেলায়। এবং এই অমনোযোগের দায়—শক্তিমান ঔপন্যাসিকদের রচনায় দেখা যায়—নারী চরিত্রগুলিই কমবেশি করে বহন করে। তাই দেখা যায় গোরার অগ্নিপরীক্ষা জীবনের বিভিন্ন অগ্নিকুণ্ডে যতটা তীব্র, সুচরিতার হরিমোহিনীর বাড়িতে জীবন পরীক্ষা যেন সে তুলনায় অনেক নিস্তেজ। খগেনবাবুর অস্থির দীর্ঘযাত্রা ও রমলার আবেগময়তা কিছুটা ভারসাম্যেব ব্যত্যয় ঘটিয়েছে এই ভাবেই। এই আবেগময়তা তার জীবনে উপযুক্ত আধাব পায়নি বলেই এমনটা ঘটেছে। খগেনবাবুর চরিত্র-বীজ কিছুটা রিয়ালিস্ট গল্পে মেলে। শুধু সেখানে ছোট গল্পের মিত-পরিসরে যা কেবল এক চমকে গোটা অন্তর্লোককে ক্ষণকালের জন্য উন্মোচিত করেছে—উপন্যাসের বিস্তৃত পটে স্থায়ী আলোক-সম্পাতে তাকে সমগ্র করে তোলা হয়েছে। সে আলোক-সম্পাত যেখানে যেখানে দৃঢ় হস্তে হয়নি রমলা চরিত্র তার মধ্যে প্রধান। রমলার জীবনে প্রেম কতকগুলি মানসিক প্রতিক্রিয়া ছাড়া আর কোনো বৃহৎ তাৎপর্য সৃজন করেনি। রমলার পরাভবের মূলে এই সত্য। ফলে অন্তঃশীলার অন্তঃশীলা নদীধারার ন্যায় শক্তিশালিনী নারী মোহানায় গিয়ে শুষ্ক রঙিন বালুরাশি। খগেনবাবুকে দীর্ঘ টানাপোড়েনে সহায়তা করাতেই রমলার অধিকাংশ শক্তি ব্যয়িত হয়েছে।

সেদিক থেকে গ্রন্থত্রয়ের নামকরণ খগেনবাবুকে লক্ষ্য করেই হয়েছে বললে ভুল হবে না। খগেনবাবুর অন্তঃশীলা জীবন-পিপাসা সংসারের নানা অভিজ্ঞতার, আত্মনিরীক্ষার জটিল ঘূর্ণিগুলি পেরিয়ে মোহানায় উপনীত হয়ে খুঁজে পেয়েছে মানুষের জন্য বেঁচে থাকাতেই সার্থকতা। কিন্তু এই সার্থকতার মুখ তাকিয়েও এ-কথা না বলে উপায় নেই যে তিন খণ্ডের আয়তনগত বিশালতা পটভূমির বিশালতার বিকল্প হতে পারেনি। যে তাৎপর্যার্থ প্রথম খণ্ডের স্বজনে, সে তাৎপর্যার্থ বিজনে নেই। মাসিমার মৃত্যু অবশ্যই ব্যবহারযোগ্য ঘটনা, কিন্তু রমলার কাশীর অভিজ্ঞতা বন্ধ্যা। বিশেষত নায়কদের আলাপে এবং আলোচনায় যেখানে বিশ্ববীক্ষা প্রতিফলিত হয়েছে সেখানে তাদের অকারণে যান্ত্রিক কথাবার্তার হাতে কেন যে ধূর্জটিপ্রসাদ তুলে দিয়েছেন বোঝা যায় না—অথচ সেখানে নায়কদের নিজস্ব অভিজ্ঞতার ছন্দেই যথেষ্ট তাৎপর্য তিনি সঞ্চার করতে পেরেছেন, বিশিষ্ট হয়েছে তাদের ভাষা, তাদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, সকলই। যে বিশেষ শক্তিতে ধূর্জটিপ্রসাদ সম্পন্ন তা সুধীন্দ্রনাথের অননুকরণীয় ভাষায় এই : "অন্ততপক্ষে সব বুদ্ধিজীবীই বৈনাশিক নন, এবং মানুষের মধ্যে যেমন দেহ ও মনের দ্বিত্ব আছে, মনকে যেমন ভাব ও চিন্তায় ভাগ করা যায়, তেমনই বুদ্ধিও দ্বিমুখী—একদিকে বিকলনে ব্যস্ত, অন্য দিকে সংকলনে নিরত। ধূর্জটিপ্রসাদের বুদ্ধি এই শেষধর্মাবলম্বী।" কিন্তু নানা মতামত, নানা তত্ত্ব আবর্তের ভিতরে এত প্রবল যে সেখানে লেখকের মনীষা পাত্র খুঁজে না পেয়ে অনেক স্থলে স্বহস্তে পরিবেশিত হওয়ার ফলে লেখকের উক্ত প্রধান ধর্ম মাঝে মাঝে খণ্ডিত হয়েছে। এই ত্রুটি খুবই প্রভাবী হতে পারত। হয়নি কেবল খগেনবাবুর জন্যই। "ধূর্জটিপ্রসাদের মন এমন অকপট, তাঁর ব্যক্তিস্বরূপ এত ব্যাপক, তাঁর অনুসন্ধিৎসা এ-রকম মর্মস্পর্শী যে" বইখানি "আধুনিক জীবনযাত্রার প্রতীক হয়ে উঠেছে।" অবশ্যই খগেনবাবু এর মূলে। তিনি যেন চৈতন্যময় আধুনিক মানুষের প্রতিনিধি। মস্তক ও হৃদয়, বিশেষ ও সামান্য, প্রেম ও প্রভুত্বের উভয় সংকটের সম্মুখীন যে যন্ত্রণা খগেনবাবুতে তারই প্রতিবিম্ব।

কিন্তু যন্ত্রণার জন্য যে তীব্র রঙের কথা আমরা কল্পনা করে থাকি তা আবার খগেনবাবু এবং তাঁর জগৎ সম্বন্ধে কতটা প্রযোজ্য সে সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠতে পারে। যে নিরাসক্তি নিয়ে খগেনবাবুর ভারত পর্যটন, অভিজ্ঞতার ঘাটে ঘাটে উত্তরণ সে নিরাসক্তি শিল্পীকে মানালেও মুক্তি-সন্ধানী নায়কের পক্ষে একটু দুর্বহ হয়ে ওঠে। যে জ্ঞান ব্যক্তিকে জীবন সম্বন্ধে আগ্রহী করে, জীবনের ভগ্নাংশ কণিকা-

গুলিকে ফেলে সমগ্রের অভিমুখী করে অন্তঃশীলায় তা উপস্থিত। এবং আবর্তে জ্ঞানের নীরস বোঝার ভারে ন্যুব্জতা। এটা মোহানায় ফের সুসমতা ফিরে পেয়েছে কিনা তা বলা মুশ্‌কিল। শেষ পর্বে খগেনবাবুর কর্মযোগ এবং রমলাদেবীর প্রজাপতি-বিহার এক দুর্লঙ্ঘ্য বৈপরীত্য—অথচ এই রমলাদেবীকেই প্রথম পর্বে খগেনবাবুর আদর্শ নিকষে মনে হয়েছিল খাঁটি সোনা, সাবিত্রী (খগেনবাবুর আত্মহত স্ত্রী) যেন রাংতা। কিন্তু খগেনবাবুর এই প্রতি মুহূর্তের হয়ে ওঠার ভিতরে যে অজস্র মৃত্যুর যন্ত্রণা—যার অভাবে নব জন্মকে আমরা প্রত্যয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি না—সেটা অন্তঃশীলায় যত তীব্র, আবর্তে ও মোহানায় তত তীব্রতার প্রাণস্পর্শ পায়নি। অথচ অন্তঃশীলায় এই যন্ত্রণাকে ধারণ করার সর্বতোমুখী আয়োজন ছিল প্রস্তুত। মানুষ তার আত্মস্বরূপকে আবিষ্কার করে দীর্ঘ এবং ক্লান্তিহীন যাত্রার পথে। রমলাদেবীকে একদিন খগেনবাবু ভেবেছিলেন সমধর্মী। দীর্ঘযাত্রার শেষে যেখানে তিনি পৌঁছলেন সেখানে রমলাদেবীর থেকে জীবন বড়ো কথা। যাত্রার পূর্বেই খগেনবাবু ক্লান্ত এবং নীরক্ত—তাই যাত্রার যন্ত্রণা শেষ পর্যন্ত রঙ ফোটাতে পারেনি। এই নীরক্ত এবং ক্লান্ত মানুষটির চৈতন্য প্রবাহেও তাই পরম নিরাসক্তি। প্রথম পরিচ্ছেদে স্ত্রীর শবদাহ দেখতে দেখতে তার যে চিন্তাধারা তা নিঃসন্দেহে চেতনা-নদীর আত্মপ্রকাশ—জয়েস প্রুস্তের ছায়াচ্ছন্ন সে নদী।—

> কাঠ ক্রমে ধরে উঠল, প্রথমে ধীরে ধীরে, খানিক পরে জোরে অতি শীঘ্র দাউ দাউ করে। মাথার একরাশ চুল গেল পুড়ে, কী দুর্গন্ধ যেন উনুনে ফেন পড়েছে। সাবিত্রী একবার রাঁধতে গিয়ে উনুনের ওপর ভাতের হাঁড়ি ফাঁসিয়ে ফেলে। তখন তার চুল আধখানা বাঁধা ছিল। তাই দেখে খগেনবাবু বলেছিলেন—যে রাঁধে সে বুঝি চুল বাঁধে না। সাবিত্রী ভীষণ রেগে উত্তর দেয়—এখান থেকে চলে যাও। চলে আসেন নাকে কাপড় দিয়ে···;প্রত্যেক অঙ্গ গেল ঝলসে, পুট পুট করে শব্দ হতে লাগল। গা ফেটে জল বেরুচ্ছে।

গন্ধের অনুষঙ্গে খগেনবাবুর অতীত জীবন মনে পড়া এবং 'চলে আসেন নাকে কাপড় দিয়ে' এই বাক্যাংশের ওপর ভর দিয়ে বর্তমানে ফিরে আসায় চেতনার প্রবাহধর্মিতা অনুসৃত হয়েছে। তিরিশের ঔপন্যাসিকদের মধ্যে ধূর্জটিপ্রসাদ এবং গোপাল হালদার প্রবাহধর্মী চেতনার ব্যাপার প্রথমে উপলব্ধি করেন—আজ এ-শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকে পৌঁছে এ-কথা আমাদের বিশেষ ভাবে স্মরণীয়।

কিন্তু এই মনে-পড়াকে অবলম্বন করে যদি আমরা ধূর্জটিপ্রসাদকে জয়েসীয় পদ্ধতির নিরীক্ষক বলি তা হলে ভুল হবে। বরঞ্চ "পুরুষার্থের তাৎপর্যকে" অনুসরণ করতে করতে তিনি একটা নিটোল কাহিনী গড়েছেন—বলাই বাহুল্য সে কাহিনীর সাদৃশ্য আমরা শরৎচন্দ্রে খুঁজে পাব না—পাব রবীন্দ্রনাথের চতুরঙ্গ নষ্ট নীড় জাতীয় সৃষ্টিতে, যেখানে কাহিনী শীর্ণ-শরীর তপস্বিনীর মতো বক্তব্যের আত্মাকে দীপ্ত করে তোলে। সে কারণেই এই উপন্যাসের যেখানে যেখানে ধূর্জটিপ্রসাদের ভাষায় নায়কের যন্ত্রণার ধ্বনি বেজেছে সেখানে কাহিনী-ধৃত মানুষটাকে বোঝা যায় সহজে—বোঝা যায় খগেনবাবুর পীড়িত অস্তিত্বের দাহ।—

> শ্রাদ্ধ তিনি করবেন না। শ্রদ্ধা নেই তার আর শ্রাদ্ধ কী? এ-দেশে এ-সমাজে এ-যুগে শ্রাদ্ধ অচল, চল হওয়া উচিত প্রায়শ্চিত্তের, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রায়শ্চিত্ত, অপঘাত মৃত্যু কী দোষ করেছে, ধরা পড়েছে বিষ।

এই যন্ত্রণাময় মানুষটাই যখন অনুভব করে দুঃখের কাব্যময় গোপন পদসঞ্চারকে তখন ভাষায় ধূর্জটিপ্রসাদের বিপরীত কণ্ঠ শুনে আমরা বিস্মিত হলেও পুলকিত না হয়ে পারি না।—

> দুঃখ আসে বনের মাঝে সন্ধ্যার মতন, ধীরে গোপন সঞ্চারে আমার প্রিয়ার মতো তার নম্রগতি। দুঃখ নামে করুণার মতন আমার প্রিয়ার মতো বিপদ-মাখা স্মিত হাস্যময়ী মুখটি নিয়ে, দুঃখ আচ্ছন্ন করে আমার প্রিয়ার চোখে অশ্রুকণার মতন। যমুনার কালো জলে ডুবে যাবার যে আনন্দ গোপিকাকে আবিষ্ট করে, আজ আমার মন সেই আনন্দে ভরে উঠেছে। দুঃখ রূপান্তরিত হল।

বুদ্ধির উগ্র প্রহরায় ক্লান্ত মন মুক্তি খুঁজছে—এই হল ধূর্জটিপ্রসাদের বিষয়। সদ্যোদ্ধৃত অংশটিকে আমরা মনে করতে পারি খগেনবাবুর ক্ষণিক মুক্তির দীর্ঘশ্বাস। তাঁর গদ্যের যুক্তিপন্থী কাটা-কাটা গতি এখানে পরিহৃত। কিন্তু এ-মনোভাব ক্ষণিকের বলেই তার প্রতিফলন-স্বরূপে গদ্যেও কবিত্বের আতিশয্য ঘটেছে। ধূর্জটিপ্রসাদ সাধারণ লেখকের মতো এ-সমস্ত অংশে পূর্বাভাস সূচিত করেন না। আধুনিক মানুষের প্রতি মুহূর্তটাই সত্য—তাই তার অতীত নিয়ে অশ্রুপাত ও বর্তমান নিয়ে ব্যঙ্গ দুইই অচল। শুধু হয়ে-ওঠাকেই রূপময় করতে হবে, উপকরণের এবং লক্ষ্যের দ্বন্দ্বটা মিটিয়ে মিটিয়ে। এই উপন্যাসত্রয়ের প্রথম খণ্ডে তার সার্থক আশ্চর্য পরিচয় আমরা পেয়েছি এবং তা বাংলা সাহিত্যে

এখনও একক। "কর্মপ্রবৃত্তি অবরুদ্ধ হলে মানুষ বুদ্ধিজীবী হয়" এই সাধারণ সামাজিক সূত্রকে, জীবননিষ্ঠ উপন্যাস শিল্পে প্রয়োগ করা অবশ্যই দুরূহ। শেষ দুই খণ্ডে সুজন-বিজন-রমলা খগেনবাবুর মতো তাৎপর্য পেলে এ-বইখানি কী হত সে আলোচনা না করেও এ-মন্তব্য আমরা স্বচ্ছন্দেই করতে পারি যে— তিরিশের দ্বিধামুক্তির মনোভাব যদি জীবন এবং শিল্পকে কোথাও কোথাও সাযুজ্যে নিয়ে গিয়ে থাকে অন্তঃশীলা তাদের অগ্রগণ্যদের মধ্যে।

অন্নদাশঙ্কর এবং ধূর্জটিপ্রসাদ উভয়েই যথার্থ নাগরিক মানসের অধিকারী। এঁদের উপন্যাসেও স্বভাবতই সেই মানসিকতার প্রতিফলন ঘটেছে। এঁদের বাদল এবং খগেনবাবু উভয়েই প্রকৃতপক্ষে জীবনের মুক্ত স্বরূপের সন্ধানী নায়ক। উভয়েই বিশ্ব-পথিক, দেশের এবং বিদেশের ধ্রুবলোক ও বহতা নদীর প্রসাদ দুজনেরই সঞ্চয়কে সমৃদ্ধ করেছে। কিন্তু বাদল অপেক্ষা খগেনবাবুর পুরুষার্থের তাৎপর্য অবশ্যই গভীর। বাদলের উজ্জয়িনীকে ফেলে রেখে ইওরোপের জটিল আকাশের নিচে গিয়ে জীবনকে খোঁজা কতখানি সার্থক সে বিষয়ে আমরা ইতোপূর্বে সন্দেহ প্রকাশ করেছি, সে হিসাবে স্ত্রীর আত্মহত্যার পরে খগেনবাবুর অভিজ্ঞতার ঘাটে ঘাটে উত্তরণে অনেক বাস্তব যন্ত্রণার ব্যাপার। বাদলের এবং খগেনবাবুর উপসংহারে যে পার্থক্য তার মূলেও এই জীবন-বোধের ভূমিকা। বাদল আমাদের প্রতীতি উৎপাদন করে না। অথচ মনে হয় খগেনবাবুর পটে অপূর্ণতা থাকলেও এমনটা ঘটাই স্বাভাবিক। আমাদের এই বোধ, উভয় ক্ষেত্রেই লেখকদ্বয়ের স্বদেশ-সভ্যতার ব্যাখ্যার তারতম্যের প্রভাব-জাত। বিরাট ইওরোপীয় সভ্যতার পটে সুধী যদিবা মানবিকতায় সার্থক, বাদল বহিরাগত বলেই ব্যর্থ—অথচ সে ব্যর্থতা নায়কের ব্যর্থতা নয়, পরীক্ষার ব্যর্থতা। পাত্র-পাত্রীর জীবনোদ্ভূত জটিলতাই মনোলোকে যন্ত্রণার নানা আকার সৃষ্টি করে— ধূর্জটিপ্রসাদের অন্তঃশীলার খগেনবাবু তার নিদর্শন। যন্ত্রণা থেকে তর্ক এবং মননের টানাপোড়েনটা এসেছে এবং শেষোক্তের টানে আবার এসেছে নতুন যন্ত্রণা। এই দ্বন্দ্ব ছাড়া বুদ্ধিবাদী উপন্যাসে সার্থকতা অসম্ভব।

রবীন্দ্রনাথ-ধূর্জটিপ্রসাদ-অন্নদাশঙ্করের বুদ্ধি-মার্গ বাংলা উপন্যাস জগৎকে যে আকর্ষণ করেনি চতুর্থ এবং পঞ্চম দশকের সৃজিত উপন্যাসরাজির দিকে তাকালে তা স্পষ্টই বোঝা যায়। সামন্ত-যুগাবশেষের ক্ষীণপ্রভ স্নিগ্ধ মায়ালোকের পিছুটান বাঙালী সমাজে যেমন কাটেনি, তেমনি তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি না থাকলে এই পিছুটানের সঙ্গে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের বিষয়কে উপন্যাসস্থ করাও কঠিন। উপকরণের

দেশ-নির্ভরতাকে মেনে নিয়ে ঔপন্যাসিককে অগ্রসর হতে হয়, তার সঙ্গে দ্বন্দ্বে, আপসে, জয়ে, পরাজয়ে, এক-এক দেশের উপন্যাসের এক-এক ধারা গড়ে ওঠে। আমাদের ব্যর্থ নাগরিকতা নিশ্চয় সার্থক উপন্যাসের প্রতিবন্ধক, যদি না তার মধ্যেই আমরা ব্যক্তির দ্বন্দ্বময় জীবনোপকরণকে ব্যবহার করার দিকে ঝুঁকি। চতুর্থ এবং পঞ্চম দশকে সেই সুস্থ বুদ্ধিদীপ্ত জিজ্ঞাসার অনুসরণ ব্যাহত হয়েছে নানা ভাবে। সে-কথা আমরা পরবর্তী পরিচ্ছেদে বলব। শুধু একটা কথা এখানে বলা দরকার। আমাদের এলোমেলো জীবনে বুদ্ধির দায়-দায়িত্বকে পালন করায় নিশ্চয় দুঃসাধ্য কর্তব্যপালনের গৌরব। বর্তমান কালের বাংলা উপন্যাসে সে দৃষ্টান্ত বিরল হলেও অলভ্য নয়। ধূর্জটিপ্রসাদের অনুবর্তী লেখক না হলেও আধুনিক জীবনের বহু স্রোতের কাটাকুটি খেলাকে পুরুষার্থের তাৎপর্যে অন্বিত করে দু-একটি উপন্যাস রচিত রয়েছে। অসীম রায়ের এ-কালের কথা ও গোপালদেব তার মধ্যে অন্যতম। অসীম রায়ের যেটা দুর্বলতা সেটা হল এই যে, তিনি আধেয়ের গৌরবকে আধাবের কার্পণ্যে লঘু করে ফেলেন। একালের কথা ও গোপালদেব সে দোষ থেকে কিছুটা মুক্তি পেলেও দ্বিতীয় জন্ম সেই দোষে ব্যর্থ। দায়িত্ব-গম্ভীর অসীম রায়ের এই অসঙ্গতির অপনোদনে ধূর্জটি-প্রসাদের সৃষ্ট ঐতিহ্যেব সফলতর পরিণতি এখনও ভবিষ্য-মুখাপেক্ষী। অসীম রায়ের সৃজিত আমাদের সীমিত মধ্যবিত্ত জীবনের বুদ্ধির খর্বতায় ('বেঁড়েমি') পীড়িত নায়ককুল এখনও বিরক্তির প্রাথমিক স্তর ছাড়িয়ে উঠতে পারেনি।

তিরিশের সাহিত্যের সর্বতোমুখী বিস্তার উপন্যাসের ক্ষেত্রে আত্মমর্যাদা অর্জনের কঠিন সাধনায় ব্রতী থাকলেও সে সাধনায় পূর্ণসিদ্ধির পথে বাধা ছিল প্রচুর। আমাদের জীবনের উপকরণগত দৈন্য থেকেই যে প্রকরণগত ঔদাসীন্যের জন্ম তার পরিচয় বিভিন্ন সূত্রে তিরিশেব উপন্যাসরাজির মধ্যে মেলে। বৃহৎ পাঠক সমাজের ঝোঁক ছিল যেমন স্বয়ংসিদ্ধার মতো ইচ্ছাপূরণের কাহিনীর প্রতি অধিক, লেখক সমাজেও তেমন উপকরণগত দৈন্যকে বর্ণাঢ্যতায় ঢেকে ফেলার প্রয়াস। প্রমথনাথ বিশীর জোড়াদিঘির চৌধুরী পরিবার অথবা কোপবতী কিংবা বনফুলের দ্বৈরথ অথবা মৃগয়া-য় ঔপন্যাসিকের মানসদৃষ্টি খণ্ডিত হয়েছে। জোড়াদিঘির চৌধুরী পরিবার এবং দ্বৈরথের মতো উপন্যাস-বিভ্রমেরই পরবর্তী পর্যায়ে ঘটেছে (চতুর্থ ও পঞ্চম দশকে) ইতিহাস-রূপকথার অশুভ-পরিণয়, যে সমস্ত রচনায় নিটোলতা হারিয়ে ফেলা হয়েছে উচ্ছলতায়। প্রমথনাথ বিশী

ও বনফুলের অসঙ্গতি এইখানে যে তাঁরা কন্‌টেণ্টের ব্যবহার্যতার ভিতরেই যে-প্রেরণা এবং নিষেধের দ্বন্দ্ব বিরাজমান তাকে জানেন না। এবং জানেন না বলেই যা এঁদের লক্ষ্য, সেই ফর্মের সাধনায় তদ্‌গত হওয়া এঁদেরও পক্ষে সম্ভব নয়। বিভূতিভূষণ ও তারাশঙ্করের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও তাঁদের উপন্যাসের প্রধান গুণ অভিনিবেশসম্পন্ন কন্‌টেণ্ট-জ্ঞান। এই গুণেই তাঁরা বনফুল প্রমুখ অপেক্ষা অগ্রণী উপন্যাস-শিল্পী। কিন্তু ঔপন্যাসিক হিসাবে ব্যক্তিস্বরূপের বিকাশের ছন্দকে তারাশঙ্কর ও বিভূতিভূষণ সঠিক অনুধাবন করেন না বলেই আবার ফর্মের প্রসঙ্গে এঁদের আগ্রহ শেষ পর্যন্ত দুর্বল। তাই তাঁরা তুলনায় শক্তিমান হলেও উপন্যাসের সমগ্র রস-রূপ রচনায় অতি অল্পক্ষেত্রেই সফল।

তাই যে-ত্রুটি জগদীশ গুপ্তের শিল্পী-জীবনে বিবর্তনকে সম্ভব হতে দিল না, সেই ত্রুটিই অন্য মূর্তি পরিগ্রহ করে বাধা দিয়েছে তিরিশের কনিষ্ঠতম কথাশিল্পী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়কে। উপনিবেশের চর ইসমাইলের কাহিনীতে যে বিষয়ী সম্ভাবনা তা মহাকাব্যোপম উপন্যাসের প্রতিশ্রুতিতে যুক্ত। নারায়ণবাবু যে তা উপলব্ধি করেননি, তাও নয়। তিনি পট-লগ্ন চরিত্রগুলিকে পটে বন্দী করে ফেলেন বলেই তাদের গতি এবং বিবর্তনকে হারিয়ে ফেলেন। এই অসঙ্গতিকে আবৃত করার জন্যই তিনি রোমাণ্টিক কল্পনাসিদ্ধ ভাষার আশ্রয়ী। অথচ ছোট গল্পের সিদ্ধহস্ত শিল্পী নারায়ণবাবু সেই ভাষাতেই ছোট গল্পের মুডে আশ্চর্য-রূপে লক্ষ্যভেদী। তিরিশের ঔপন্যাসিকদের সার্থক উত্তরাধিকারকে উপন্যাসে বহন করার কর্তব্য-বোধ চতুর্থ-পঞ্চম দশকে একমাত্র নারায়ণবাবুরই ছিল। সে উত্তরাধিকারের মূল কথা হল জীবন-প্রেম। এই জীবনপ্রেম-ভিত্তিক মূল্য-বোধকে নারায়ণবাবু গৃহদেবতার শ্রদ্ধায় দেখেন। কিন্তু যুদ্ধোত্তর জিজ্ঞাসার নিকষে সেই শ্রদ্ধাকে তিনি যাচাই করেননি। তাঁর সম্বন্ধে এই কথাটিই সুখ-দুঃখ মিশিয়ে বলা যায়—তিনি কখনও পশ্চাদপসরণ করেননি, কিন্তু কখনও অগ্রগামীও হলেন না।

তিরিশের অসামান্য ঔপন্যাসিক প্রচেষ্টার এক বাহুতে তারাশঙ্কর-বিভূতিভূষণ-মানিকের প্রয়াস, অপর বাহুতে অন্নদাশঙ্কর-ধূর্জটিপ্রসাদের। কিন্তু এই দুই কোটির মধ্যে বাস্তবিক কোনো দ্বি-মেরু-ব্যবধান নেই। কল্পনার সঙ্গে মননের ন্যায়কে যুক্ত করে তাকে জীবনরসে সমৃদ্ধ করে তোলাতেই তিরিশের সাধারণ সার্থকতা। একে দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তর ঔপন্যাসিকেরা কতটা ব্যবহার করলেন তা পরবর্তী পরিচ্ছেদে আলোচিত হবে।
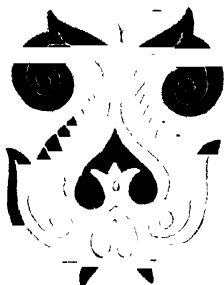
উদ্‌ভ্রান্ত বর্তমান এবং বাংলা উপন্যাস

•• এক ••

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে, যুদ্ধ যখন বাংলা দেশের দোর-গোড়ায় এসে উপস্থিত হল, তখন থেকেই বাংলা উপন্যাসও এক অগ্নি-পরীক্ষার সম্মুখীন হল। যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, গণবিক্ষোভ ও দেশবিভাগজাত স্বাধীনতা চতুর্থ দশকেরই চারটে মাইলস্টোন—এগুলিকে পেরিয়ে চতুর্থ দশকের মধ্যবর্তী সময় থেকে, পঞ্চম দশকের শেষ পর্যন্ত বাংলা উপন্যাসের ক্লান্ত, স্খলিত গতি ক্বচিৎ কখনো স্থির হয়ে ভার-সাম্যের প্রমাণ দিয়েছে বটে, নতুবা এলোমেলো পদক্ষেপেই তার লক্ষ্যহীনতার পরিচয় ক্রমশ প্রকট হয়েছে। এই লক্ষ্যহীনতার সামাজিক ও ঐতিহাসিক কারণ এই সময়কার ঔপন্যাসিক প্রচেষ্টাকে বোঝার জন্যই বিশেষভাবে অনুসন্ধেয়। নানা পরস্পর-বিরোধী কাটাকুটি খেলায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর জনমানসও ছিল যেমন খণ্ডিত, শিল্পীমানসের বৃহৎ অংশেও ছিল তারই অনুরূপ এক পন্থা-বিহ্বলতা। তৃতীয় দশকের সমস্ত জিজ্ঞাসার স্রোত যেন যুদ্ধোত্তর বালুকাময় খাতের ওপরে বিশুষ্কতায় মুখ গুঁজে-গুঁজে, কখনও নিজেকে হারিয়ে ফেলে, কখনও কোনো ঘোলা জলের ঋণ থেকে ঈষৎ গতি সঞ্চয় করে এগিয়ে চলছিল। এই প্রায় বিশ বছরের উপন্যাস প্রয়াসের প্রথম পরিচয় কতকটা এই:

(ক) যুদ্ধকালীন দুর্ভিক্ষের সময় লেখা উপন্যাস। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, নবেন্দু ঘোষ, সুবোধ ঘোষ প্রমুখ আরো অনেকের লেখা উপন্যাস এর মধ্যে পড়ে। আগস্ট আন্দোলনের পটভূমিকায় লেখা অনেকগুলি উপন্যাসও এই সময়ের কীর্তি। নারায়ণবাবুর অনেক ছোট গল্প ও দু-একটি উপন্যাসও এই পর্যায়ের স্মরণীয় প্রয়াস। গোপাল হালদারের

উনপঞ্চাশী, পঞ্চাশের পথের কথাও আমাদের মনে পড়ে।

(খ) অব্যবহিত-পূর্ব যুদ্ধ ও পরবর্তী কালের গণবিক্ষোভের পটে লিখিত উপন্যাস। সতীনাথ ভাদুড়ীর জাগরী, তারাশঙ্করের ঝড় ও ঝরা পাতা, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিহ্ন এবং এই ধরনের আরো কিছু প্রয়াস এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয় প্রচেষ্টা। আয়তন এবং পরিমাণ উভয়ের দিক থেকেই এটি অতি সংক্ষিপ্ত পর্যায়।

(গ) প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে শুরু হয়েছে রম্যরচনার অজস্র ধারাবর্ষণ। দৃষ্টিপাতের ও দেশে-বিদেশের জয়যাত্রা লেখকদের আকর্ষণ করেছে এবং সংখ্যাগণনার বাইরে চলে গেছেন রম্যরচনার লেখকেরা।

(ঘ) বাংলা উপন্যাসের ইতিহাসগত পশ্চাদপসরণ ও ভৌগোলিক সীমা বিস্তৃতিও এবারে শুরু হল। বিমল মিত্র, রমাপদ চৌধুরী, প্রাণতোষ ঘটক, সমরেশ বসু, সতীনাথ ভাদুড়ী, অদ্বৈত মল্লবর্মণ প্রমুখ নবীন লেখকেরা যোগ দিলেন মনোজ বসু, তারাশঙ্কর, প্রমথনাথ বিশী ও বিভূতিভূষণের সঙ্গে। পাঠকমহলে এই অংশই চতুর্থ ও পঞ্চম দশকে সর্বাপেক্ষা প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিলেন।

(ঙ) সমকালীন কলকাতার অবক্ষয় ও মূল্যবোধের বিপর্যয়ের পটভূমিতে রচিত উপন্যাস। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, বিমল কর, সন্তোষকুমার ঘোষ ও নরেন্দ্রনাথ মিত্র এ-প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য নাম।

(চ) জীবনের দ্বান্দ্বিক সমগ্রতার ওপর স্থাপিত এবং বৃহৎ এপিক-লক্ষ্য উপন্যাস। অসীম রায়, গুণময় মান্না, (গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের একটি উপন্যাস) অমিয়ভূষণ মজুমদার প্রমুখেরা এই ক্ষুদ্র কিন্তু তাৎপর্যময় অংশের প্রধান কয়েকজন।

এখন আপাতদৃষ্টিতে পরস্পর-বিচ্ছিন্ন এই বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে কোনো কারণগত যোগসূত্র আবিষ্কার করা যায় কিনা দেখা যাক। ক-পর্যায়ের উপন্যাসগুলিতে দুর্ভিক্ষের মূল হিসাবে চোরা-গহ্বর ও তার সঙ্গে যুদ্ধরত মানুষের কথা প্রধান হয়ে উঠেছে। মানুষ যে তখনও প্রতিকূলতার কাছে সমর্পিত-প্রাণ নয়—জীবন যত দুর্বিষহ হোক না কেন, মৃত্যু যে তার বিকল্প হতে পারে না এ-বোধ তখনও বাংলা দেশের জনমানসে দৃঢ়। তখনও সামনে রয়েছে ঔপনিবেশিক ইংরেজ প্রভুরা, গণ-আন্দোলনের প্রত্যাশা ও বাসনা। তিরিশের জের টেনে জীবন তখনও, যত অস্পষ্ট ভাবেই হোক, আশাবাদী। যুদ্ধের ঠিক শেষ মুখে যে

গণ-বিক্ষোভের তরঙ্গ তাতে জীবনের সেই বাসনারই অভিব্যক্তি। মন্বন্তরে, ঝড় ও ঝরা পাতায়, শিলালিপিতে, চিহ্নে এই সময়ের হস্তাক্ষর স্পষ্ট। তখনও পর্যন্ত জীবনের প্রতি যে বাস্তব আগ্রহ উপন্যাসের আত্মা, তারই প্রতিফলন খুঁজে পেয়েছি আমরা গণ-আন্দোলনের প্রতি লেখকদের আগ্রহে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রূপান্তর এবং নবেন্দু ঘোষ ও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সাহিত্য-প্রয়াস তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। যুদ্ধের সময়ে যে প্রগতি-লেখক আন্দোলন লেখক মহলে প্রভাব বিস্তার করেছিল—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ উপস্থিত। কিন্তু বাইরেব দিক থেকে যে কারণে প্রগতি-লেখক আন্দোলন আর অধিকতর প্রসারিত হতে পারল না, সেই কারণেই বাংলা উপন্যাসেরও এল গতিচ্যুতি ও পদস্খলন। দেশবিভাগজাত স্বাধীনতায় প্রকৃতপক্ষে আমাদের ইতোপূর্বে কুঠারাহত আশাতরুকে সঞ্জীবিত কবে তোলার কোনো মন্ত্রের সন্ধান মিলল না। দেশবিভাগে ছিন্নমূল-জনতার জীবনেও এবার নেমে এল মূল্যবোধ বিনষ্টির দুর্দিন। তখনকার গণ-আন্দোলন হয় অতি-বামপন্থায় উন্মত্ত, নয় পরম নিশ্চিন্তে অন্ধ। এদিকে সাম্প্রদায়িক হানাহানি, ওদিকে অগ্নিগর্ভ বাংলার গ্রাম জীবন। এই বিপর্যস্ত মূল্যবোধের মাঝখানে হারিয়ে গেল জীবনের পরম সহিষ্ণু অথচ জিজ্ঞাসু সম্মুখ-দৃষ্টি। স্বভাবতই শিল্প-জীবনও গভীর আঘাত পেল। জীবনের সৎ সন্ধিৎসু চেষ্টার নিদর্শন হিসাবে গুণময় মান্নার লখিন্দর দিগার এবং অসীম রায়েব একালের কথার মতো শিল্প প্রয়াসের সাক্ষ্যের কথা অবশ্যই উঠবে—কিন্তু তাতে গোটা জীবন এবং শিল্পের যে চেহারা তাতে উপলব্ধির কোনো রকমফের হয় না। এ-সময়ের পাঠকদের আগ্রহও এই সমস্ত রচনায় বিশেষ ছিল না। জীবন সম্বন্ধে আগ্রহশূন্যতাই ধীরে ধীরে তার অধিকার বিস্তার করছিল। যে মূল্যবোধগত নৈরাজ্যের ফলে রাষ্ট্র এবং সমাজের পরস্পর ঔদাসীন্যে পাঠক সমাজের এই শূন্যমনস্কতা গড়ে উঠল তার চেহারা এই :

(ক) জীবনের প্রধান দাবি অর্থাৎ জীবিকাব দাবি দারুণভাবে আহত হল। জীবনযাত্রার সুস্থ মানোন্নয়নের জন্য যে শ্রমজীবী-সমাজের দাবি তা মধ্যবিত্তের আবেগময় সমর্থন থেকে বঞ্চিত হল দু-কারণে। এক, দেশভাগের ফলে কলকাতার মধ্যবিত্তের বহুলাংশের পূর্ব-বাংলার গ্রামীণ শিকড় ছিঁড়ে যাওয়ায়, তারা হারিয়ে ফেলল অর্থনৈতিক স্থিরতা। দুই, অর্থনৈতিক সংকটের প্রথম ঝাপটায় বাঙালী ব্যাঙ্কগুলিই প্রথম শিকার হওয়ার দরুন মধ্যবিত্ত মানসে দেখা দিল দারুণ প্রতিক্রিয়া। তৎকালীন

বাংলা দেশের কৃষক-আন্দোলন ও বড়ো বড়ো শ্রমিক-আন্দোলনগুলি এই কারণের জন্য পাঠক সমাজের বৃহৎ কল্পনাকে স্পর্শ করতে পারেনি। তার প্রমাণ দীপক চৌধুরীর শঙ্খবিষ, সন্তোষকুমার ঘোষের কিনু গোয়ালার গলি ও জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর বারো ঘর এক উঠোনের মতো আরো নানা রচনায় স্পষ্ট।

(খ) এতদিন পর্যন্ত আমাদের জীবনের প্রধান দুই ধারায় কোনো বিরোধ ছিল না। আমাদের প্রধান চাওয়ার বিষয় ছিল ঔপনিবেশিকতার হাত থেকে মুক্তি। যা কিছু আমাদের জট তার মূল নির্দেশ করেছি আমরা ঐখানেই। আমাদের ঐতিহ্যগত যা কিছু, সাংস্কৃতিক যা কিছু, সব কিছুকেই আমরা ঐ একই মুক্তিসাধনার কাজে লাগিয়েছি। বাংলাব সাংস্কৃতিক জীবনেব একটা সমগ্র একমুখিনতা গড়ে উঠেছিল জাতীয় সংগ্রামের উন্মেষের যুগে। আমাদের কালী অথবা দুর্গা দেশের জন্য খড়্গ ধারণ করেছেন, আমাদেব কৃষ্ণের সুদর্শন চক্রও জাতীয় সংগ্রামে সৈনিকদেরই প্রেরণা জুগিয়েছে। রামকৃষ্ণের ভক্তিসাধনার থেকেও নৈতিক মর্যাদায় সন্ত্রাসবাদীদের কাছে অধিক দীপ্যমান ছিল বিবেকানন্দের 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য'। সুতরাং আমাদের ধর্মপ্রাণতায় ও মুক্তিপ্রাণতায় কোনো দুস্তব বিরোধ ছিল না। কিন্তু যুদ্ধ পরবর্তীকালে, স্বাধীনতার পর সে সমগ্র একমুখিনতা হারিয়ে গেল। 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য' কিংবা 'হে রুদ্র নিষ্ঠুর যেন হতে পারি তথা' প্রভৃতি মনোভাবের উপযুক্ত মধ্যবিত্ত জীবন-ভিত্তিক আধার গেল ভেঙে। নানা ঠাকুর, নানা স্বামী ও নানা অলৌকিক শক্তিময় লামা অথবা বাবাদের জন্য অনেক ছোট-বড়ো আসন তখন দিকে-দিকে প্রস্তুত। ব্যাঙ্ক মালিক এবং চাকুরিহারা ও ব্যাঙ্কফেলে সর্বস্বহারা ছা-পোষা মানুষের আশ্চর্য তীর্থ-সঙ্গম গড়ে উঠেছে এই সমস্ত আসনের পাদপীঠে। জীবনে যখন এবম্প্রকার ক্লীবেব ভক্তি সামাজিক কারণেই প্রবল হয়ে ওঠে, তখন স্বভাবতই সাহিত্যেও তার প্রতিফলন অবশ্যম্ভাবী। আতুর ও পীড়িত মধ্যবিত্তের সান্ত্বনার জন্য সে-ব্যবস্থা সাহিত্যে করলেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর পবমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ গ্রন্থে। বেদের লেখকের এবম্বিধ ভক্তিরসাপ্লুতি প্রায় জগাই-মাধাই উদ্ধারের আদর্শ স্থাপন করল। কিন্তু ব্যবধানটা এবার হল দুরতিক্রম্য। বারো ঘর এক উঠোনে প্রতিফলিত সামাজিক পরিস্থিতি ও পরমপুরুষের জন্য তদ্‌গতচিত্ততাকে

মেলানো কবি অমিয় চক্রবর্তীর সেই মহামিলনের দেবতার পক্ষেও অসম্ভব। উভয় দিকেই যখন নেতির বোধ প্রবল, তখনকার সাংস্কৃতিক নৈরাজ্য আসলে রাষ্ট্রিক নৈরাজ্যেরই সন্তান ; সামাজিক স্থিরাদর্শহীনতারই ফল।

(গ) পারিবারিক সম্পর্কগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক জটগুলি অতিমাত্রায় প্রকট হতে লাগল এ-যুগে। সতীত্ব-মাতৃত্ব-নারীত্ব প্রভৃতি যে সমস্ত স্নিগ্ধ পবিত্রভাবে বিধৃত সুকুমার বৃত্তিগুলিকে এতদিন জীবনে বড়ো মূল্য দেওয়া হয়েছে সেগুলি ভাঙতে লাগল কলকাতার ফ্ল্যাটে, রাস্তায়, বাস্তুহারা লাঞ্ছিত মানবতার সমাবেশে। চেতনায এ-কথাটা পরিষ্কার হয়েছে যে অপরাধী ব্যক্তিটিকে সাজা দেবার মৌল প্রেরণা হওয়া উচিত সংশোধনী প্রেরণা কিন্তু রাষ্ট্রশক্তি নিজে বৃহৎ অপরাধীগুলি সম্বন্ধে শিথিল। এই শৈথিল্য থেকেই দেহপণ্যা নারীদের সম্বন্ধে আমাদের মনে অনিবার্য ঘটনা-সঞ্জাত নিরুপায় সহিষ্ণুতার বোধ জন্মাল। আমরা নিরুপায় হয়ে যেমন চোরাকারবারীদের সহ্য করলাম তেমনি মেয়েদের দেহগত শুচিতা বোধের বিনষ্টিকেও সইতে পারলাম। এই ঔদাসীন্য এবং আগ্রহের অভাবের সামনে আমরা আত্মহত্যাকারীর নীরবতা পালন করেছি। কখন যে সমাজ-প্রদত্ত আচরণগত সীমা মুছে যেতে শুরু করেছে তা হয়তো মীরার দুপুরে (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী) স্বামীটির আত্মহত্যার মতো ঘটনাব পর স্পষ্ট হবার কথা, তা যে হয়নি তাও তো প্রমাণ হল বারো ঘর এক উঠোনের শেষে শিবনাথের স্ত্রীর শৈথিল্যকে (হঠাৎ বুদ্ধিমানের মতো) মেনে নেবার মতো ঘটনায়।

(ঘ) লক্ষ্যহীন অসংগঠিত যুবসম্প্রদায় সাংস্কৃতিক কোনো নেতৃত্ব পেল না কোথাও। যুদ্ধেব সময়ে গণনাট্য সংঘ প্রমুখ আন্দোলনেব ভিতর দিয়ে লোক-জীবনের বেগবতী ধারাকে জানবার জন্য যে আগ্রহ সঞ্চারিত হল, অতি-রাজনৈতিকতার ঘূর্ণাবর্তে তা যেমন সংগঠনের দিক থেকে হারিয়ে গেল, তেমনি নানা দিক থেকে আহত লোক-জীবনেব নিজস্ব সাংস্কৃতিক ছন্দও ব্যাহত হল গভীরভাবে। কলকাতায় পল্লী-সাংস্কৃতিক মেলা, রেডিওতে ভাটিয়ালির মতো কলকাতার পক্ষে মনোজ্ঞ হল মাত্র—আর কিছু নয়। উদ্‌ভ্রান্ত জট-পাকানো অবস্থার আর এক প্রমাণ রইল চলচ্চিত্রে আর আধুনিক গানে। কোনোটাই রসপিপাসার সঙ্গে যুক্ত হল না। এরা হল শুধু অতি মিষ্টমাত্র—শিল্পকর্ম নয়। একপ্রকার রুচির বিকারে আচ্ছন্ন হল সারা দেশ।

স্বভাবতই এমতাবস্থায় শিল্প-সাহিত্যের প্রাণদায়িনী স্নিগ্ধ স্রোত দুই কূলের মৃত্যুবিকীর্ণ তটরেখায় অগ্নিদাহের তাপে শুকিয়ে যাবার কথা। গেলও তাই। পাঠকদের, কাজেই বিভ্রান্ত লেখকদের কাছে, জীবন-বিষয়ক আগ্রহের কোনো স্থির আদর্শ রইল না। বঙ্কিমী যুগে ঔপন্যাসিকের আগ্রহ ছিল অদৃষ্ট-লাঞ্ছিত পুরুষকারের যন্ত্রণা-মথিত হাহাকারের দিকে অথবা কর্মিষ্ঠ প্রয়াসের দিকে। রবীন্দ্রনাথ জানতে চাইতেন মানুষের ব্যক্তিত্বের সমগ্রতা-সঞ্জাত সমস্যাকে, শরৎচন্দ্র ভালবাসতে চাইতেন দুঃখী মানুষকে, তিরিশের লেখকেরা জীবনের বিস্তৃত, জটিল এবং রহস্যঘন অখণ্ডতাকে ধারণ করতে চেয়েছেন—জীবনতৃষ্ণার তাগিদে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এমন ধরনের ইতিবাচক কোনো মানসদৃষ্টির সন্ধান পাওয়া ছিল দুষ্কর। যে ঐক্যানুভূতির অলক্ষ্য সূত্রে এতদিনের সমস্ত প্রয়াস ধৃত ছিল তা তখন শতধাবিদীর্ণ। বিমুখ বর্তমান ও বিশূন্য ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে অধিকাংশ লেখকদেরই মনে এল এক পঙ্গু অসহায়তাবোধ। এ-রকম অবস্থায় জনজীবনের শুষ্ক খাতে আশার ধারা সঞ্চারিত করতে হলে অবশ্যই গোটা সমাজের দ্বান্দ্বিক চেহারার অনুধাবন প্রয়োজন ছিল। কিন্তু ইতিহাসের কার্যকারণ পরম্পরায় সে দ্বন্দ্বময় স্বরূপকে তখন সমাজ-জ্ঞানের মুখস্থ করা সূত্র দিয়ে উপলব্ধি করা যায়নি। অ্যাভারেজ বাঙালী পাঠক তখন নিজের জীবনকে ঘৃণা করে বলেই সাহিত্য-দর্পণেও নিজেকে প্রতিফলিত দেখতে আগ্রহী ছিল না। এই মানসিক শূন্যতা পুরণের জন্য লেখকদের বৃহৎ অংশে তখন প্রয়াসও ছিল অন্তহীন। তারই পরিণতিতে দেখা দিল বিষয়বস্তু পরিবর্তনের তাগিদ। এই তাগিদের মধ্যে কতখানি স্বাস্থ্য ছিল, ছিল কতখানি জাতীয়-বেদনার মূল সন্ধানের প্রয়াস তার খানিকটা প্রমাণ আমরা পাই সমরেশ বসুর উত্তরঙ্গের মতো উপন্যাসে। উত্তরঙ্গ, সাহেব বিবি গোলাম, আকাশ-পাতাল যেমন নবীন লেখকদের বিষয় পরিবর্তনের প্রয়াসসমূহের কয়েকটি, ইছামতী ও রাধা তেমনি তিরিশের প্রতিষ্ঠিত লেখকদের উক্ত প্রয়াসে যোগদানের দুটি উদাহরণ। অতীত জীবনাশ্রয় এর মূল কথা।

এই বিষয়বস্তুর পরিবর্তন-সাধনের আর এক মুখ অজ্ঞাতপুর্ব আঞ্চলিক জীবনের সন্ধানে সচেষ্ট হওয়ার ভিতরে। নিঃসন্দেহেই তৎকালীন মধ্যবিত্ত জীবনের হতাশ্বাস ক্লান্তি থেকেই এই প্রয়াসের জন্ম। এখানেও শ্রমিক জীবন (বি.টি. রোডের ধারে), ধীবর জীবন (তিতাস একটি নদীর নাম অথবা সাম্প্রতিক কালের গঙ্গা), অন্ত্যজ-জীবন (ঢোঁড়াই চরিত মানস), নাগা পাহাড়ের কাহিনী

(পূর্বপার্বতী) প্রভৃতি নানা প্রয়াসের উল্লেখ করা চলে। লেখকেরা যা চেয়েছিলেন তার মধ্যে যে একেবারেই অকৃত্রিমতা অনুপস্থিত এ-কথা ঠিক নয়। বিমুক্ত, বলিষ্ঠ জীবনস্রোত, উন্মুক্ত প্রকৃতি এবং জীবন-মৃত্যুর সুস্থ স্বাভাবিকতায় অথচ নিষ্ঠুরতায় একটা আলাদা স্বাদ আছে। যদিও হাঁসুলিবাঁকের উপকথার তারাশঙ্করকে অতিক্রম করা এঁদের কারো পক্ষেই সম্ভব হয়নি, তথাপি বিভিন্ন ভাবে এঁদের কীর্তির আংশিক সাফল্য উপভোগ্য। যে ক্লান্ত দ্বীপ-জীবনের মন্থর জীবনস্রোতের প্রতিক্রিয়াকে পরাস্ত করার জন্য মম সাহেবের লেখায় প্রশান্ত মহাসাগরীয় পটভূমি উঁকি দিয়েছে, এখানে প্রেরণা তার চেয়ে খাঁটি ছিল। বিষয়বস্তুকে ব্যবহার করার সময় লেখকদের অনেকেরই দুর্বলতা প্রকট হয়েছে বটে, কিন্তু এদেশে, স্বাধীনতার পরে, আঞ্চলিকতার তাগিদের পশ্চাতে দেশকে জানতে চাওয়ার একটা অবচেতন তৃষ্ণা কাজ করেনি এটা ঠিক নয়।

অথচ সেই অবক্ষয়ের মুখোমুখি বাংলা দেশের মধ্যবিত্ত জীবনের নানা স্তরের ভাঙনকে প্রত্যক্ষ করার সাহসও একেবারে বিলুপ্ত হয়নি। বারো ঘর এক উঠোন, চেনা মহল অথবা মোমের পুতুলের মতো উপন্যাসে সেই নানামুখী ভাঙনকে ব্যবহার করা হয়েছে। যে নৈরাশ্য এবং শূন্যমনস্কতা মধ্যবিত্ত জীবনের সমস্ত সত্তাকে ফোঁপরা করে দিচ্ছিল তার বিশ্বস্ত প্রতিফলন এই সমস্ত উপন্যাসে মেলে। সচেতন পাঠকদের সীমিত পরিসরের কথা বাদ দিলে, অ্যাভারেজ পাঠক এই সমস্ত রচনায় বাস্তব-যন্ত্রণা-বিস্মরণী কোনো উপাদান খুঁজে পায়নি। তাদের প্রাথমিক আকর্ষণ ছিল বরঞ্চ ইতিহাস-ভূগোলাশ্রয়ী উপন্যাসগুলির প্রতি। কিন্তু সচেতন পাঠক একটা কথা সেদিন অনুভব করেছিলেন। সেটা এই : উপন্যাসের শিল্পগত আত্মাকেই আমরা উপন্যাসের বিষয়বস্তুর ব্যবহারে খুঁজে থাকি। সেটা এ-জাতীয় উপন্যাসে সুলভ ছিল না, তথাপি সমকালীন দেশের মানুষকে নিয়ে লিখিত এই সমস্ত উপন্যাসের পরোক্ষ ধাক্কায় গড়ে উঠল বর্তমান বাংলা উপন্যাসের দুই রূপ। এক রূপে জীবনের বিশাল ভাঙা-গড়াকে তার দ্বান্দ্বিক সমগ্রতাকে ধারণ করার প্রয়াস। অমিয়ভূষণ মজুমদার, গুণময় মান্না, অসীম রায় ও ননী ভৌমিক এঁদেরই কয়েকজন। আর একরূপে—অস্তিত্ব, বিশেষ কলকাতাই নাগরিক জীবনের অস্তিত্ব, যুদ্ধ পরবর্তীকালে যে মানসিক জটিলতার মধ্যে যন্ত্রণা-বিদ্ধ তার চেতনাবাহী সমগ্রতাকে ব্যবহারের প্রচেষ্টা। বিমল কর এঁদের পুরোধা। দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ তরুণেরা এই নবীন নিরীক্ষার পথের

প্রথম পথিক। এখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরের কথাসাহিত্যের সমগ্র অবস্থাটার একটা রেখাচিত্র অঙ্কন করলে এই দাঁড়ায় :

॥ হতাশ্বাস সমাজজীবন ও বিপর্যস্ত মূল্যবোধ ॥

॥ উপন্যাসের বিষয়বস্তু পরিবর্তনের তাগিদ।

॥ অতীত ইতিহাস আশ্রয় ॥
সমরেশ বসু
বিমল মিত্র
প্রাণতোষ ঘটক
রমাপদ চৌধুরী
মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য
গজেন্দ্রকুমার মিত্র
প্রমথনাথ বিশী প্রমুখ।

॥ অজ্ঞাতপূর্ব আঞ্চলিক জীবনাশ্রয় ॥
মনোজ বসু
সতীনাথ ভাদুড়ী
সমরেশ বসু
প্রফুল্ল রায়
অদ্বৈত মল্লবর্মণ
প্রমুখ।

। মধ্যবিত্ত জীবনের ভাঙন-ভিত্তিক রচনা ॥
জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, সন্তোষকুমার ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র।

॥ নতুন রীতি চেতনা প্রবাহ ॥
বিমল কর, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
মতি নন্দী, জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ।

॥ বিশাল দ্বন্দ্বময় জীবন-ভিত্তিক ও এপিক-লক্ষ্য রচনা ॥
অমিয়ভূষণ মজুমদার
অসীম রায়
গুণময় মান্না
গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য
ননী ভৌমিক
গৌরকিশোর ঘোষ

•• দুই

এখন আমরা এই সমগ্র অবস্থাটিকে বিশ্লেষণ করে দেখাব যে সৎ-সাহিত্যের জন্য দায়িত্বশীল নিষ্ঠাকে কত পিছুটান এড়িয়ে এবং কাটিয়ে চলতে হয়েছে। দেখাব একবার এদিকে একবার ওদিকে পাড় ভেঙে ভেঙে শিল্পহীন বাণিজ্যবুদ্ধি কেমন করে সব কিছু গ্রাস করতে চাওয়া সত্ত্বেও বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো একটি দুটি শিল্পকর্মে আমরা ভবিষ্যতের আশ্বাস পেয়েছি। প্রথমেই স্মরণীয়, ঔপন্যাসিকদের সৎ সন্ধিৎসু প্রয়াস বারে বারে খণ্ডিত হয়েছে নানাভাবে। পাঠক সমাজের উৎসাহহীন, পঙ্গু কৌতূহলকে নিবৃত্ত করতে হয়েছে শিল্পীদের, যার জন্ম দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঘটনা-ঘন দিনগুলিতে। এই কৌতূহলের অব্যবহিত পূর্বপুরুষ হল যুদ্ধকালীন সংবাদ-স্পৃহা। সংবাদ-স্পৃহা যে জীবন সম্বন্ধে আগ্রহেরই নামান্তর, সে কথা এ-গ্রন্থের প্রারম্ভে আমরা বলেছি। কিন্তু যুদ্ধের কালে সংবাদপত্রের

পাঠক-সংখ্যার সাধারণ বৃদ্ধির কালে সংবাদ-স্পৃহা মাত্র কৌতূহল-বৃত্তি। সমাচার দর্পণের পাঠক সংবাদের ভিতর দিয়ে জানতে চাইতেন দেশের নব রূপান্তরের কথা, ইংরাজি শিক্ষার বিস্তারের কথা, সতীদাহ-বিধবাবিবাহ, নীলকর দমন, প্রভৃতির বিবরণ। যুদ্ধপূর্ব জীবনে সংবাদ-পিপাসার মূল কথায় ছিল জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিবিম্ব। জাতীয় আন্দোলনের মন্থরতার কালেই ভাওয়াল মামলার বা পাকুড় মামলার প্রতি বিকারগ্রস্ত আসক্তি সম্ভব হয়েছিল। ঠিক সেই রকম যুদ্ধেব কালে মানব-সৃষ্ট দুর্ভিক্ষের অন্ধকার দিনগুলিতে বড়ো বড়ো শহরের পতন, জাহাজডুবি, বিরাট পশ্চাদপসরণের সংবাদে (কখনও গোপন কখনও প্রকাশ্য) ছিল আমাদের আগ্রহ। আগস্ট আন্দোলনের অগ্নু্যজ্জ্বল দিন কটি ছাড়া এর ব্যতিক্রম অল্পই। সংবাদ-পিপাসা মানেই তখন ভিতরের খবর জানতে চাওয়ার বাসনা। কে নুনের চোরাকাববারে ফেঁসেছে, কে ধরা পড়ল লক্ষ লক্ষ টাকাব চালের চোবাকারবারে, হিটলারের গোপন দূত হের হেস্‌ কী বলতে চায—কেমন করে ডুবল বিসমার্ক, বেহাত হল সিঙ্গাপুর—এই ধবনের অলস কৌতূহল ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন করে ফেলল বিবাট পাঠকসমাজের উদ্দেশ্য-হীন মস্তিষ্ক। এ-যুগের উপন্যাস-রচয়িতা এই চরিত্রহীন কৌতূহল-বৃত্তিকে বাণিজ্যিক স্বার্থে ব্যবহার করেছেন।

দৃষ্টিপাত উপন্যাস নয এবং আমাদের আলোচনার তালিকায় এ-জাতীয় গ্রন্থ স্বভাবাধিকারেই অন্তর্ভুক্ত নয়। তথাপি দৃষ্টিপাতেব সাফল্যের ভিতরে তার সাহিত্যিক গুণাগুণের সঙ্গে বাইরের দিক থেকে যা যুক্ত হয়েছিল তা এই সর্বব্যাপী অলস কৌতূহল। দিল্লীর আপাত-ঔজ্জ্বল্যের অন্তরালবর্তী উঁচু তলার জীবনে যে অন্তঃসারশূন্যতা, তাব সঙ্গে মিশেছিল ক্রীপ্‌স প্রস্তাবেব বহ্বাড়ম্বর, আর এই দুটিই শেষ পর্যন্ত তলিয়ে গেল আধারকরের চকচকে জীবনের অন্তরালবর্তী নির্বোধ প্রেমের কারুণ্যে। এর মধ্যে কিছুটা সমাজদৃষ্টি অবশ্যই ব্যবহৃত হয়েছে এবং যে কাবণে বইখানির অসামান্য অশ্রুসজল জনপ্রিয়তা, সেই আধারকবের কাহিনী বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে তা যদিও সংবাদধর্মী রিপোর্টাজ, তথাপি প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গে ওপরতলার কৃত্রিম জীবনকে বিদ্ধ করা হয়েছে বলেও এ-বই কম প্রশংসা, এবং ন্যায্য প্রশংসা, লাভ করেনি। আমরা আবারও বলছি যে দৃষ্টিপাত আমাদের আলোচ্য নয়—এবং এ-জাতীয় গ্রন্থ আলোচনা করলে সৈয়দ মুজতবা আলির অসামান্য জনপ্রিয় গ্রন্থ দেশে-বিদেশের কথাও আসে—সে ক্ষেত্রে আমাদের আলোচনা লক্ষ্যভ্রষ্ট হবার সম্ভাবনা বেশি।

আমাদের বলবার কথা শুধু এই যে, পাঠক-সাধারণের সংবাদ-স্পৃহার যে আতিশয্যকে যুদ্ধ-পরবর্তী যুগের একটা প্রবণতা বলে আমরা মনে করছি, দৃষ্টিপাত থেকে তাকে পরিচর্যা করা শুরু হল। এ-ব্যাপারে রম্যরচনার প্রকরণের সঙ্গে তৎকালীন উপন্যাস-সাহিত্যের উপকরণের একটা অলক্ষ্য যোগসূত্র বিদ্যমান। এই পরিচর্যা-প্রবণতার ফলে যুদ্ধ-পরবর্তী বাংলা উপন্যাসের বৃহৎ অংশে কতকগুলি ঝোঁক স্পষ্ট হয়ে উঠল। সেগুলি এই :

(ক) পুরনো আমলের সামন্ততান্ত্রিক পরিবার-জীবনকেন্দ্রিক উপন্যাস-গুলিতে উক্ত জীবনের অন্তর্দ্বন্দ্ব অপেক্ষা দুর্নীতি এবং বিলাসের বর্ণনার আতিশয্য। তারাশঙ্করের সামন্ত-পরিবার-কেন্দ্রিক গল্প-উপন্যাসগুলিতে যে অন্তর্দ্বন্দ্বের ব্যবহার সেগুলিকে বিশিষ্ট করে তুলেছিল, সেই অন্তর্দ্বন্দ্বের বদলে উনিশ শতকীয় বা তারও পূর্বের সামন্ত পরিবেশের বাস্তব চিত্রটিকে খুঁটিনাটি বর্ণনায় নিখুঁত করে পাঠককে মুগ্ধ করার চেষ্টাই এ-সমস্ত উপন্যাসে প্রবল। বরঞ্চ বিষয়বস্তুর নিজস্ব তাগিদেই যেখানে এই ঝোঁকের হাত থেকে মুক্তি ঘটেছে সেখানে আবারও বোঝা গেছে বক্তব্যের সম্পদেই উপন্যাসের শক্তির উৎস। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইছামতী ও সমরেশ বসুর উত্তরঙ্গে তার পরিচয়।

(খ) আঞ্চলিক জীবনাশ্রয়ী উপন্যাসগুলিতেও এই খুঁটিনাটি সম্বন্ধে বাস্তব অভিজ্ঞতা সরবরাহের প্রয়াসে পাঠকের কৌতূহলাতিশয্যকে তুষ্ট করার অহমিকাই সক্রিয়। পাঠক কত কম জানেন, তার ওপরেই যেন লেখকদের অভিজ্ঞতার প্রাসাদ নির্ভরশীল।

আঞ্চলিক জীবন এবং অতীত জীবন-আশ্রয়ী উপন্যাসগুলির এই প্রবণতা যে কেবল বাস্তব সম্বন্ধে জ্ঞানের আংশিকতার পরিচায়ক তাই নয় উপন্যাসে পাত্র-পাত্রীদের ব্যক্তিস্বরূপ সম্বন্ধে অকিঞ্চিৎকর জ্ঞানের নিদর্শনও বটে। নায়ক-পরিকল্পনার দৈন্য এ-যুগের উপন্যাস সাহিত্যের কেবল উল্লিখিত অংশেই সীমাবদ্ধ নয়। নায়ক-পরিকল্পনার দৈন্য এ-যুগের উপন্যাসগুলির সাধারণ ব্যাধি। আমরা তারাশঙ্কর-সংক্রান্ত আলোচনায় দেখেছি যে এই দৈন্যের বোধ কেমনভাবে যুদ্ধের সময়েই তাঁর মধ্যে তীব্র হয়ে ওঠে, কেমন করে তা থেকে তিনি তাঁর শিল্পী-জীবনের চোরাবালির মধ্যে পড়তে চলেছেন। ব্যক্তির ভূমিকাহারা সামাজিক পরিবেশে, সেতুবন্ধন, নগর স্থাপন, বাঁধ নির্মাণ প্রভৃতির আমলাতান্ত্রিক যান্ত্রিকতায়, জনগণ-উদ্দীপনা-বঞ্চিত পরিকল্পনার সরকারী আড়ম্বরে হতাশ্বাস

ব্যক্তিত্ব, এদেশে তখন লাঞ্ছনার ও অবমাননার সম্মুখীন। এ-অবস্থায় লেখকদের পক্ষ থেকে নায়ক-সবল কাহিনী গড়ে তোলার প্রেরণা অনুভব করা ছিল দুরূহ। ইতিহাসের এবং ভূগোলের ছায়ায় আশ্রয় নিয়েও তাঁরা অতীতে এবং সুদূরেও বর্তমানের স্বদেশেরই প্রতিফলন খুঁজে ফিরেছেন। একমাত্র সমরেশ বসুর উত্তরঙ্গে এবং গঙ্গায় এই সামগ্রিক অবস্থার ব্যতিক্রম প্রশংসার সঙ্গে লক্ষণীয়। লখাই এবং বিলাস তাঁর নায়ক-সবল কাহিনীর বলিষ্ঠ পরিকল্পনার প্রমাণ। কিন্তু তিনি উপন্যাসের পট এবং পটলগ্ন জীবনের পরস্পরের টানাপোড়েনকে সবটা চিনতে ভয় পান বলেই সে পরিকল্পনা শেষ তাৎপর্যে বঞ্চিত।

বিষয়বস্তুর পরিবর্তনের তাগিদ থেকে যে দুই শাখা উদ্গত হয়েছে তাদের সাধারণ লক্ষণ যেমন বিবৃত হল, তেমনি মধ্যবিত্ত জীবনের সর্বাঙ্গীণ ভাঙনের বিষয় নিয়ে লিখিত উপন্যাসগুলিতেও কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ বিদ্যমান। যেমন :

(ক) গুণময় মান্না ও পূর্ণেন্দু পত্রীব প্রয়াস স্মবণে বেখেও বলা যায় উপন্যাসে গ্রাম হারিয়ে যেতে বসল। কলকাতাকেন্দ্রিকতা হল এই উপন্যাসগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য। ভাঙনের তীব্রতা সর্বাপেক্ষা গভীবভাবে অনুভূত হয়েছে কলকাতায়—মূল্যবোধেব বিপর্যযগুলিকেও, রুচির বিকার-চিহ্নগুলিকেও সর্বাপেক্ষা বেশি প্রকট হতে দেখা গেল এখানে। কলকাতা এই সমস্ত উপন্যাসের ঘটনাভূমি হওয়ার ফলে জীবনের জটিলতাকে অবশ্যই ব্যবহার করা গেল, কিন্তু কলকাতাকেই গোটা দেশ ভেবে বসায় বিচ্ছিন্ন দৃষ্টির যা কুফল তাও ভোগ করতে হয়েছে। উপন্যাসগুলির অধিকাংশেরই অন্তরের কথা হল মধ্যবিত্ত হতাশা। সে হতাশার পাশাপাশি লখিন্দর দিগার উপন্যাসে বর্ণিত ঘটনাও বাংলার গ্রামে-গ্রামে ঘটছিল, কিন্তু কলকাতার হতভবিষ্যৎ মধ্যবিত্তের কাছে তা শুধু সংবাদ, অথবা সংবাদও নয়। কলকাতা-কেন্দ্রিকতা বিষয়গত সীমাবদ্ধতার বীজ ছিল। অসীম রায়ের একালের কথা ও গোপালদেবের মতো উপন্যাসে কলকাতার জীবনের দ্বন্দ্বময় সমগ্রতাকে ব্যবহারের সৎ প্রয়াস সে-প্রসঙ্গে খুবই নিঃসঙ্গ প্রয়াস।

(খ) তিরিশের উপন্যাসে নারী চরিত্র প্রাধান্য কিঞ্চিৎ স্তিমিত ছিল। সার্থক নারী চরিত্র সৃজনের পাশাপাশি পুরুষ চরিত্রের প্রাধান্যই বরঞ্চ তিরিশের উপন্যাসের প্রাথমিক লক্ষণ ছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী কলকাতাই মধ্যবিত্ত জীবন-ভিত্তিক উপন্যাসে দেখা গেল নায়কের ঐতিহ্য রীতিমতো

আঘাত পেতে চলেছে। অনায়ক লক্ষণাক্রান্ত নায়কদের পাশে বরং নারী চরিত্রগুলির মানসিক জটিলতা শরৎচন্দ্রের পরে আবার লেখকদের অভিনিবেশের বিষয় হয়েছে। প্যাশন-বিহীন পিঙ্গল এই নারীচরিত্রগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মবিড। মধ্যবিত্ত নায়কদের অবশ্যই আর ধাত্রী দেবতার শিবনাথ প্রমুখের আদলে চিন্তা করার অবকাশ সামাজিক কারণেই সম্ভব ছিল না। করতে গেলে তাদের কি রকম বেখাপ্পা লাগে সমরেশ বসুর ত্রিধারা উপন্যাসের নায়ক রাজেন তার প্রমাণ।

(গ) বুদ্ধদেবের তিথিডোর ছাড়া বিশুদ্ধ প্রেমের আখ্যানও আর নেই। তিরিশের কাল থেকেই অবশ্য প্রেমকে উপজীব্য করে লেখা উপন্যাসের সংখ্যায় ঘাটতি বিদ্যমান। এবং গোটা বাংলা উপন্যাসের বিস্তৃত ঐতিহ্যের দিকে তাকালে এ-কথাও মেনে নিতে হয় যে প্রেমের বিশুদ্ধ আখ্যানে আমাদের উৎসাহ বরাবর কম। ভারতী-র যুগের লেখকদের কারো কারো প্রয়াস স্মরণে রেখেও এ-কথার কোনো ঘোরফের হয় না। চতুর্থ দশকের বিপর্যস্ত মানসিক অশান্তির কালে প্রেমেব বা প্রকৃতির বিশুদ্ধ আখ্যানের অবকাশ আর রইল না। নবেন্দ্রনাথ মিত্রের বস নামক বড়ো গল্পে প্রেমকে সামাজিক কর্মসূত্রের তাৎপর্যে গেঁথে গোটা জীবনের পটে ধারণ করে রস সৃজন করা হয়েছে। এমন ধরনের তাৎপর্যপূর্ণ প্রেমের কাহিনীর দ্বিতীয় নামোল্লেখ এই দুই দশকে সহজসাধ্য নয়।

(ঘ) হাস্যরসের সম্পূর্ণ অবিদ্যমানতায় এ-যুগের উপন্যাস-কীর্তির আব এক চরিত্র-লক্ষণ প্রকাশিত। যে উদার সহানুভূতি এবং মুক্ত নিরাসক্ত দৃষ্টির সন্তান হাস্যরস, চতুর্থ আব পঞ্চম দশকে তাকে লালনের অনুকূল পরিবেশ ছিল না। অসঙ্গতিব মাত্রাধিক্যে হাস্যরসিকেব প্রশ্রয়ের পবিবর্তে সামাজিকেব বিক্ষোভেব কারণই বেশি ছিল। ব্যঙ্গেব জন্য যে অনুকূল ভূমি তিরিশে বিদ্যমান ছিল, সমসাময়িক জীবনের বন্ধ্যাত্বে সে জীবন সম্পর্কে উদাসীনতায়, ব্যঙ্গরসেব প্রস্রবণও শুকিয়ে গেল। পবশুরাম, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় ও শিবরাম চক্রবর্তী প্রথম মহাযুদ্ধের পরের ও তিরিশের সুফল। চল্লিশে-পঞ্চাশে পরিমল গোস্বামীর সংক্ষিপ্ত প্রয়াস ব্যতীত প্রায় কোনো হাস্যরস নেই, কাজেই তার বিকল্পে ভাঁড়ামি বৃদ্ধি পেয়েছে—যা আমাদের আলোচনার মধ্যে পড়ে না।

সমস্ত অবস্থাটাই ছিল যেন মেঘাবৃত গুমোট—যেখানে ক্লেদাক্ততাই বেশি।

সে বন্ধ্যা মেঘে যেমন ঝড়ের ইঙ্গিতও ছিল না, তেমনি হাস্যের বিদ্যুৎস্ফুরণও নেই। মাঝে মাঝে এদিকে ওদিকে ক্ষণকালের জন্য এলোমেলো হাওয়া বয়েছে—তাতে তার চারিত্র ঘোচেনি।

•• তিন ••

এই ভাবে চতুর্থ ও পঞ্চম দশকের বাংলা উপন্যাস-প্রবাহ বয়ে চলেছে। জীবন সম্বন্ধে ঔদাসীন্যের ফলে বিশুষ্ক ও বিশূন্য মানসে নানা বিভ্রান্তি, নানা বিকার যেমন পাঠকদের অ্যাভারেজ চারিত্র, লেখকেরাও তেমনি বহু প্রলোভনের সঙ্গে যুদ্ধ করে করে কখনও পরাভূত, কখনও 'জড়োয়া গয়না গায়ে ভ্রান্তির গণিকা'র আহ্বানে রঙিন গলিতে পদার্পণের বিপদ থেকে বাঁচার জন্য প্রাণপণে প্রয়াসশীল। সেইজন্যই রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের জন্য প্রতীক্ষায় ক্লান্ত মানসে পাঠকের পক্ষে ধৈর্যের আসন পাতাও দুঃসম্ভব, আবার লেখকও সেখানে কী আসন নেবেন সে সম্বন্ধে সাধারণত অস্থিরমতি। তবু জীবনের সম্ভাবনাময় দ্বন্দ্বকে লেখকেরাই খুঁজে ফেরেন, বরং রাজনৈতিক কর্মী ও সমাজ-নীতির ছাত্রদের চেয়ে এ-দায় তাঁদেরই বেশি। তারা জানেন—

> "বর্তমান যদি কিছুমাত্র সুস্থ হত, তাহলে হয়তো আমাদের স্বপ্ন-প্রয়াণে সামঞ্জস্য থাকত। কিন্তু নানা লোভে ক্রূরতায় আজ আমরা ক্ষত-বিক্ষত। স্বেচ্ছাকৃত অভাবে যুদ্ধে প্রতিষেধ্য রোগে, অনাবশ্যক মৃত্যুতে আমাদের স্বপ্নগুলিও ছত্রভঙ্গ। তাই ঐকতান ছিন্নভিন্ন অন্ধকার কলকাতার উচ্চকিত রাস্তায়-গলিতে। কিন্তু জীবন তবু হার মানে না, তার শিকড় আমাদের মনের গভীরে, দুর্মর প্রাণ নৈর্ব্যক্তিক আবেগে নির্নিমেষ চোখ মেলে থাকে, উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে দেশ, আসন্ন সমাজ কাঁপে চৈতন্যের সম্ভাবনায়, অবশ্যম্ভাবিতায় বীজ কম্প্র নীল অন্ধকারে বর্শার ফলার মতো, পাহাড়ের চূড়ার মতন। বিসংবাদের মধ্যেই উজ্জীবনের সমাধান হেঁকে যায়··।"
>
> (বিষ্ণু দে)

এখন আমরা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর কয়েকটি বাংলা উপন্যাসের কথা প্রসঙ্গক্রমে আলোচনা করব। এ-আলোচনা কোনোক্রমেই প্রতিটি শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের আলোচনা নয়। তার প্রয়োজনও বর্তমান লেখক অনুভব করেন না। যে-কোনো দিক থেকেই হোক, দোষে অথবা সম্ভাবনায় তাৎপর্যপূর্ণ—এমন কয়েকটি গ্রন্থের আলোচনা করা হবে।

•• চার ••

যুদ্ধ-দুর্ভিক্ষ-দেশবিভাগেব ফলে আঘাতপ্রাপ্ত মূল্যবোধেব সম্মুখে অবক্ষয়ের হাত থেকে রেহাই পাবাব জন্য ইতিহাস-ভূগোল আশ্রয়-বাসনা যেমন প্রবল হয়ে উঠল, বাংলা উপন্যাসের টেকনিকেব বিকাশও তেমনি ব্যাহত হল নানাভাবে। জীবনকে খুঁজতে গিয়েই টেকনিকেব উপলব্ধি এবং ভাঙাগড়া। ধূর্জটিপ্রসাদ-গোপাল হালদাব যে চিন্তাধাবা ও চেতনাস্রোতকে ব্যবহাবেব ইঙ্গিত দিয়েছিলেন তিবিশেব কালে—অথবা তাবাশঙ্কব, বিভূতিভূষণ, মানিক যে ঔপন্যাসিক কনটেণ্টজ্ঞানের পবিচয় দিয়েছিলেন, চতুর্থ-পঞ্চম দশকে ইতিহাস ভূগোলকে আশ্রয় করায় কনটেণ্ট এবং টেকনিকেব সে দায় তাঁদেব মানতে হল না। শিল্পীব দিক থেকে সকল ক্ষেত্রে না হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ এক শ্রেণীব সুবিধাবাদেব জনক। এবং সেই সুবিধাবাদী মনোভাব তখনই প্রকট হযে উঠেছে যখন স্থানগত পবিবর্তনেব নাম কবে সৃজন কবা হয়েছে বিস্ময, পাঠকেব বিমূঢ অজ্ঞতাকে ভাবা হয়েছে বসসিদ্ধিব সহজ সোপান, যখন কালগত পশ্চাদপসবণেব নাম করে স্বেচ্ছাবিহাবী নিবঙ্কুশতাকে ভাবা হয়েছে কাহিনীগত সাফল্যেব স্বর্ণ-সড়ক।

তাই বাংলা সাহিত্যেব পবিধি বা দিগন্তেব বিস্তৃতিও দৃষ্টিপাতেব মতোই আব এক ধবনেব সংবাদ-পিপাসাব—পঙ্গু কৌতূহলেব পরিনিবৃত্তি। কলকাতায় বড়ো অস্বাস্থ্য, অতএব চলো যাই বায়ু পবিবর্তনে, প্রায এই সূত্রকে অনুসবণ কবেই যেন ভাবা হযেছে নগবজীবন বন্ধ্যা, চলো যাই পাহাড়ে পর্বতে দ্বীপে দ্বীপান্তবে। যেন জীবন নামক ব্যাপাবটা কখনো সংসাবে থাকে, কখনো সংসারে থাকেই না, তখন সে থাকে শ্মশানে, অথবা জঙ্গলে। অপবিচিত পবিবেশ, আঞ্চলিক ভাষা লেখককে পাঠকেব কাছে সর্বজ্ঞ কবে তোলে। লেখকও সর্বজ্ঞ হবাব লোভ সংববণ কবতে না পেবে যথাসম্ভব পুঙ্খানুপুঙ্খ খুঁটিনাটি জ্ঞানেব বিস্তৃত পসবা মেলে ধবেন। ফলে বহু ক্ষেত্রেই উপলক্ষ্য বড়ো হয়ে লক্ষ্যকে গ্রাস কবেছে, ঔপন্যাসিকেব নিরাসক্তিব ঘটেছে ভরাডুবি।

আবাব ইতিহাসকে আশ্রয় কবে যেখানে সমকালকে পরিহাব কবেছেন লেখকেবা, সেখানেও তাঁবা মনে কবেছেন ইতিহাসের পুঞ্জীভূত তথ্যবাশিব সঙ্গে কাহিনীব চুনবালি কোনোক্রমে মেশাতে পাবলেই বুঝি উপন্যাসেব প্রাসাদ খাড়া করা যাবে। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকেব জীবনযাত্রাব বিবরণকে প্রত্যক্ষ করে তোলাতেই যে উপন্যাসের সার্থকতা নয়—জীবনেব প্রাণস্পন্দন তথা ব্যক্তির

সংঘাতময় বিকাশকে মুখ্য করে দেখানোতেই যে তার প্রধান পরিচয়, চতুর্থ-পঞ্চম দশকের ইতিহাস-নির্ভর উপন্যাসগুলিতে সে সত্যের সমর্থন খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। এখানেও পাঠকের কৌতূহল-বৃত্তিকেই পরিচর্যা করা হয়েছে। যখন আমরা অনেক কিছু হারিয়েছি তখন আমাদের হাতিশাল, ঘোড়াশাল, পালকি, হাওদা, গণিকা, বেড়ালের বিয়ে, পায়রা এবং জড়োয়ার গয়নায় গল্প শুনতে নিদ্রাপিপাসু বালকের মতোই ভালো লেগেছে। সাহেব বিবি গোলাম ও আকাশ-পাতালের জন-অভিনন্দনের মূল কারণ এখানে।) গোপাল হালদারের ভূমিকা-জাতীয় উপন্যাসে সাধারণ পাঠকের আসক্তি ছিল না। এর কারণ গোপালবাবু যে পরিমাণে উপন্যাসে ইতিহাস-চেতনাকে ব্যবহার করেছেন, সে পরিমাণে জীবনের রঙ ধরাতে পারেননি।

সাহেব বিবি গোলামের ঐতিহাসিক ত্রুটি নিয়ে অনেক আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু ঐতিহাসিক ত্রুটিগুলিই ঔপন্যাসিক ব্যর্থতার একমাত্র হেতু নয়। যে সামন্ত পরিবারের পতনের কাহিনীকে উপন্যাসের মূল উপজীব্য করা হয়েছে তার মধ্যে কল্পনার অসঙ্গতিই সেই পতনকে বিশ্বাস্য করে তুলেও তাৎপর্যে অন্বিত করতে পারেনি। ছোট বৌয়ের ব্যক্তিগত পরিসমাপ্তি ব্যক্তিত্বের গদ্যচ্ছন্দে না ঘটে গল্পের বৃত্ত পূর্ণতার তাগিদে ঘটেছে। যন্ত্রণার যে সমস্ত ছোট ছোট ক্ষীণ উৎস এ-উপন্যাসে স্বাভাবিক ভাবেই ছিল, ছোট বৌয়ের স্বামীর ওপর অধিকার হারানোর বেদনা, বংশীর ভালবাসা, সকলই স্বাভাবিক পরিণতি লাভ করতে পারত। জীবন সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার অভাব এবং কল্পনার দৈন্য উভয় ক্ষেত্রে কৃত্রিমতার আশ্রয়ী হয়ে ট্র্যাজেডি এবং মহিমার সন্ধান করেছে। ফলে শালাবাবু দাস মহিমা থেকে বাঁচেনি অথচ শেষ পর্যন্ত প্রেমের উপন্যাসের নায়কও হতে পারেনি। ছোট বৌ ট্র্যাজিক মহিমার জন্য প্রস্তুত কখনই ছিল না, মাঝখান থেকে সে হয়ে দাঁড়াল করুণার পাত্রী। ঔপন্যাসিকের অসঙ্গতির জন্যই ঐতিহাসিক ত্রুটিগুলি অত প্রকট হয়েছে।

গল্প কথনের অসামান্য নৈপুণ্য সত্ত্বেও এই ত্রুটি অধিকতর তাৎপর্যহীন হয়েছে তারাশঙ্করের রাধা উপন্যাসে। মোগল আমলের শেষ পাদে বর্গির হাঙ্গামা অধ্যুষিত বাংলার ধর্মীয় সাধনার পটভূমিতে লিখিত এই উপন্যাসে যে পরিমাণে চড়া রঙের ব্যবহার সে পরিমাণে কান্তি নেই। এ-অভিজ্ঞতার রসরূপ নির্মাণে কোন্ বিশিষ্ট বক্তব্য দ্যোতনা লাভ করল তা স্পষ্ট হয়নি। সাহেব বিবি গোলাম, রাধা প্রমুখ বেশ কিছু সংখ্যক ইতিহাসগত উপন্যাসের মধ্যে যেটি অপেক্ষাকৃত

শিল্প-সফল, সেটিও এই উপন্যাসগত দৈন্য থেকে একেবারে মুক্ত নয়। এটি বিভূতিভূষণের ইছামতী। অক্লেশে এবং অবলীলায় উপাদানের ব্যবহারে, বিধৃত কালখণ্ডের চিত্রণে, তৎকালীন সমাজের বাস্তব অভিজ্ঞতায় এই উপন্যাসটি এই ধরনের সমুদয় উপন্যাসের মধ্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। কেরী সাহেবের মুন্সিতে বহু কাঠখড় পুড়িয়ে প্রমথনাথ বিশী সময়-সমাজ চিত্রণে যে সাফল্য লাভ করেছেন, অল্প আয়াসে বিভূতিভূষণ সে-ক্ষেত্রে সামান্য উপাদানে সে কালকে ফুটিয়েছেন সুন্দর ভাবে। নীলকর সাহেবদের কথা, নীলের নায়েব, নীলচাষীদের বিদ্রোহ, কৌলীন্য প্রথা, বহুবিবাহ, সে কালের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, অনাড়ম্বর নির্লোভিতায় চিত্রিত হয়েছে। যে নির্দ্বন্দ্ব স্নিগ্ধতা বিভূতিভূষণের কবি-ব্যক্তিত্বের প্রধান উপাদান তা যদিও এ-উপন্যাসে পরিণতিকে স্পষ্ট হতে দেয়নি—যদিও নায়কের জীবন যেন শান্তি থেকে অধিকতব প্রশান্তিতে যাত্রারূপে কল্পিত হওয়ায় উপন্যাসের ছন্দের ব্যাঘাত ঘটেছে, তথাপি পাঠক মনেব ওপরে সেই অতীত দিনেব আলোকরশ্মি সম্পাতে তিনিই সফলকাম, এ-কথা চতুর্থ ও পঞ্চম দশকের একাধিক অতীতাশ্রয়ী উপন্যাস পাঠান্তে আমাদের স্বীকাব করতে কোনো বাধা নেই।

এই ধরনেব উপন্যাসের সমগ্র কল্পনাব অসঙ্গতিব আর একটি লক্ষণ এই যে গৌণের প্রলোভনে মুখ্য প্রায়শই হাবিয়ে যায়। যেমন ছোটখাট খুঁটিনাটির অরণ্যে হাবিয়ে যায় ইতিহাসের সত্য, তেমনি চরিত্র বিশেষেব ওপর নির্ভর-আতিশয্যে নষ্ট হয় উপন্যাসের ভারসাম্য। কেরী সাহেবেব মুন্সির কাহিনী এই ভাবেই হয়ে ওঠে রেশমির কাহিনী। রেশমিব সাফল্যকেই লেখক এবং বহু ক্ষেত্রে সমালোচকেরা উপন্যাসের সাফল্য বলে ভেবেছেন। অথচ এ-কথা আমবা সকলেই জানি যে উপন্যাসে বিশ্লিষ্ট কিছুব একক সাফল্যের কোনো মূল্য নেই। বেশমির প্রাধান্য কেরী সাহেবের মুন্সিকে গ্রাস কবে ফেললে যুগচিহ্নিত তাৎপর্যে বাম বসুকে, তাব দ্বন্দ্ব-সংঘাত বাসনা-কামনাকে আর ফুটিয়ে তোলা যায় না। প্রমথবাবুব এই সর্বাপেক্ষা সুলিখিত উপন্যাসেও যায়নি। নতুন কালের মানুষ হিসাবে রামরাম বসুকে স্থাপিত করতে হলে রামরাম বসুর কীর্তি-বাসনা সত্যিই কীর্তি-বাসনা না সুবিধাবাদ এ-সম্বন্ধে লেখকের স্পষ্ট সিদ্ধান্ত থাকা দরকার। রামরাম বসুর মনের সংশয় লেখকেরও সংশয় হলে খণ্ডিত ইতিহাস চেতনা নতুন কালের চরিত্রাঙ্কনে ফলপ্রসূ হয় না। রামরাম বসু স্রোতের মুখে শৈবালের মতো ভাসতে থেকেছে—লেখকের কৌতুকপ্রিয় মন তা দেখে কিছু

রস নিষ্কাশন করেছে বটে কিন্তু যে ঐতিহাসিক তাৎপর্যের রসরূপ প্রদানে এ-জাতীয় উপন্যাসের সিদ্ধিলাভ ঘটে তার অভাব প্রতিপদেই অনুভূত হয়।

একটা কথা এখানে স্পষ্ট করে বলা দরকার। বর্তমান সমালোচক এ-কথা মনে করেন না যে চতুর্থ অথবা পঞ্চম দশকে ঐতিহাসিক লক্ষণাক্রান্ত অতীতাশ্রয়ী উপন্যাসগুলির অসাফল্যের হেতু তাদের বিষয়বস্তুর মধ্যে নিহিত। ঐতিহাসিক কাঠামোয় উপন্যাসের কাহিনী গাঁথার বিরুদ্ধে আমাদের কোনো ফতোয়া নেই। বরঞ্চ জেম্‌স্‌ সাহেবের পরামর্শ স্মরণে রেখে বলা যায় যে লেখকদের বিষয়বস্তুগত স্বাধীনতা সম্পূর্ণ স্বীকার্য। আমাদের অনুসন্ধেয় শুধু এই যে বিষয়বস্তুর শিল্পময় প্রয়োগের পথ ধরে তিনি উপন্যাসে কোনো সার্থকতায় পৌঁচেছেন কিনা। এই শেষ, কিন্তু প্রধান জিজ্ঞাসার সামনে বিভূতিভূষণ ছাড়া সকল ঔপন্যাসিকই নীরব। রমাপদবাবুর লালবাঈ-এর বেগবান কাহিনীস্রোত কিংবা গজেন্দ্রকুমার মিত্রের কলকাতার কাছেই উপন্যাসের মধ্যবিত্ত ইচ্ছা-পূরণের ইতিহাস-লীলা এই উত্তরহীনতার জন্যই তাৎপর্যহীন। সে ক্ষেত্রে বিভূতিভূষণ নিজস্ব পদ্ধতিতে একটা জীবন বিষয়ক বক্তব্যে উপস্থিত হয়েছেন। কাল-কালান্তর, নরকালের জন্ম প্রমুখ ব্যাপার নিয়ে তাঁর কোনো মাথাব্যথা নেই। তিনি যুগাতিক্রান্ত মানব-জীবনধারাকে, ইছামতীর প্রতীকে যার পূর্ণ ব্যাখ্যা, ছোট সুখ-দুঃখের ভিতর দিয়ে জীবন্ত করেছেন। উপন্যাসের শেষাংশের করুণ সুরে যে জীবন মুগ্ধতার পরিচয়—তা নিরবচ্ছিন্ন অপরিমেয় জীবন লীলা সম্বন্ধে পাঠককে যুগপৎ স্নিগ্ধ করে এবং ব্যথিত করে। ভূতকে পিণ্ড দিলে সে মানুষ হয়ে যায়। নীলকর সাহেবদের উদ্দেশে প্রদত্ত দেশীয় প্রেমিকার পুষ্পাঞ্জলি পেয়ে নীলকর সাহেবও এখানে মানুষ হয়ে গেছে। যে দুর্বলতায় অধিকাংশ অতীতাশ্রয়ী উপন্যাস চিহ্নিত এবং ভারাক্রান্ত, ইছামতী তা থেকে মুক্ত এই জীবনীশক্তির জোরেই। অন্যদের ক্ষেত্রে এ-দুর্বলতার প্রধান প্রমাণ কাহিনীকে বর্ণাঢ্য এবং প্রচণ্ড কৌতূহলময় করে সাজানোর ভিতর বিদ্যমান। তারা মনে করেন যখন সিপাহী বিদ্রোহ সম্বন্ধে কিছু লিখতে হবে তখন বিদ্রোহের তাৎপর্যকে কল্পনায় ও মননে ধারণ না করে নানা সাহেব বা অনুরূপ কারো সম্বন্ধে অনাবশ্যক কৌতূহলকে ব্যবহার করাই ইতিহাসগত জীবন-ব্যাখ্যার পরাকাষ্ঠা। সে-ক্ষেত্রে বিভূতি-ভূষণের অসামান্য সংযমসিদ্ধ নির্লোভ কাহিনী মানুষের শাশ্বত মূর্তিকেই একটা সময়খণ্ডের পটে ধারণ করতে পেরেছে।

•• পাঁচ ••

উপন্যাসের অভিনব বিষয়বস্তু নির্বাচনের জন্য অপরিজ্ঞাত-পূর্ব আঞ্চলিক জীবন-যাত্রার সন্ধানে বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যেব ভৌগোলিক বিস্তৃতি-সাধন ঘটল চতুর্থ আব পঞ্চম দশকে। আমরা আবাবও বলছি যে এ বিস্তৃতি-সাধনেব প্রয়াসে আমাদের কোনো আপত্তি নেই। ববঞ্চ অভিজ্ঞতাকে সর্বতোচারী কবে তোলার এই প্রচেষ্টা কথাসাহিত্যের স্বাস্থ্যবক্ষাব তাগিদেই প্রয়োজনীয় ছিল। এখানেও বিষয়বস্তুর সার্বিক স্বাধীনতাকে আমবা স্বীকাব করি। কিন্তু এখানেও একই সতর্কবাণী উচ্চার্য—বিষয়বস্তু নিজে একাকী শিল্পসিদ্ধিব নিয়ামক নয়। এ-জাতীয় অধিকাংশ উপন্যাসেই দেখা গেছে অভিনব হবাব প্রাণপণ প্রয়াসে অভিজ্ঞতার প্রদর্শনী সৃজনই যেন লেখকদেব উদ্দেশ্য। আঞ্চলিকতা একটা আধার, সেই আধাবে ধৃত জীবন-জাহ্নবীর জল লেখক আহবণ কববেন—এমনটাই বাঞ্ছনীয়। যদি দেখা যায় আধাবটিকে ঘুবিয়ে ফিবিয়ে সযত্নে অলংকৃত করতে গিয়ে হাবিয়ে বসেছেন সব আধেয়টুকু—তবে তাকে বিড়ম্বিত প্রয়াস ছাড়া আব কিছু বলা যায না। ভাবতীয় অলংকারশাস্ত্রে যাকে বিস্ময় বস বলা হয় তাব সঙ্গে এ-জাতীয় বচনায় ঔপন্যাসিকেবা যে strangeness-কে মূলধন কবে থাকেন তাব কোনো সংযোগ নেই। অথচ পদ্মানদীব মাঝিদেব কথায় মানিকবাবু আঞ্চলিক ভাষা, আঞ্চলিক জীবনকে পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসবণ কবেও জীবনেব গভীর নদীপ্রতিম বহস্যকে কেমন উদ্ভাসিত কবে তুললেন। আঞ্চলিক-তাকে অতিক্রম কবাই আঞ্চলিক কথাসাহিত্যেব শেষ লক্ষ্য। সে-কথা চতুর্থ-পঞ্চম দশকেব ঔপন্যাসিকেবা মাত্র মৌখিক সূত্রে জানেন। এই বোধেব সম্যক ব্যবহাব না ঘটায় মনোজ বসুব বিখ্যাত উপন্যাস জল-জঙ্গল, জল ও জঙ্গলেব বিশ্বাস্য বাস্তবালেখ্য হিসাবে চমৎকাব হযেও উপন্যাসেব মহিমায় বিশিষ্ট হতে পারেনি। শিল্পীব আন্তবিকতা তাব বিচিত্র অভিজ্ঞতাকে বসসিদ্ধির পথে নিয়ে যায়। কিন্তু সে-আন্তবিকতা শিল্পীব সদিচ্ছামাত্র নয। জীবন বহস্যেব গভীব উপলব্ধিতে ও জীবনার্থ সন্ধানের তীব্র প্রেবণায় এবং টানে সে আন্তবিকতাব অনিবার্য আবির্ভাব। সে উপলব্ধি যেখানে নেই আন্তবিকতাব বিকল্প হিসাবে সেখানে নানা পল্লবগ্রাহিতাব ডাক পড়ে।

আঞ্চলিক জীবন এবং প্রায়ই অন্ত্যজ জীবন অথবা অপবিচিত শ্রমজীবী-জীবনকে অবলম্বন কবে নবীন লেখকদেব হাতে যে কটি উপন্যাস লেখা হয়েছে তার মধ্যে আলোচনার যোগ্য বা উল্লেখযোগ্য উপন্যাস তিনটি—সতীনাথ ভাদুড়ীব ঢোঁড়াই

চরিতমানস, অদ্বৈত মল্লবর্মণের তিতাস একটি নদীর নাম এবং সমরেশ বসুর গঙ্গা। তিনটি উপন্যাসেই লেখকদের বিষয়বস্তু নির্বাচনের ব্যক্তিগত সাহস অভিজ্ঞতার প্রসারিত রূপের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। তিনজনেই ধৃত বিষয়কে এমনভাবে নিঃশেষে ব্যবহার করেছেন যে পাঠান্তে পাঠকের মনে এই ফলশ্রুতির উদয় হয়—এর বেশি কিছু এ-জীবন সম্বন্ধে আমরা আর জানতে পারতাম না।) কিন্তু এই তিনটি উপন্যাসেও দেখা যায় যে উপন্যাসের পটকে এঁরা যত চেনেন, পটলগ্ন ব্যক্তির ছন্দকে শেষ পর্যন্ত তেমন নিষ্ঠায় রূপময় করতে পাবেননি। তাই ঢোঁড়াই চরিতমানসের প্রথম খণ্ডের আশ্চর্য বিকাশশীলতা দ্বিতীয় খণ্ডে বাধাগ্রস্ত এবং অবসিত। তাৎমাটুলির প্রাকৃত পরিবেশে বুনো লতার মতো বৃদ্ধি এবং শেষে উন্মূলতা, আমাদের যে ঢোঁড়াইয়ের সমব্যথী করে, দ্বিতীয় খণ্ডের শেষে অসীম শূন্যতার মুখোমুখি সেই লোকটা শুধু করুণার উদ্রেক কবে গেল। প্রথম খণ্ডের পরে আর তার ব্যক্তিজীবন আমাদেব কাছে নবীন বিকাশের কোনো তাৎপর্য সৃষ্টি কবেনি। আগস্ট আন্দোলনেব পটে তার নতুন অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও এ-কথা সত্য। কিন্তু প্রথম খণ্ড ঢোঁড়াই চরিতমানস বাংলা সাহিত্যে তুলনারহিত। বৌকাবাওয়া, গান্‌হি বাবা, বটহিয়ার গান, রেবণগুণী,—চেতনার প্রাথমিক স্তরে পড়ে রয়েছে এমন একদল মানুষের অতি মন্থব বিবর্তনকে ঢোঁড়াইয়ের আশৈশবের সঙ্গে যুক্ত করা অতীব দুরূহ—সতীনাথবাবুর শক্তিশালী লেখনী সে কাজে পারঙ্গম ছিল এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। বৌকাবাওয়া সতীনাথবাবুব শক্তির স্মাবক-চিহ্ন হয়ে থাকবে।

ব্যক্তির বিকাশের এই শর্তকে তিতাস একটি নদীর নামে অনুসরণ করার প্রয়োজন লেখক অনুভবই করেননি আদপে। তিতাসের মন্থর স্রোতের পাশেপাশে উদাসীন মালোপাড়ার জন্ম-বিবাহ-মৃত্যু জড়িত জীবিকার ছবিকে কাব্যময় ভাষায় ফুটিয়ে তুলেছেন অদ্বৈতবাবু। তিতাসের স্রোতের মতোই ভাষাতেও এসেছে একটা মৃদু সঙ্গীত—যা জীবনের মৃদু এবং মেদুর, সুখ এবং দুঃখকে ধ্বনিত কবেছে অসীম নীলাকাশের অঙ্কশায়ী নদীর অস্পষ্ট এবং চিরন্তন তরঙ্গ কল্লোলের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে। অথচ ব্যক্তির বিকাশের সূত্রকে লঙ্ঘন করেও তিতাস নদীর মালোদের কাহিনী ডকুমেণ্টারি আলেখ্যে রূপান্তরিত হয়নি। ববঞ্চ যা বলা হয়েছে—বইখানি যেন নদীর পাঁচালি হয়ে উঠেছে। লেখক যেন এখানে কোনো ব্যক্তির কাহিনীকে ধারণ করতে চান না। নদীর যেমন বিশেষের প্রতি কোনো পক্ষাপাত নেই, কাহিনীও তেমনি এখানে বিশেষ কিছুর

ঘাটে বাঁধা নয়। এখানে স্নিগ্ধ বিষণ্ণ জীবনের করুণ শ্রীটুকু পলকে-পলকে মূর্তি ধারণ করেছে—এবং কোনো ভাবপ্রবণ অশ্রুর মূল্যে সে-কারুণ্যকে অমর্যাদা করতে হয় না। উপন্যাস পাঠের ফলশ্রুতি তিতাস একটি নদীর নাম পাঠ করে অবশ্যই মেলে না। সেই পূর্ণবৃত্ত অভিজ্ঞতার সমগ্র রসরূপ এখানে নির্মিত হয়নি, এও ঠিক। কিন্তু জীবনমুগ্ধতার অক্ষয় সম্পদের একটা সমালোচনা-নিরপেক্ষ শ্রী আছে, সেই সম্পদে বইখানি সম্পন্ন।

গঙ্গা সেই সমগ্রতার সন্ধানে আর-একপদ অগ্রসর রচনা, যদিও তিতাসের শান্ত নিয়তি বা অদৃষ্টবোধজনিত উদাসীন শ্রী থেকে তা বঞ্চিত। কিন্তু এও স্মরণীয় যে সমরেশ বসুর লক্ষ্য তা ছিল না। নদীসূত্রে গ্রথিত অদৃষ্ট তিতাসের কাহিনীতে মূল বোধ হিসাবে কাজ করেছে। নদীর প্রতিকূলতার সঙ্গে জড়িত মৃত্যুবোধ গঙ্গার মূল চেতনা। সমরেশবাবু কাহিনীর শেষার্ধে এই মৃত্যুবোধকে স্তিমিত করে এনেছেন হিমির খাতিরে। যতক্ষণ তা করেননি ততক্ষণ গঙ্গার খরস্রোতের সঙ্গে সেই মৃত্যু-চেতনাকে মিলিয়ে উপন্যাসের ঈপ্সিত গতিতে শিল্প-সাফল্য সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। উপন্যাসের নায়ক বিলাস সমরেশবাবুর সাহিত্য-জীবনের তো বটেই, চতুর্থ-পঞ্চম দশকের উল্লেখযোগ্য চরিত্র-সৃষ্টিগুলির মধ্যেও অন্যতম। অভিনব বিষয়বস্তুকে আঁকড়ে ধরার যে-ব্যক্তিগত সাহসিকতায় সমরেশবাবু বর্তমান বাংলা সাহিত্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী তার পরিণত ফসল গঙ্গায়। বিলাসের উপসংহার বিষয়ে আমাদের শিল্পগত আপত্তি সত্ত্বেও এ-কথা ন্যূনাধিক পরিমাণে স্বীকার্য। হিমি বইখানির সর্বাপেক্ষা দুর্বলতম অংশ। তার ভালবাসায় মধ্যবিত্ত নায়িকার ধাঁচ এসে পড়ায় বিলাসের সমুদ্র-যাত্রার ফলশ্রুতি সৃজিত হয়নি। অবশ্য বিলাস সমুদ্রে যেতে না-পারলে, অথচ সমুদ্রের আহ্বান অহরহ তার বুকে বাজতে থাকলে বইখানি জীবনের গভীর তাৎপর্যে আলোকিত হত—শুধু জেলেদের কাহিনীই হত না। ডিটেল সম্বন্ধে অতি-সতর্কতায় এ-গ্রন্থেও চতুর্থ ও পঞ্চম দশকের পাঠকের সংবাদগত কৌতূহল-বৃত্তিকে তুষ্ট করার প্রবণতা প্রকাশিত। সমরেশবাবু বর্তমান বাংলা সাহিত্যে বৈপরীত্যের এক আশ্চর্য সমাবেশ। হিমিকে দেখলে স্বতঃই মনে হবে সমরেশ বসুর নারীচরিত্র-গুলি একেবারেই কল্পনাসিদ্ধ নয়, একই নারীর বিভিন্ন ঘোরফেরকে তিনি বিভিন্ন নামে হাজির করেন, কিন্তু পাঁচুর কথা মনে পড়লেই, বিশেষ তার মৃত্যুর সিচুয়েশন—স্তম্ভিত হতে হবে লেখকের বাস্তব জ্ঞানে ও তার রূপায়ণের ক্ষমতায়।

গঙ্গা সম্বন্ধে প্রাসঙ্গিক আপত্তিগুলিকে ধামা চাপা না-দিয়েও, যুদ্ধোত্তর বাংলা সাহিত্যের তথাকথিত অভিজ্ঞতার অভিনব উপন্যাসগুলির বিপুল ব্যর্থতার দিকে তাকিয়ে এ-কথা বলতে হয় যে, গঙ্গার ঔপন্যাসিক দৃঢ়তা এ-জাতীয় অন্য উপন্যাসগুলির তুলনায় সিদ্ধির অনেক নিকটতর। ব্যক্তিরূপে বিলাস গঙ্গার ক্ষুরধার পটভূমিকায় আশ্চর্য বীর্যবানরূপে চিত্রিত হওয়ায়, মধ্যবিত্ত পঙ্গুতার প্রতিক্রিয়ায় আমাদের ভালবাসাকে ন্যায়তই আকর্ষণ করে। জীবনের চলিষ্ণু মূর্তি, শ্রমে-স্বেদে-শ্রান্তিতে অপরূপ, কিন্তু আকাঙ্ক্ষায় দুর্মর মানুষ—সমরেশ বসু এই ব্যাপারটুকুকেই তাঁর সাহিত্য-জীবনের সম্বল করেছিলেন। এ-সম্বলের মহত্ত্ব কোথায় বিলাসকে দেখলে তা বোঝা যায়। কিন্তু সমরেশবাবু এই বিষয়-গৌরবের কোনো সার্থকতর শিল্পগত প্রমাণ উপন্যাসের ক্ষেত্রে আর দিতে পারেননি। তাঁর অভিজ্ঞতা ও কল্পনার দৈন্য দুইই সমপরিমাণে প্রকট হয়েছে কলকাতাই মধ্যবিত্ত জীবন-ভিত্তিক উপন্যাস ত্রিধারায়। এখানে দেখা যায় যে, যে-সমাজের প্রকৃত চেহারা এবং প্রকৃত সংকট কোনোটিকেই তিনি চেনেন না, তার কতগুলি একান্ত বহিরঙ্গ পরিচয়কেই তিনি সর্বস্ব বলে ভুল করেছেন। এই গ্রন্থের নায়ক-পরিকল্পনায় গোরা উপন্যাসের আদর্শ ব্যবহার সে-কারণেই হাস্যকর হয়েছে।

•• ছয় ••

আমরা সাম্প্রতিক বাংলা উপন্যাস-বিষয়ক আলোচনার প্রারম্ভে এ-কথা বলেছিলাম যে সমকালের দ্বন্দ্বময় মূর্তিকে স্বীকার করে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে যুদ্ধ-দুর্ভিক্ষ-দেশবিভাগে জর্জরিত বাংলা দেশের অবক্ষয়িত অবস্থাকে ব্যাখ্যা করতে অস্বীকৃত হয়ে স্থানগত এবং কালগত পশ্চাদপসরণ করে বাংলা দেশের উপন্যাসের দুই মূর্তি গড়ে উঠেছে। তার এক মূর্তিতে অতীতাশ্রয় বাসনা অথবা অপরিজ্ঞাত-অঞ্চলমুখিনতা। কিন্তু এরই সঙ্গে-সঙ্গে বাংলা উপন্যাসের সমকাল-মুখিনতার প্রবহমান স্রোতটুকুও কম মূল্যহীন নয়। বরঞ্চ বলা যেতে পারে যে সমকাল এবং কলকাতাকে অবলম্বন করে বাঙালী মধ্যবিত্তের জীবনের নতুন জটিলতা এবং জিজ্ঞাসাকে যাঁরা উপন্যাসে ব্যবহার করলেন, তাঁরাই প্রকৃতপক্ষে তিরিশের ধারাবাহী এবং ভবিষ্যতের ইঙ্গিত। যে-অবক্ষয়, স্থায়ী মূল্যবোধগুলির ভাঙন এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশ্বাসহীনতা বাঙালী মধ্যবিত্তকে যুদ্ধ পরবর্তীকালে জর্জরিত করে ফেলল, এমন কি তার আঘাতে বেদনাবোধ এবং মৃত্যুতে দুঃখবোধ, এ-সবও যখন হারিয়ে যাওয়ার মুখোমুখি, তখন বাঙালী ঔপন্যাসিকদের এক

সংখ্যালঘিষ্ঠ জীবননিষ্ঠ অংশের রচনায় এই অবক্ষয়িত চেহারার প্রতিফলন দেখা গেল।)

চতুর্থ ও পঞ্চম দশকের সমকালীন কলকাতাকে নিয়ে যাঁরা উপন্যাস লিখেছেন তাঁদের মধ্যে তারাশঙ্কর এবং মানিকবাবুর কথা ছেড়ে দিলে পৃথক ভাবে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেন বুদ্ধদেব বসু। তাঁর রচিত তিথিডোর উপন্যাসখানি যদিও আমাদের পূর্ব অনুচ্ছেদে কথিত সংজ্ঞার মধ্যে পড়ে না, তথাপি কলকাতার ছা-পোষা মধ্যবিত্ত জীবনের যা কিছু গৌরব, তার যা কিছু সততা সমস্তের আশ্চর্য পরিবার-কেন্দ্রিক চিত্র তিথিডোর। উপন্যাসটির প্রধান পাত্র-পাত্রীদের বাদ দিয়ে বলা যেতে পারে যে সমগ্র রচনাটি যে ব্যক্তির পরম স্নেহের আলোকে সমুজ্জ্বল হয়ে রয়েছে তিনি রাজেনবাবু, নায়িকার পিতা। নির্দ্বন্দ্ব স্নিগ্ধতার প্রতি বিভূতিভূষণের ন্যায় বুদ্ধদেববাবুরও পক্ষপাত আছে। তার শিল্প-সার্থক মূর্তি গঠিত হয়েছে রাজেনবাবুর পরিবারকে ঘিরে। স্নেহে প্রেমে পরিপূর্ণ একটি মধ্যবিত্ত পরিবারে ছন্দোপতনের মতো হারীত এবং বিজন বুদ্ধদেববাবুর উপন্যাস-বিষয়ক চিন্তার দৌর্বল্যের নিদর্শন এ-কথা মেনে নিয়েও, এই উপন্যাসকে, যে স্নিগ্ধ দিনগুলি আর একটু পরেই বাংলা দেশ হারিয়ে ফেলল তার শেষ অকৃত্রিম চিহ্ন হিসাবে আমরা মনে রাখব। বিজন এবং বিজনের ব্যবসায়ের [illegible]দেব মজুমদার তৎকালীন বাংলা দেশের আসন্ন পতনের পূর্বাভাস। বুদ্ধদেববাবু তাদের চিনতেন না, আমাদের চেনাতেও চাননি, সেটা এ-উপন্যাসের সামগ্রিকতার পক্ষে সুসঙ্গতই হয়েছে। আর একটি কারণে তিথিডোর উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে ভবিষ্য-প্রভাবী। উপন্যাসটির উপসংহারে স্রোতোময় চেতনার বাহন হিসাবে যে জয়েসীয় গদ্যরীতির সফল নিরীক্ষা, তা পঞ্চম দশকের বাংলা সাহিত্যের নবীন পরীক্ষাশীলদের কাছে পূর্বসূরী হিসাবে সক্রিয় হয়ে রয়েছে।

কিন্তু কাল যে প্রবল এবং কালবৈগুণ্য যে প্রবলতর তা বোঝা গেল বুদ্ধদেববাবুর নির্জন স্বাক্ষর পাঠ করে। যে আত্যন্তিক বিনষ্টির চেতনা জীবনানন্দকে ক্রমশই করে তুলেছিল ধূসর, সেই হতাশ্বাস অবস্থাকে বুদ্ধদেববাবুর মতো নির্দ্বন্দ্ব স্নিগ্ধতার উপাসকও যে এড়াতে পারছিলেন না নির্জন স্বাক্ষরে তা স্পষ্ট। নির্জন স্বাক্ষরের মতো ঘোরালো প্লট বুদ্ধদেব বসুর আর একখানি উপন্যাসেরও নেই। বোঝা যায় যে নবাগত জটিলতা তাঁকে স্পর্শ করেছে কিন্তু এও বোঝা যায় যে এ-জটিলতার আহ্বানকে গ্রহণ করার উপযুক্ত পাত্র তিনি নন। তার জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হয়েছে বিমল মিত্র, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, সন্তোষকুমার ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র

পর্যন্ত। বিমল মিত্রের ছাই উপন্যাসে যুদ্ধকালীন বিপর্যয়কে ধারণ করার প্রথম প্রয়াস এবং সবিশেষ আন্তরিক প্রয়াস সর্বদা স্মরণীয়। তাঁর বাস্তবকে জানার ব্যগ্রতা যে কত গভীর ছিল এ-বইখানি তার প্রমাণ। আবার জীবনের অবক্ষয় এবং মৃত্যুর ব্যভিচার আমাদের কোন্ পঙ্গু অসহায়তার মধ্যে নিয়ে গিয়েছিল জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর বারো ঘর এক উঠোন উপন্যাসখানি তার একটি স্মারক-স্তম্ভ। এই উপন্যাসে লেখক তৎকালীন বাংলা দেশের রূপক নির্মাণ করেছিলেন নির্মম দুঃসাহসিকতায় এবং যে-নিরাসক্তি প্রায় নিষ্ঠুরতার সামিল তাকে তিনি প্রজ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের মতো জ্বালিয়ে রেখেছিলেন এই উপন্যাসে, যে-অগ্নিকুণ্ডে আমাদের এতদিনের শুনে-রাখা সমস্ত সুন্দর সুকুমার কথাগুলো এবং স্মৃতিগুলো পুড়ে ছাই হয়েছে। কোন্ কলকাতাকে দেখে, কোন্ জীবনের ছিন্নমস্তা মূর্তিকে দেখে, সহ্য করতে না পেরে স্থানগত এবং কালগত পশ্চাদপসরণ শুরু করেছিলেন তৎকালীন বাঙালী সাহিত্যিকেরা, তাকে জানতে গেলে পড়তে হয় বারো ঘর এক উঠোন। কত আমরা হারিয়েছি বিনা ক্রন্দনে তা যদি কোথাও বলা হয়ে থাকে তবে তা বলা হয়েছে এই একটি উপন্যাসে ও প্রবোধকুমার সান্যালের অঙ্গার নামক ছোট গল্পে। প্রবোধকুমার সান্যাল অঙ্গারে সংযম রাখতে পারেননি। ছোট গল্পের মিত পরিসরেও তিনি অসংযত হয়ে পড়েছিলেন গল্পের উপসংহারে। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী সে-ক্ষেত্রে নিষ্করুণ ও নিষ্পলক দৃষ্টিতে অগ্নি-দাহটিকে প্রত্যক্ষ করেছেন। এবং পরিশেষে ভস্মশেষটুকু নেড়ে-চেড়ে দেখিয়েছেন আর কোথাও এক কণা প্রাণাবশেষও বাকি রইল কিনা।

কিন্তু এই বিষয়-চেতনার মধ্যে একটা সংকট আছে। নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনের উক্ত অবক্ষয়ের চেহারাকে, তার স্বরূপকে ব্যাখ্যা করায় তদ্গত লেখক প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা যায় নিজ শিল্পজীবনের একটা চোরাবালি সৃষ্টি করে বসেন। এবং সেখান থেকে বেরিয়ে আসা তাঁদের পক্ষে আর সম্ভব হয় না। মধ্যবিত্ত জীবনের অতলগামী ক্ষয়িষ্ণুতাকে দেখতে দেখতে তাঁরা ভুলে যান, ঔপন্যাসিকের কাজ অর্জুনের অস্ত্র-পরীক্ষার কালে বিচ্ছিন্ন ভাবে পাখির মাথাটুকুকে দেখামাত্র নয়। সমগ্রকে জানা ব্যতীত ঔপন্যাসিকের মুক্তি নেই। এবং বাস্তবের দ্বন্দ্বময় স্বরূপকে না উপলব্ধি করা পযন্ত সমগ্রকে ধারণ করাও সাধ্যাতীত। তাই জ্যোতিরিন্দ্রবাবু বারো ঘর এক উঠোনের নিঃসংশয়িত লক্ষ্যভেদের পরে অকস্মাৎ দেখেন বিষয়বস্তু যেন নিঃশেষিত। নীল রাত্রি, মীরার দুপুর এবং বারো ঘর এক উঠোনের নামোল্লেখে কালানুক্রমিকতা রক্ষার এই জন্য কোনো প্রয়োজন নেই

যে এরা বিষয়-নির্বাচন, কাহিনী নির্মাণ ও বক্তব্য—কোনো বিবর্তনের সাক্ষ্যই বহন করে না। সমগ্রে পৌছলে সুখও নেই, দুঃখও নেই। তেমনি কালো অথবা সাদা তার কোনো রঙও নেই। জ্যোতিরিন্দ্রবাবু যেন সমকালীন জীবনকে নিষ্ঠুরের কালো রঙে ছুপিয়ে দেখাতে চান। তাঁর দৃষ্টি এর ফলে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। মানিকবাবুর মন্ত্র-শিষ্য জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী। মানিকবাবুর বিবর্তন তাঁর স্বধর্ম অনুযায়ী হয়নি। কিন্তু বিবর্তনকে রোধ করেও মানিকবাবু উদ্ধার পেতেন না। জ্যোতিরিন্দ্রবাবুর শিল্পধর্ম নিশ্চয় জীবন-বিষয়ক বক্তব্য থেকেই উৎসারিত হবে। সে-কারণে জীবনের দিকেই তাঁকে তাকাতে হবে বারেবারে। দুঃখের বিষয় এই তাকানোর ব্যাপারটাতে তাঁর ব্যত্যয় আছে। আছে বলেই তাঁর বিবর্তন বিষয়বস্তুর দিক থেকে এগুতে পারল না। এই ব্যাপার নিজেই যখন তিনি বুঝতে পারলেন যে বারো ঘর এক উঠোনের পর আর তাঁর বক্তব্যগত কোনো গতি নেই তখনই আঙ্গিকের বিচ্ছিন্ন সাধনা তাঁকে পেয়ে বসেছে। এ-আঙ্গিক জীবনোপলব্ধির কোনো অনিবার্য আকর্ষণে উদ্ভূত নয়। বক্তব্যের শূন্যতাকে আচ্ছন্ন করার জন্যই এর জন্ম, কেননা এই আঙ্গিক-সাধনা লেখক অথবা পাঠককে আঙ্গিকরীতিতেই আবদ্ধ করতে চায়। দীপ-শিখার মতো আলোকসম্পাত করে তা জীবনকে চেনাতে চায় না।

এই ত্রুটি নরেন্দ্রনাথ মিত্র এবং সন্তোষকুমার ঘোষের শক্তিশালী দুটি উপন্যাস-কীর্তিরও কোনো পরবর্তী বিবর্তন ঘটতে দেয়নি। চেনামহল ও মোমের পুতুল-এ মরণদশাগ্রস্ত কলকাতাই মধ্যবিত্ত জীবনের অন্তর্দৃষ্টি-দীপ্ত আলেখ্য অঙ্কন করা হয়েছে। উভয় ক্ষেত্রেই যুদ্ধোত্তর জীবনের সকল বিড়ম্বনা এবং মূল্যবোধের বিনষ্টিকে লেখকেরা দৃঢ় হাতে ধারণ করেছেন এবং নিরাসক্ত মন নিয়ে ধৃত বিষয়কে বিন্যস্ত করেছেন উপন্যাসে। যদিও সন্তোষকুমার নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ন্যায় মনোজ্ঞ নন, তথাপি উঁচুতলার জীবনের ফাঁকিবাজি, জালিয়াতি এবং ধনতান্ত্রিক সমাজের সংবাদপত্রের ভূমিকা সম্বন্ধে তাঁর অন্তর্ভেদী দৃষ্টি মোমের পুতুলের রসরূপ নির্মাণে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছে। চেনামহলে যদিও মানুষের ঐকান্তিক সৎপ্রচেষ্টা যে কিছুতেই পরাভূত নয় তার ইঙ্গিত এখানে-ওখানে ছড়ানো রয়েছে, এবং যদিও সন্তোষকুমারের মোমের পুতুলে সেই ইঙ্গিত একেবারেই অনুপস্থিত তথাপি সন্তোষকুমার নরেন্দ্রনাথ মিত্র অপেক্ষা অবক্ষয়ের চরিত্র চিত্রণে অনেক বেশি গভীরতর দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু গোয়ালার গলিতে সন্তোষকুমারের পদচিহ্ন ছিল শিথিল। মোমের পুতুল কিন্তু গোয়ালার

গলি অপেক্ষা অগ্রবর্তী পদক্ষেপ নয়, শুধু এখানে তিনি শক্ত করে মাটিতে পা বসাতে পেরেছেন এইমাত্র। কিন্তু এই অবক্ষয়ের কর্দমেই পদক্ষেপকারী লেখকও ডুবে গেলেন অতি সত্বর। নরেন্দ্রনাথ বর্তমানে আন্তরিকভাবে ঔপন্যাসিক প্রয়াস পরিহার করেছেনই বলা চলে। সন্তোষকুমার সে-ক্ষেত্রে নতুন আঙ্গিক-রীতির দ্বারস্থ হয়েছেন বক্তব্যহীন অনাথের মতো। মুখের রেখায় তাঁর ব্যর্থতা বক্তব্যের ব্যর্থতার জন্যই পরিহার করা যায়নি।

সম্ভবত প্রাচীন নায়ক পরিকল্পনা মহাযুদ্ধোত্তর নানা সংঘাতে ক্ষুব্ধ মধ্যবিত্ত জীবনে কার্যকরী ছিল না। সেই কারণে যাঁরা ক্ষয়ের বিপুল সর্বনাশা তরঙ্গের সঙ্গে যুদ্ধরত মানুষের মুক্তিও এঁকেছেন তাঁরাও পুরাতন ঔপন্যাসিক সংস্থান-রীতিকে পরিহার করে নতুন রীতির অভিমুখী হতে চলেছেন। ননী ভৌমিকের ধূলামাটি এবং বিমল করের দেওয়াল দুইখণ্ড এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ননী ভৌমিকের উপন্যাসের বিষয়বস্তু একটি সংগ্রামী মধ্যবিত্ত পরিবারের কিশোর চেতনার ক্রমবিকাশ। এখানে প্রাচীন নায়ক-পরিকল্পনার কথা ওঠেই না—তিনিও সে প্রয়াস করেননি। বিমল করের দেওয়ালের নায়িকা সুধা কার্যকারণ পরম্পরাতেই এমন স্তিমিত এবং নায়ক সুচারু এমন ভূমিকাবিহীন, বিপরীত উদাহরণ হিসাবে সমরেশ বসুর ত্রিধারা উপন্যাসে কর্মবীর নায়ক রাজেনের আতিশয্য এমন হাস্যকর যে এ-সিদ্ধান্তে উপনীত হতেই হয় যে, সচেতন লেখকদের কাছে এই সময়ে প্রাচীন নায়ক-পরিকল্পনার ঐতিহ্য একটা দারুণ আঘাত পেয়েছে। এই আঘাতের প্রতিক্রিয়াতেই ননী ভৌমিক এবং বিমল করের মতো শক্তিশালী এবং দূরদর্শী লেখকেরা অ-নায়কোচিত নায়ক, সীমিত সময়খণ্ড, চেতন-অবচেতনের দ্বৈতাদ্বৈতে ও অন্তর্ভাষণের আলোকে চলিষ্ণু জটিলতাকে ধারণের প্রয়াস প্রভৃতি নবীন নিরীক্ষায় ব্রতী হয়েছেন। ব্যক্তির চেতনাকে ব্যবহার করাই এই নতুন পরীক্ষার মূল কথা। বিমল করের ফানুসের আয়ু, খোয়াই, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃতীয় ভুবন, সীমন্ত-নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের তিন প্রহর, জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়ের অন্তর্মনা প্রভৃতি এই বিতর্কিত নবীন নিরীক্ষার নবীন পদচিহ্ন। কিন্তু তা এখনও বিতর্কিত বলেই এবং সে-বিতর্কের মধ্যে বর্তমান গ্রন্থের লেখকও একজন অংশীদার বলেই নতুন প্রতিশ্রুতি-প্রসঙ্গের বিস্তৃত আলোচনা এই গ্রন্থে এখনকার মতো স্থগিত রইল।

•• সাত ••

অবশ্য এমন কথা কখনই সত্য নয় যে কলকাতার মধ্যবিত্ত জীবন অবলম্বন করে আদি-অন্ত সমন্বিত উপন্যাস অথবা বাংলা দেশের বিভিন্ন দিকে ছড়ানো বাঙালী জীবন-ভিত্তিক উপন্যাসের সমৃদ্ধ প্রয়াস একেবারেই স্তিমিত হয়ে পড়েছে। অসীম রায়ের একালের কথা ও গোপালদেবের প্রসঙ্গ পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। বুদ্ধিপ্রধান বাংলা উপন্যাসের ক্ষীণ কিন্তু তীব্র ধারায় তিনি যে শক্তিশালী সংযোজন সে-কথাও বলেছি। সঙ্গে সঙ্গে বাংলা দেশের শিল্পাঞ্চলে অথবা গ্রামে, কলকাতার বাইরে, জীবন যেখানে শত তরঙ্গভঙ্গে, নানা টানে এবং ধাক্কায় উদ্বেল হয়ে উঠেছে, স্বদেশের সেই সমগ্র পরিচয় স্বভাবতই ঔপন্যাসিকদের কাউকে কাউকে আকর্ষণ করেছে। জাতীয় বেদনা এবং আশা বাসনার সংঘাতময় মূর্তিকে তাঁরা জীবনের মৃত্তিকায় ও অশ্রু-স্বেদের রঙে রচনা করতে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। গুণময় মান্না এবং অমিয়ভূষণ মজুমদার সেই সব বিরল ঔপন্যাসিকদের দুজন। ঔপন্যাসিকের স্বভাব তাঁদের সহজাত। লখিন্দর দিগারে এবং জুনাপুর স্টীলে গুণময়বাবু বাংলা দেশের দুই নবীন ধারা সম্বন্ধে যে গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন তাতে এ-কথা বিশ্বাস করা অসঙ্গত হবে না যে, এ-দেশের বৃহৎ অসংগঠিত জনগোষ্ঠী নিয়ে মহাকাব্যোপম উপন্যাস রচনার যোগ্য নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা গুণময়বাবুর আছে। তিনি যতটা ব্যাপকতা ও বিশালতাকে বোঝেন ততটা যদি বিশেষের বিশেষ স্বরকে সমগ্রের সঙ্গে সঙ্গতি মিলিয়ে বুঝতে শেখেন তাহলে তাঁর সিদ্ধির গুণগত উৎকর্ষ বৃদ্ধি পাবে। জীবন এবং শিল্প সম্বন্ধে দৃষ্টিসাম্যে আমাদের এ-যুগের ঔপন্যাসিকেরা এখনও অভ্যস্ত হননি বলেই তজ্জনিত অসঙ্গতি থেকে তাঁরা এখনও আত্মরক্ষা করতে পারেন না। বিরাটের দিকে দৃষ্টি যেমন গুণময়বাবুকে বিশেষের সম্বন্ধে মাঝে মাঝে অনবহিত করে তোলে, তেমনি গৌরকিশোর ঘোষের একখানি উপন্যাস, জল পড়ে পাতা নড়ে-তে বিশেষের দিকে অতি-মনোযোগ তাঁকে বিশাল উপন্যাসের পটাকাশের সঙ্গে যুক্ত হতে দেয়নি। গৌরকিশোরবাবুর উপন্যাসটিতে ছোট এপিসোড, দৃশ্য, সিচুয়েশন বিশেষ সার্থকতার সঙ্গে, জীবন সম্বন্ধে স্বাস্থ্যবান সচেতনতায় চিত্রিত হয়েছে, কিন্তু সমগ্রের সঙ্গে অন্বিত হবার পথে বারেবারে তারা হোঁচট খেয়েছে।

সে-ক্ষেত্রে সরল কিন্তু অনাড়ম্বর শক্তিতে উপন্যাসের আকাশ মৃত্তিকায়, প্রান্তরে-প্রাঙ্গণে এক অচ্ছেদ্যতার আবহাওয়া রচনা করতে পারেন অমিয়ভূষণ। তিনিই

বর্তমান কালের একমাত্র তরুণ ঔপন্যাসিক যিনি গ্রামীণ আর্থনীতিক কাঠামোকে তার তাৎপর্য সমেত বোঝেন। তার নানা স্তরের ভাঙা-গড়ার সঙ্গে ব্যক্তির টানাপোড়েনকে যুক্ত করতে পারেন। অথচ গোঁজামিলের সাহায্যে যে কিছু মিলিয়ে দেওয়া যায় না এ-সম্বন্ধেও তাঁর জ্ঞান স্পষ্ট। তার গড় শ্রীখণ্ড এবং দুখিয়ার কুঠি, এই দুইখানি উপন্যাসের প্রয়াসগত তারতম্যের মধ্যেও এই সত্যের কোনো হেরফের নেই। গড় শ্রীখণ্ড বর্তমান বাংলা কথাসাহিত্যের বহু বিতর্ক-জটিল ও কুতর্ক-কুটিল আকাশে একমাত্র নিঃসংশয় শিল্পসৃষ্টি যা কালোত্তীর্ণ হবার ক্ষমতা রাখে। গড় শ্রীখণ্ডে একটি যুগের জাতীয় বেদনা বিপুল ঐকতানে ঝংকৃত হয়েছে। জাতীয় জীবনের একটি চূড়ান্ত বেদনাময় মুহূর্তে একটা গোটা সমাজের কথা চিত্রিত হয়েছে এই উপন্যাসে। জীবনের সেই বেদনাকে এই উপন্যাসের সর্বত্র প্রায় হাত দিয়ে স্পর্শ করা যায়। মানুষের জীবনের সঙ্গে জীবিকার সম্পর্ক, ছিন্নমূল হবার পূর্বক্ষণটিতে কোথায় টান পড়ে, কেমন করে গুঁড়িয়ে যায় বহুকালাগত সম্পর্ক —লেখক যেন অপূর্ব নিরভিমান মন নিয়ে সেগুলিকে দেখেছেন, নিরাসক্তির রাজসিংহাসন তাঁর বিন্দুমাত্র বিচলিত হয়নি, বেদনায় যখন হৃৎপিণ্ড উন্মূল হয়ে যাবার কথা, তখনও। উত্তর বঙ্গের জীবন, কোনো প্রকার আঞ্চলিকতার প্রয়াস ব্যতিরেকেই ধৃত হয়েছে পরম নিশ্চিতিতে ও বিশ্বাসে। সমাজের সর্বস্তরের, বিশেষ উঁচুতলার—সান্যাল মশাইদের মতো মানুষগুলি সম্বন্ধে অমিয়ভূষণের জানা-শোনা-দেখা যদি সম্পূর্ণতা পায়, তিনি যদি প্রতিষ্ঠায় শান্ত হয়ে না পড়েন এবং সংহতির দিকে আর একটু অভিনিবিষ্ট হন, তাহলে বাংলা উপন্যাসের একদিকের দৈন্য তিনি ঘোচাবেন— গড় শ্রীখণ্ডে সে ইঙ্গিত ক্ষীণ নয়। বাজার-চালু বহু-সংস্করণধন্য অনেক ঔপন্যাসিকই অমিয়ভূষণের কাছে ঔপন্যাসিকের শ্রম, নিষ্ঠা, বিস্তৃতি ও অভিজ্ঞতা বলতে কি বোঝায় সে সম্বন্ধে পাঠ গ্রহণ করতে পারেন।

গড় শ্রীখণ্ডের পর দুখিয়ার কুঠির পরিমিত পরিসরে অমিয়ভূষণ ভিন্ন ধরনের শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। ক্রম-অগ্রসরমান একটি রাজপথের ধাক্কায় একটি গ্রাম ও একটি মেয়ের প্রতিক্রিয়াকে প্রায় প্রতীকে-রূপকে সাজিয়ে ফেলেছেন লেখক। বিষয়বস্তু নির্বাচনে ও ব্যবহারে শেষ ত্রুটি এসেছে জন্ম-বৃত্তান্তের পুরাতন কৌশলের অবতারণায়। তথাপি উপন্যাসটির প্রথমাংশের ছন্দোগুণ সার্থক শিল্পীর স্বাক্ষরধন্য।

বিমল কর প্রমুখ নতুন নিরীক্ষাশীলেরা এখন নিরীক্ষাশীল। তাঁদের প্রতি আমার

শ্রদ্ধা আছে। ইতোমধ্যে অমিয়ভূষণ মজুমদার, গুণময় মান্না এবং অসীম রায়ের মতো ঔপন্যাসিকদের সৎ শিল্পদায়িত্ববোধকে এলোমেলো নৈরাজ্যের মাঝখানে স্বীকৃতি না দিলে সমালোচক সত্যভ্রষ্ট হবেন।

একশো বছরের ইতিহাস রয়েছে আমাদের উপন্যাস সাহিত্যের। সেই পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পথে নানা শৈথিল্য এবং নানা শক্তির পর্যায়ক্রম উপস্থিত ছিল। পশ্চাৎপদতা ও অগ্রচারিতায় তার গতি শুধুই সবল ও ঋজু নয়, নয় শুধুই দুর্বল ও বঙ্কিম। কর্মিষ্ঠ জীবন ও তন্নিষ্ঠ জীবনচেতনার সাযুজ্য জাতির জীবনকে যত সমৃদ্ধ করবে—যত লেখকেরা মুক্তি পেতে থাকবেন নিজ নিজ অহমিকার হাত থেকে, অসন্তুষ্টির হাত থেকে, আসক্তির হাত থেকে, যতই তাঁরা অতীতকে ব্যবহার করতে থাকবেন, বর্তমানকে নিংড়ে নিতে পারবেন—ততই তাঁরা রচনা করবেন বাংলা উপন্যাসের ভবিষ্যৎ গৌরবের ভূমিকা। এ-পথে নিষেধ শুধু একটাই—আমরা যেন ফেনিলতাকে কখনও সমুদ্র বলে না ভুল করি, পাতা-বাহারকে না ভাবি অরণ্যের গহনতা।

নির্ঘণ্ট

অ

অকিঞ্চন—২৭৩, ২৭৪, ২৭৫, ২৭৭

অগ্রদানী—২৮৭

অঙ্গার—৩৬৩

অচলা—২৪২, ২৪৩, ২৪৪, ২৪৫, ২৪৬

অচিন্ত্যকুমার—৭০, ২৬৮, ২৬৯, ২৮২, ৩২১

অজয়া—২৭০, ২৭১, ২৭২

অডিসি –২৪

অডেন – ৩২৬

অতিথি—১৭১

অতীন—১৯৬

অদ্বৈত মল্লবর্মন—৩৪২, ৩৪৮, ৩৫৯

অধিকারী—১২৯

অনঙ্গ ডাক্তার—২৪১

অন্তঃশীলা—৩৩৩, ৩৩৪, ৩৩৮

অন্তর্মনা—৩৬৫

অন্নদা দিদি—২৫৫, ২৫৬, ২৫৭, ২৫৮, ২৬৪, ২৬৫

অন্নদাশঙ্কর রায়—১৬৪, ২৮৩, ৩২০, ৩২১, ৩২৫, ৩৩০, ৩৩৮, ৩৪০

অন্নপূর্ণা—২৩২, ২৩৩

অপু—২৮৪, ২৮৫, ২৮৬

অপূর্ব—১৬৬, ১৬৭

অভয়ের বিয়ে—২৩০

অভাগীর স্বর্গ—২৫৩

অমরনাথ—১২০, ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১৪৩

অমিত—১৬২, ২৮৪, ৩২১, ৩২৩

অমিয় চক্রবর্তী—৩৪৫

অমিয়ভূষণ মজুমদার—৩৪২, ৩৪৭, ৩৪৮, ৩৬৭, ৩৬৮

অযান্ত্রিক – ৩১৩

অরক্ষণীয়া—২৪৭

অসাধু সিদ্ধার্থ—২৭০

অসীম রায়—৩৩৯, ৩৪২, ৩৪৩, ৩৪৭, ৩৪৮, ৩৫১, ৩৬৬, ৩৬৮

অহিংসা—৩১২

অহীন—২৮৮, ২৯৩, ২৯৪, ২৯৫, ২৯৭

আ

আইভান হো—১৫০

আইরিন ফরসাইট—২২৬, ২২৭

আউটসাইডার – ৩৯

আকাশ পাতাল—৩৪৬, ৩৫৫

আত্মশক্তি – ২০০

আনন্দময়ী—৩৮, ২০০, ২০১, ২১২, ২১৩, ২২৭, ২৩৪

আনন্দমঠ –১৫৪

আনা কারেনিনা—৩৭, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৬৪, ১৪৬, ১৪৮, ২৩৬, ২৪৩, ২৪৬

আবর্ত—৩৩৩

আয়ান ওয়াট—৯৯

আর্নলড্ কেট্‌ল্—১৬, ২৪

আরতি—২৯৪, ২৯৫

আরণ্যক—৩০২, ৩০৩, ৩০৪, ৩০৫, ৩০৬, ৩০৮, ৩১০

আরোগ্য—৩১২, ৩১৭
আরোগ্য নিকেতন—২৯৪, ২৯৬, ২৯৮
Arnold and Peter—১১২
Art of Fiction—১২
আলালের ঘরের দুলাল—৬৬, ৭৮, ৮৭, ৮৮, ৯১, ৯২, ৯৩, ৯৪, ৯৬, ৯৭, ৯৮, ১০১, ১১৩, ১১৪
আশা—১৬২, ১৭৩, ১৭৬, ১৭৭, ১৭৯, ১৮১, ১৮৬

ই

Ulysses—৯, ১১, ২৩, ৩৯
ইছামতী—৩৪৬, ৩৫০, ৩৫৬, ৩৫৭
ইন্দিরা—৬৩, ৬৫, ৭৮, ১১৩, ১১৪, ১১৫, ১২০, ১৩৪
ইন্দির ঠাকরুণ—৩০৩
ইন্দ্রনাথ—১৬৬, ২৫৬—২৫৯, ২৬৩, ২৬৪, ২৬৫
ইন্দ্র রায়—২৯০, ২৯২, ২৯৭
ইলিয়াড—২৪
ইসাবেল—২১
ইয়ুং—২১

ঈ

ঈশ্বর গুপ্ত—১১৬

উ

উইলিয়ম কসমো মঙ্কহাউস—৮০
উজ্জয়িনী—৩২১, ৩২২, ৩২৩, ৩২৯, ৩৩০, ৩৩১, ৩৩২, ৩৩৮
উত্তম—২৭৮, ২৭৯
উত্তরঙ্গ—৩৪৬, ৩৫০, ৩৫১
উত্তরায়ণ—২৮৮, ২৯০, ২৯৪, ২৯৬
উপনায়ন—২৬৮, ২৬৯, ২৮২, ২৮৩, ৩২২
উপনিবেশ—৩৪০
উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়—২৩০
উপেন্দ্রনাথ দাস—১৯১

ঊ

ঊনপঞ্চাশী—৩৪২

এ

একদা—২৮৫
একালের কথা—৩৪৩, ৩৫১, ৩৬৬
এনড্রু—৫৪, ৫৫
এফিংহাম—৩২৭
এমা বোভারি—৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ২৪৩
এমিল—১২৯
অ্যান্ ইন্‌ভেন্‌টিভ এজ—৭৯
An Introduction to the English Novel—১৬
এরেনবুর্গ—৩১১
এলিয়ট—১০, ২০, ১১২, ৩২৬
এলোকেশী—২৩২
Aspects of Novel—২৪
'ঐতিহাসিক-উপন্যাস' (রবীন্দ্রনাথ)—১৪৯
ওঅর অ্যাণ্ড পীস—১১, ৩২, ৩৭, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৪, ১৫০, ১৫১, ২০৫

ওড টু নাইটিঙ্গেল - ৩৭
ওডিসি—৩৩৪
ওয়ার্ড্‌সওয়ার্থ—১৮, ৭৯, ৮০, ১১৫, ১১৬, ১১৭, ১২৯
ওয়েলি—৩২৫, ৩২৬, ৩২৮
Walpurgis night—৩২৪

ঔ

ঔরঙ্গজেব—১৫৩, ১৫৪

ক

কন্‌রাড—২১, ৫৮, ২০১
কপালকুণ্ডলা—৬২, ১১৪, ১১৭, ১১৮, ১২১—১৩৩, ১৩৭, ১৫৬, ১৭১, ২৮১
কবি—২৮৭, ২৮৮, ২৯০, ২৯৬, ২৯৭, ২৯৮
কমল (শেষ প্রশ্ন)—২০১
কমলমণি—১২০, ১৩৪, ১৩৫
কমললতা—২৬৪
করালী—২৮৮, ২৯০, ২৯২, ২৯৩, ২৯৪, ২৯৯
করুণা—৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯২
কলকাতার কাছেই—৩৫৭
কলিন্স—৩২৮
কল্লোল—২৬৮, ২৬৯, ২৮১, ২৮২, ২৮৩, ৩২৩
কাদম্বিনী—২৩২
কানাই—২৯৯
কাপালিক—১২৩, ১২৯, ১৩১
কারেনিন—৪১
কার্লাইল—২০০
কালিন্দী—২৮৭, ২৮৮, ২৯৪
কিনু গোয়ালার গলি—৩৪৭, ৩৬৪
কিরণময়ী—২৪০, ২৪১, ২৪২, ২৪৩
কিশোরী—২৭৩, ২৭৪, ২৭৫, ২৭৬, ২৭৭, ২৭৯
কীটস—৯৪, ১১৬, ২২৯
কীর্তি নিয়োগী—৩১৫
কুটজভ—১৫২, ১৫৩
কুন্দ—৬৩, ৬৪, ১১৮, ১২২, ১২৫, ১৩৬, ১৩৭, ১৩৮, ১৩৯, ১৪০, ১৬৪
কুবের—৩৩, ৩১৬, ৩১৮, ৩১৯
কুমার সাহেব—২৫৯
কুমু—৪৩, ৪৫, ৪৬, ৪৮, ৪৯, ১৬২, ১৬৪, ১৬৮, ১৭০, ১৮৭, ২২৩—২২৭, ২৩৩, ২৭৫, ২৭৬, ২৭৭
কুসুম—৩১৪
কৃষ্ণদয়াল—২১২, ২১৩
কৃষ্ণকান্তের উইল—৩৭, ৪৫, ৪৬, ৪৮, ১২০, ১২১, ১২৪, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৫, ১৪১—১৪৯, ১৭৩, ১৮৪, ২৩৫
কৃষ্ণেন্দু—২৯০, ২৯৪, ৩০০
কেরী সাহেবের মুন্সী—৩৫৬
কেষ্ট—৩২২
কৈলাস—৬৫, ১৬৫
কোম্‌তে—১২৪
কোল্‌রিজ—৩০৮
Craft of Fiction—৫০
ক্রাইম অ্যাণ্ড পানিশমেণ্ট—২৩, ৩৯, ৪৪

ক্লাভদিয়া—৫১, ৫২, ৫৩
ক্ষুধিত পাষাণ—১৭১

খ

খগেনবাবু—২৮৪, ৩৩৪, ৩৩৫, ৩৩৬, ৩৩৮
খোয়াই—৩৬৫

গ

গঙ্গা—৩৪৬, ৩৫১, ৩৫৯, ৩৬০, ৩৬১
গজেন্দ্রকুমার মিত্র—৩৪৮, ৩৫৭
গণদেবতা—২৮৬, ২৮৮, ৩১৫
গণনাট্য সংঘ—৩৪৫
গতিহারা জাহ্নবী—২৭৩
গল্পগুচ্ছ—৩০১
গল্স্‌ওয়ার্দি—২২৬
গড় শ্রীখণ্ড—৩৬৭
গিরিবালা—১৯০, ১৯৩, ১৯৬, ১৯৮
গুণময় মান্না—৩৪২, ৩৪৩, ৩৪৭, ৩৪৮, ৩৫১, ৩৬৬, ৩৬৭, ৩৬৮
গৃহদাহ—২৩৪, ২৪২—২৪৬
গোকুল নাগ—২৬৮, ২৮২, ৩২২
গোত্রান্তর—৩১৩
গোপাল—৩১৪, ৩১৫
গোপাল হালদার—২৮৩, ২৮৫, ৩৩৬, ৩৪১, ৩৫৪, ৩৫৫
গোপালদেব—৩৫১, ৩৬৬
গোবিন্দলাল—৪৫, ৪৬, ৪৮, ১১৭, ১১৮, ১২১, ১৩৪, ১৩৫, ১৪১—১৪৮, ১৫৫, ১৬১, ১৬৪, ১৭৩, ১৭৪, ১৮০, ১৮৪, ১৮৫, ২৩৫
গোরা—৩৮, ৬৫, ৭০, ৭১, ৭২, ৯৭, ৯৮, ১৫৯, ১৬১, ১৬২, ১৬৩, ১৬৪, ১৬৬, ১৬৭, ১৬৮, ১৭০, ১৭১, ১৭২, ১৮৪, ১৮৬—১৮৮, ১৯০, ১৯২, ১৯৪, ১৯৫—২১৫, ২৪৭, ২৪৯, ২৫০, ২৯০, ৩২৩, ৩৩৪, ৩৬১
গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য—৩৪২, ৩৪৮
গৌরকিশোর ঘোষ—৩৪৮, ৩৬৬

ঘরে বাইরে—১৬৩, ১৬৯, ২১৫, ২৩৪

চতুষ্কোণ—৩১২, ৩১৩, ৩১৭
চতুরঙ্গ—৭২, ১৬১, ১৬৮, ১৭০, ১৭১, ১৭২, ১৮৭, ২১৬—২২৩, ২৮১, ৩২৩, ৩৩৭
চন্দ্রমুখী—২৭৮
চন্দ্রশেখর—১৫২, ১৫৪, ১৫৭, ২৩৬
চার অধ্যায়—১৯৬
চারুবাবু—২৩০, ২৩১
চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়—৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯১
চিহ্ন—৩১২, ৩১৭, ৩৪২, ৩৪৩
চেখভ—১৯৬
চেনামহল—৩৪৭, ৩৬৪
চেস্টারটন—২৬৫
চোখের বালি—১৪৭, ১৫৯, ১৬১, ১৭০, ১৭৩—১৮৬, ১৮৭, ২২৮, ২৩৫, ২৩৮

ছ

"ছন্দোমুক্তি ও রবীন্দ্রনাথ"—১৭১
ছাই—৩৬৩
ছিরে ঘোষ—২৯৪, ২৯৫, ২৯৭
ছোট বৌঠান—৪৩, ৪৮, ৪৯, ৩৫৫

জ

জগদীশ গুপ্ত—২৬৬—২৭১, ২৭৩, ২৭৪, ২৭৭, ২৭৮, ২৭৯, ৩১৮, ৩১৯, ৩২০, ৩৪০
জগৎ পান্না—৩০৯
জঙ্গম—২৮৫
জগমোহন—২১৬, ২১৭, ২১৮, ২২২
জন স্টুয়ার্ট মিল—১০৬, ১০৭, ১০৮, ১০৯, ১১০, ১১৫, ১১৬
জর্জ ইলিয়ট—১৯, ২১
জল জঙ্গল—৩৫৮
জল পড়ে পাতা নড়ে—৩৬৬
জয়েস—২১, ২২, ২৩, ৩৯, ১৫৯, ৩৩৬
জাগরী—৩৪২
জঁ। ক্রিস্তফ—৩৭
জীবন মশাই—২৯৮
জীবনানন্দ দাশ—৩০১, ৩৬২
জীবানন্দ—২৬৫
জুনাপুর স্টীল—৩৬৬
জেন অস্টেন—১৯, ২১, ২৩, ৫০, ২৮০, ২৮১
জেবউন্নিসা—৬১, ১৫১—১৫৩
জোড়া দিঘির চৌধুরী পরিবার—৩৩৯
জোলা—২৪, ২৯, ৩০, ১৫৯
জোয়াকিম—৩২৪
জ্যাঠাইমা (পল্লীসমাজ)—২৩৩, ২৩৪, ২৩৮, ২৩৯
জ্যাঠামশাই (চতুরঙ্গ)—২১৬, ২১৭
জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়—৩৪৮, ৩৬৫
জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী—৩৪২, ৩৪৪, ৩৬২, ৩৬৩, ৩৬৪
ঝড় ও ঝরাপাতা—৩৪২, ৩৪৩

ট

টমাস মান—২২, ২৫, ৫১, ৫২, ৫৪, ২২৬, ৩২৪
টলস্টয়—১৯, ২০, ২২, ২৫, ৩২, ৩৩, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৫, ৫৪, ১৪৮, ১৫০, ১৫১, ১৫২, ১৫৩, ২০৫, ২৯৫
টিলিয়ার্ড—২০৫, ২০৬
টুকি—২৭৮, ২৭৯
টুর্গেনিভ—৪৭, ১৯০, ১৯২
টেস—২৯২
Tristram Shandy—৯

ঠ

ঠকচাচা—৯২, ৯৩, ৯৫, ৯৬, ৯৮, ৯৯, ১০০, ১০১
ঠকচাচী—৯৩, ৯৪, ৯৯

ড

ডন্ কুইকসোট—৩০
ডিকেন্স—১৭, ১৮, ১৯, ২৩, ১০০, ১১৫, ১১৭, ১১৯, ২৬৫

ডিফো—১৫, ১৬, ২৩, ৩০, ৩১, ৪৭, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬২, ৯৯, ১১৩
ডেভিড কপারফিল্ড—২৩

ঢ

ঢোঁড়াই চরিত মানস—৩৪৬, ৩৫৮, ৩৫৯

ত

তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়—৬৩
তারাশঙ্কর—২৮৩ - ৩০০, ৩১২, ৩১৯, ৩২০, ৩৪০, ৩৪১, ৩৪২, ৩৪৭, ৩৫০, ৩৫৪, ৩৫৫, ৩৬২
তারাচরণ—১৩৪
তারিণী—২৪০, ২৫১
তিতাস একটি নদীর নাম—৩৪৬, ৩৫৯, ৩৬০
তিথিডোর—৬১, ২৮২, ৩৫২, ৩৬২
তিন প্রহর—৩৬৫
তৃতীয় ভুবন—৩৬৫
তোরাপ—১৯৪, ১৯৫
ত্রিধারা—৩৫২, ৩৬১

দ

দরিয়া—১৫১
দস্তয়েভস্কি—২০, ২৩, ২৫, ৪৫
দান্তে—২০
দামিনী—১৬৮, ১৮৭, ২১৬—২২৩, ২৩৭
দামোদরবাবু—২২৯
দিগম্বরী—২৩২
দি নাইট এক্সপ্রেস—৮০
দিবাকর—২৪১
দীপক চৌধুরী—৩৪৪
দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—৩৪৭, ৩৪৮, ৩৬৫
দুই বিঘা জমি—১৮৮
দুখিয়ার কুঠি—৩৬৭
দুর্গেশনন্দিনী—১১৩, ১১৪, ১২৮, ১৩৭
দুর্বুদ্ধি—১৮৮, ১৮৯, ১৯০
দৃষ্টি প্রদীপ—৩০৩, ৩০৪
দৃষ্টিপাত—৩৪২, ৩৪৯
দেওয়াল—৩৬৫
দেবদাস—২৪৬
দেবেন্দ্র—১২২, ১২৪, ১৩৪, ১৩৫, ১৩৬, ১৪০, ১৪১
দেবু ঘোষ—২৮৮, ২৯০, ২৯৪, ২৯৫, ২৯৭, ২৯৮
দেশে বিদেশে—৩৪২, ৩৪৯
দে সরকার—৩৩০, ৩৩১
দোবরু পান্না—৩০৯, ৩১০
দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়—৮৭
দ্বৈরথ—৩৩৯

ধ

ধাওতাল সাহু—৩০৪, ৩০৫, ৩০৬
ধাতুরিয়া—৩০৪
ধাত্রী দেবতা—২৮৬, ২৮৮, ২৯০, ৩১৪, ৩৫২
ধূর্জটিপ্রসাদ—১৬৪, ২৮৩, ৩৩৩, ৩৩৫, ৩৩৬, ৩৩৭, ৩৩৮, ৩৩৯, ৩৪০, ৩৫৪

ধূলামাটি - ৩৬৫

ন

নগেন্দ্রনাথ—৬৩, ১২২, ১২৪, ১২৫, ১৩৫, ১৩৬, ১৩৭, ১৩৮, ১৩৯, ১৪১, ১৪২, ১৬১
নটবর—২৭০, ২৭১, ২৭২, ২৭৩, ২৭৭, ২৭৯
নতুনদা—২৫৫
ননীবালা—২১৮, ২১৯
ননী ভৌমিক—৩৪৭, ৩৪৮, ৩৬৫
নন্দলাল ওঝা—৩০৬
নফর সংকীর্তন—৩০০
নবকুমার—১১৭, ১২৩, ১২৮, ১২৯, ১৩১, ১৩২, ১৩৩
নববাবু বিলাস—৭৫, ৯৩
নবীন—১৬৬
নবীনচন্দ্র—১১৬
নবেন্দু ঘোষ—৩৪১, ৩৪৩
নরেন্দ্রনাথ মিত্র—৩৪২, ৩৫২, ৩৬২, ৩৬৫
নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত—২৩০, ২৩১
নষ্টনীড়—১৭৩, ২৩৪, ২৩৬, ৩৩৭
নাকছেদী—৩০৪
নাগিনী কন্যার কাহিনী—২৮৮
নাটাশা—৫১, ৫৪, ৫৫
নাপিত (গোরা)—৬৫, ১৯৯, ২৪৯, ২৫০
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়—৩৪০, ৩৪১, ৩৪৩
নারায়ণী— ২৩২, ২৩৩, ২৬৫
নিকোলাস – ৫১, ৫৪
নিখিলেশ—১৬২, ১৬৩, ১৬৪, ১৬৯, ১৭০, ১৮৭, ২১৫, ২১৬, ২২৫
নাগু ঠাকুর—২৮৮
নির্জন স্বাক্ষর—৩৬২
নিতাই—২৯০, ২৯৪ ২৯৮, ২৯৯
নিশাকর—১৪৭, ১৪৮, ১৮২
নীল রাত্রি—৩৬৩
নীলকমল—১৫৭
নীলদর্পণ—৮৬, ১৯১
নীলমাধব —৭৮
নেখল্যুডফ—২৩, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ২৯০, ২৯৫
নেপোলিয়ন—১৫২, ১৫৩, ১৫৪
Napoleon's Russian Compaign—১৫৪
নৈবেদ্য—১৯১, ১৯২
নৌকাডুবি—১৫৬, ১৬৯

প

পঞ্চাশের পথে—৩৪২
পটলডাঙার পাঁচালি—২৮২
পথিক—২৬৮, ২৮২, ৩২২
পথের দাবি—১৬৬
পথের পাঁচালি—৩৭, ৩০২, ৩০৩, ৩০৪
পণ্ডিতমশাই—২৪৭
পদ্মানদীর মাঝি—৩৩, ৩১২, ৩১৩
পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ—৩৪৪
পরশুরাম—৩৫২
পরিমল গোস্বামী—৩৫২

পরেশবাবু—৩৮, ২০০, ২০১, ২০৪, ২১২, ২১৩, ২১৪
পল্লীসমাজ—২৩৩, ২৪৭, ২৪৮
পশুপতি—১২৬
পাকা—৩১৮, ৩১৯
পাঁক—২৮২
পানুবাবু—২০২, ২১৩
পার্সি লাবক—৫০
পিউ—৩২৭, ৩২৮
পিকারেস্ক উপন্যাস—৮৬, ৯৮, ৯৯, ১০০
পিকারো—৯৯
পিটার—৩৩
পিয়ারী বাঈজী—২৫৯, ২৬০, ২৬১, ২৬৩
পিয়্যের—১৫১
পুতুলনাচের ইতিকথা—৩১২, ৩১৩
পূর্ণেন্দু পত্রী—৩৫১
প্রেমেন্দ্র মিত্র—২৬৯, ২৮২, ৩২১, ৩২২
প্রুস্ত—৩৩৪, ৩৩৬
The Portrait of a Lady—২০
প্যারীচাঁদ—৬৮, ৯১, ৯২, ৯৩, ৯৪, ৯৫, ৯৬, ১০০, ১০১
প্রতাপ—১১৭, ১১৮, ১২০, ১৫৪, ১৫৫, ১৫৭
প্রতাপাদিত্য চরিত্র—৮৯
প্রফুল্ল রায়—৩৪৮
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়—২৩০, ২৩১, ২৬৯, ২৭০, ২৭১, ২৭৩, ২০৯
প্রবীর—২৮৮, ২৯০, ২৯৫
প্রবোধকুমার সান্যাল—৩৬৩
প্রমথ চৌধুরী—৩২১
প্রমথনাথ বিশী—৩৩৯, ৩৪২, ৩৪৮, ৩৫৬
প্রাণতোষ ঘটক—৩৪২, ৩৪৮
প্রায়শ্চিত্ত—১৭২
প্লেটো ক্যারাটিয়েভ—১৫১

ফ

ফরসাইট সাগা—২২৬
ফর্স্টার—১৯, ২৪, ৩৭
ফরুসর্দার—১৯২, ১৯৪, ২৫০
ফসিল—৩১৩
ফানুসের আয়ু—৩৬৫
ফিল্ডিং—১৫, ১৬, ২৩, ৩০, ৬২
ফুলমণি—৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯২
Phases of Fiction—১৫
ফ্রয়েড—২১, ২৮১, ৩০১
ফ্রান্সিস পালগ্রেভ—১৫০
ফ্লবেয়ার—২০, ২১, ২৪, ৪০, ৪৩

ব

বক্রেশ্বর—৯৫, ৯৬
বঙ্কিমচন্দ্র—৫৭, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৮, ৭৬, ৮৩, ৯৫, ১০১—১৫৭, ১৫৯, ১৬০, ১৬১, ১৬২, ১৬৪, ১৬৬, ১৭৩, ১৭৫, ১৯২, ২০২, ২৩৫, ২৬৭, ২৮১, ২৮৩, ২৮৪, ২৮৮, ২৮৯, ২৯৪
বঙ্কু—২৬৩, ২৬৪
বনফুল—২৮৪, ২৮৫, ৩৩৯, ৩৪০
বনোয়ারী—২৯২, ২৯৩, ২৯৪, ২৯৯

বনোয়ারীলাল (আরণ্যক)—৩০৯

বরদাসুন্দরী—২১২, ২১৩, ২১৪

বরদাবাবু—৯২, ৯৫, ৯৬, ৯৭, ৯৮

বসওয়েল—১৪, ১৮

বংশী—৩৫৫

বাজাবভ—৪৭, ১৯৩, ২৯০

বাডেনব্রুক্‌স—২২৬

বাথসেবা—২৯২

বাদল—২৮৪, ৩২০, ৩২২, ৩২৩, ৩২৪, ৩২৫, ৩২৬, ৩২৭, ৩২৮, ৩৩০, ৩৩২

বাবুবামবাবু—৬৬

বার্ক—৯৪

বাবো ঘব এক উঠোন—৩৪৪, ৩৪৫, ৩৪৭, ৩৬৩

বালজাক—১৯, ২০, ২৩

বায়বন—১১৬

বিজন—৬১, ৩৬২

বি টি. বোডেব ধারে—৩৪৬

বিদ্যাসাগব—৭৬, ৮৫, ৮৭, ১০৩, ১০৫, ১০৬, ১১০

বিনয়—৩৮, ৭০, ৭১, ১৫২, ১৬৬, ১৬৭, ২০৮, ২০৯, ২১০, ২১৪

বিনু—২৮২, ২৮৩

বিনোদিনী—১৪৭, ১৬২, ১৭৩—১৮৬, ২২৮, ২৩৫, ২৩৭, ২৩৮, ২৪৬

বিন্দু—২৩৩

বিপাশা—৩০০

বিপ্রদাস—১৬৮

বিপ্রপদ—২৮৭

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়—৩৫২

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়—২৮৩, ২৮৪, ৩০১—৩১০, ৩১৯, ৩২০, ৩৪০, ৩৫০, ৩৫৪, ৩৫৬, ৩৫৭, ৩৬২

বিমল কর—৩৪২, ৩৪৭, ৩৪৮

বিমল মিত্র—৬৯, ৩৪২, ৩৪৮, ৩৬২, ৩৬৩

বিমল মুখুজ্যে—২৮৮, ২৯০, ২৯২

বিমলা—১৬৯, ১৮৭, ২১৫, ২১৬

বিলাস—৩৫১, ৩৬০, ৩৬১

বিশ্বম্ভর—২৭৮, ২৭৯

বিশ্বম্ভব রায় (তাবাশঙ্কব)—২৯২

বিশ্বেশ্ববী—২১২

বিষ্ণু দে—১৬৪, ৩৩৩, ৩৩৪, ৩৫৩

বিষবৃক্ষ—৬৩, ৬৪, ৬৬, ১২২, ১২৪, ১৩৩—১৪১, ২৬৮

বিহাবীলাল (চোখেব বালি)—১৬২, ১৬৬, ১৭৯, ১৮০, ১৮১, ১৮২, ১৮৩, ১৮৬, ১৮৭, ২৩৫, ২৩৮

বিহাবীলাল চক্রবর্তী—৭৭, ৭৮, ৮০

বীণা—৩৩০

বুদ্ধদেব বসু—৬১, ৭০, ১৫৯, ১৬৭, ১৬৮, ১৬৯, ১৭০, ২৬৯, ৩৫২, ৩৬২

বুদ্ধু সিং—৩০৯

বেঙ্কটেশ্বব—৩০৪

বেণী ঘোষাল—২৩৩, ২৩৪, ২৩৯, ২৪০, ২৫১, ২৫৩

বেণীবাবু—৯২, ৯৫, ৯৬

বেদে—২৬৮, ২৮১, ২৮২

তে ইশ—২৪

বোষ্টম—১০৬, ১০৭, ১১০, ১১৫, ১১৬
বোকা বাওয়া রেবণগুণী—৩৫৯
বৌ-ঠাকুরানীর হাট—১৫৯, ১৭৩
বৌরানী—২৩১, ২৭১
ব্রাউনলো—২১৪, ২৫০
'ব্রাহ্মণ' (রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ)—১৯৪
Bleak House—১৮

ভ

ভানুমতী—৩০৯, ৩১০
ভার্জিনিয়া উল্ফ্—১৫, ৭০
ভারতী—৮৫, ২৩১, ২৩২, ২৩৪
ভাঁড়ু দত্ত—৯৫
ভুবন—২৭৪
ভূমিকা —৩৫৫
ভ্রনস্কি—৪১, ৪২, ১৪৬, ২৩৬
ভ্রমর—৪৩, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৬৫, ১২১, ১৪১—১৪৮, ১৫৫, ১৬১, ১৭৩, ১৮৪, ১৮৫, ২২৭

ম

মজুমদার—৩৬২
মঞ্জরী—৩১০
মটুকনাথ—৩০৪
মণিহারা—১৭২
মণীন্দ্রলাল বসু—২৩০, ২৩১
মতি নন্দী—৩৪৮
মতিবিবি—১২৩, ১৩২, ১৩৩
মতিলাল—৯২, ৯৩, ৯৫, ৯৬
মধুসূদন—৪৫, ৪৮, ৪৯, ১৬৪, ১৮৭, ২২৩—২২৭, ২৩৩, ২৭৫
মধ্যবর্তিনী—২৬৮
মন—৩৪৭
মনোজ বসু—৩৪৮, ৩৫৮
মনোরমা—১১৭, ১২৬, ১৩৩
মন্বন্তর—২৯৯, ৩১২, ৩৪৩
মবারক—১৫১
Moby Dick—৯
মল ফ্লাণ্ডার্স—৯৯
মহাভারত—২৪
মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য—৩৪৮
মহিমচন্দ্র (অন্নদাশঙ্কর)—৩২৯, ৩৩৩
মহিম (গৃহদাহ)—২৪৪, ২৪৫
মহিম (গোরা)—৬৫
মহেন্দ্র (রবীন্দ্রনাথ)—১৬১, ১৬২, ১৭৩—১৮৬, ১৮৭, ২২৫, ২৩৩
মহেশ—২৫৩
মাইকেল মধুসূদন—৭৬
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়—৩৩, ৭২, ২৮৩, ২৯৫, ২৯৬, ৩১১—৩১৯, ৩৪০, ৩৪১, ৩৪৩, ৩৫৪, ৩৫৮, ৩৬২, ৩৬৪
মাদ্‌মোয়াজেল দ্য মোপাঁ্যা—১৫৯
মাদাম বোভারি—৩৭, ৩৯, ৪০, ২৩৬, ২৪৬
মাধব চাটুজ্যে—১১৯, ২৪৯
মারউড—৩২৬, ৩২৮
মার্সেল—৩৩২
মাসলোভা—৪৪
মিঃ মিকোবর—৩০, ১০১

মিছিল—২৬৮, ২৮২
মিস মেয়ো—৮৮
মিসেস স্যামুয়েল্‌স্‌—৩২৯
মীরার দুপুর—৩৪৫, ৩৬৩
মুকুন্দরাম—২০
মুখের রেখা—৩৬৫
মৃর—১১৬
মৃণাল—২৪৩
মৃণালিনী—১১৪, ১২৩, ১২৬, ১৩৩, ১৩৭
মৃণ্ময়ী—২২৯
মেঘ ও রৌদ্র—১৮৮, ১৮৯, ১৯০, ১৯১, ১৯৭, ২৪৮
মেজদিদি—২৬৫, ৩২২
মেবিয়ন—৩২৬
মেরিডিথ—৭০
মোপাসাঁ—১০, ৪৩
মোমের পুতুল—৩৪৭, ৩৬৪
মোহানা—৩৩৩, ৩৩৪, ৩৩৫
ম্যাজিক মাউণ্টেন—৯, ২২, ৩৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৩২৪, ৩২৬
শ্রীমতী ম্যালেন্স—৯০, ৯১, ৯২

য

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত—২৭৮
যশোদা—৩১৮, ৩১৯
যাদব—৩১৭, ৩১৯
যুগলপ্রসাদ – ৩০৪, ৩০৮, ৩০৯
যুবনাশ্ব —২৮২
যোগানন্দ—৩২৯
যোগাযোগ—৩৯, ৪৫, ৪৮, ১৬১, ১৬২, ১৭০, ১৭১, ২২৩—২২৭, ২৭৩
যোধপুরী—১৫৩

র

রঙ্গলাল—১১৬
রঘুবর প্রসাদ—৩০৭
রজনী—১১৪, ১১৫, ১২০, ১২১, ১২৪, ১২৬, ১৩৪, ১৪৩, ১৫৪
রত্নদীপ—২৩০, ২৩১, ২৭১
রবিন্‌সন্‌ ক্রুশো—৩১, ৪৭, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬২
রবীন্দ্রনাথ—৫৭, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭১, ১৪৯, ১৫০, ১৫২, ১৫৭—২২৭, ২২৯, ২৩০, ২৩২, ২৩৪, ২৩৬, ২৩৭, ২৪০, ২৪৭, ২৪৮, ২৪৯, ২৫০, ২৫১, ২৬৭, ২৬৮, ২৬৯, ২৭০, ২৭৬, ২৭৯, ২৮২, ২৮৩, ২৮৪, ২৮৯, ৩০১, ৩০২, ৩২১, ৩২৩, ৩৩৮, ৩৪৬
রবীন্দ্রনাথ: কথাসাহিত্য—১৬৭
রমলা—৩৩৪, ৩৩৬
রমা—২৩৩, ২৩৮, ২৩৯, ২৪০, ২৫১, ২৫২, ২৫৩
রমাপদ চৌধুরী—৩৪২, ৩৪৮, ৩৫৭
রমাপতি—১৯৯, ২৪৯
রমাসুন্দরী—২৩০
রমেশ—২৩৩, ২৩৪, ২৩৯, ২৪০, ২৫১, ২৫২, ২৬৫

রমেশচন্দ্র দত্ত—৬২, ৬৩, ৭৭, ৭৮, ৮০ ২৪৭, ২৪৯

রস—৩৫২

রাইকমল—২৮৭

রাখাল—২৩১, ২৭১, ২৭৩

রাজর্ষি—১৫৯, ১৭৩

Rajmohon's Wife—১১৩

রাজলক্ষ্মী (শ্রীকান্ত)—২৪১, ২৫৯, ২৬০ —২৬৪, ২৭৮

রাজলক্ষ্মী (চোখের বালি)—১৭৫, ১৭৬, ১৭৭, ১৮৪, ১৮৫, ২৩৩

রাজসিংহ—৩৭, ১২১, ১২৪, ১২৬, ১৩৫, ১৪৯—১৫৪

রাজু পাঁড়ে—৩০৪

রাজেন—৩৫২, ৩৬৫

রাধা—২৮৮, ৩৪৬, ৩৫৫

রামতনু লাহিড়ী—৯৬

রামদীন—২১১

রামমোহন—৭৬, ৮১, ৮২, ৮৫, ৮৭, ১০৩

রামরাম বসু—৮৯, ৩৫৬

রামেশ্বর—২৯২, ২৯৭

রাসকল্‌নিকফ—৪৩, ৪৪, ৪৫

রাসবিহারী—২৭২

রাসবিহারী সিং—৩০৪, ৩০৬

রাস্কিন—১১৫

রিনা ব্রাউন—৩০০

রিচার্ডসন—১৫, ১৬, ১১৩

রুশো—১২৯

রেজারেকসন—২৩, ৩৯, ৪৪, ২৯৫

রেশমী—৩৫৬

রোমিও জুলিয়েট—২৩৬

রোহিণী—৪৫, ৪৬, ৪৮, ৬৫, ১২১, ১২৪, ১২৫, ১৩৫, ১৪১—১৪৯, ১৭৩, ১৭৪, ১৮২, ১৮৪, ২৩৫, ২৩৭, ২৩৮, ২৪৬

ল

লখাই—৩৫১

লখিন্দর দিগার—৩৪৩, ৩৫১, ৩৬৬

লঘুগুরু—২৭৮

লছমি—২১১

লবঙ্গলতা—১২০, ১৩৪

লরেন্স—২১, ২২, ২৩

ললিতা—৩৮, ৭০ ৭১, ২০৮, ২০৯, ২১০, ২১২, ২১৩, ২১৪, ৩৩১

লালবাঈ—৩৫৭

লিপিকা—১৭১

লীলানন্দ—২১৬, ২১৮, ২১৯, ২২০, ২২২

লুসি—১২৯

লুৎফউন্নিসা—১৩১, ১৩৩

লেসলি স্টিফেন—১৬

লোকরহস্য—৭৫

শ

শঙ্কর—২৮৫

শঙ্খবিষ—৩৪৪

শচীশ—১৬২, ১৬৮, ১৭০, ১৮৭, ২১৬ —২২৩, ২৩৭

শরৎ—৭৭, ৭৮

শরৎচন্দ্র—৬৮, ৬৯, ১৭০, ২২৮—২৭০, ২৭৮, ২৭৯, ২৮৩, ২৮৪, ৩২১, ৩২২, ৩২৩, ৩৩৪, ৩৩৭, ৩৪৬, ৩৫২
শরৎ সরোজিনী—১৯১
শশিভূষণ (মেঘ ও রৌদ্র)—১৯০, ১৯২, ১৯৩, ১৯৫, ১৯৬, ১৯৭, ১৯৮
শশিভূষণ দাশগুপ্ত—২০৫
শশী—২৮৪, ২৮৫, ২৮৬, ২৯৫, ২৯৬, ৩১৪, ৩১৫, ৩১৮, ৩১৯
শহরতলী—৩১২, ৩১৭
শার্লট ব্রন্টি—৭০
শিবতোষবাবু—২২২, ২২৩
শিবরাম চক্রবর্তী—৩৫২
শিবনাথ—২৮৪, ২৮৫, ২৮৬, ২৮৮, ২৯০, ২৯৩, ২৯৪, ২৯৫, ২৯৭, ৩১৪, ৩৫২
শিবনাথ শাস্ত্রী—৯৬
শিলালিপি—৩৪৩
শেক্‌স্‌পীয়ার—২০, ১২০, ১৩৩, ১৭০, ২২৯, ২৬৫
শেলী—১৮, ৯৪, ১১৬
শেষ প্রশ্ন—২৩৪
শেষের কবিতা—১৭২
শেষের পরিচয়—২৬৬
শ্যামা (বঙ্কিমচন্দ্র)—১২৯, ১৩০
শ্যামা (স্বর্ণলতা)—১৫৭
শৈবলিনী—১৫৫
শ্রীকান্ত—১৬৬, ২৫৪, ২৬৪, ২৬৫, ৩২১, ৩২৩
শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—১২৬, ১২৮, ১৭৮, ১৭৯, ১৮০, ২১৬, ২৪০, ২৪১, ২৪৪, ৩৩০
শ্রীনাথ বহুরূপী—২৫৬
শ্রীবিলাস—১৬২, ১৬৬, ২১৬, ২২০, ২২২, ২২৩, ২৩৭
শ্রীশ—১২০, ১৩৪, ১৩৫

স

সতীনাথ ভাদুড়ী—৩৪২, ৩৪৮, ৩৫৮
সতীশ—২৪০, ২৪১
সত্যাসত্য—৩২০, ৩২১, ৩২২, ৩২৩, ৩২৪, ৩৩০
সন্তোষকুমার ঘোষ—৩৪২, ৩৪৪, ৩৬২, ৩৬৫
সন্দীপ—১৮৭, ২০২, ২১৫, ২১৬
সপ্তপদী—২৯০, ২৯৪
সব্যসাচী—১৬৬, ১৬৭
সর্বজয়া—৩০৩
সমরেশ বসু—৩৪২, ৩৪৬, ৩৪৮, ৩৫০, ৩৫২, ৩৫৯, ৩৬০, ৩৬১, ৩৬৫
সমাচার চন্দ্রিকা—৮৪
সমাচার দর্পণ—৮১, ৮২
সরীসৃপ—৩১২, ৩১৩
সংসার—৬৫, ৭৭
Sign of Four—৯
সাবিত্রী—২৪০, ২৪১, ৩৩৬
সাহিত্যপত্র—২০০
সাহেব-বিবি-গোলাম—৪৩, ৩৪৬, ৩৫৫
সিদ্ধার্থ—২৭০, ২৭১, ২৭২, ২৭৩

সীতারাম—১১৩, ১১৪, ১১৭, ১১৮, ১২৫, ১৫৪
সীমন্তনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়—৩৬৫
সুকুমার সেন—৯৮, ১৯১
সুচরিতা—৩৮, ৬৫, ১৬৩, ১৬৪, ২০১, ২০২, ২০৪, ২১২, ২১৩, ২১৪
সুচারু—৩৬৫
সুধা—৩৬৫
সুধী—৩২০, ৩২১, ৩২২, ৩২৩, ৩২৮, ৩২৯, ৩৩১, ৩৩৮
সুধীন্দ্রনাথ দত্ত—১৬৪, ১৭১, ১৭২, ২৩৫, ৩৩৫
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—৮৮
সুবোধ ঘোষ—৩১৩
সুবোধ সেনগুপ্ত—১১৮, ১৩৩, ১৪৫, ১৪৬, ১৪৭, ১৫২
সুরবালা—২৪৩
সুরেশ—২৪২, ২৪৩, ২৪৪, ২৪৫, ২৪৬
সুরেন্দ্র—১৪০, ১৪১
সুরেন্দ্র বিনোদিনী—১৯১
সূর্যমুখী—৪৬, ১২২, ১৩৫, ১৩৮, ১৩৯, ১৪২, ১৪৩, ১৮৫
সেনদিদি—৩১৪
সৈয়দ মুজতবা আলি—৩৪৯
সোনিয়া (ওঅর অ্যাণ্ড পীস)—৫১, ৫৪, ৫৫
Segur—১৫৪
সোনিয়া (ক্রাইম অ্যাণ্ড পানিশমেণ্ট)—৪৪, ৪৫
সোম ফরসাইট—২২৬
সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়—২৩০
স্কট—১৭, ৬১, ১১৬, ১৫০
স্তাঁদাল—১৯, ২০, ২৩, ২৫
স্বর্ণলতা—৬৩, ৭৮, ৯৫, ১০১, ১৫৬, ১৫৭
স্বদেশী সমাজ—২০০
স্মলেট—১৫, ১৬

হ

হবলাল—১৪৮
হরকুমার—১৯৩, ১৯৪, ২৪৮
শ্রীহরি ঘোষ—২৯০
হরিমোহিনী—৬৫, ১৬৫, ২০৪
হাওয়ার্ড ফাস্ট—৩১১
হার্ডি—১৯, ২২, ২৩, ৫৭, ২৮৯, ২৯১, ২৯৩
হান্স কার্স্টপ—৫১, ৫২, ৫৩, ৩২৪, ৩২৬
হারীত—৩৬২
হাঁসুলী বাঁকের উপকথা—২৮৭, ২৮৮, ২৯২, ২৯৩, ২৯৪, ২৯৬, ২৯৭, ২৯৯, ৩৪৭
হিমি—৩৬০
হীরা—৬৩, ১২২, ১২৪, ১২৫, ১৩৪, ১৩৫
হুতোম প্যাঁচার নক্শা—৭৫, ৭৮, ৯৩
হেন্‌রি জেমস্—১২, ১৯, ২০, ২৬, ৩০, ৩১১, ৩৫৭

হেমচন্দ্র (রমেশচন্দ্র দত্ত)—৭৭, ৭৮
হেয়াঙ্গিনী—২৩২
হের সেটেম্ব্রিনি—৫১, ৫৩, ৩২৪
হ্যামলেট—১০
হোসেন মিয়া—৩১৫, ৩১৬, ৩১৭, ৩১৮, ৩১৯

- - - - - -